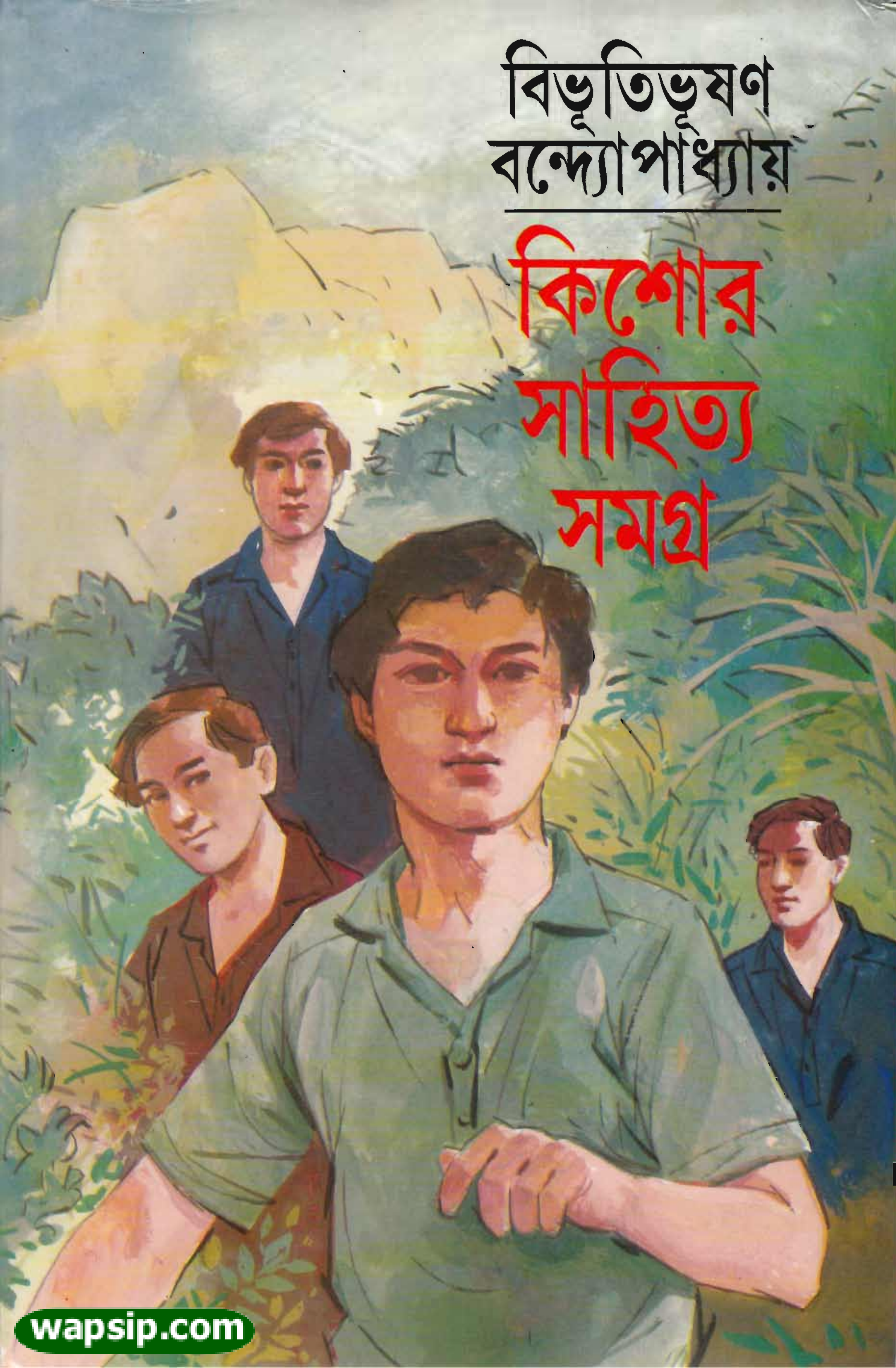

wapsip.com

সূচীপত্র

ভূমিকা	...	লীলা মজুমদার	[১]
আমার চোখে বাবার শিশুসাহিত্য ও			
আমার মন্ত্রগুরু বিভূতিভূষণ	...	তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	[৮]
উপন্যাস			
চাঁদের পাহাড়	...	...	১
মরণের ডঙ্কা বাজে	...	...	৭১
মিস্‌মিদের কবচ	...	...	১৪৫
হীরামানিক জ্বলে	...	...	১৮৭
সুন্দরবনে সাত বৎসর	...	...	২৫৫
গল্পগ্রন্থ (তালনবমী)			
তালনবমী	...	...	৩১৭
রঙ্কিনীদেবীর খড়্গ	...	...	৩২১
মেডেল	...	...	৩২৬
মসলাভূত	...	...	৩৩৩
বামা	...	...	৩৩৭
বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি	...	...	৩৪২
অরণ্যে	...	...	৩৪৮
গঙ্গাধরের বিপদ	...	...	৩৫৩
রাজপুত্র	...	...	৩৫৭
চাউল	...	...	৩৬০
অপ্রকাশিত গল্প			
ভূত	...	...	৩৬৪
এয়ারগান	...	...	৩৬৭
শুভ কামনা	...	...	৩৭০
গ্রন্থ-পরিচয়	...	...	[৩৭২]

wapsip.com

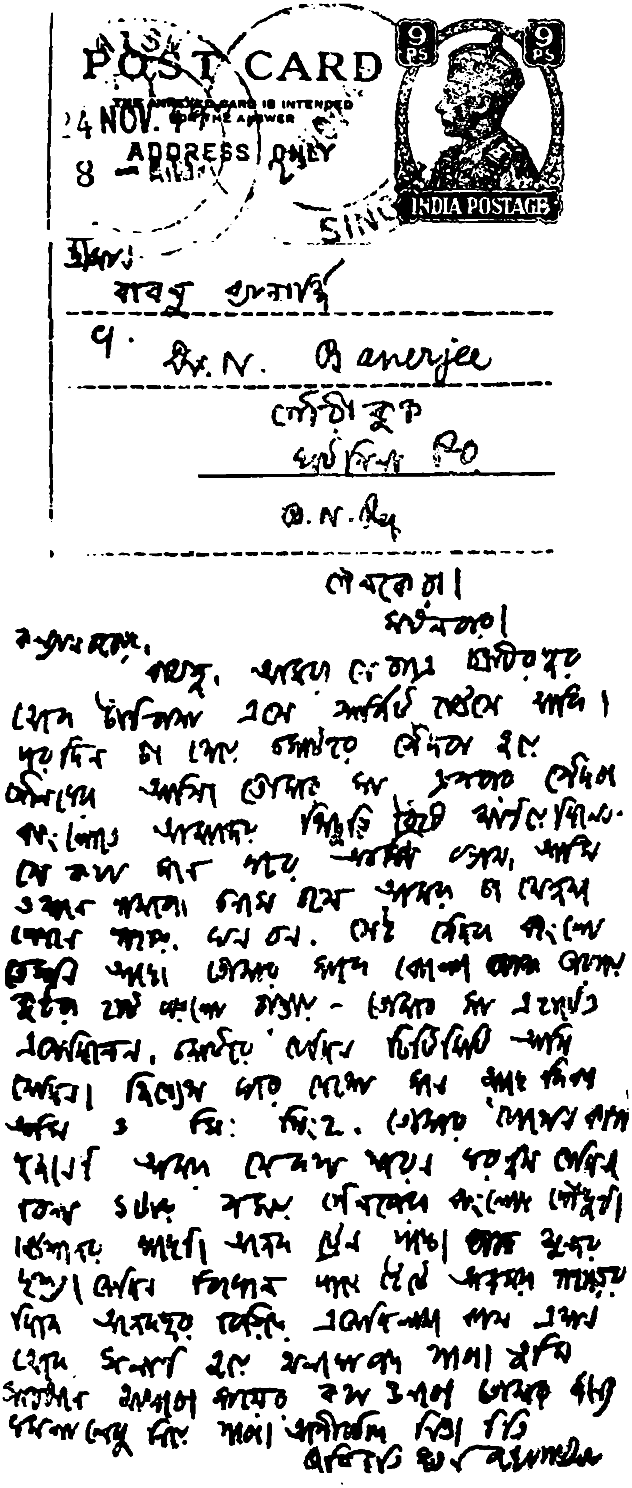
POST CARD

ADDRESS ONLY

INDIA POSTAGE

বাবলু ব্যানার্জী

Dr. N. Banerjee

গৌরীকুঞ্জ

ঘাটশিলা P.O.

বিভূতিভূষণ তাঁর বন্ধু বিহার সরকারের তদানীন্তন চীফ কনসার্ভেটর অফ ফরেস্ট শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হার সঙ্গে অরণ্যভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সেই সময়ে প্রবাস থেকে দুই বছরের শিশুপুত্র বাবলুকে (তারাদাস) উদ্দেশ করে লেখা এই পত্র।

পোস্টকার্ডের ঠিকানায় উল্লিখিত : বাব্‌লু ব্যানার্জী = পুত্র তারাদাস, ডাঃ এন. ব্যানার্জী = অনুজ স্বর্গীয় নুটবিহারী, গৌরীকুঞ্জ = ঘাটশীলার বাড়ির নাম— প্রথমা পত্নী গৌরীর নামানুসারে। পত্রে উল্লিখিত: মা' = বিভূতিভূষণের পত্নী— বাব্‌লুর মা = শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ সিংহ— যোগেন = কাকা = চীফ কনসার্ভেটর অফ ফরেস্ট শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হা।

পুত্র শ্রীমান তারাদাসকে লিখিত বিভূতিভূষণের পত্রের প্রতিলিপি

wapsip.com

ভূমিকা

গুণ-জ্ঞানের সব সম্মান, সব অভিমান খুলে ফেলে দিয়ে মানব-চেতনার একেবারে মূলে যদি পৌঁছনো যায়, দেখা যাবে সেইখানেই শিশু-সাহিত্য দানা বাঁধছে। এ যে-সে লেখকের কর্ম নয়। অতি দক্ষ যে রবীন্দ্রনাথ, তিনিও এ ব্যাপারে ততখানি সাফল্য লাভ করেন নি, যতখানি করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার। বিভূতিভূষণও এঁদের দলের, যদিও সবাই কিছু সমান ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। তবু যেমন করেই হক ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনার মূল মন্ত্র তাঁদের সবার জানা ছিল।

গোড়া থেকেই অসুবিধা। দেখতে হবে সুকুমার সুনির্মল চোখ দিয়ে, অথচ লিখতে হবে এমন পাকা হাতে যে একটি বাড়তি কথার প্রয়োজন হবে না, এতটুকু বাক্-চাতুরির সাহায্য লাগবে না। এ ধরনের লেখার উদ্দেশ্য শুধুই শিক্ষা-দানের চেয়ে অনেক বড়। এর ফলে ছোট ছেলেদের মনের পাপড়িগুলি একে একে খুলে যায় আর নির্মল অরুণালোক অন্তরকে স্পর্শ করে। কোনো অধীত বিদ্যা দিয়ে, কোনো গভীর অভিজ্ঞতা দিয়ে এ বিদ্যা লাভ করা যায় না। এই নিয়ে কেউ জন্মায়, কেউ জন্মায় না। যে এ গুণ নিয়ে জন্মায় না, সে যে হাজার তপস্যা করেও তাকে আয়ত্ত করতে পারে না, তার শত শত শোচনীয় প্রমাণ, একটু তাকালেই সব ভাষায় দেখতে পাওয়া যায়, খুঁজতেও হয় না। এ ক্ষেত্রে অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিকও হতাশ হয়েছেন। তাদের কথা ছেড়েই দিলাম যারা সরলভাবে বিশ্বাস করে যে বড়দের জন্য বই লেখা ব্যাপারে কড়ি না পেলেও, ছোটরা অত বোঝে-সোঝে না, তাদের ক্ষেত্রে কোমর বেঁধে নেমে পড়া যায়। হাত-ও পাকবে, নাম-ও হবে— আর ঘরে দু'পয়সা এলে তো আরো ভালো!

কিন্তু ঐ যে মানব-চেতনার মূলের কথা বলা হল, সেখানে অনুকৃত, কৃত্রিম, বা চেষ্টা-করে খাড়া-করা কোনো কিছুর জায়গা নেই। সেখানে কেমন একটা সহজ, আদিম, প্রাথমিক ভাব থাকে যে খাঁটি জিনিস ছাড়া কিছু নেয় না। সেখানে ভদ্রতার আড়াল বলেও কিছু নেই; যাকে যেমন দেখা যায়, তাকে ঠিক তেমনি করেই দেখানো হয়। খুব যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা হয়, তাও নয়। কারণ খাঁটি জিনিস ছাড়া সেখানে কিছু থাকার কথাই নয়। অবিশ্যি গল্প কাহিনীর চরিত্রদের মধ্যে অনেক ভুলচুক, দোষ-দুর্বলতা পার পেয়ে যায়, কারণ ন্যায়-অন্যায়ের মান সেখানে আলাদা। সেখানে যে-সব মন্দ লোকদের ক্ষমা করা হয়, তারা বাইরে মন্দ হলেও হৃদয়ে মন্দ নয়। সেখানকার নিয়মে যারা দুঃখী তারা কখনো একেবারে মন্দ হতে পারে না।

অনিয়মের রাজ্য নয় সেটা; ছোটদের মনে এক ধরনের পরিচ্ছন্নতা বিরাজ করে। সৃজনের কাজ চলে সেখানে, মানুষের ছেলেমেয়েদের মন তৈরি হয়, খেলো অকেজো কিছু থাকলে চলবে কেন। ছোটরা যা দিয়ে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বড় হবে, হাতে পায়ে শক্তি, চোখে দৃষ্টি, মনে উদারতা, বুকে বল, চিত্তে আনন্দ পাবে, শুধু তাই দিতে হবে। চুপ করে পড়ে থাকাও চলবে না, কেবলি বাড়া, কেবলি জানা, কেবলি চলা, চোখে কেবলি নব নব বিস্ময়ের উন্মেষ।

এত কথা মনে রেখে ছোটদের সাহিত্য রচিত হয়। বিচিত্র ব্যবস্থা সে রাজ্যে। জড়তার ঠাঁই নেই। মামুলী জীবন যাত্রাও যে রস-রহস্যে ভরপুর, সেটুকু দেখাতে না পারলে সব বাতিল হয়ে যায়। ভয়ের জিনিসের সঙ্গে লড়াই করা হয়। নিষ্ঠুররা কঠিন সাজা পায়। বিশ্বাসঘাতকরা বাঁচে না। ভীতুরা কষ্ট পেয়ে সাহসী হয়। ভালোদের ভালো হয়। সাদাকালো মোটামুটি ভাগ করা থাকে। সত্য সেখানে অ-নড়, যদিও বাস্তব আর কল্পনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তাছাড়া সবটার মধ্যে এক রকম

wapsip.com

প্রবলতা বিরাজ করে, যাকে কেউ বাগ মানাতে পারে না। এত সব অলিখিত নিয়মকানুন কেউ কাকেও শেখাতে পারে না। বেনে-বৌ পাখির মতো আপনা থেকেই গলায় ডাক আসা চাই।

যদিও বিভূতিভূষণ ছোটদের জন্য গ্রন্থ-রচনায় খুব বেশি সময় দিতে পারেন নি এবং যে-টুকু লিখেছেন তার সবগুলিও সমান নয়, তবু তিনি সহৃদয় শিক্ষক ছিলেন, ছোট ছেলে ঘেঁটে তাঁর জীবন কেটেছিল। বন-জঙ্গল, পল্লী-জীবন, গাছপালা ভালোবাসতেন। উদ্ভিদ-তত্ত্ব পড়তেন, শত শত গুল্ম-লতা বুনো গাছের নাম জানতেন, চিনতে পারতেন। পাখি দেখতেন, জন্তু-জানোয়ার দেখতেন, বনবাসীরা কি খায়, কি রকম জীবন কাটায়, তাও দেখতেন। ঘোর বনে গভীর রাতে চাঁদের আলোয় বসে থাকতেন। নির্জনতা তাঁর কাছে নৈঃসঙ্গ ছিল না। সমস্ত প্রকৃতি জগৎ তাঁকে সঙ্গ দিত। এ-সব মানুষরাই কবি হয়, এরাই ছোট ছেলেমেয়ে চেনে।

অভাবনীয় সব ভাবনা তাদের মনে জাগে। মনে হয় অগম্যের পরপারে গন্তব্য পথের নিশানা খুঁজে পাওয়া যাবে। মাঝখানে শুধু এই অলঙ্ঘ্য বাধাটুকু পার হলেই হল। তার পরেই নব নব দিগন্ত চোখের সামনে খুলে যাবে। তবে এ-সব জিনিস বর্ণনা দিয়ে, ভাষা দিয়ে বোঝাবার নয়; এদের মনের মধ্যে উপলব্ধি করতে না পারলে, কিছুই হয় না। সব বয়স্ক লোকেরা তা পারে না। যারা নিজেদের ছোটবেলার কথা ভুলে গেছে, তারা পারে না। যারা শুধু ছোটবেলাকার ঘটনাগুলি মনে রেখেছে, তখনকার মনটিকে কোথায় ফেলে রেখে চলে এসেছে, তারাও পারে না। তুচ্ছ কারণে সে-সব তীব্র বেদনার কথা তারা কি বুঝবে? ঘাসের উপর শিশির-বিন্দুতে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব তারা কি করে দেখবে? পোকাদের পিঁপড়েদের দরকারি কথার তারা কি খোঁজ রাখে? শিশু-মনস্তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন, তাঁরাও এ বিষয়ের ধার ধারেন না।

আর কেউ না জানলেও বিভূতিভূষণরা জানতেন। তা না হলে শুধু ঘটনা দিয়ে ছোটদের জন্য লেখা যায় না। তাঁরা জানেন যে ছোটদের মনের মধ্যে এক রকম সমগ্রতা, সম্পূর্ণতা থাকে, যার মধ্যে থেকে কোনো কিছুকে বাদ দেওয়া চলে না। জলের উপর বাতাসে ভেসে থাকা স্থির অচঞ্চল ড্রাগন ফ্রাইয়ের স্বচ্ছ মসৃণ ডানাতে সূর্য-কিরণের প্রতিফলনও যেমন ছোটদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে, তেমনি জগতের ভয়ঙ্করতম সর্বনাশও তারা বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করে। পৃথিবীর বেবাক শিশু-কাহিনী ঘাঁটলেও এই কথাই মনে হয়। যদি ভেবে দেখা যায় যাবতীয় লোক-কথার, রূপ-কথার পরীদের শিশুপাঠ্য গল্পের বিষয়-বস্তু কি, তা হলে এই সত্য আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হতে হয় যে সেগুলির সঙ্গে ছোটদের জীবনের কম-ই সম্বন্ধ থাকে। সেগুলির বিষয়বস্তুই হল বড়দের লোভ, হিংসা, দ্বেষ, ব্যর্থ প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিশোধ, নিষ্ঠুরতা। এর কোন্‌টিকে শিশুদের কোমল মনের উপযুক্ত বলা চলে? অথচ এই গল্পগুলিই আমাদের ছোটবেলায় নিশ্বাস বন্ধ করে পাঠ করে আমরা হাসি-কান্নার আনন্দসাগরে ভেসেছি। আসলে বিষয়গত অর্থের চেয়ে মর্মগত অর্থটি ছোটদের মনকে বেশি অধিকার করে। দুঃখীদের হারানো ছেলেমেয়ে ফিরে আসে, বুভুক্ষুরা পেট ভরে খেতে পায়, ডুবন্ত নৌকো আবার উদ্ধার হয়, ওদের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

এই গ্রন্থে বিভূতিভূষণের পাঁচটি ছোটদের বই সঙ্কলিত হয়েছে। তার মধ্যে চারটি নিছক দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প, ইংরিজিতে যাকে বলে অ্যাডভেঞ্চার স্টরি। একটি হল ছোট গল্পের সংগ্রহ, তার মধ্যেও রহস্য ও রোমাঞ্চের অভাব নেই। এ ধরনের কাহিনীর প্রধান উপজীব্যই হল রহস্য ও রোমাঞ্চ এবং প্রধান অবলম্বন হল সাহসিকতা। এদের একটা মোটামুটি মামুলী কাঠামোও দেখতে পাওয়া যায়, যদিও ঘটনাগুলি বিচিত্র। হয়তো এক বা একাধিক উৎসাহী কিম্বা ভাগ্য-বিড়ম্বিত মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ির নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা ছেড়ে বিষম বিপদ-সঙ্কুল পথে, রোমাঞ্চময় অভিজ্ঞতা আশায়, কিম্বা অবাস্তব আলেয়ার পিছনে বেরিয়ে পড়ে। সব সময় বেরোতেও হয় না; বিপদ আর লোমহর্ষণ অভিজ্ঞতা আপনি এসে ঘাড়ে চাপে। নায়ক গোড়াতে খুব ইচ্ছুক বা সাহসী না-ও হতে

wapsip.com

পারে। কিন্তু পাকে-চক্রে পড়ে তার মনুষ্যত্ব প্রকট হয়, কিম্বা তার অযোগ্যতা প্রমাণ হয়। শেষ পর্যন্ত গুপ্তধনটিকে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

অনেক অভিভাবক এই সব মন-গড়া অভিযানের কাহিনী পছন্দ করেন না। বিশেষ করে যখন পৃথিবীর বাস্তব ইতিহাসে দুঃসাহসিক ঘটনার অভাব নেই। তাঁদের মতে এ-ধরনের আজগুবি গল্প তরুণ পাঠকের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটায়, এতে বাস্তবের পথ ছেড়ে মনকে মরীচিকার পিছনে ধাবিত করানো হয়। তবু মনে হয় আজগুবি ও অবাস্তবকে প্রত্যাখ্যান করলে বিশ্বসাহিত্য কানা হয়ে যাবে। কোন্‌টা বাস্তব সত্য আর কোন্‌টা কল্পনা এটুকু জানলেই যথেষ্ট। অধিকাংশ সময়ই গল্পের ভূমিকাতে সে-কথা স্পষ্ট করে বলে দেওয়াই থাকে। ১৩৪৪ সালে লেখা 'চাঁদের পাহাড়ে'র ভূমিকায় বিভূতিভূষণ বলছেন, 'চাঁদের পাহাড় কোনও ইংরিজি উপন্যাসের অনুবাদ নয়, বা ঐ শ্রেণীর কোনও বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত নয়। এই বইয়ের গল্প ও চরিত্র আমার কল্পনাপ্রসূত। তবে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাকে প্রকৃত অবস্থার অনুযায়ী করবার জন্য আমি... কয়েকজন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি।...এই গল্পে উল্লিখিত রিখটারস্‌ভেল্ড পর্বতমালা মধ্য-আফ্রিকার অতি প্রসিদ্ধ পর্বতশ্রেণী এবং ডিঙ্গোনাক ও বুনিপের প্রবাদ জুলুল্যাণ্ডের বহু আরণ্য অঞ্চলে আজ-ও প্রচলিত।' বাস্তব ইতিহাস ভূগোলের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে, কাল্পনিক ঘটনা দিয়েই বিশ্বের শিশু-সাহিত্যের বহু ভালো ভালো রোমাঞ্চ-কাহিনী তৈরি হয়েছে। এর দরকারও আছে।

মনে পড়ে প্রায় চল্লিশ বছর আগে, এম্‌.এ. পাশ করেই এক বছর ধরে শান্তিনিকেতনে ইংরিজি সাহিত্য পড়িয়েছিলাম। এক দিন বারো তেরো বছরের ছেলে-মেয়েদের ক্লাস নিতে গিয়ে দেখি একটা রোগা ছেলে আমার দিকে প্রায় পিঠ ফিরিয়ে, গাছে ঠেস দিয়ে বসে কি একটা রংচঙে বই গিলছে। ক্লাসে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। বেজায় চটে গিয়ে তার কাছ থেকে বইটা নিলাম। পাতলা কাগজের মলাট দেওয়া চটি এক বাংলা বই, নাম তার 'তিব্বতী গুহার ভয়ঙ্কর'। মলাটের রংচঙে ছবিতে দেখি ভীষণ অন্ধকার গুহা থেকে একটা বিকট দানবের মুখ বেরিয়ে আছে। তার নিচে লেখা 'রোমাঞ্চ সিরিজ ২২ নং' অমনি আমার বিরক্তি দূর হয়ে গেছিল। আমি জানতাম এ-জিনিসের জন্যেও ঐ বয়সে একটা খিদে থাকে। তাই ভালো বই না পেলে শেষটা বাজে বই পড়তে হয়। সে-সময়ে ইংরিজিতে বহু দুঃসাহসিক কাহিনী পাওয়া যেত, কিন্তু ঐ হতভাগ্য ছেলের সম্ভবত এতটা বিদ্যা ছিল না যে ইংরিজি বইয়ের রস গ্রহণ করতে পারবে। 'চাঁদের পাহাড়' হয়তো এই ঘটনার তিন চার বছরের মধ্যেই লেখা হয়েছিল, যদিও আমি আরো পরে সিগনেট প্রেসে প্রকাশিত সংস্করণ পড়েছিলাম। এবং ঐ ছেলের কথা মনে করে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম।

আসলে শুধু প্রাত্যাহিক কাজ-কর্মও মামুলী ঘটনা, অর্থাৎ শুধু কাজের জিনিস মনে রঙ ধরায় না; তাই দিয়ে শিশু-সাহিত্য রচনা করতে হলে তার মধ্যে গ্রন্থকারের মনের রঙ ঢালতে হয়। শুধু রূপ থাকলেই তো আর হল না, তাকে দেখার চোখও তৈরি হওয়া চাই। সেই রূপকে সব সময় পৃথিবীতে বাস্তব আকৃতি নিয়ে যে থাকতেই হবে, তাই বা কি করে বলা যায়। মনগড়া রূপও বড় কম যায় না। পাঠকের মনের উপর তার প্রতিক্রিয়াও বাস্তব রূপের চেয়ে কম নয়। তবে সেই রূপকে সর্বদা সত্যের বাহন হতে হবে। এই জন্যই ফ্যান্টাসির সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু এ-সব গল্পে বিভূতিভূষণ ও-পথ ধরেন নি। যতখানি সম্ভব তিনি বাস্তবকেই অবলম্বন করেছেন। ঘটনা অবিশ্যি বানানো। প্রকৃতির বর্ণনা 'চাঁদের পাহাড়' গল্পের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন বিভূতিভূষণ প্রকৃতি-প্রেমিক ছিলেন বটে, কিন্তু সে হল তাঁর দেশের গ্রামের, কিম্বা প্রিয় ছোটনাগপুর, সিংভূম, মানভূমের চেনা-জানা প্রকৃতি। এতে কিন্তু যথেষ্ট বলা হয় না। বর্তমান গ্রন্থের অকুস্থল মধ্য আফ্রিকা, যে সব জায়গা তিনি কখনো চোখে দেখেন নি। শুনেছি শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকারীরা নিজদের দেখা জায়গা তাঁদের লেখার মধ্যে দিয়ে অপরকে দেখাতে পারেন। বিভূতিভূষণ

wapsip.com

আরো এক-কাটি বাড়া। না-দেখা জায়গাও তিনি অপরের সামনে জীবন্ত ছবির মতো তুলে ধরেছেন।৮

এর অবশ্য একটা কারণও আছে। গল্পের নায়ক শঙ্করের গ্রামের বাড়ির দারিদ্র্যক্লিষ্ট বৈচিত্র্য বিহীন জীবনের সঙ্গে অন্য নামের গাঁয়ে হলেও গ্রন্থকারের যথেষ্ট পরিচয় ছিল।

শঙ্করদের গাঁয়ের একজন ফেরারী জামাই আফ্রিকাতে নতুন রেলের লাইনের কাজে তাকে ঢুকিয়ে দিল। কাজটা অবিশ্যি নামে স্টেশন মাস্টারি হলেও কেরানীগিরি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেই নির্জন বনভূমিতে সিংহ ও সাপের অধ্যুষিত লীলাভূমির কেরানীও সাধারণ কেরানী হতে পারে না। তার উপর নির্জনতা আর সূর্য ডুবলেই গাঢ় অন্ধকার। রাতে সিংহের ভয়ে ট্রেনও চলত না। সে সব দিন রাতের ভীষণ-সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। চোখের সামনে যেন দেখা যায়। মনে হয় শুধু বই-এ পড়া মন-গড়া পরিবেশ এ নয়। হয়তো কেউ চাক্ষুষ দেখে এসে তাঁকে মুখে মুখে বলেছিল। বার্ড কোম্পানির ভূ-বিদ্যাবিষয়ের শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে বিভূতিভূষণের যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। শ্যামলকৃষ্ণের শৈশব ও প্রথম যৌবন আফ্রিকায় কেটেছিল, ঠিক ঐ পরিবেশেই। হয়তো স্পর্শকাতর রেকর্ডিং যন্ত্রের মতো শ্যামলকৃষ্ণের সেই অনুভূতি বিভূতিভূষণের মনের ওপর প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। তাই অল্প কথায় বলা সেই কাল্পনিক অভিজ্ঞতার বিষয় পড়ে গায়ে কাঁটা দেয়। নায়ক অবিশ্যি সেখানে বেশিদিন থাকে নি, গুপ্তধনের সন্ধানে বিদেশী সঙ্গীর সঙ্গে দুর্গম গিরি কান্তার মরু পার হয়ে ফিরেছিল।

"চাঁদের পাহাড়" নামটিও মন-গড়া নয়, সত্যিকার আফ্রিকার সত্যিকার পাহাড়ের স্থানীয় নামের অনুবাদ মাত্র। গল্পে বর্ণিত গাছ-পালা, পশু-পাখি, ভূ-গর্ভের সম্পদ, স্থানীয় অধিবাসীদের আচার, আচরণ, আহার-বিহার সব-ই বাস্তবানুগ। বনময় পাহাড় চড়ার, ক্লেশ-ক্লান্তি পর্যন্ত বাস্তব এবং রচয়িতার অভিজ্ঞতা-প্রসূত। যদিও যে অভিজ্ঞতা মানভূমে সিংভূমে আহৃত, আফ্রিকাতে নয়।

একজন সাহিত্যিকের মধ্যে একটি সমগ্র মননশীলতা থাকে, যদিও তাঁর প্রতিভা নানান্ দিকে বিচিত্রভাবে বিচ্ছুরিত হতে পারে। বলিষ্ঠ লেখকের নিজের সাহিত্য-সত্তার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না। যে বিভূতিভূষণ "পথের পাঁচালী" "আরণ্যক" লিখেছেন, তিনিই, এবং একমাত্র তিনিই নিঃসন্দেহে ছোটদের জন্য এই কাহিনীগুলি রচনা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে বর্তমান রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকাতে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের উক্তির কথা মনে পড়ে। বিভূতিভূষণের মূল সাহিত্য-পরিচয়ের বিষয়ে তিনি লিখেছেন, "...তার মূল সূত্রগুলি... একবার নির্দেশ করা যেতে পারে। ...জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সহজ বিস্ময়-দৃষ্টি, কতকটা তা কবি-সুলভ, কতকটা শিশু-সুলভ, কিন্তু সততায় সুস্থির; অকৃত্রিম নিসর্গানুভূতি বা প্রকৃতি-প্রীতি; অকুণ্ঠিত রহস্যানুভূতি বা অন্তর্মুখিতা এবং সাধারণ জীবনযাত্রার শ্রী ও মাধুর্যবোধ—এই চার সীমায় বিভূতিভূষণের মূল সাহিত্য পরিচয়কে স্থাপিত করা যায়।"

কথাগুলি অনুশীলন করলেই বোঝা যায় যে ঠিক এই উপাদানেই শিশু-সাহিত্যও তৈরি হয়। সমরসেট মম এক জায়গায় লিখেছিলেন যে গদ্যের আদর থাকে চল্লিশ বছর, কিন্তু কাব্যের আদর চিরন্তন। অর্থাৎ চল্লিশ বছরের মধ্যে যে কোনো গল্পের বইয়ের বিষয়-বস্তু পুরনো ও সে-কেলে হয়ে যায়, কাজেই পাঠকদের আর আকৃষ্ট করে না। কিন্তু কাব্য লেখা হয় হৃদয়ের চিরন্তন সামগ্রী দিয়ে; সেগুলি স্থান-কাল-পাত্রের হিসাবের বাইরে। এই প্রসঙ্গে এ কথাও মনে হয় যে গদ্যে লিখিত কয়েক শ্রেণীর রচনা আছে, যে-গুলি কাব্য-ধর্মী; তাদের আদরও সহজে ফুরোয় না। উত্তম রস-রচনা, ভ্রমণ-কাহিনী, দিন-পঞ্জিকা ও শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্য এই পর্যায়ে পড়ে।

তবে কথাটা শুধু সেরা লেখার বেলাতেই খাটে। শ্রীবুদ্ধদেব বসু অযোগ্য লেখার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "কালের নির্মম সম্মার্জনী" তাদের ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। ছোটদের বইয়ের বেলাও

wapsip.com

তাই। শুধু শ্রেষ্ঠগুলিই টিকে থাকবে। "চাঁদের পাহাড়" এমনি একটি বই। শুধু এই সংগ্রহেই নয়, বিশ্বের শিশু-সাহিত্যের যে-কোনো দরবারে এ রচনা সম্মান পেতে পারে।

নানান্ দিক দিয়ে অসাধারণ মনে হয় এই বইটিকে। শেষের দিকে একটি প্রাচীন চৈনিক প্রবাদ উদ্ধৃত আছে, তার মধ্যে দুনিয়ার দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের মনের কথার সারমর্ম বিবৃত—

"ছাদের আলসের চৌরস একখানা টালি হয়ে অনড় অবস্থায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার চেয়ে, স্ফটিক পাথর হয়ে ভেঙে যাওয়া অনেক ভালো, অনেক ভালো, অনেক ভালো।"

শ্রীগোপাল হালদারের উক্তিতে বিভূতিভূষণের সাহিত্য পরিচয়ের মূল সূত্রগুলির মধ্যে অন্তর্মুখিতাকে একটি বলে নির্দেশ করা হয়েছে। তাঁর ছোটদের জন্য লেখা বইগুলি সম্পর্কে এটা সত্য নয়। আসলে শিশু-সাহিত্য আদৌ অন্তর্মুখী নয় এবং হতেও পারে না। শিশু-সাহিত্যের গতিই হল বাইরের দিকে, বিশেষ করে রহস্য ও দুঃসাহসিক অভিযানের গল্পে।

হয়তো উক্ত সমালোচক বিভূতিভূষণের রচিত ছোটদের গল্প পড়েন নি। কিম্বা আরো শত শত বঙ্গীয় সাহিত্যরসিকদের মতো সেগুলি পড়েছেন বটে, কিন্তু তাদের তিনি স্থায়ী সাহিত্যের মর্যাদা দিতে চান না। তাঁর পরবর্তী মন্তব্য থেকে সেই রকমই মনে হয়। তিনি লিখেছেন, "ঘটনার ঘনঘটা বিভূতিভূষণের কোনো উপন্যাসে বিশেষ নেই।" আমরা তো দেখি তাঁর লেখা ছোটদের গল্পগুলি ঘটনার ঊর্মিমালার শিখরদেশের ফেনপুঞ্জের মতো বিপুল জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে অট্টহাস্য করতে করতে একেবারে পাঠকের হৃদয়ের তটে এসে আছড়িয়ে পড়ে।

সেই সঙ্গে আরো মনে হয় ছোটদের বই হবে জাপানী বাগানের মতো। শিল্পী সেখানে একটি বাড়তি পাতা, বা বোঁটা বা ফুল রাখেন না। কেটেছেঁটে সব বাদ দিয়ে, শুধু সৌন্দর্যের অন্তরের অন্তঃকরণকে রক্ষা করার জন্য যেটুকু না হলেই নয়, কেবলমাত্র তাকেই রাখেন। তখন যদি দৈবাৎ বাতাস লেগে একটি পাতা বা কুঁড়ি বা ফুল খসে পড়ে যায়, বাকি সবটা তার জন্য হাহাকার করতে থাকবে।

ছোটদের জন্য লেখার বেলাও তাই হবে। এতটুকু বাহুল্য থাকবে না। শুধু কাহিনীর এগিয়ে চলার জন্য, পরিস্থিতি প্রস্ফুটিত করার জন্য, সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, রসকে ঘনীভূত করার জন্য যতটুকু দরকার, তাই থাকবে। বড় বেশি প্রগল্‌ভতা ছোটদের গল্পে জায়গা পাবে না।

নিজের থেকেই এ-সব কথা বিভূতিভূষণের জানা ছিল। তাঁর গল্পের আরম্ভের শৈলীই বা কি মনোহর। কোনো অবান্তর ধানাই পানাই নেই; এক পদক্ষেপেই রচয়িতা পাঠককে গল্পের সিং-দরজা পার করিয়ে দেন। তারপর তার জন্য আর কাউকে ভাবতে হয় না, ঘটনার প্রবলতাই তাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় উপন্যাসের নাম 'মরণের ডঙ্কা বাজে' গল্প শুরু হচ্ছে, 'চাঁদপাল ঘাট থেকে রেঙ্গুনগামী মেল স্টিমার ছাড়ছে। বহু লোকজনের ভিড়...' আর দেখতে হয় না। নায়ক 'সুরেশ্বরকে কেউ তুলে দিতে আসে নি, কারণ কলকাতায় তার জানাশোনা বিশেষ কেউ নেই। সবে সে চাকরিটা পেয়েছে, একটা বড় ঔষধ ব্যবসায়ী ফার্মের ক্যানভাসার হয়ে সে যাচ্ছে রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর।' অমনি সুরেশ্বরের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে গল্পের নৌকো-ও পাল তুলে দিল। কোনো গল্পের-ই কোথাও কৃত্রিমতার এতটুকু খাদ নেই। অতি সহজ সরল কথা বলার ভাষা। চরিত্রগুলি যেন জীবন থেকে সদ্য তুলে নেওয়া। ঘটনাচক্রও যেন বড়ই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বাকি যা-কিছু সে-সব রহস্যের মেঘের আড়াল থেকে পাঠককে বিস্ময়ে বিমোহিত করে।

তার-ই মধ্যে রয়েছে গল্পকারের শ্রেষ্ঠ গুণ। সেটি হল এক ধরনের বলিষ্ঠ সততা, যার জোরে যা অভাবনীয় তাও সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। প্রায় সর্বদাই মন গড়া দেশ কাল না নিয়ে, বিভূতিভূষণ সাম্প্রতিক ও প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, জ্ঞান বিজ্ঞানের নানান তথ্য ও বিবরণী নির্ভুল ভাবে ব্যবহার করেন। তাঁর অনুশীলনের বিস্তার দেখে আশ্চর্য হতে হয়। যে জায়গার কথাই লেখেন, সেখানকার

wapsip.com

খুঁটিনাটি থাকে তাঁর নখাগ্রে। সেখানকার বনজঙ্গলের গাছপালার নাম, বর্ণনা, স্বাদ-গন্ধ কিছু বাকি রাখেন না। এ গল্পে বর্মার জাহাজের যাত্রীদের দৈনিক জীবনযাত্রা কারো সত্যিকার দিনপঞ্জিকার মতো শোনায়। সত্যিই লেখাপড়া শেষ করে কার্যপদেশে বিভূতিভূষণ ঐ সব অঞ্চল ঘুরেছিলেন। অবিশ্যি না ঘুরলেও, যেমন করে সম্ভব তথ্যগুলি নিশ্চয়ই সংগ্রহ না করে ছাড়তেন না।

দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী হলেও, এ গল্পের মেজাজ তাঁর অন্যান্য কিশোর-পাঠ্য উপন্যাস থেকে আলাদা। চীন-জাপানের যুদ্ধ ও চীনদেশের বিপ্লবের সূত্রপাতের তথ্য অবলম্বন করে এ বই লেখা হয়েছিল। বড় বেশি বাস্তব-আশ্রয়ী, তথ্য-বহুল, তাই মন বড়ই ক্লিষ্ট হয়। আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণকে যেন এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া দায় হয়। কামানের গোলা, বোমা, বারুদের গন্ধ, আকস্মিক আক্রমণ, শোচনীয় মৃত্যু, নিষ্ঠুর অত্যাচার, এ-সব আদপেই বিভূতিভূষণের মনের-মেজাজ-মতো জিনিস নয়। তবু মনে হয় জীবনের এই রূঢ়, নির্মম, সংহারের দিকটাকে শিশু-সাহিত্যে উপেক্ষা করলেও চলবে না। মানুষ তৈরির এ-ও একটা উপাদান। মানুষের মনে মানবতার প্রতিষ্ঠা হয় শৈশবে কৈশোরে, যে বয়সের ছেলেমেয়েরা এ বই পড়বে।

এই পাঁচটি বইয়ের মধ্যে 'মিস্‌মীদের কবচ'কে সব চাইতে দুর্বল রচনা বলে মনে হয়। ডিটেক্‌টিভ গল্প, কিশোর সাহিত্যে যার জনপ্রিয়তার তুলনা হয় না। কাহিনীর অকুস্থলটি মন্দ নয়। বিভূতিভূষণের প্রিয় বাংলার পাড়া-গাঁ। অবিশ্যি সেখানকার সাধারণ অধিবাসীরা তাঁর হাতে পড়ে একটু অসাধারণত্ব লাভ করেছে। ঘটনাটিও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার নয়। একজন নিঃসঙ্গ নিরুপদ্রব বৃদ্ধ রাতে খুন হয়েছেন। লোকে বলত নাকি বেজায় কঞ্জুষ। রান্নাঘরের মেজে খোঁড়া। চারদিকে সন্দেহের জাল নামল। দুঃখের বিষয় জালটি গোড়া থেকেই ছেঁড়া ছিল। খুনের উদ্দেশ্য, টাকা লুকোবার জায়গা, সাস্পেক্টদের মধ্যে কে বেশি সন্দেহজনক সব-ই বড় বেশি প্রকট।

কাজেই ডিটেক্‌টিভ গল্পের প্রাণরস সেই সাসপেন্স, সেটিই জমতে পারে নি। সেই দিক দিয়ে পাঠক হতাশ হলেও মিস্‌মীদের কবচের ব্যাপারটা রোমাঞ্চময়। পাড়াগাঁর পরিবেশটিও খুব ভালো। গাঙ্গুলীমশায়ের মাছঃ-ধরার প্রস্তুতি বড় মনোহর। গল্পের আরম্ভটিও বেশ, কিন্তু তবু পাকা হাতের ডিটেকটিভ গল্প এ নয়।

"তালনবমী" হল ছোটদের ছোট গল্পের সংগ্রহ। এই দশটি ছোট গল্পের সবগুলিকে হয়তো বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্পের তালিকা-ভুক্ত করা যাবে না, কিন্তু এগুলির বিচিত্র বিষয় ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে বিভূতিভূষণের বহুমুখী সাহিত্য-প্রতিভা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে চারটি অলৌকিকের কাহিনী আছে; তার মধ্যে রঙ্গিনীদেবীর খড়্গ— পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টির দিক থেকে প্রশংসনীয়। মেডেল ও গঙ্গাধরের বিপদও ভৌতিক গল্প। শুধু মশলাভূতের গল্পটি তেমন উৎরোয় নি। অলৌকিকের প্রতি লেখকের আকর্ষণের কথা সবাই জানে।

ছোটদের জন্য লেখা অধিকাংশ রহস্য ও রোমাঞ্চের গল্পের বিষয়-বস্তুই হল খুন, চুরি; ডাকাতি, ছেলেধরার কারসাজি, গুপ্তধন, অসাধ্য-সাধন ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে আকস্মিকের অবদান অনেকখানি। "বামা" গল্পে একজন ফাঁসুড়ে তার শিকারকে ভুলিয়ে এনে বাড়িতে তুললেও, তার দয়াময়ী বৌমার সুবুদ্ধির জন্য কাজ হাসিল করতে পারল না। বামাচরণের কাহিনীর বিষয় সেই চির-নূতন গুপ্তধন। এই বইয়ের বাকি চারটির মধ্যে তিনটি গল্প; "তালনবমী" "চাউল" ও "অরণ্যে" অপূর্ব ও অদ্বিতীয়। তালনবমী হল পাড়াগাঁয়ের গরীব ছেলের সাত পুরুষের জমানো খিদের গল্প। "চাউল"ও সেই জাতের-ই গল্প, তবে এতে ট্র্যাজেডির ভূমিকা বড়। পাথর ফাটাবার জন্য ডিনামাইট ব্যবহারের ফলে দরিদ্র শিশুর একমাত্র সহায় তার বাপের গুরুতরভাবে জখম হয়ে হাসপাতালে যাওয়া, তাঁর স্মৃতি-কথায় বর্ণিত বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছায়াপাতে বেদনায় বিধুর। "অরণ্যে" গল্প সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি। স্থান লেখকের প্রিয় বিচরণভূমি গালুডির প্রতিবেশী অঞ্চল। আখ্যান কিছু নেই,

wapsip.com

রাখা মাইন্সের কাছে ঘোর জঙ্গলে পাহাড়ে নদীর ধারের বিপদ-সঙ্কুল স্থানে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ। পড়ে মনে হয় বিভূতিভূষণের স্মৃতি-রেখা থেকে ভেঙ্গে আনা টুকরো, রসে ভরপুর, ভাবে গম্ভীর। একমাত্র "রাজপুত্র" হল রূপকথা।

গ্রন্থের পঞ্চম কাহিনীর নাম শুনে কান মুগ্ধ হয়। "হীরামানিক জ্বলে"। যেমন নাম, তেমনি গল্পও বটে। গ্রামের ছেলের দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প। গ্রামের নাম সুন্দরপুর, ছেলের নাম সুশীল। এক কালের ধনী পরিবারের গরীব বংশধর। পয়সাকড়ি না থাকলেও হাল-চাল বজায় আছে। বি. এ. পাস করেও ছেলেকে বসিয়ে রাখা হয়েছে; ওদের বাড়ির কেউ নাকি পরের চাকরি করে না। ছেলেটিকে ভালোমানুষ মনে হত। কিন্তু যেই সুযোগ এসে ডাক দিল, অমনি দড়াদড়ি কেটে সুশীল ভেসে পড়ল।

অস্বাভাবিক বা অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু অসাধারণ। যে কোনো পাঠকের মনে হতে পারে যে এ-রকম রোমাঞ্চময় অভিজ্ঞতা তার বরাতেও লেখা থাকতে পারে। রোমাঞ্চ যেন বড় কাছাকাছি এসে পড়ে। একজন দৈবাৎ-দেখা-হওয়া নাবিকের প্ররোচনায়, ভারত মহাসাগরে স্থিত, কাহিনী-কথিত চম্পাদ্বীপের রত্ন-ভাণ্ডার আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হল। ব্যথা, বিপদ, দুর্ভাগ্য যে থাকবেই— সে তো জানা কথা। তবু সে সবের সঙ্গে ক্রমাগত সংগ্রাম, অবিরাম পরিশ্রম, রত্ন-ভাণ্ডার আবিষ্কার, তার জন্য দুঃখময় দান দেওয়া, পরিশেষে একজন প্রিয়জনকে রেখে ঘরে ফেরা। অসাধারণ কিন্তু অসম্ভব নয়। এমন ছেলে তো কতই আছে, এমন ঘটনা সত্যি ঘটবে না-ই বা কেন? চম্পাদ্বীপের কিংবদন্তীও আছে। যদিও কাহিনীতে তার সঙ্গে ওঙ্কারধামের খুবই সাদৃশ্য দেখা যায়। তবু বলব আশ্চর্য রোমাঞ্চময় এ গল্প, ছোটবড় সকলের উপভোগ্য। সার্থক শিশু সাহিত্যের এ-ও আরেকটি পরীক্ষা, বড়দের পাকা বিচারেও উৎরোয় কি না। বাংলা শিশু-সাহিত্য এইরকম তথ্য-সমৃদ্ধ, কল্পনা-সুন্দর, রোমাঞ্চময়, দুঃসাহসিক অভিযানের আরো কাহিনীর জন্য আজও অপেক্ষা করে রয়েছে।

লীলা মজুমদার

wapsip.com

আমার চোখে বাবার শিশুসাহিত্য

শৈশবের রাতগুলো, প্রত্যেক মানুষের, কাটা উচিত হ্যারিকেনের আলোয়। হ্যারিকেনের মৃদু আলো, যা অন্ধকারকে যতটা দূরীভূত করে তার চেয়ে বেশি করে তোলে রহস্যময়, বিশেষ করে শিশুর মনে এক আশ্চর্য জগৎ তৈরি করে দেয়। আলোর সঙ্কীর্ণ বৃত্তের বাইরে সে যেন এক না-দেখা পৃথিবী, এক রোমাঞ্চকর জগৎ। আমার ছোটবেলা কেটেছে হ্যারিকেনের আলোয় আর বাবার বই পড়ে। রাত্তিরে যখন মাঝে মাঝে পড়বার ঘরে খাটের ওপর 'চাঁদের পাহাড়' নিয়ে বসতাম, পড়তে পড়তে আসতাম বুনিপ-এর প্রসঙ্গে, মনে আছে তখন ভয়ে আর খাট থেকে পা নামাতে পারতাম না। যেন পা নামানো মাত্র খাটের নিচে থেকে কেউ খপ্ করে পা ধরে টেনে নেবে। খাটের তলাটা নিতান্ত পরিচিত স্থান, সে বয়সে লুকোচুরি খেলবার জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হত। অথচ রাত্তিরে সেটাই ভীষণ ভয়ের জায়গা হয়ে উঠত। তখন বোধহয় দু'আনা (আমার তৎকালীন দৈনিক হাতখরচ— দাদামশাই দিতেন) জরিমানা দিতে অনায়াসে রাজী হতাম, কিন্তু জ্যামিতির প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার ভয় দেখিয়েও কেউ আমাকে খাটের তলায় ঢোকাতে পারত না। এখন তো চারদিক বৈদ্যুতিক আলোয় আলো হয়ে গেছে— বাচ্চারা আর হ্যারিকেনের আলোয় পড়াশুনো করে না। সব অন্ধকার পালিয়ে গিয়ে বাসা বেঁধেছে পৃথিবীর কিছু মানুষের মনে। সেখানে খুব অন্ধকার। প্রাত্যহিক খবরের কাগজ খুললেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে আর বেঁচে নেই— এতে আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি অসামান্য হলেও আর একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। এসব দেখে যেতে হয় নি। দুঃখ পেতেন।

ছোটদের জন্য লেখা (শুধুই কি ছোটদের জন্য?) বাবার সব বইয়ের মধ্যে আমার সব চেয়ে প্রিয় 'চাঁদের পাহাড়'। বস্তুত আমাকে রোম্যান্সপ্রিয় করে তুলেছে এ বই। সাত-আট বছর বয়স থেকে কতবার, কত জায়গায় এবং কত অবস্থায় যে এ বই পড়েছি তা আর কি বলবো! বইটার প্রায় পুরো আখ্যানভাগ আমার মুখস্থ এবং আমি অনেক বন্ধুর কাছে গল্পটা কিছুটা অভিনয় করে বহুবার বলেছি। গল্প বলতে গেলে আমার একটু অভিনয়ের ঢঙ্ এসে যায়। ঠাকুরদা কথক ছিলেন। রক্তের প্রভাব বড় সাঙ্ঘাতিক।

বাবার লেখা আমাকে অনেকবার অনেকভাবে সাহায্য করেছে। একটা ঘটনার উল্লেখ করতে খুব ইচ্ছে করছে।

তখন ক্লাস নাইন-এ পড়ি— রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম-এর হোস্টেলে থাকি। একদিন বিকেলে শিক্ষক বনাম ছাত্রদের ক্রিকেট ম্যাচ্ দেখতে দেখতে অনুভব করলাম জ্বর এসেছে। গ্যালারি থেকে উঠে হাসপাতালে গেলাম। আমাদের স্কুলেরই হাসপাতাল—নিজস্ব। ডাক্তারবাবু একনজর দেখেই বললেন—হাম হয়েছে। আর হোস্টেলে যেতে হবে না, শুয়ে পড়ো বেডে। বেড দেখিয়ে দেওয়া হল। যথাদিষ্ট সে রকমই করলাম। সমস্ত ঘরে আর কেউ নেই, কেবল লম্বা হলের প্রায় শেষ প্রান্তে একটি ছেলে ছাড়া। তার নাম সাধন তালুকদার। পা ভেঙে পড়ে ছিল। সারাদিন একাকীত্ব ভুসো কম্বলের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরত। একা থাকার অভ্যেস নেই মোটে। তখন নতুন গেছি হোস্টেলে। একদিন আর থাকতে না পেরে কনুই-এ ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বললাম— ভাই সাধন, একটা গল্প শুনবি?

শুরু করলাম 'চাঁদের পাহাড়'। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনদিন ধরে বলেছিলাম। দাঁড়ি-কমাও বোধহয় বাদ দিই নি আর তার সঙ্গে ফাঁকে-ফোঁকরে নিজের কিছু মালমশলাও ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। একাজ আমি এখনো করে থাকি। যে কারণেই হোক, বন্ধুরা আমার মুখে গল্প শুনতে ভালোবাসে। বলার

wapsip.com

সময় গল্পটা আমার এত নিজের দাঁড়িয়ে যায় যে আমার রয়্যালটির ভাগ পাওয়া উচিত। চেকভ্, মোপাসাঁ— কাউকে বাদ দিই না।

যাই হোক্, একথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না যে, মৃত্যুর বারো বছর পরেও বাবা হাসপাতালে রোগশয্যায় শায়িত এবং একাকীত্বের দ্বারা বিপর্যস্ত তাঁর সন্তানকে আনন্দিত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন। গল্প শেষ করার পরের দিনই ভাত পথ্য পেয়েছিলাম।

বাবার অস্তিত্ব মোড়া ছিল একটা কবিত্বের আবরণে। ছোটদের জন্য লেখা বইয়েও তার অভাব নেই। আলভারেজ যখন জ্বরের ঘোরে বলে যাচ্ছে তার জীবনকাহিনী—সে ঘটনাটাই বা কম কিসে? জিম কার্টারের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের এক জায়গায় তাঁবু ফেলেছে আলভারেজ। জিম আক্রান্ত হয়েছে বুনিপ-এর হাতে— যার পায়ে তিনটে মাত্র আঙুল। জিম মারা গেলে আলভারেজ তিন আঙুল-বিশিষ্ট অপদেবতার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে হাজির হয়েছে এক গুহামুখে। তখন বিশালদেহ গাছেদের মাথায় শেষবেলার পড়ন্ত রাঙা রোদ্দুর। যাঁরা আমার এই লেখা পড়ছেন, তাঁরা দয়া করে 'চাঁদের পাহাড়'-এর ঐ বিশেষ অংশটুকু ভালো করে পড়ে দেখবেন। একে কবিত্ব না বললে কবিত্ব আর কাকে বলে তা আমার জানা নেই।

আলভারেজকে বড়ো ভালো লাগে। তার সেই রোদে পোড়া তামাটে মুখ, দৃঢ় চিবুক, ঋজু দেহ—এসব মনে ভীষণ এক ছাপ ফেলেছে। ডিয়েগো আলভারেজ—যে শয়তানকেও ভয় করে না। যে ক্র্যাক্-শট, অব্যর্থ লক্ষ্যে যে উড়িয়ে দিতে পারে মাটাবেল সর্দারের মাথার খুলি তার উইন্‌চেস্টার রিপিটার দিয়ে। এমন মানুষকে ভালো না বেসে উপায় নেই। বোধহয় আমরা অনেকেই অনেকদিক দিয়ে দুর্বল বলে আমাদের অবচেতন মন খোঁজ করে এমন একজন দৃঢ়চেতা মানুষের।

বেশি কথা বলে লাভ নেই। মোটের ওপর বলি, বইখানা আমার এমনই প্রিয় যে, কেউ যদি বলে—তারাদাস, তোমাকে এখুনি এককোটি টাকা দিচ্ছি, যেমনভাবে ইচ্ছে খরচ করতে পারো— কিন্তু একটি শর্তে, আর কখনো 'চাঁদের পাহাড়' পড়তে পাবে না। তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ সেই লোকটিকে জাহান্নমে যেতে অনুরোধ করব এবং আবার বসে যাবো 'চাঁদের পাহাড়' নিয়ে।

'হীরামানিক জ্বলে' সম্বন্ধে ঐ একই কথা খাটে। জামাতুল্লা-বর্ণিত বিল্মমুনির দেশের কথা চোখবুজে একা বসে ভাবলে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দেয়। বাবা ছিলেন কবিত্বের আবরণের মধ্যে enveloped, encased— চাঁদ, ফুল এবং শাড়ির আঁচল নিয়ে ন্যাকা কাব্য নয়, ক্ষুরধার অসি হাতে অজানার আহ্বানে লাল কাঁকড়া অধ্যুষিত বেলাভূমি দিয়ে ঘেরা প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ বুকে নিয়ে পড়ে থাকা এক জনহীন দূরপ্রাচ্যের দ্বীপে যাত্রা করার মধ্যে যে রোম্যান্টিক কাব্য আছে—এ হচ্ছে তাই। মাঝে মাঝে আমার নিজেরই অবাক লাগে। বাবা বাঙালী, বাঙলাদেশের এক সাধারণ পাড়াগাঁয়ের ছেলে। এই ভীষণ জীবনীশক্তি এবং সুদূরপ্রসারী কল্পনা তাঁর মধ্যে কিভাবে এল। একজন গড়পড়তা বাঙালী এতদূর কল্পনা করার সাহসই পাবে না। বাবা যদিও নিজে এমন কোনো অভিযান করেন নি, কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সুযোগ পেলেই বাবা এ ধরনের ঝুঁকি নিতে একটুও দ্বিধাবোধ করতেন না। এ ব্যাপারে বাবাকে আমি থর হেইয়েরডালের সমকক্ষ মনে করি।

খলচরিত্র বাবার লেখায় নেই বললেই হয়। 'হীরামানিক জ্বলে'—উপন্যাসে ইয়ার হোসেন-এর চরিত্রটিকে বাবা বোধহয় খলচরিত্র হিসেবে আঁকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে ইয়ার হোসেনও যেন যথেষ্ট খল হয়ে উঠতে পারে নি। আসলে বাবার ভেতরে ঘোরপ্যাঁচ এতই কম ছিল যে মনের সুখে খলচরিত্র সৃষ্টি করা আর তাঁর দ্বারা হয়ে ওঠে নি। উপন্যাসের শেষে ইয়ার হোসেন যেন অনেকটা নরম হয়ে আসে, পূর্ব্বের সে দাপট কমে যায়। বরং একটু কষ্টই লাগে তার জন্য।

বিল্মমুনির দেশে জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে এক দুঃস্বপ্ন দেখেছিল সুশীল। সে জায়গাটা আমার ভারি ভালো লাগে। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার আত্মা এসে যেন ডাক দিয়েছে সুশীলকে, তার পেছনে পেছনে

wapsip.com

সে হেঁটে চলেছে ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, রাইডার হ্যাগার্ডের 'শী' ছাড়া এমন বর্ণনা অ্যাডভেঞ্চার গল্পে কখনো পড়ি নি। আমাদের দেশে ছোটদের জন্য অ্যাড্‌ভেঞ্চার বই লেখার নিয়মই—যেন যত পারা যায় খুনখারাপি, উড়োচিঠি, মারপিট, গুপ্তধনের ম্যাপ—এইসব দিয়ে বইখানা ঠেসে দেওয়া। কিন্তু বাচ্চাদের চোখ খুলে দেবার, কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তোলবার দায়িত্বও যে শিশুসাহিত্য-রচয়িতার। বাবার লেখায় যে poetic fantasy আর grotesque-এর সন্ধান আছে, তাতেই কিশোরদের মন যে স্বপ্নে বুঁদ হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত আর একজন আছেন। তিনি শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী লীলা মজুমদার। তাঁর 'পদিপিসির বর্মিবাক্স' পড়তে পড়তে ছোটবেলায় একটা বেশ বড় মার্বেল প্রায় গিলে ফেলেছিলাম অন্যমনস্কভাবে। শিশুসাহিত্যের স্বীকৃত ও ক্লাসিক লেখকদের নাম আর করলাম না— তাঁরা তো হৃদয়ে আছেনই।

বাবা বড় নিষ্ঠুর লেখক ছিলেন। 'হীরামানিক জ্বলে' উপন্যাসের শেষে অমন খাঁচাকলে ফেলে সনৎ-কে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলে দেবার কোনো মানে হয়! মনটা হায় হায় করে ওঠে সনৎ না ফেরায়। ছোটবেলায় ঐ জায়গাটা পড়বার সময় চোখে জল আসত। এখনো সমুদ্রের ধারে কোথাও বেড়াতে গেলেই আমার সুলু সাগরের সে বিস্মৃত দেশের কথা মনে পড়বেই। বেলাভূমিতে চোখ নিচু করে লাল কাঁকড়া খুঁজতে খুঁজতে কতবার ভেবেছি চোখ তুললেই নজরে পড়বে জঙ্গল, আর ভেতরে পড়ে আছে বিশাল ধ্বংসস্তূপ— রাত্তিরে যেখানে হিন্দু সভ্যতার অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায়।

'মরণের ডঙ্কা বাজে' ছোট লেখা। চীন-জাপানের যুদ্ধে দুই বাঙালী ছেলে গিয়েছিল জাপানী আক্রমণের সামনে কম্পমান চীনকে সাহায্য করতে। এ বইটায় আমার সবচেয়ে ভাল লাগে কতকগুলো ডিটেলের ব্যবহার। ছোটবেলায়—তখন 'অল কোয়ায়েট' পড়ি নি— 'যুদ্ধ' বলতেই মনে পড়ত 'মরণের ডঙ্কা বাজে'-এর ঘটনাগুলো। বাবাও সম্ভবত স্বচক্ষে যুদ্ধ দেখেন নি। কিন্তু কাওয়াসাকি বম্বার-এর ধ্বংসলীলার কথা পড়লে মনে হয় লেখক ঘটনাস্থলে বসে নোট নিচ্ছিলেন। দু-একটা ডিটেলের কথা না বলে থাকতে পারছি না। এ থেকেই বোঝা যায় বাবা কাব্যের ঘোরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লিখতেন না। চারদিকে ভীষণ সতর্ক নজর ছিল। যুদ্ধের মধ্যে বিমল আর সুরেশ্বর এক কম্যান্ডারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে, তিনি বসে আছেন একটা উলটো কলসীর ওপর। ব্যাপারটা আমার এখনো মনে আছে। যুদ্ধের অত ঘনঘটার বর্ণনার মধ্যে লেখক ভুলে যাননি যে কম্যান্ডারের উলটো কলসীর ওপরে বসে থাকার কথাটাও লিখতে হবে। এক জায়গায় বিমলকে জাপানীরা ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এখুনি তাকে গুলি করে মারা হবে (অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে বেঁচে গেল)। বিমলের সামনে তার আগে অন্য দু'জন চীনাম্যানকে গুলি করা হল। সেই জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিমলের কিন্তু মা-বাবা-দেশ-গ্রাম-জীবন কোনকিছুই মনে হল না। শুধু মনে হল জাপানী রাইফেলে তো খুব কম ধোঁয়া হয়। আশ্চর্য লেখক! আশ্চর্য কৌশল! একটু কাঁচা লোকের হাতে পড়লেই এখানে হরেক রকম আগড়ম-বাগড়ম লেখা হোতো। কিন্তু অভিজ্ঞ লেখক জানেন, নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে মানুষ benumbed হয়ে যায়, বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে। তখন বরং ঐ তুচ্ছ জিনিসগুলোই চোখে পড়ে আরো বেশি করে। ডিটেলের কাজ আর এক জায়গায় আছে খুব চমৎকারভাবে। 'অপরাজিত'-এ অপুর যখন বিয়ে হচ্ছে—তখনকার ঘটনা। বিয়ের রাত্তিরের অনেক ঘটনাই অপু ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু একটা কথা মনে ছিল অনেকদিন। শামিয়ানার একধারে কে যেন একটা ডাব কাটছিল। ডাবটা গোল ও রাঙা, কাটারির হাতলটা বাঁশের। বিয়ের অত প্রয়োজনীয় গোলমালের মধ্যে অপুর চোখে পড়ল এবং মনে রইল শুধু একটা ডাব কাটার দৃশ্য। মানবমনের অতলে কি আছে সে সন্ধান না জানলে এত সহজে এ কথা লেখা যায় না।

'মরণের ডঙ্কা বাজে'-তে পাতায় পাতায় বর্ণনা আছে বিমল আর সুরেশ্বর সবুজ চা আর

wapsip.com

কুম্‌ড়োর বিচির কেক খাচ্ছে। দোকানে দোকানে ইঁদুর ভাজা ঝোলানো। বারবার বইটা পড়ে আমার ছোটবেলায় প্রায়ই কুমড়োর বিচির কেক খাবার ইচ্ছে হত এবং সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই, একবার ইঁদুরভাজা খাবার শখও হয়েছিল।

'পিজিন ইংরিজি' কথাটাও প্রথম পাই এখানে। চীনের সব রিক্‌শাওয়ালা বা দোকানদারই পিজিন ইংরিজিতে কথা বলত সে সময়। এখনো বলে কিনা জানি না। সে ভাষা পড়ে খুব মজা লাগত।

'তালনবমী' একটি ছোটগল্পের সঙ্কলন। তন্মধ্যে 'তালনবমী' গল্পটি আমার বিশেষ প্রিয়। আশা করে থেকে, ভোজ খাবার জন্য আশা করে থেকে, শেষপর্যন্ত ভোজে নিমন্ত্রিত না হলে একটি বাচ্চার কেমন লাগতে পারে, তা আমি ছোটবেলায় মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলাম। ফার্স্ট ইয়ারে যখন পড়ি, তখন 'দি ফেস্‌টিভ্যাল' নাম দিয়ে এর একটা অনুবাদও করেছিলাম বলে মনে পড়ে— এতই ভালো লাগত গল্পটি। অবশ্য সে অনুবাদ কখনো কোথাও প্রকাশিত হয়নি এবং কোনোদিন যে হবে, সে ব্যাপারে আমার চেয়ে নৈরাশ্যবাদী বোধহয় আর কেউ নেই।

'তালনবমীর' অন্যান্য গল্পগুলি সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু বলবার নেই। সবগুলিই আমার কাছে অতীব সুখপাঠ্য বলে প্রতীত হয়। 'মশলাভূত', 'বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি', এসব গল্প শৈশবে বড় বড় চোখ করে পড়তাম। পেছন থেকে কেউ ঠেলা দিলে গড়িয়ে পড়ে যেতাম হয়তো এবং সে অবস্থাতেও পড়ে যেতাম গল্পগুলো।

বাবার কোনো রচনাই সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে পড়িনি— পড়েছি রসিকের মন নিয়ে। ফলে সবকটিই ভীষণ ভালো লাগে। নিজের বাবাকে বারবার 'ভালো সাহিত্যিক' বলে জিগির দেবার ব্যাপারটা লোকচক্ষে হাস্যকর জানি, সে জন্যই সবাইকে অনুরোধ, কেউ দয়া করে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না আমার প্রিয় লেখক কে; কারণ তাহলে লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকে বাবার নামটাই করতে হবে।

আমার মন্ত্রগুরু : বিভূতিভূষণ

বাবার সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে অসুবিধের ব্যাপার। তার দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, বাবাকে এখনো আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। বাবার শিল্পীসত্তা আমার বোধশক্তির যে গণ্ডি—তার বাইরে। সেটা অনেক বড় জিনিস। দ্বিতীয় কারণটা ব্যক্তিগত। সেটা এই : বাবার সম্বন্ধে আমি কখনোই নিরপেক্ষ নই। সব সময়েই আমি বাবার দলে। ছোটবেলায়, আড়াই কি তিন বছর বয়সে, বাবার সঙ্গে আমার নানারকম খেলা জমে উঠতো। সে এক অদ্ভুত খেলা, কারণ বাবা তাতে আমার প্রতিপক্ষ ছিলেন না। দুজনে একই দলে খেলতাম। সেই থেকেই আমি সব ব্যাপারে ভীষণভাবে বাবার দলে। খুব মজার কথা সন্দেহ নেই। আমি বাবার বিশাল প্রতিভাকে সম্যক বুঝি না, তবুও সবার কাছে জাঁক করে বেড়াই—বাবা একজন বিরাট লেখক। মনে মনে (এবং কখনো কখনো প্রকাশ্যভাবেই) বাবাকে শেক্‌স্‌পীয়র, কালিদাস কিম্বা টলস্টয়ের সঙ্গে একাসনে বসাই। কেউ যদি অত্যন্ত সঙ্গত কারণেও বাবার কোনো রচনা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন, তাহলে আমি চেঁচামেচি করে ছেলেমানুষের মতো তার প্রতিবাদ করি এবং সে মন্তব্য বিশ্বাস করি না। কারণ আড়াই বছর যখন আমার বয়স তখন থেকে বাবা আমার দলের লোক—আমার বাল্যবন্ধু, আমার খেলার সঙ্গী। বাবা বলে ততটা নয়, যতটা বাল্যবন্ধু বলে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা আমার খুব গায়ে লেগে যায়।

wapsip.com

ছোটবেলা থেকে বাবার বই পড়ে পড়ে আমার জীবন মোটামুটিভাবে বাবার দর্শনের ছায়াতেই গড়ে উঠেছে। আমি এটাকে আশীর্বাদ বলে মেনে নিয়েছি ঠিকই কিন্তু এতে একটা অসুবিধে হয়েছে। আমাকে একজায়গায় দাঁড় করিয়ে যুগটা দৌড়ে এগিয়ে গেছে বহুদূর। অনেক পিছিয়ে পড়েছি এ যুগের চেয়ে। একজন নিয়ানডার্থালি মানুষকে হঠাৎ বিংশ শতাব্দীর নিউ ইয়র্কের ফিফ্থ্ অ্যাভেন্যুতে এনে ফেললে তার যে বিস্ময় হতে পারত—এ যুগের প্রতি আমার দৃষ্টি ঠিক তেমনি বিস্ময়াকুল। বিভূতিভূষণের সাহিত্য পাঠ করে যে পৃথিবীকে ভালোবেসেছি, সে পৃথিবী এখন কোথায়? সেই নদী, সেই অরণ্য, সেই গ্রহজগৎ এবং আনীহারিকাসৌরচরাচরব্যাপী বিশ্বটা ঠিকই আছে। কিন্তু এসব যার পটভূমি সেই মানবজগৎ বড় বদলে গেছে। কোথায় সে সব মানুষ যারা বিভূতিভূষণের রচনায় দুই জেলার প্রান্তে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে জেলা কেমন করে শেষ হয় দেখে অবাক হয়ে যেত, অথবা শুধুই বনের শোভা বাড়ানোর জন্য নিজের পয়সা খরচ করে গাছ লাগাত লবটুলিয়ার জঙ্গলে?

মানুষ বদলে গেছে ঠিকই, কিন্তু সান্ত্বনাও আছে—বিভূতিভূষণের রচনাতেই আছে। যে কালে আমরা বাস করি সেই বর্তমান কাল সময়ের পারাপারহীন সমুদ্রের একটা ছোট্ট ঊর্মি মাত্র। কোটি বছরের ব্যাপ্তিতে যে জীবনের পথ বিসর্পিত তার বাঁকে বাঁকে অনেক দুঃসময় অনেক মন্বন্তর। সে সব পার হয়েই অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হতে হয়। এখন দুঃসময়। তাতে কি? সামনে নিশ্চয়ই নতুন আলোর দিন। বাবার লেখা পড়ে এ বিশ্বাস আমার হয়েছে।

বাবা যখন মারা যান আমার তখন তিন বছর বয়স। অত শৈশবের স্মৃতি সাধারণত স্মরণ করা যায় না। কিন্তু বাবার সম্বন্ধে স্মৃতির ভাণ্ডার অত্যন্ত স্বল্প উপাদানে তৈরি বলেই বোধ হয় তা খুব তীব্র। ফলে চেষ্টা করলে আমি বিচ্ছিন্ন কতকগুলো ঘটনা মনে করতে পারি। বাবার কাঁধে চেপে ঘাটশিলার শালবনে বেড়ানো, বোম্বে মেল দেখতে যাওয়া—এসব খুব মনে পড়ে। দেশের বাড়ির বারান্দায় বাবা বসে আছেন, আমি, তিন বছরের শিশু, বারান্দার ধারের কি একটা গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে আনছি আর বাবাকে বলছি— বাবা, আলুভাজা খা। বাবা নকল খাওয়ার ভঙ্গি করছেন—এ দৃশ্যটাও খুব মনে পড়ে! বস্তুত ছোটবেলায় যেন বাবার অভাবটা ততখানি অনুভব করতে পারিনি, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে বয়স বাড়ছে, ততই মনের গোপন কোণে এক বীণা খাদের সুরে বারবার কেঁদে কেঁদে বলছে—নেই—নেই—নেই। আমার বয়স খুব বেশি নয় বলে আমার জীবনে সমস্যা নেই এটা ঠিক নয়। আশ্চর্য সব জাগতিক এবং নীতিগত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যখন অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করি, তখন বাবার জন্য প্রাণটা কেঁদে ওঠে। অনেক আত্মীয়ের মধ্যেও একা লাগে যে!

যখন কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম পুরী। মা আর বাবা পুরী বেড়াতে এসেছিলেন বহুদিন আগে। তখন আমার জন্ম হয় নি। সঙ্গে ছিলেন গজেনকাকু (সুসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র) এবং আরো অনেকে। মার কাছে সে গল্প অনেকবার শুনেছি রাত্তিরে-দুপুরে মার বুকের কাছে শুয়ে। পুরীর সমুদ্রবেলায় চাঁদের আলোয় একা বেড়াতে বেড়াতে আমার সে কথা মনে পড়েছিল। কবে সমুদ্র রূঢ় হাতে মুছে দিয়েছে বেলাভূমিতে সাতাশ বছর আগে আঁকা পাশাপাশি বাবা-মার পায়ের ছাপ। অথচ আজকের দিনটা যেমন সত্য—সেদিনটাও ঠিক তেমনি সত্য ছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ঢেউ-এর মাথায় জ্বলে ওঠা স্বতঃপ্রভ আলো দেখতে দেখতে মন আবার খুব স্বাভাবিক হয়ে এল। ভেবে দেখলাম এটাই নিয়ম। আমিই কি চিরকাল থাকতে এসেছি? আজ চল্লিশ বছর পরে হয়ত আমারই উত্তরপুরুষ এই পুরীর বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ভারাক্রান্ত মনে আমাকে স্মরণ করবে। আমি তখন পঞ্চভূতে মিশে গেছি। যে নিয়মের প্রতিকার নেই, শান্তি পাবার উপায় বোধ হয় তাকে শান্তভাবে মেনে নেওয়া।

নিবন্ধের মধ্যপথে বোধ হয় একটা কথা বলে নেওয়া ভালো। আমি ক'পাতায় বাবার রচনার কোনো সমালোচনা করব না বা সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কথাও বলব না। কারণ সে রকম যোগ্যতা

wapsip.com

আমার নেই আর বাবার সব লেখাই আমার ভালো লাগে। এই নিবন্ধে বাবার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ক'টি স্মৃতি এবং অনুভূতির কথাই বলব মাত্র। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন রচনা এগিয়ে যাচ্ছে অথচ লেখক এখনো আসল কথায় আসছে না কেন! আসল কথা আমি বহুক্ষণ শুরু করে দিয়েছি।

বাবাই মাকে প্রথম সমুদ্র দেখান। সেই কারণে সমুদ্র সম্বন্ধে মায়ের একটা দুর্বলতা আছে। ১৯৭১-এর জুন মাসে মাকে দীঘা বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। দুপুর বারোটায় দীঘা পৌঁছে একেবারে গাড়িসুদ্ধ বেলাভূমিতে নেমে পড়লাম। পথশ্রমের পর সামনেই সমুদ্র দেখে খুশীমনে সবাই এগুচ্ছি, হঠাৎ খেয়াল হল সঙ্গে মা নেই। মা কই? মা ছাড়া আমার কোনো আনন্দই সম্পূর্ণ হয় না। গাড়িতে ফিরে দেখি মা সামনের সীটের ওপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছেন। হঠাৎ আমার সেই দ্বিপ্রহরের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল—বাবা দেখ তোমাকে আমরা ভুলিনি। মা-ও না আমিও না। আমরা তোমাকে মনে রাখব। যতদিন বেঁচে আছি, যতদিন পৃথিবীর পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে এক একটি শান্ত আনন্দের সামনে দাঁড়াব, তখনই তোমাকে মনে করব। পার্থিব জীবনের চেয়ে অনেক বেশি করে তুমি আমাদের মধ্যে বেঁচে আছ।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্ল্যানচেট করা আমার রীতিমত নেশা ছিল। জন কেপলার থেকে শুরু করে ১৮২৭ সালে মৃত বৃটিশ যোদ্ধা ক্যাপটেন এন. পি. গ্র্যান্ট্ পর্যন্ত অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু বাবাকে বিশেষ কখনো আনবার চেষ্টা করি নি, যাঁকে হৃদয়ের ভেতরে অহরহ পাচ্ছি, তাঁকে ঘটা করে প্ল্যানচেটে ডাকার সার্থকতা খুঁজে পাই নি।

আমার স্বল্প স্মৃতি এবং মায়ের কাছে শোনা গল্পের ওপর নির্ভর করে বাবার একটি ভাবমূর্তি আমার মনে গড়ে উঠেছে। বাবাকে তো বেশিদিন পাই নি। ঐ ভাবমূর্তি দিয়েই বেশ কাজ চলে যায়। রাত্তিরে মায়ের কাছে শুয়ে গল্প শুনি। রাত্রি গভীর হয়, কথা বলতে বলতে মায়ের স্বর অশ্রুতে ভারী হয়ে আসে। আমি অবাক হয়ে শুনি নানা সাধারণ কথা। কেমন করে মা রান্না করে বাবাকে রোজ খেতে দিতেন, স্নান করতে যেতেন ইছামতী নদীতে। তারপর আছে বাবা-মার দেশভ্রমণের গল্প। বাবা মজা করতে ওস্তাদ ছিলেন। একবার মাকে বললেন—চলো, সালানপুর বেড়িয়ে আসি। অনেকদিন বেরুনো হয় না। অনেকদিন মানে অবশ্য মাস দুই। বাবা ঐ রকমই ছিলেন। চলতি কথায় যাকে বলে পায়ের নিচে সরষে থাকা, বাবার ছিল তাই। একজায়গায় দু'মাস থাকলে একেবারে ভীষণ হাঁপিয়ে উঠতেন। একটা nomadic মন বাবাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতো।

সালানপুর জায়গাটা বর্ধমান থেকে খুব কাছে। মা রাগ করে বললেন—আর বেড়াবার জায়গা পেলে না? লোকে বেড়াতে যায় দিল্লী—বেনারস—হরিদ্বার, আর তুমি চললে সালানপুর?

বাবা বললেন—আহা চলোই না কেন, সব সময় খালি দূরে বেড়াতে যেতে হবে তার কি কোন ধরাবাঁধা নিয়ম আছে নাকি? কাছে কি দেখবার জিনিস নেই?

অতঃপর সালানপুরের দ্রষ্টব্য সম্পর্কে বাবা মাকে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে পরের দিন ট্রেনে উঠে বসলেন। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল। একের পর এক স্টেশন যায় কিন্তু সালানপুর আর আসে না এবং বাবাও নামবার উদ্যোগ করেন না। মা ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করছেন—আর কতদূর? এ তো অনেক পথ আসা হল। বাবাও ক্রমাগত সান্ত্বনা দিয়ে চলেছেন—এই তো এসে পড়লুম বলে। ব্যস্ত হলে কি চলে?

মা প্রশ্ন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে শেষে ঘুমিয়ে পড়লেন। কয়েক ঘণ্টা বাদে জেগে উঠে দেখেন বিরাট এক স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে। গলা বাড়িয়ে মা স্টেশনের নাম পড়লেন—সেটা মোগলসরাই। তখন মায়ের ভীষণ সন্দেহ হয়েছে। বাবা তবুও বুঝিয়ে চলেছেন—সালানপুর আর বেশি রাস্তা নয়। শেষে যখন ট্রেন বিরাট এক নদী পেরুচ্ছে আর ওপারে দেখা যাচ্ছে প্রাচীন এক শহর, তখন মা বাবাকে একেবারে চেপে ধরেছেন—সত্যি করে বলো কোথায় যাচ্ছি?

wapsip.com

ততক্ষণে ট্রেন ওপারে পৌঁছে গেছে। বাবা নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন—তোমার সামনে বারাণসী! তারপরেই জোরে হেসে—কেমন বোকা বানিয়েছি?

এই হচ্ছে মায়ের কাশী ভ্রমণের ইতিহাস। *

এসব গল্প বলতে বলতে মা কেঁদে ফেলেন। আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বলি—কাঁদে না মা, লক্ষ্মী খুকি আমার, আমি তোমাকে আবার কাশী নিয়ে যাবো—হরিদ্বার, দেরাদুন—বাবা তোমাকে যে সব জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন, সে সব জায়গায় আমার সঙ্গে তুমি আবার যাবে। কাঁদে না।

সত্যি কথা বলতে কি, মায়ের মত এত ভালোমানুষ আমি কমই দেখেছি। এখন মাকে আমি খুকি বলে ডাকি, মা আমাকে বাবা বলে ডাকেন। আমি বাবা হয়ে গেছি, আর মা হয়ে গেছেন ছোট্ট মেয়ে। আমরা দুজনে বাবাকে আমাদের বুকের মধ্যে রেখে দিয়েছি। নিষ্ঠাবান ভক্তের মনে যেমন তার অজান্তেই অবিরত নামগান চলে—তেমনি বাবার কথা আমরা কখনোই ভুলে নেই।

এ পৃথিবীর ধুলো আমার কাছে পবিত্র। কারণ এর ওপরে একদিন বাবা হেঁটেছেন। যখনই কোনো সুন্দর ঝরনার ধারে কিংবা পাহাড়ের চূড়ায় শালবনের মধ্যে বসব। যখনই অস্তসূর্য অথবা পূর্ণিমার বিভিন্ন আলোয় বনভূমি স্বপ্নিল হয়ে উঠবে, তখনই আমি বুকের ভেতরে শুনতে পাব সেই মানুষটির চরণধ্বনি যে আমাকে তিনবছর বয়সে মায়ের কাছে ফেলে চলে গিয়েছিল। হয়তো আমরা দুজনে পাশাপাশি বসে দেখব সূর্যাস্ত—একই সঙ্গে, আমি জানতেও পারব না।

আমার রক্তে আছে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। আমি নিজে লিখতে ভালোবাসি। কিন্তু তা বোধ হয় হয়ে উঠবে না। কারণ বাবা দিবাকর। তাঁর তীব্র আলোকচ্ছটায় চার দিক উদ্ভাসিত। সে আলোর হাটে আমার ক্ষুদ্র প্রদীপের সামান্য আলো কারো নজরে পড়বে না। স্বনামে খ্যাত হওয়া হয়তো আমার হবে না। ছোটবেলা থেকে যা হয়ে আসছে তাই হবে—অর্থাৎ চিরকাল আমি পরিচিত হব বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে বলে। তা হোক, আমি যশ চাই না— অমরত্ব চাই না, আমি শুধু কল্পান্তর ধরে বারবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে হয়ে জন্মগ্রহণ করতে চাই। এর চেয়ে বেশি কিছুতে আমার দরকারও নেই, বিশ্বাসও নেই। জন্মজন্মান্তর ধরে শুধু বাবাকে চাই। নইলে আমার শৈশবের সেই পঞ্চাশ বছরের শিশু সঙ্গীটিকে আবার ফিরে পাব কি করে?

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

* ১৯৪৫ সালের পূজার ঠিক পরের ঘটনা। গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তখন কাশীতে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ওখানে যোগ দিয়ে বিভূতিভূষণ সস্ত্রীক আগ্রা, দিল্লী, হরিদ্বার ও মুসৌরী পর্যন্ত যান।

wapsip.com

wapsip.com

চাঁদের পাহাড় কোনও ইংরিজি উপন্যাসের অনুবাদ নয়, বা ঐ শ্রেণীর কোনও বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত নয়। এই বইয়ের গল্প ও চরিত্র আমার কল্পনাপ্রসূত।

তবে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাকে প্রাকৃতিক অবস্থার অনুযায়ী করবার জন্য আমি স্যার এইচ. এইচ. জনস্টন, রোসিটা ফরবস প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি যে, এই গল্পে উল্লিখিত রিখটারস্‌-ভেল্ড পর্বতমালা মধ্য-আফ্রিকার অতি প্রসিদ্ধ পর্বতশ্রেণী, এবং ডিঙ্গোনেক (রোডেসিয়ন মনস্টার) ও বুনিপের প্রবাদ জুলুল্যান্ডের বহু আরণ্যঅঞ্চলে আজও প্রচলিত।

সেন্টফ্র্যাঙ্কো সৌর স্তোত্রের অনুবাদটি স্বর্গীয় মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কৃত।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বারাকপুর, যশোহর
১লা আশ্বিন ১৩৪৪

wapsip.com

এক

শঙ্কর একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে। এইবার সে সবে এফ. এ. পাশ দিয়ে এসে গ্রামে বসেছে। কাজের মধ্যে সকালে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দেওয়া, দুপুরে আহারান্তে লম্বা ঘুম, বিকেলে পালঘাটের বাঁওড়ে মাছ ধরতে যাওয়া। সারা বৈশাখ এভাবে কাটবার পরে একদিন তার মা ডেকে বললেন—শোন্ একটা কথা বলি শঙ্কর। তোর বাবার শরীর ভাল নয়। এ অবস্থায় আর তোর পড়াশুনো হবে কি করে? কে খরচ দেবে? এইবার একটা কিছু কাজের চেষ্টা দ্যাখ্।

মায়ের কথাটা শঙ্করকে ভাবিয়ে তুললে। সত্যিই তার বাবার শরীর আজ ক'মাস থেকে খুব খারাপ যাচ্ছে। কলকাতার খরচ দেওয়া তাঁর পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। অথচ করবেই বা কি শঙ্কর? এখন কি তাকে কেউ চাকরি দেবে? চেনেই বা সে কাকে?

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, ইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধতে তখনও পাঁচ বছর দেরি। ১৯০৯ সালের কথা। তখন চাকরির বাজার এতটা খারাপ ছিল না। শঙ্করদের গ্রামের এক ভদ্রলোক শ্যামনগরে না নৈহাটীতে পাটের কলে চাকরি করতেন। শঙ্করের মা তাঁর স্ত্রীকে ছেলের চাকরির কথা বলে এলেন। যাতে তিনি স্বামীকে বলে শঙ্করের জন্যে পাটের কলে একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক পরদিন বাড়ি বয়ে বলতে এলেন যে শঙ্করের চাকরির জন্যে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করবেন।

শঙ্কর সাধারণ ধরনের ছেলে নয়। স্কুলে পড়বার সময় সে বরাবর খেলাধুলোতে প্রথম হয়ে এসেছে। সেবার মহকুমার এক্‌জিবিশনের সময় হাইজাম্পে সে প্রথম স্থান অধিকার করে মেডেল পায়। ফুটবলে অমন সেন্টার ফরওয়ার্ড ও অঞ্চলে তখন কেউ ছিল না। সাঁতার দিতে তার জুড়ি খুঁজে মেলা ভার। গাছে উঠতে, ঘোড়ায় চড়তে, বক্সিং-এ সে অত্যন্ত নিপুণ। কলকাতায় পড়বার সময় ওয়াই.এম.সি.এ.তে সে রীতিমত বক্সিং অভ্যাস করেছে। এই সব কারণে পরীক্ষায় সে তত ভাল করতে পারে নি, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু তার একটি বিষয়ে অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। তার বাতিক ছিল যত রাজ্যের ম্যাপ ঘাঁটা ও বড় বড় ভূগোলের বই পড়া। ভূগোলের অঙ্ক কষতে সে খুব মজবুত। আমাদের দেশের আকাশে যে-সব নক্ষত্রমণ্ডল ওঠে, তা সে প্রায় সবই চেনে—ওটা কালপুরুষ, ওটা সপ্তর্ষি, ওটা ক্যাসিওপিয়া, ওটা বৃশ্চিক, কোন্ মাসে কোন্‌টা ওঠে, কোন্‌দিকে ওঠে—ওর সব নখদর্পণে। আকাশের দিকে চেয়ে তখনি বলে দেবে। আমাদের দেশের বেশি ছেলে যে এসব জানে না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

এবার পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে আসবার সময়ে সে একরাশ ওই সব বই কিনে এনেছে, নির্জনে বসে প্রায়ই পড়ে আর কি ভাবে ওই জানে। তার পর এল তার বাবার অসুখ, সংসারের দারিদ্র্য এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখে পাটকলে চাকরি নেওয়ার জন্যে অনুরোধ। কি করবে সে? সে নিতান্ত নিরুপায়। মা-বাপের মলিন মুখ সে দেখতে পারবে না। অগত্যা তাকে পাটের কলেই চাকরি নিতে হবে। কিন্তু জীবনের স্বপ্ন তা হলে ভেঙে যাবে, তাও সে যে না বোঝে এমন নয়। ফুটবলের নাম-করা সেন্টার ফরওয়ার্ড, জেলার হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ন, নামজাদা সাঁতারু শঙ্কর হবে কিনা শেষে পাটের কলের বাবু? নিকেলের বইয়ের আকারের কৌটোতে খাবার কি পান নিয়ে ঝাড়ন পকেটে করে তাকে সকালের ভোঁ

wapsip.com

বাজতেই ছুটতে হবে কলে—আবার বারোটার সময় এসে দুটো খেয়ে নিয়েই আবার রওনা—ওদিকে সেই ছ'টার ভোঁ বাজলে ছুটি। তার তরুণ তাজা মন এর কথা ভাবতেই পারে না যে! ভাবতে গেলেই তার সারা দেহ-মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—রেসের ঘোড়া শেষকালে ছ্যাক্‌ড়া গাড়ি টানতে যাবে? সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই। নদীর ধারে নির্জনে বসে বসে শঙ্কর এইসব কথাই ভাবছিল। তার মন উড়ে যেতে চায় পৃথিবীর দূর, দূর দেশে শত দুঃসাহসিক কাজের মাঝখানে। লিভিংস্টোন, স্ট্যানলির মত, হ্যারি জনস্টন, মার্কো পোলো, রবিনসন ক্রুসোর মত। এর জন্যে ছেলেবেলা থেকে সে নিজেকে তৈরি করেছে—যদিও এ কথা ভেবে দেখে নি অন্যদেশের ছেলেদের পক্ষে যা ঘটতে পারে, বাঙালীর ছেলের পক্ষে তা ঘটা এক রকম অসম্ভব। তারা তৈরি হয়েছে কেরানী, স্কুলমাস্টার, ডাক্তার বা উকিল হবার জন্যে। অজ্ঞাত অঞ্চলের অজ্ঞাত পথে পাড়ি দেওয়ার আশা তাদের পক্ষে নিতান্তই দুরাশা।

প্রদীপের মৃদু আলোয় সেদিন রাত্রে সে ওয়েস্টমার্কের বড় ভূগোলের বইখানা খুলে পড়তে বসল। এই বইখানার একটা জায়গা তাকে বড় মুগ্ধ করে। সেটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ জার্মান ভূপর্যটক আন্টন হাউপ্টমান লিখিত আফ্রিকার একটা বড় পর্বত—মাউনটেন অফ দি মুন (চাঁদের পাহাড়) আরোহণের অদ্ভুত বিবরণ। কত বার সে এটা পড়েছে। পড়বার সময় কতবার ভেবেছে হের হাউপ্টমানের মত সেও একদিন যাবে মাউনটেন অফ দি মুন জয় করতে। স্বপ্ন! সত্যিকার চাঁদের পাহাড়ের মতই দূরের জিনিস হয়ে থাকবে চিরকাল।··· চাঁদের পাহাড় বুঝি পৃথিবীতে নামে?

সে রাত্রে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলে সে।···

চারধারে ঘন বাঁশের জঙ্গল। বুনো হাতীর দল মড়্ মড়্ করে বাঁশ ভাঙছে। সে আর একজন কে তার সঙ্গে, দুজনে একটা প্রকাণ্ড পর্বতে উঠছে; চারিধারের দৃশ্য ঠিক হাউপ্টমানের লেখা মাউনটেন অফ দি মুনের দৃশ্যের মত। সেই ঘন বাঁশবন, সেই পরগাছা ঝোলানো বড় বড় গাছ, নীচে পচাপাতার রাশ, মাঝে মাঝে পাহাড়ের খালি গা—আর দূরে গাছপালার ফাঁকে জ্যোৎস্নায় ধোয়া সাদা ধবধবে চিরতুষারে ঢাকা পর্বত শিখরটি—এক একবার দেখা যাচ্ছে, এক একবার বনের আড়ালে চাপা পড়ছে। পরিষ্কার আকাশে দু-একটি তারা এখানে ওখানে। একবার সত্যিই সে যেন বুনো হাতীর গর্জন শুনতে পেলে। সমস্ত বনটা কেঁপে উঠল···এত বাস্তব বলে মনে হল সেটা, যেন সেই ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেল! বিছানার উপর উঠে বসল, ভোর হয়ে গিয়েছে, জানালার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঘরের মধ্যে এসেছে।

উঃ, কি স্বপ্নটাই দেখেছে সে! ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়! বলে তো অনেকে।

অনেকদিনের আগেকার একটা ভাঙা পুরোনো মন্দির আছে তাদের গাঁয়ে। বারভুঁইয়ার এক ভুঁইয়ার জামাই মদন রায় নাকি প্রাচীন দিনে এই মন্দির তৈরি করেন। এখন মদন রায়ের বংশে কেউ নেই। মন্দির ভেঙেচুরে গিয়েছে, অশথ গাছ, বট গাছ গজিয়েছে কার্নিসে—কিন্তু যেখানে ঠাকুরের বেদী, তার ওপরের খিলেনটা এখনও ঠিক আছে। কোনো মূর্তি নেই, তবুও শনি-মঙ্গলবারে পুজো হয়, মেয়েরা বেদীতে সিঁদুর চন্দন মাখিয়ে রেখে যায়, সবাই বলে ঠাকুর বড় জাগ্রত—যে যা মানত করে তাই হয়। শঙ্কর সেদিন স্নান করে উঠে মন্দিরের একটা বটের ঝুরির গায়ে একটা ঢিল ঝুলিয়ে কি প্রার্থনা জানিয়ে এল।

বিকেলে সে গিয়ে অনেকক্ষণ মন্দিরের সামনে দূর্বাঘাসের বনে বসে রইল। জায়গাটা

wapsip.com

পাড়ার মধ্যে হলেও বনে ঘেরা, কাছেই একটা পোড়ো বাড়ি; এদের বাড়িতে একটা খুন হয়ে গিয়েছিল শঙ্করের শিশুকালে—সেই থেকে বাড়ির মালিক এ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বাস করছেন। সবাই বলে জায়গাটায় ভূতের ভয়। একা বড় কেউ এদিকে আসে না। শঙ্করের কিন্তু এই নির্জন মন্দির-প্রাঙ্গণের নিরালা বনে চুপ করে বসে থাকতে বড় ভাল লাগে!

ওর মনে আজ ভোরের স্বপ্নটা দাগ কেটে বসে গিয়েছে। এই বনের মধ্যে বসে শঙ্করের আবার সেই ছবিটা মনে পড়ল—সেই মড় মড় করে বাঁশঝাড় ভাঙছে বুনোহাতীর দল, পাহাড়ের অধিত্যকার নিবিড় বনে পাতালতার ফাঁকে ফাঁকে অনেক উঁচুতে পর্বতের জ্যোৎস্নাপাণ্ডুর তুষারাবৃত শিখরদেশটা যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যের সীমা নির্দেশ করছে। কত স্বপ্ন তো সে দেখেছে জীবনে—এত সুস্পষ্ট ছবি স্বপ্নে সে দেখে নি কখনো—এমন গভীর রেখাপাত করে নি কোনো স্বপ্ন তার মনে।...

সব মিথ্যে। তাকে যেতে হবে পাটের কলে চাকরি করতে। তাই তার ললাট-লিপি নয় কি?

কিন্তু মানুষের জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে তা উপন্যাসে ঘটাতে গেলে পাঠকেরা বিশ্বাস করতে চাইবে না, হেসেই উড়িয়ে দেবে।

শঙ্করের জীবনেও এমন একটি ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে গেল।

সকালবেলা সে একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে এসে সবে বাড়িতে পা দিয়েছে, এমন সময়ে ওপাড়ার রামেশ্বর মুখুজ্জের স্ত্রী একটুকরো কাগজ নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে বললেন—বাবা শঙ্কর, আমার জামায়ের খোঁজ পাওয়া গেছে অনেক দিন পরে। ভদ্রেশ্বরে ওদের বাড়িতে চিঠি দিয়েছে, কাল পিন্টু সেখান থেকে এসেছে, এই ঠিকানা তারা লিখে দিয়েছে। পড় তো বাবা?

শঙ্কর বললে—উঃ, প্রায় দু-বছরের পর খোঁজ মিলল। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কি ভয়টাই দেখালেন! এর আগেও তো একবার পালিয়ে গেছলেন—না? তার পর সে কাগজটা খুললে। লেখা আছে—প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউগান্ডা রেলওয়ে হেড অফিস, কন্স্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট, মোম্বাসা, পূর্ব আফ্রিকা।

শঙ্করের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা পড়ে গেল। পূর্ব আফ্রিকা! পালিয়ে মানুষে এতদূর যায়? তবে সে জানে ননীবালা দিদির এই স্বামী অত্যন্ত একরোখা ডানপিটে ও ভবঘুরে ধরনের। একবার এই গ্রামেই তার সঙ্গে শঙ্করের আলাপও হয়েছিল—শঙ্কর তখন এন্ট্রান্স ক্লাসে সবে উঠেছে। লোকটা খুব উদার প্রকৃতির, লেখাপড়া ভালই জানে, তবে কোন একটা চাকরিতে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না, উড়ে বেড়ানো স্বভাব। আর একবার পালিয়ে বর্মা না কোচিন কোথায় যেন গিয়েছিল। এবারও বড়দাদার সঙ্গে কি নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ার দরুন বাড়ি থেকে পালিয়েছিল—এ খবর শঙ্কর আগেই শুনেছিল। সেই প্রসাদবাবু পালিয়ে গিয়ে ঠেলে উঠেছে একেবারে পূর্ব আফ্রিকায়!

রামেশ্বর মুখুজ্জের স্ত্রী ভাল বুঝতে পারলেন না তাঁর জামাই কতদূরে গিয়েছে। অতটা দূরত্বের তাঁর ধারণা ছিল না। তিনি চলে গেলে শঙ্কর ঠিকানাটা নিজের নোট বইয়ে লিখে রাখলে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যেই প্রসাদবাবুকে একখানা চিঠি দিলে। শঙ্করকে তাঁর মনে আছে কি? তাঁর শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের ছেলে সে। এবার এফ. এ. পাশ দিয়ে বাড়িতে বসে আছে। তিনি কি একটা চাকরি করে দিতে পারেন তাঁদের রেলের মধ্যে? যতদূরে হয় সে যাবে।

wapsip.com

দেড়মাস পরে, যখন শঙ্কর প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে চিঠির উত্তর-প্রাপ্তি সম্বন্ধে—তখন একখানা খামের চিঠি এল শঙ্করের নামে। তাতে লেখা আছে

মোম্বাসা
২ নং পোর্ট স্ট্রীট

প্রিয় শঙ্কর,

তোমার পত্র পেয়েছি। তোমাকে আমার খুব মনে আছে। কব্জির জোরে তোমার কাছে সেবার হেরে গিয়েছিলুম, সে কথা ভুলি নি। তুমি আসবে এখানে? চলে এসো? তোমার মত ছেলে যদি বাইরে না বেরুবে, তবে কে আর বেরুবে? এখানে নতুন রেল তৈরি হচ্ছে, আরও লোক নেবে। যত তাড়াতাড়ি পারো, এসো। তোমার কাজ জুটিয়ে দেবার ভার আমি নিচ্ছি।

তোমাদের—প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শঙ্করের বাবা চিঠি দেখে খুব খুশি। যৌবনে তিনিও নিজে ছিলেন ডানপিটে ধরনের লোক। ছেলে পাটের কলে চাকরি করতে যাবে তাঁর এতে মত ছিল না, শুধু সংসারের অভাব্ অনটনের দরুনই শঙ্করের মায়ের মতে সায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এর মাসখানেক পরে শঙ্করের নামে এক টেলিগ্রাম এল ভদ্রেশ্বর থেকে। সেই জামাইটি দেশে এসেছেন সম্প্রতি। শঙ্কর যেন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে টেলিগ্রাম পেয়েই। তিনি আবার মোম্বাসায় ফিরবেন দিন কুড়ির মধ্যে। শঙ্করকে তা হলে সঙ্গে করে তিনি নিয়ে যেতে পারেন।

দুই

চার মাস পরের ঘটনা। মার্চ মাসের শেষ।

মোম্বাসা থেকে রেলপথ গিয়েছে কিসুমু-ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদের ধারে—তারই একটা শাখা লাইন তখন তৈরি হচ্ছিল। জায়গাটা মোম্বাসা থেকে সাড়ে তিন শো মাইল পশ্চিমে। ইউগান্ডা রেলওয়ের নুডসবার্গ স্টেশন থেকে বাহাত্তর মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। এখানে শঙ্কর কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পের কেরানী ও সরকারী স্টোর্‌কিপার হয়ে এসেছে। থাকে ছোট একটা তাঁবুতে। তার আশে-পাশে অনেক তাঁবু। এখানে এখনও বাড়িঘর তৈরি হয় নি বলে তাঁবুতেই সবাই থাকে। তাঁবুগুলো একটা খোলা জায়গায় চক্রাকারে সাজানো—তাদের চারিধারে ঘিরে বহু দূরব্যাপী মুক্ত প্রান্তর, দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসে ভরা, মাঝে মাঝে গাছ। তাঁবুগুলোর ঠিক গায়েই খোলা জায়গার শেষ সীমায় একটা বড় বাওবাব্ গাছ। আফ্রিকার বিখ্যাত গাছ, শঙ্কর কতবার ছবিতে দেখেছে, এবার সত্যিকার বাওবাব্ দেখে শঙ্করের যেন আশ মেটে না।

নতুন দেশ, শঙ্করের তরুণ তাজা মন—সে ইউগান্ডার এই নির্জন মাঠ ও বনে নিজের স্বপ্নের সার্থকতাকে যেন খুঁজে পেলে। কাজ শেষ হয়ে যেতেই সে তাঁবু থেকে রোজ বেরিয়ে পড়তো—যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকে বেড়াতে বার হত—পুবে, পশ্চিমে, দক্ষিণে, উত্তরে। সব দিকেই লম্বা লম্বা ঘাস, কোথাও মানুষের মাথা সমান উঁচু, কোথাও তার চেয়েও উঁচু।

কনস্ট্রাকশন তাঁবুর ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একদিন শঙ্করকে ডেকে বললেন—শোনো রায়, ওরকম এখানে বেড়িও না। বিনা বন্দুকে এখানে এক পাও যেও না। প্রথম, এই ঘাসের জমিতে পথ হারাতে পারো। পথ হারিয়ে লোকে এসব জায়গায় মারাও গিয়েছে জলের অভাবে। দ্বিতীয়, ইউগান্ডা সিংহের দেশ। এখানে আমাদের সাড়াশব্দ আর

wapsip.com

হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজে সিংহ হয়তো একটু দূরে চলে গিয়েছে—কিন্তু ওদের বিশ্বাস নেই। খুব সাবধান। এসব অঞ্চল মোটেই নিরাপদ নয়।

একদিন দুপুরের পরে কাজকর্ম বেশ পুরোদমে চলছে, হঠাৎ তাঁবু থেকে কিছু দূরে লম্বা ঘাসের জমির মধ্যে মনুষ্যকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। সবাই সেদিকে ছুটে গেল ব্যাপার কি দেখতে। শঙ্করও ছুটল—ঘাসের জমি পাতি-পাতি করে খোঁজা হল—কিছুই নেই সেখানে।

কিসের চীৎকার তবে?

এঞ্জিনিয়ার সাহেব এলেন। কুলীদের নাম-ডাকা হল, দেখা গেল একজন কুলী অনুপস্থিত। অনুসন্ধানে জানা গেল সে একটু আগে ঘাসের বনের দিকে কি কাজে গিয়েছিল, তাকে ফিরে আসতে কেউ দেখে নি।

খোঁজাখুঁজি করতে করতে ঘাসের বনের বাইরে বালির ওপরে ক'টা সিংহের পায়ের দাগ পাওয়া গেল। সাহেব বন্দুক নিয়ে লোকজন সঙ্গে পায়ের দাগ দেখে দেখে অনেক দূর গিয়ে একটা বড় পাথরের আড়ালে হতভাগ্য কুলীর রক্তাক্ত দেহ বার করলেন।

তাকে তাঁবুতে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল। কিন্তু সিংহের কোনো চিহ্ন মিলল না। লোকজনের চীৎকারে সে শিকার ফেলে পালিয়েছে। সন্ধ্যার পূর্বেই কুলীটা মারা গেল।

তাঁবুর চারিপাশের লম্বা ঘাস অনেকদূর পর্যন্ত কেটে সাফ করে দেওয়া গেল পরদিনই। দিনকতক সিংহের কথা ছাড়া তাঁবুতে আর কোনো গল্পই নেই। তারপর মাসখানেক পরে ঘটনাটা পুরানো হয়ে গেল, সে কথা সকলের মনে চাপা পড়ে গেল। কাজকর্ম আবার বেশ চলল।

সেদিন দিনে খুব গরম। সন্ধ্যার একটু পরেই কিন্তু ঠাণ্ডা পড়ল। কুলীদের তাঁবুর সামনে অনেক কাঠকুটো জ্বালিয়ে আগুন করা হয়েছে। সেখানে তাঁবুর সবাই গোল হয়ে গল্পগুজব করছে। শঙ্করও সেখানে আছে, সে ওদের গল্প শুনছে এবং অগ্নিকুণ্ডের আলোতে 'কেনিয়া মর্নিং নিউজ' পড়ছে। খবরের কাগজখানা পাঁচদিনের পুরোনো। কিন্তু এ জনহীন প্রান্তরে তবু এখানেতে বাইরের দুনিয়ার যা কিছু একটু খবর পাওয়া যায়।

তিরুমল আপ্পা বলে একজন মাদ্রাজী কেরানীর সঙ্গে শঙ্করের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিরুমল তরুণ যুবক, বেশ ইংরাজি জানে, মনেও খুব উৎসাহ! সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। শঙ্করের পাশে বসে সে আজ সন্ধ্যা থেকে ক্রমাগত দেশের কথা, তার বাপ মায়ের কথা, তার ছোট বোনের কথা বলছে! ছোট বোনকে সে বড় ভালবাসে। বাড়ি ছেড়ে এসে তার কথাই তিরুমলের বড় মনে হয়। একবার সে দেশের দিকে যাবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। মাস-দুই ছুটি মঞ্জুর করবে না সাহেব?

ক্রমের রাত বেশি হল। মাঝে-মাঝে আগুন নিভে যাচ্ছে, আবার কুলীরা তাতে কাঠকুটো ফেলে দিচ্ছে। আরও অনেকে উঠে শুতে গেল। কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ ধীরে-ধীরে দূর দিগন্তে দেখা দিল—সমগ্র প্রান্তর জুড়ে আলো-আঁধারে লুকোচুরি আর বুনো গাছের দীর্ঘ-দীর্ঘ ছায়া।

শঙ্করের ভারি অদ্ভুত মনে হচ্ছিল বহুদূর বিদেশের এই স্তব্ধ রাত্রির সৌন্দর্য। কুলীদের ঘরের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে একদৃষ্টে সে সমুখের বিশাল জনহীন তৃণভূমির আলো-আঁধার-মাখা রূপের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কি ভাবছিল। ওই বাওবাব্ গাছটার ওদিকে অজানা দেশের সীমা কেপটাউন পর্যন্ত বিস্তৃত—মধ্যে পড়বে কত পর্বত অরণ্য, প্রাগৈতিহাসিক যুগের

wapsip.com

নগর জিম্বারি—বিশাল ও বিভীষিকাময় কালাহারি মরুভূমি, হীরকের দেশ, সোনার খনির দেশ!

একজন বড় স্বর্ণান্বেষী পর্যটক যেতে যেতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। যে পাথরটাতে লেগে হোঁচট খেলেন—সেটা হাতে তুলে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার সঙ্গে সোনা মেশানো রয়েছে। সে জায়গায় বড় একটা সোনার খনি বেরিয়ে পড়ল। এ ধরনের কত গল্প সে পড়েছে দেশে থাকতে।

এই সেই আফ্রিকা, সেই রহস্যময় মহাদেশ, সোনার দেশ, হীরের দেশ—কত অজানা জাতি, অজানা দৃশ্যাবলী, অজানা জীবজন্তু এর সীমাহীন ট্রপিক্যাল অরণ্যে আত্মগোপন করে আছে, কে তার হিসেব রেখেছে?

কত কি ভাবতে-ভাবতে শঙ্কর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কিসের শব্দে তার ঘুম ভাঙল। সে ধড়মড় করে জেগে উঠে বসল। চাঁদ আকাশে অনেকটা উঠেছে। ধবধবে সাদা জ্যোৎস্না দিনের মত পরিষ্কার। অগ্নিকুণ্ডের আগুন গিয়েছে নিবে। কুলীরা সব কুণ্ডলী পাকিয়ে আগুনের ওপরে শুয়ে আছে! কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই।

হঠাৎ শঙ্করের দৃষ্টি পড়ল তার পাশে—এখানে তো তিরুমল আপ্পা বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল। সে কোথায়? তা হলে হয়তো সে তাঁবুর মধ্যে ঘুমুতে গিয়ে থাকবে।

শঙ্করও নিজে উঠে শুতে যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে অল্প দূরেই পশ্চিম কোণে মাঠের মধ্যে ভীষণ সিংহগর্জন শুনতে পাওয়া গেল। রাত্রির অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে যেন তাঁবু কেঁপে উঠল সে রবে। কুলীরা ধড়মড় করে জেগে উঠল। এঞ্জিনিয়ার সাহেব—বন্দুক নিয়ে তাঁবুর বাইরে এলেন। শঙ্কর জীবনে এই প্রথম শুনলে সিংহের গর্জন—সেই দিক-দিশাহীন তৃণভূমির মধ্যে শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় সে গর্জন যে কি এক অনির্দেশ্য অনুভূতি তার মনে জাগালে!—তা ভয় নয়, সে এক রহস্যময় ও জটিল মনোভাব। একজন বৃদ্ধ মাসাই কুলী ছিল তাঁবুতে। সে বললে, সিংহ লোক মেরেছে। লোক না মারলে এমন গর্জন করবে না।

তাঁবুর ভেতর থেকে তিরুমলের সঙ্গী এসে হঠাৎ জানালে তিরুমলের বিছানা শূন্য। সে তাঁবুর মধ্যে কোথাও নেই।

কথাটা শুনে সবাই চমকে উঠল। শঙ্কর নিজে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখে এল সত্যিই সেখানে কেউ নেই। তখনি কুলীরা আলো জ্বেলে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সব তাঁবুগুলোতে খোঁজ করা হল, নাম ধরে চীৎকার করে ডাকাডাকি করলে সবাই মিলে—তিরুমলের কোনো সাড়া মিলল না।

তিরুমল যেখানটাতে শুয়েছিল, সেখানটাতে ভাল করে দেখা গেল তখন। একটা কোনো ভারী জিনিসকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ মাটির ওপর সুস্পষ্ট। ব্যাপারটা বুঝতে কারও দেরি হল না। বাওবাব্ গাছের কাছে তিরুমলের জামার হাতার খানিকটা টুকরো পাওয়া গেল। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে আগে আগে চললেন, শঙ্কর তাঁর সঙ্গে চলল। কুলীরা তাঁদের অনুসরণ করতে লাগল। সেই গভীর রাত্রে তাঁবু থেকে দূরে মাঠে চারিদিকে অনেক জায়গা খোঁজা হল, তিরুমলের দেহের কোনো সন্ধান মিলল না। এবার আবার সিংহগর্জন শোনা গেল—কিন্তু দূরে। যেন এই নির্জন প্রান্তরে অধিষ্ঠাত্রী কোনো রহস্যময়ী রাক্ষসীর বিকট চিৎকার।

মাসাই কুলীটা বললে—সিংহ দেহ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে নিয়ে আমাদের ভুগতে হবে। আরও অনেকগুলো মানুষ ও ঘাল্ না করে ছাড়বে না। সবাই সাবধান। যে সিংহ একবার মানুষ খেতে শুরু করে, সে অত্যন্ত ধূর্ত হয়ে ওঠে।

wapsip.com

রাত যখন তিনটে, তখন সবাই ফিরল তাঁবুতে। বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সারা মাঠ আলো হয়ে উঠেছে। আফ্রিকার এই অংশে পাখি বড় একটা দেখা যায় না দিনমানে, কিন্তু এক ধরনের রাত্রিচর পাখির ডাক শুনতে পাওয়া যায় রাত্রে—সে সুর অপার্থিব ধরনের মিষ্ট। এইমাত্র সেই পাখি কোন্ গাছের মাথায় বহুদূরে ডেকে উঠল। মনটা এক মুহূর্তে উদাস করে দেয়। শঙ্কর ঘুমুতে গেল না। আর সবাই তাঁবুর মধ্যে শুতে গেল—কারণ পরিশ্রম কারও কম হয় নি। তাঁবুর সামনে কাঠকুটো জ্বালিয়ে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করা গেল। শঙ্কর সাহস করে বাইরে বসতে অবিশ্যি পারলে না—এরকম দুঃসাহসের কোনো অর্থ হয় না। তবে সে নিজের খড়ের ঘরে শুয়ে জানলা দিয়ে বিস্তৃত জ্যোৎস্নালোকিত অজানা প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইল।

মনে কি এক অদ্ভুত ভাব। তিরুমলের অদৃষ্টলিপি এই জন্যেই বোধ হয় তাকে আফ্রিকায় টেনে এনেছিল। তাকেই বা কি জন্যে এখানে এনেছে তার অদৃষ্ট, কে জানে তার খবর?

আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর দেখতে—কিন্তু আফ্রিকা ভয়ঙ্কর! দেখতে বাবলা বনে ভর্তি বাংলাদেশের মাঠের মত দেখালে কি হবে, আফ্রিকা অজানা মৃত্যুসঙ্কুল! যেখানে সেখানে অতর্কিত নিষ্ঠুর মৃত্যুর ফাঁদ পাতা···পর মুহূর্তে কি ঘটবে, এ মুহূর্তে তা কেউ বলতে পারে না।

আফ্রিকা প্রথম বলি গ্রহণ করেছে—তরুণ হিন্দু যুবক তিরুমলকে। সে বলি চায়।

তিরুমল তো গেল, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পে পরদিন থেকে এমন অবস্থা হয়ে উঠল যে আর সেখানে সিংহের উপদ্রবে থাকা যায় না। মানুষ-খেকো সিংহ অতি ভয়ানক জানোয়ার! যেমন সে ধূর্ত তেমনি সাহসী। সন্ধ্যা তো দূরের কথা, দিনমানেই একা বেশিদূর যাওয়া যায় না। সন্ধার আগে তাঁবুর মাঠে নানা জায়গায় বড় বড় আগুনের কুণ্ড করা হয়, কুলীরা আগুনের কাছ ঘেঁষে বসে গল্প করে, রান্না করে, সেখানে বসেই খাওয়া-দাওয়া করে। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক হাতে রাত্রে তিন-চার বার তাঁবুর চারিদিকে ঘুরে পাহারা দেন, ফাঁকা দ্যাওড় করেন—এত সতর্কতার মধ্যেও একটা কুলীকে সিংহে নিয়ে পালালো তিরুমলকে মারবার ঠিক দুদিন পরে সন্ধ্যা রাত্রে। তার পরদিন একটা সোমালি কুলী দুপুরে তাঁবু থেকে তিনশো গজের মধ্যে পাথরের ঢিবিতে পাথর ভাঙতে গেল—সন্ধ্যায় সে আর ফিরে এল না।

সেই রাত্রেই, রাত দশটার পরে, শঙ্কর এঞ্জিনিয়ার সাহেবের তাঁবু থেকে ফিরছে, লোকজন কেউ বড় একটা বাইরে নেই, সকাল সকাল যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে, কেবল এখানে ওখানে দু-একটা নির্বাপিত-প্রায় অগ্নিকুণ্ড। দূরে শেয়াল ডাকছে—শেয়ালের ডাক শুনলেই শঙ্করের মনে হয় সে বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে আছে—চোখ বুজে সে নিজের গ্রামটা ভাববার চেষ্টা করে, তাদের ঘরের কোণের সেই বিলিতি-আমড়া গাছটা ভাববার চেষ্টা করে—আজও সে একবার থমকে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চোখ বুজলে।

কি চমৎকার লাগে! কোথায় সে? সেই তাদের গাঁয়ের বাড়িতে জানলার কাছে তক্তপোশে শুয়ে? বিলিতি আমড়া গাছটার ডালপালা চোখ খুললেই চোখে পড়বে? ঠিক? দেখবে সে চোখ খুলে?

শঙ্কর ধীরে ধীরে চোখ খুললে।

অন্ধকার প্রান্তর। দূরে সেই বড় বাওবাব্ গাছটা অস্পষ্ট অন্ধকারে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার মনে হল সামনের একটা ছাতার মত গোল খড়ের নিচু চালের ওপর একটা কি যেন নড়ছে। পরক্ষণেই সে ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল।

wapsip.com

প্রকাণ্ড একটা সিংহ খড়ের চাল থাবা দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করবার চেষ্টা করছে ও মাঝে মাঝে নাকটা চালের গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে কিসের যেন ঘ্রাণ নিচ্ছে!

তার কাছ থেকে চালাটার দূরত্ব বড় জোর বিশ হাত।

শঙ্কর বুঝলে সে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। সিংহ চালার খড় খুঁচিয়ে গর্ত করতে ব্যস্ত, সেখান দিয়ে ঢুকে সে মানুষ নেবে—শঙ্করকে সে এখনও দেখতে পায় নি। তাঁবুর বাইরে কোথাও লোক নেই, সিংহের ভয়ে বেশি রাত্রে কেউ বাইরে থাকে না। নিজে সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, একগাছা লাঠি পর্যন্ত নেই হাতে।

শঙ্কর নিঃশব্দে পিছু হঠতে লাগল এঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর দিকে সিংহের দিকে চোখ রেখে। এক মিনিট···দু মিনিট···নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর যে তার এত কর্তৃত্ব ছিল, তা এর আগে শঙ্কর জানতো না। একটা ভীতিসূচক শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরুল না বা সে হঠাৎ পিছু ফিরে দৌড় দেবার চেষ্টাও করলে না।

এঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে সে ঢুকে দেখল সাহেব টেবিলে বসে তখনও কাজ করছে। সাহেব ওর রকম-সকম দেখে বিস্মিত হয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ও বললে—সাহেব, সিংহ!···

সাহেব লাফিয়ে উঠল—কই? কোথায়?

বন্দুকের র‍্যাকে একটা ৩৭৫ ম্যানলিকার রাইফল ছিল—সাহেব সেটা নামিয়ে নিলে। শঙ্করকে আর একটা রাইফল দিলে। দুজনে তাঁবুর পর্দা তুলে আস্তে আস্তে বাইরে এল। একটু দূরেই কুলী লাইনের সেই গোল চালা। কিন্তু চালার ওপর কোথায় সিংহ? শঙ্কর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই মাত্র দেখে গেলাম স্যর। ঐ চালার ওপর সিংহ থাবা দিয়ে খড় খোঁচাচ্ছে।

সাহেব বললে—পালিয়েছে। জাগাও সবাইকে।

একটু পরে তাঁবুতে মহা শোরগোল পড়ে গেল। লাঠি, সড়কি, গাঁতি, মুগুর নিয়ে কুলীর দল হল্লা করে বেরিয়ে পড়ল—খোঁজ খোঁজ চারিদিকে, খড়ের চালে সত্যিই ফুটো দেখা গেল। সিংহের পায়ের দাগও পাওয়া গেল। কিন্তু সিংহ উধাও হয়েছে। আগুনের কুণ্ডে বেশি করে কাঠ ও শুকনো খড় ফেলে আগুন আবার জ্বালানো হল। সে রাত্রে অনেকেরই ভাল ঘুম হল না, কিন্তু তাঁবুর বাইরেও বড় একটা কেউ রইল না। শেষ রাত্রের দিকে শঙ্কর নিজের তাঁবুতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল—একটা মহা শোরগোলের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। মাসাই কুলীরা 'সিম্বা সিম্বা' বলে চীৎকার করেছে। দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল। শঙ্কর তাঁবুর বাইরে এসে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করে জানলে সিংহ এসে আস্তাবলের একটা ভারবাহী অশ্বতরকে জখম করে গিয়েছে—এই মাত্র! সবাই শেষ রাত্রে একটু ঝিমিয়ে পড়েছে আর সেই সময়ে এই কাণ্ড।

পরদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে একটা ছোকরা কুলীকে তাঁবুর একশো হাতের মধ্যে থেকে সিংহে নিয়ে গেল। দিন চারেক পরে আর একটা কুলীকে নিলে বাওবাব্ গাছটার তলা থেকে।

কুলীরা আর কেউ কাজ করতে চায় না। লম্বা লাইনে গাঁতিওয়ালা কুলীদের অনেক সময়ে খুব ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করতে হয়—তারা তাঁবু ছেড়ে দিনের বেলাতেও বেশিদূর যেতে চায় না। তাঁবুর মধ্যে থাকাও রাত্রে নিরাপদ নয়। সকলেরই মনে ভয়—প্রত্যেকেই ভাবে এবার তার পালা। কাকে কখন নেবে কিছু স্থিরতা নেই। এই অবস্থায় কাজ হয় না। কেবল মাসাই কুলীরা অবিচলিত রইল—তারা যমকেও ভয় করে না। তাঁবু

wapsip.com

থেকে দু-মাইল দূরে গাঁতির কাজ তারাই করে, সাহেব বন্দুক নিয়ে দিনের মধ্যে চার-পাঁচবার তাদের দেখাশুনা করে আসে।

কত নতুন ব্যবস্থা করা হল, কিছুতেই সিংহের উপদ্রব কমল না। কত চেষ্টা করেও সিংহ শিকার করা গেল না। অনেকে বললে সিংহ একটা নয়, অনেকগুলো—ক'টা মেরে ফেলা যাবে? সাহেব বললে—মানুষ-খেকো সিংহ বেশি থাকে না। এ একটা সিংহেরই কাজ।

একদিন সাহেব শঙ্করকে ডেকে বললে বন্দুকটা নিয়ে গাঁতিদার কুলীদের একবার দেখে আসতে। শঙ্কর বললে—সাহেব, তোমার ম্যানলিকারটা দাও।

সাহেব রাজী হল। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে একটা অশ্বতরে চড়ে রওনা হল—তাঁবু থেকে মাইল খানেক দূরে একজায়গায় একটা ছোট জলা। শঙ্কর দূর থেকে জলাটা যখন দেখতে পেয়েছে, তখন বেলা প্রায় তিনটে। কেউ কোনো দিকে নেই, রোদের ঝাঁঝ মাঠের মধ্যে তাপ-তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে।

হঠাৎ অশ্বতর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আর কিছুতেই সেটা এগিয়ে যেতে চায় না। শঙ্করের মনে হল জায়গাটার দিকে যেতে অশ্বতরটা ভয় পাচ্ছে। একটু পরে পাশের ঝোপে কি যেন একটা নড়ল। কিন্তু সেদিকে চেয়ে সে কিছু দেখতে পেলে না। সে অশ্বতর থেকে নামল। তবুও অশ্বতর নড়তে চায় না।

হঠাৎ শঙ্করের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঝোপের মধ্যে সিংহ তার জন্যে ওৎ পেতে বসে নেই তো? অনেক সময়ে এরকম হয় সে জানে, সিংহ পথের পাশে ঝোপঝাপের মধ্যে লুকিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নিঃশব্দে তার শিকারের অনুসরণ করে। নির্জন স্থানে সুবিধা বুঝে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে। যদি তাই হয়? শঙ্কর অশ্বতর নিয়ে আর এগিয়ে যাওয়া উচিত বিবেচনা করলে না। ভাবলে তাঁবুতে ফিরেই যাই। সবে সে তাঁবুর দিকে অশ্বতরের মুখটা ফিরিয়েছে, এমন সময় আবার ঝোপের মধ্যে কি একটা নড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক সিংহগর্জন এবং একটা ধূসর বর্ণের বিরাট দেহ সশব্দে অশ্বতরের ওপর এসে পড়ল। শঙ্কর তখন হাত চারেক এগিয়ে আছে। সে তখনি ফিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক উঁচিয়ে উপরি উপরি দুবার গুলি করলে। গুলি লেগেছে কি না বোঝা গেল না, কিন্তু তখন অশ্বতর মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—ধূসর বর্ণের জানোয়ারটা পলাতক। শঙ্কর পরীক্ষা করে দেখলে অশ্বতরের কাঁধের কাছে অনেকটা মাংস ছিন্নভিন্ন, রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় সেটা ছটফট করছে। শঙ্কর এক গুলিতে তার যন্ত্রণার অবসান করলে।

তার পর সে তাঁবুতে ফিরে এল। সাহেব বললে, সিংহ নিশ্চয়ই জখম হয়েছে। বন্দুকের গুলি যদি গায়ে লাগে তবে দস্তুরমত জখম তাকে হতেই হবে। কিন্তু গুলি লেগেছিল তো? শঙ্কর বললে—গুলি লাগালাগির কথা সে বলতে পারে না। বন্দুক ছুঁড়েছিল, এই মাত্র কথা। লোকজন নিয়ে খোঁজখুঁজি করে দু-তিন দিনেও কোন আহত বা মৃত সিংহের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না।

জুন মাসের প্রথম থেকে বর্ষা নামল। কতকটা সিংহের উপদ্রবের জন্যে, কতকটা বা জলাভূমির সান্নিধ্যের জন্যে অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তাঁবু ওখান থেকে উঠে গেল।

শঙ্করকে আর কন্স্‌ট্রাকশন তাঁবুতে থাকতে হল না। কিসুমু থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে একটা ছোট স্টেশনে সে স্টেশন মাস্টারের কাজ পেয়ে জিনিসপত্র নিয়ে সেখানেই চলে গেল।

wapsip.com

তিন

নতুন পদ পেয়ে উৎফুল্ল মনে শঙ্কর যখন স্টেশনটাতে এসে নামল, তখন বেলা তিনটে হবে। স্টেশন ঘরটা খুব ছোট। মাটির প্ল্যাটফর্ম, প্ল্যাটফর্ম আর স্টেশন ঘরের আশপাশ কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। স্টেশন ঘরের পিছনে তার থাকবার কোয়ার্টার। পায়রার খোপের মত ছোট। যে ট্রেনখানা তাকে বহন করে এনেছিল, সেখানা কিসুমুর দিকে চলে গেল। শঙ্কর যেন অকূল সমুদ্রে পড়ল। এত নির্জন স্থান সে জীবনে কখনো কল্পনা করে নি।

এই স্টেশনে সে একমাত্র কর্মচারী। একটা কুলী পর্যন্ত নেই। সেই কুলী, সে-ই পয়েন্টস্‌ম্যান, সেই সব।

এরকম ব্যবস্থার কারণ হচ্ছে যে এসব স্টেশন এখনও মোটেই আয়কর নয়। এর অস্তিত্ব এখনও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। এদের পেছনে রেল-কোম্পানি বেশি খরচ করতে রাজী নয়। একখানি ট্রেন সকালে, একখানি এই গেল—আর সারা দিন-রাত ট্রেন নেই।

সুতরাং তার হাতে প্রচুর অবসর আছে। চার্জ বুঝে নিতে হবে এই যা একটু কাজ। আগের স্টেশন মাস্টারটি গুজরাটি, বেশ ইংরেজি জানে। সে নিজের হাতে চা করে নিয়ে এল। চার্জ বোঝাবার বেশি কিছু নেই। গুজরাটি স্টেশন মাস্টার তাকে পেয়ে খুব খুশি। ভাবে বোধ হল সে কথা বলবার সঙ্গী পায় নি অনেকদিন। দুজনে প্ল্যাটফর্মের এদিক ওদিক পায়চারী করলে।

শঙ্কর বললে—কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা কেন?

গুজরাটি ভদ্রলোকটি বললে—ও কিছু নয়। নির্জন জায়গা—তাই।

শঙ্করের মনে হল কি একটা কথা লোকটা গোপন করে গেল। শঙ্করও আর পীড়াপীড়ি করলে না। রাত্রে ভদ্রলোক রুটি গড়ে শঙ্করকে খাবার নিমন্ত্রণ করলে। খেতে বসে হঠাৎ লোকটি চেঁচিয়ে উঠল—ঐ যাঃ, ভুলে গিয়েছি।

—কি হল?

—খাবার জল নেই মোটে, ট্রেন থেকে নিতে একদম ভুলে গিয়েছি।

—সে কি? এখানে খাবার জল কোথাও পাওয়া যায় না?

—কোথাও না। একটা কুয়ো আছে, তার জল বেজায় তেতো আর কষা। সে জলে বাসন মাজা ছাড়া কোনো কাজ হয় না। খাবার জল ট্রেন থেকে দিয়ে যায়।

বেশ জায়গা বটে। খাবার জল নেই, মানুষ-জন নেই। এখানে স্টেশন করেছে কেন তা শঙ্কর বুঝতে পারলে না।

পরদিন সকালে ভূতপূর্ব স্টেশন মাস্টার চলে গেল। শঙ্কর পড়ল একা। নিজের কাজ করে, রাঁধে খায়, ট্রেনের সময় প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ায়। দুপুরে বই পড়ে কি বড় টেবিলটাতে শুয়ে ঘুমোয়। বিকেলের দিকে ছায়া পড়লে প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করে।

স্টেশনের চারিধার ঘিরে ধু ধু সীমাহীন প্রান্তর, দীর্ঘ ঘাসের বন, মাঝে ইউকা, বাবলা গাছ—দূরে পাহাড়ের সারি সারা চক্রবাল জুড়ে। ভারি সুন্দর দৃশ্য।

গুজরাটি লোকটি ওকে বারণ করে গিয়েছিল—একা যেন এই সব মাঠে সে না বেড়াতে বার হয়।

শঙ্কর বলেছিল—কেন?

wapsip.com

সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর গুজরাটি ভদ্রলোকটির কাছ থেকে পাওয়া যায় নি! কিন্তু তার উত্তর অন্য দিক থেকে সে রাত্রেই মিলল।

সকাল রাতেই আহারাদি সেরে শঙ্কর স্টেশন ঘরে বাতি জ্বালিয়ে বসে ডায়েরী লিখছে—স্টেশন ঘরেই সে শোবে—সামনের কাচ-বসানো দরজাটি বন্ধ আছে—কিন্তু আগল দেওয়া নেই—কিসের শব্দ শুনে সে দরজার দিকে চেয়ে দেখে—দরজার ঠিক বাইরে কাচে নাক লাগিয়ে প্রকাণ্ড সিংহ! শঙ্কর কাঠের মত বসে রইল। দরজা একটু জোর করে ঠেললেই খুলে যাবে। সেও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। টেবিলের ওপর কেবল কাঠের রুলটা মাত্র আছে।

সিংহটা কিন্তু কৌতূহলের সঙ্গে শঙ্কর ও টেবিলের কেরোসিন বাতিটার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। খুব বেশিক্ষণ ছিল না, হয়তো মিনিট দুই—কিন্তু শঙ্করের মনে হল সে আর সিংহটা কতকাল ধরে পরস্পরে পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পর সিংহ ধীরে ধীরে অনাসক্ত ভাবে দরজা থেকে সরে গেল। শঙ্কর হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পেল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজার আগলটা তুলে দিলে।

এতক্ষণে সে বুঝতে পারলে স্টেশনের চারিদিকে কাঁটা তারের বেড়া কেন আছে। কিন্তু শঙ্কর একটু ভুল করেছিল—সে আংশিক ভাবে বুঝেছিল মাত্র, বাকি উত্তরটা পেতে দু-একদিন বিলম্ব ছিল।

সেটা এল অন্য দিক থেকে।

পরদিন সকালের ট্রেনের গার্ডকে সে রাত্রে ঘটনা বললে। গার্ড লোকটি ভাল, সব শুনে বললে—এসব অঞ্চলে সর্বত্রই এমন অবস্থা। এখান থেকে বারো মাইল দূরে আর একটা তোমার মত ছোট স্টেশন আছে—সেখানেও এই দশা। এখানে তো যে কাণ্ড—

সে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কথা বন্ধ করে ট্রেনে উঠে পড়ল। যাবার সময় চলন্ত ট্রেন থেকে বলে গেল, বেশ সাবধানে থেকো সর্বদা—

শঙ্কর চিন্তিত হয়ে পড়ল—এরা কি কথাটা চাপা দিতে চায়? সিংহ ছাড়া আরও কিছু আছে নাকি? যাহোক, সেদিন থেকে শঙ্কর প্ল্যাটফর্মে স্টেশনে ঘরের সামনে রোজ আগুন জ্বালিয়ে রাখে। সন্ধ্যার আগেই দরজা বন্ধ করে স্টেশন ঘরে ঢোকে—অনেক রাত পর্যন্ত বসে পড়াশুনো করে বা ডায়েরী লেখে। রাত্রের অভিজ্ঞতা অদ্ভুত। বিস্তৃত প্রান্তরে ঘন অন্ধকার নামে, প্ল্যাটফর্মের ইউকা গাছটার ডালপালার মধ্যে দিয়ে রাত্রির বাতাস বেধে কেমন একটা শব্দ হয়, মাঠের মধ্যে প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকে, এক একদিন গভীর রাতে দূরে কোথায় সিংহের গর্জন শুনতে পাওয়া যায়—অদ্ভুত জীবন।

ঠিক এই জীবনই সে চেয়েছিল। এ তার রক্তে আছে। এই জনহীন প্রান্তর, এই রহস্যময়ী রাত্রি, অচেনা নক্ষত্রে ভরা আকাশ, এই বিপদের আশঙ্কা—এই তো জীবন! শান্ত নিরাপদ জীবন নিরীহ কেরানীর জীবন হতে পারে—তার নয়—

সেদিন বিকেলের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সে নিজের কোয়ার্টারের রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময়ে খুঁটির গায়ে কি একটা দেখে সে তিন হাত লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল—প্রকাণ্ড একটা হলদে খড়িশ গোখরো তাকে দেখে ফণা উদ্যত করে খুঁটি থেকে প্রায় একহাত বাইরে মুখ বাড়িয়েছে! আর দু সেকেন্ড পরে যদি শঙ্করের চোখ সেদিকে পড়ত—তা হলে—না, এখন সাপটাকে মারবার কি করা যায়? কিন্তু সাপটা পরমুহূর্তে খুঁটি বেয়ে উপরে খড়ের চালের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। বেশ কাণ্ড বটে। ঐ ঘরে গিয়ে শঙ্করকে এখন ভাত রাঁধতে বসতে হবে। এ সিংহ নয় যে দরজা বন্ধ করে আগুন জ্বেলে রাখবে। খানিকটা ইতস্তত

wapsip.com

করে শঙ্কর অগত্যা রান্নাঘরে ঢুকল এবং কোনোরকমে তাড়াতাড়ি রান্না সেরে সন্ধ্যা হবার আগেই খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ করে সেখান থেকে বেরিয়ে স্টেশন ঘরে এল। কিন্তু স্টেশন ঘরেই বা বিশ্বাস কি? সাপ কখন কোন্ ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকবে, তাকে কি আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

পরদিনের সকালের ট্রেনে গার্ডের গাড়ি থেকে একটা নতুন কুলী তার রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল। সপ্তাহে দুদিন মোম্বাসা থেকে চাল আর আলু রেল কোম্পানি এই সব নির্জন স্টেশনের কর্মচারীদের পাঠিয়ে দেয়—মাসিক বেতন থেকে এর দাম কেটে নেওয়া হয়।

যে কুলীটা রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল সে ইন্ডিয়ান, গুজরাট অঞ্চলে বাড়ি। সে বস্তাটা নামিয়ে কেমন যেন অদ্ভুতভাবে চাইলে শঙ্করের দিকে, এবং পাছে শঙ্কর তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে, এই ভয়েই যেন তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়ল।

কুলীর সে দৃষ্টি শঙ্করের চোখ এড়ায় নি। কি রহস্য জড়িত আছে যেন এই জায়গাটার সঙ্গে, কেউ তা ওর কাছে প্রকাশ করতে চায় না—প্রকাশ করা যেন বারণ আছে। ব্যাপার কি?

দিন দুই পরে ট্রেন পাশ করে সে নিজের কোয়ার্টারে ঢুকতে যাচ্ছে—আর একটু হলে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছিল আর কি। সেই খড়িশ গোখরো সাপ। পূর্বদৃষ্ট সাপটাও হতে পারে, নতুন একটা যে নয় তার কোনো প্রমাণ নেই।

শঙ্কর সেই দিন স্টেশনঘর, নিজের কোয়ার্টার ও চারধারের জমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে। সারাজায়গা মাটিতে বড় বড় গর্ত, কোয়ার্টারের উঠানে, রান্নাঘরের দেওয়ালে, কাঁচা প্ল্যাটফর্মের মাঝে মাঝে সর্বত্র গর্ত ও ফাটল আর ইঁদুরের মাটি। তবুও সে কিছু বুঝতে পারলে না।

একদিন সে স্টেশন ঘরে ঘুমিয়ে আছে, রাত অনেক। ঘর অন্ধকার—হঠাৎ শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বাইরে আর একটা কোন্ ইন্দ্রিয় যেন মুহূর্তের জন্যে জাগরিত হয়ে উঠে তাকে জানিয়ে দিলে যে সে ভয়ানক বিপদে পড়বে। ঘোর অন্ধকার, শঙ্করের সমস্ত শরীর যেন শিউরে উঠল। টর্চটা হাতড়ে পাওয়া যায় না কেন? অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা কিসের অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ টর্চটা তার হাতে ঠেকল, এবং কলের পুতুলের মত সে সামনের দিকে ঘুরিয়ে টর্চটা জ্বাললে।

সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে টর্চটা ধরে বিছানার ওপরই বসে রইল।

দেওয়াল ও তার বিছানার মাঝামাঝি জায়গায় মাথা উঁচু করে তুলে ও টর্চের আলো পড়ার দরুন সাময়িকভাবে আলো-আঁধার লেগে থ খেয়ে আছে আফ্রিকার ক্রূর ও হিংস্রতম সর্প—কালো মাম্বা! ঘরের মেঝে থেকে সাপটা প্রায় আড়াই হাত উঁচু হয়ে উঠেছে—সেটা এমন কিছু আশ্চর্য নয় যখন ব্ল্যাক মাম্বা সাধারণত মানুষকে তাড়া করে তার ঘাড়ে ছোবল মারে! ব্ল্যাক মাম্বার হাত থেকে রেহাই পাওয়া এক প্রকার পুনর্জন্ম তাও শঙ্কর শুনেছে।

শঙ্করের একটা গুণ বাল্যকাল থেকেই আছে, বিপদে তার সহজে বুদ্ধিভ্রংশ হয় না—আর তার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর সে ঘোর বিপদেও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে।

শঙ্কর বুঝলে হাত যদি তার একটু কেঁপে যায়—তবে যে মুহূর্তে সাপটার চোখ থেকে আলো সরে যাবে—সেই মুহূর্তে ওর আলো-আঁধারি কেটে যাবে এবং তখুনি সে করবে আক্রমণ।

সে বুঝলে তার আয়ু নির্ভর করছে এখন দৃঢ় ও অবিকম্পিত হাতে টর্চটা সাপের

wapsip.com

চোখের দিকে ধরে থাকার ওপর। যতক্ষণ সে এরকম ধরে থাকতে পারবে ততক্ষণ সে নিরাপদ। কিন্তু যদি টর্চটা একটুও এদিক ওদিক সরে যায়—?

শঙ্কর টর্চ ধরেই রইল। সাপের চোখ দুটো জ্বলছে যেন দুটো আলোর দানার মত। কি ভীষণ শক্তি ও রাগ প্রকাশ পাচ্ছে চাবুকের মত খাড়া উদ্যত তার কালো মিশমিশে সরু দেহটাতে।...

শঙ্কর ভুলে গেল চারিপাশের সব আসবাব-পত্র, আফ্রিকা দেশটা, তার রেলের চাকরি, মোম্বাসা থেকে কিসুমু লাইনটা, তার দেশ, তার বাবা মা—সমস্ত জগৎটা শূন্য হয়ে গিয়ে সামনের ওই দুটো জ্বলজ্বলে আলোর দানায় পরিণত হয়েছে...তার বাইরে সব শূন্য! অন্ধকার! মৃত্যুর মত শূন্য, প্রলয়ের পরের বিশ্বের মত অন্ধকার!

সত্য কেবল ওই মহাহিংস্র উদ্যত-ফণা সর্প, যেটা প্রত্যেক ছোবলে ১৫০০ মিলিগ্রাম তীব্র বিষ ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে দিতে পারে এবং দেবার জন্যে ওৎ পেতে রয়েছে।...

শঙ্করের হাত ঝিমঝিম করছে, আঙুল অবশ হয়ে আসছে, কনুই থেকে বগল পর্যন্ত হাতের যেন সাড়া নেই। কতক্ষণ সে আর টর্চ ধরে থাকবে? আলোর দানা দুটো হয়তো সাপের চোখ নয়...জোনাকি পোকা কিংবা নক্ষত্র...কিংবা...

টর্চের ব্যাটারির তেজ কমে আসছে না? সাদা আলো যেন হলদে ও নিস্তেজ হয়ে আসছে না?...কিন্তু জোনাকি পোকা কিংবা নক্ষত্র দুটো তেমনি জ্বলছে। রাত না দিন? ভোর হবে না সন্ধ্যা হবে?

শঙ্কর নিজেকে সামলে নিলে। ওই চোখ দুটোর জ্বালাময়ী দৃষ্টি তাকে যেন মোহগ্রস্ত করে তুলছে। সে সজাগ থাকবে। এ তেপান্তরের মাঠে চেঁচালেও কেউ কোথাও নেই সে জানে—তার নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করছে তার জীবন। কিন্তু সে পারছে না যে, হাত যেন টনটন করে অবশ হয়ে আসছে, আর কতক্ষণ সে টর্চ ধরে থাকবে? সাপে না হয় ছোবল দিক কিন্তু হাতখানা একটু নামিয়ে নিলে সে আরাম বোধ করবে এখন।

তার পরেই ঘড়িতে টং টং করে তিনটে বাজল। ঠিক রাত তিনটে পর্যন্তই বোধ হয় শঙ্করের আয়ু ছিল, কারণ তিনটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত কেঁপে উঠে নড়ে গেল—সামনের আলোর দানা গেল নিভে। কিন্তু সাপ কই? তাড়া করে এল না কেন?

পরক্ষণেই শঙ্কর বুঝতে পারলে সাপটাও সাময়িক মোহগ্রস্ত হয়েছে তার মত। এই অবসর... বিদ্যুতের চেয়েও বেগে সে টেবিল থেকে এক লাফ মেরে অন্ধকারের মধ্যে দরজার আগল খুলে ফেলে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলে।

সকালের ট্রেন এল। শঙ্কর বাকি রাতটা প্ল্যাটফর্মেই কাটিয়েছে। ট্রেনের গার্ডকে বললে সব ব্যাপার। গার্ড বললে—চলো দেখি স্টেশন ঘরের মধ্যে। ঘরের মধ্যে কোথাও সাপের চিহ্নও পাওয়া গেল না। গার্ড লোকটা ভাল—বললে, বলি তবে শোনো। খুব বেঁচে গিয়েছ কাল রাত্রে। এতদিন কথাটা তোমায় বলি নি, পাছে ভয় পাও। তোমার আগে যিনি স্টেশন মাস্টার এখানে ছিলেন—তিনিও সাপের উপদ্রবেই এখান থেকে পালান। তাঁর আগে দুজন স্টেশন মাস্টার এই স্টেশনের কোয়ার্টারে সাপের কামড়ে মরেছে। আফ্রিকার ব্ল্যাক মাম্বা যেখানে থাকে, তার ত্রিসীমানায় লোক আসে না। বন্ধু ভাবে কথাটা বললাম, ওপরওয়ালাদের বোলো না যেন, যে আমার কাছ থেকে এ কথা শুনেছ। ট্রান্সফারের দরখাস্ত করো।

শঙ্কর বললে—দরখাস্তের উত্তর আসতেও তো দেরি হবে, তুমি একটা উপকার করো। আমি এখানে একেবারে নিরস্ত্র, আমাকে একটা বন্দুক কি রিভলভার যাবার পথে দিয়ে যাও।

wapsip.com

আর কিছু কার্বলিক অ্যাসিড। ফিরবার পথেই কার্বলিক অ্যাসিডটা আমায় দিয়ে যেও।

ট্রেন থেকে সে একটা কুলীকে নামিয়ে নিলে এবং দুজনে মিলে সারাদিন সর্বত্র গর্ত বুজিয়ে বেড়ালে। পরীক্ষা করে দেখে মনে হল কাল রাত্রে স্টেশন ঘরের পশ্চিমের দেওয়ালের কোণে একটা গর্ত থেকে সাপটা বেরিয়েছিল। গর্তগুলো ইঁদুরের, বাইরের সাপ দিনমানে ইঁদুর খাবার লোভে গর্তে ঢুকেছিল হয়তো। গর্তটা বেশ ভাল করে বুজিয়ে দিলে। ডাউন ট্রেনের গার্ডের কাছ থেকে এক বোতল কার্বলিক অ্যাসিড পাওয়া গেল—ঘরের সর্বত্র ও আশেপাশে সে অ্যাসিড ছড়িয়ে দিলে। কুলীটা তাকে একটা বড় লাঠি দিয়ে গেল। দু-তিন দিনের মধ্যে রেল কোম্পানি থেকে ওকে একটা বন্দুক দিলে।

চার

স্টেশনে জলের বড় কষ্ট। ট্রেন থেকে যা জল দেয়, তাতে রান্না খাওয়া কোনো রকমে চলে—স্নান আর হয় না। এখানকার কুয়োর জলও শুকিয়ে গিয়েছে। একদিন সে শুনলে স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা জলাশয় আছে, সেখানে ভাল জল পাওয়া যায়, মাছও আছে।

স্নান ও মাছ ধরার আকর্ষণে একদিন সে সকালের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সেখানে মাছ ধরতে চলল—সঙ্গে একজন সোমালি কুলী, সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। মাছ ধরবার সাজ-সরঞ্জাম মোম্বাসা থেকে আনিয়ে নিয়েছিল। জলাশয়টা মাঝারি গোছের, চারিধারে উঁচু ঘাসের বন, ইউকা গাছ, নিকটেই একটা অনুচ্চ পাহাড়! জলে সে স্নান সেরে উঠে ঘণ্টা-দুই ছিপ ফেলে ট্যাংরা জাতীয় ছোট ছোট মাছ অনেকগুলি পেলে। মাছ অদৃষ্টে জোটে নি অনেক দিন কিন্তু আর বেশি দেরি করা চলবে না—কারণ আবার বিকেল চারটের মধ্যে স্টেশনে পৌঁছুনো চাই—বিকেলের ট্রেন পাস করাবার জন্যে।

প্রায়ই সে মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যায়, কোনো দিন সঙ্গে লোক থাকে—প্রায়ই একা যায়। স্নানের কষ্টও ঘুচেছে।

গ্রীষ্মকাল ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠল। আফ্রিকার দারুণ গ্রীষ্ম—বেলা ন'টার পর থেকে রৌদ্রে যাওয়া যায় না। এগারোটার পর থেকে শঙ্করের মনে হয় যেন দিক্‌বিদিক্ দাউ দাউ করে জ্বলছে। তবুও সে ট্রেনের লোকের মুখে শুনলে মধ্য আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার গরমের কাছে এ নাকি কিছুই নয়।

শীঘ্রই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা থেকে শঙ্করের জীবনের গতি মোড় ঘুরে অন্য পথে চলে গেল। একদিন সকালের দিকে শঙ্কর মাছ ধরতে গিয়েছিল। যখন ফিরছে তখন বেলা তিনটে। স্টেশন যখন আর মাইলটাক আছে, তখন শঙ্করের কানে গেল সেই রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের মধ্যে কে যেন কোথায় অস্ফুট আর্তস্বরে কি বলছে। কোন্ দিক থেকে স্বরটা আসছে, লক্ষ্য করে কিছুদূর যেতেই দেখলে একটা ইউকাগাছের নীচে স্বল্পমাত্র ছায়াটুকুতে কে একজন বসে আছে।

শঙ্কর দ্রুতপদে তার নিকটে গেল। লোকটা ইউরোপীয়ান—পরনে তালি দেওয়া ছিন্ন ও মলিন কোটপ্যান্ট। একমুখ লাল দাড়ি, বড় বড় চোখ, মুখের গড়ন বেশ সুশ্রী, দেহও বেশ বলিষ্ঠ ছিল বোঝা যায়, কিন্তু সম্ভবত রোগে, কষ্টে ও অনাহারে বর্তমানে শীর্ণ। লোকটা গাছের গুঁড়ি হেলান দিয়ে অবসন্ন ভাবে পড়ে আছে। তার মাথায় মলিন সোলার টুপিটা এক

wapsip.com

দিকে গড়িয়ে পড়েছে মাথা থেকে—পাশে একটা খাকি কাপড়ের বড় ঝোলা।

শঙ্কর ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলে—তুমি কোথা থেকে আসছ?

লোকটা কথার উত্তর না দিয়ে মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে জলপানের ভঙ্গি করে বললে—একটু জল! জল!

শঙ্কর বললে—এখানে তো জল নেই! আমার ওপর ভর দিয়ে স্টেশন পর্যন্ত আসতে পারবে?

অতি কষ্টে খানিকটা ভর দিয়ে এবং শেষের দিকে এক রকম শঙ্করের কাঁধে চেপে লোকটা প্ল্যাটফর্মে পৌঁছুলো। ওকে আনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল; বিকেলের ট্রেন ওর অনুপস্থিতিতেই চলে গিয়েছে। ও লোকটাকে স্টেশন ঘরে বিছানা পেতে শোয়ালে, জল খাইয়ে সুস্থ করলে, কিছু খাদ্যও এনে দিলে! সে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল বটে, কিন্তু শঙ্কর দেখলে লোকটার ভারি জ্বর হয়েছে। অনেক দিনের অনিয়মে, পরিশ্রমে, অনাহারে তার শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছে—দু-চার দিনে সে সুস্থ হবে না।

লোকটা একটু পরে পরিচয় দিলে। তার নাম ডিয়েগো আল্‌ভারেজ্—জাতে পর্তুগিজ, তবে আফ্রিকার সূর্য তার বর্ণ তামাটে করে দিয়েছে।

রাত্রে ওকে স্টেশনে রাখলে শঙ্কর। কিন্তু ওর অসুখ দেখে সে পড়ে গেল বিপদে—এখানে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই—সকালের ট্রেন মোম্বাসার দিকে যায় না, বিকেলের ট্রেনে গার্ড রোগীকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রাত কাটতে এখনো অনেক দেরি। বিকেলের গাড়িখানা স্টেশনে এসে যদি পাওয়া যেত, তবে তো কোনো কথাই ছিল না।

শঙ্কর রোগীর পাশে রাত জেগে বসে রইল। লোকটির শরীরে কিছু নেই। খুব সম্ভব কষ্ট ও অনাহার ওর অসুখের কারণ। এই দূর বিদেশে ওর কেউ নেই—শঙ্কর না দেখলে ওকে দেখবে কে?··· বাল্যকাল থেকেই পরের দুঃখ সহ্য করতে পারে না সে—শঙ্কর যে ভাবে সারা রাত তার সেবা করলে, তার কোনো আপনার লোক ওর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারতো না।

উত্তর-পূর্ব কোণের অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর পেছন থেকে চাঁদ উঠছে যখন সে রাত্রে—ঝম্ ঝম্ করছে নিস্তব্ধ রাত্রি—তখন হঠাৎ প্রান্তরের মধ্যে ভীষণ সিংহ-গর্জন শোনা গেল। রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল—সিংহের ডাকে সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। শঙ্কর বললে—ভয় নেই—শুয়ে থাকো। বাইরে সিংহ ডাকছে। দরজা বন্ধ আছে।

তার পর শঙ্কর আস্তে আস্তে দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে চারিধারে দেখবামাত্রই যেন সে রাত্রির অপূর্ব দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে ফেললে। চাঁদ উঠছে দূরের আকাশপ্রান্তে—ইউকা গাছের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, ঘাসের বন যেন রহস্যময় নিস্পন্দ। সিংহ ডাকছে স্টেশনে কোয়ার্টারের পেছনে প্রায় পাঁচশো গজের মধ্যে। কিন্তু সিংহের ডাক আজকাল গা-সওয়া হয়ে উঠেছে—ওতে আর আগের মত ভয় পায় না। রাত্রির সৌন্দর্য এত আকৃষ্ট করেছে ওকে, যে ও সিংহের সান্নিধ্য যেন ভুলে গেল।

ফিরে ও স্টেশন ঘরে ঢুকল। টং টং করে ঘড়িতে দুটো বেজে গেল। ঘরে ঢুকে দেখলে রোগী বিছানায় উঠে বসে আছে। বললে—একটু জল দাও, খাবো।

লোকটা বেশ ভাল ইংরিজি বলতে পারে। শঙ্কর টিন থেকে জল নিয়ে ওকে খাওয়ালে।

লোকটার জ্বর তখন যেন কমেছে। সে বললে—তুমি কি বলছিলে? আমার ভয় করছে ভাবছিলে? ডিয়েগো আল্‌ভারেজ্ ভয় করবে? ইয়াং ম্যান, তুমি ডিয়েগো আল্‌ভারেজ্‌কে

wapsip.com

জানো না। লোকটার ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হতাশা, বিষাদ ও ব্যঙ্গ মিশানো অদ্ভুত ধরনের হাসি দেখা দিলে। সে অবসন্নভাবে বালিশের গায়ে ঢলে পড়ল। ওই হাসিতে শঙ্করের মনে হল এ লোক সাধারণ লোক নয়। তখন ওর হাতের দিকে নজর পড়ল শঙ্করের। বেঁটে বেঁটে মোটা মোটা আঙুল—দড়ির মত শিরাবহুল হাত, তাম্রাভ দাড়ির নীচে চিবুকের ভাব, শক্ত মানুষের পরিচয় দিচ্ছে। এতক্ষণ পরে খানিকটা জ্বর কমে যাওয়াতে আসল মানুষটা বেরিয়ে আসছে যেন ধীরে ধীরে।

লোকটা বললে—সরে এসো কাছে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছ। আমার নিজের ছেলে থাকলে এর বেশি করতে পারতো না। তবে একটা কথা বলি—আমি বাঁচবো না। আমার মন বলছে আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তোমার উপকার করে যেতে চাই। তুমি ইন্ডিয়ান? এখানে কত মাইনে পাও? এই সামান্য মাইনের জন্যে দেশ ছেড়ে এত দূর এসে আছ যখন, তখন তোমার সাহস আছে, কষ্ট সহ্য করবার শক্তি আছে। আমার কথা মন দিয়ে শোনো, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো আজ তোমাকে যে-সব কথা বলবো—আমার মৃত্যুর পূর্বে তা তুমি কারও কাছে প্রকাশ করবে না।

শঙ্কর সেই আশ্বাসই দিলে। তার পর সেই অদ্ভুত রাত্রি ক্রমশ কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা এমন এক আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ধরনের আশ্চর্য কাহিনী শুনিয়ে গেল—যা সাধারণত উপন্যাসেই পড়া যায়।

ডিয়েগো আল্‌ভারেজের কথা

ইয়াং ম্যান, তোমার বয়েস কত হবে? বাইশ?... তুমি যখন মায়ের কোলে শিশু—আজ বিশ বছর আগের কথা, ১৯৮৮/৮৯ সালের দিকে আমি কেপ কলোনির উত্তরে পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সোনার খনি সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম। তখন বয়েস ছিল কম, দুনিয়ার কোনো বিপদই বিপদ বলে গ্রাহ্য করতাম না।

বুলাওয়েও শহর থেকে জিনিসপত্র কিনে একাই রওনা হলাম, সঙ্গে কেবল দুটি গাধা, জিনিসপত্র বইবার জন্যে। জাম্বেজী নদী পার হয়ে চলেছি, পথ ও দেশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, শুধু ছোটখাটো পাহাড়, ঘাস, মাঝে মাঝে কাফিরদের বস্তি। ক্রমে যেন মানুষের বাস কমে এল, এমন এক জায়গায় উপস্থিত এসে পৌঁছানো গেল, যেখানে এর আগে কখনো কোনো ইউরোপীয়ান আসে নি।

যেখানেই নদী বা খাল দেখি—কিংবা পাহাড় দেখি—সকলের আগে সোনার স্তরের সন্ধান করি। লোকে কত কি পেয়ে বড়মানুষ হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, এ সম্বন্ধে বাল্যকাল থেকে কত কাহিনীই শুনে এসেছিলুম—সেই সব গল্পের মোহই আমায় আফ্রিকায় নিয়ে এসে ফেলেছিল। কিন্তু বৃথাই দু বৎসর ধরে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ালুম। কত অসহ্য কষ্ট সহ্য করলুম এই দু বছরে। একবার তো সন্ধান পেয়েও হারালুম।

সেদিন একটা হরিণ শিকার করেছি সকালের দিকে। তাঁবু খাটিয়ে মাংস রান্না করে শুয়ে পড়লুম দুপুর বেলা—কারণ দুপুরের রোদে পথ চলা সে-সব জায়গায় একরকম অসম্ভব—১১৫° ডিগ্রী থেকে ১৩০° ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তাপ হয় গ্রীষ্মকালে। বিশ্রামের পরে বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি বন্দুকের নলের মাছিটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। মাছি না থাকলে রাইফেলের তাগ্ ঠিক হয় না। কত এদিক ওদিক খুঁজেও মাছিটা পাওয়া গেল না।

wapsip.com

কাছেই একটা পাথরের ঢিবি, তার গায়ে সাদা সাদা কি একটা কঠিন পদার্থ চোখে পড়ল। ঢিবিটার গায়ে সেই জিনিসটা নানা স্থানে আছে। বেছে বেছে তারই একটা দানা সংগ্রহ করে ঘষে মেজে নিয়ে আপাতত সেটাকেই মাছি করে রাইফেলের নলের আগায় বসিয়ে নিলাম। তারপর বৈকালে সেখান থেকে আবার উত্তর মুখে রওনা হয়েছি, কোথায় তাঁবু ফেলেছিলাম, সে কথা ক্রমেই ভুলে গিয়েছি।

দিন পনেরো পরে একজন ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, সেও আমার মত সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে দুজন মাটাবেল কুলী ছিল। পরস্পরকে পেয়ে আমরা খুশি হলাম, তার নাম জিম্ কার্টার, আমারই মত ভবঘুরে, তবে তার বয়স আমার চেয়ে বেশি। জিম্ একদিন আমার বন্দুকটা নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ কি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। আমায় বললে—বন্দুকের মাছি তোমার এ রকম কেন? তারপর আমার গল্প শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে—তুমি বুঝতে পারো নি এ জিনিসটা খাঁটি রূপো, খনিজ রূপো। এ যেখানে পাওয়া যায় সাধারণত সেখানে রূপোর খনি থাকে। আমার আন্দাজ হচ্ছে এক টন পাথর থেকে সেখানে অন্তত ন'হাজার আউন্স রূপো পাওয়া যাবে। সে জায়গাতে এক্ষুনি চলো আমরা যাই। এবার আমরা লক্ষপতি হয়ে যাবো।

সংক্ষেপে বলি। তারপর কার্টারকে সঙ্গে নিয়ে আমি যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে আবার গেলাম। কিন্তু চার মাস ধরে কত চেষ্টা, কত অসহ্য কষ্ট পেয়ে, কতবার বিরাট দিক-দিশাহীন মরুভূমিবৎ ভেল্ডের মধ্যে পথ হারিয়ে, মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত পৌঁছেও, কিছুতেই আমি সে স্থান নির্ণয় করতেই পারলাম না। যখন সেখান থেকে সেবার তাঁবু উঠিয়ে দিয়েছিলাম, অত লক্ষ্য করিনি জায়গাটা। আফ্রিকার ভেল্ডে কোনো চিহ্ন বড় একটা থাকে না, যার সাহায্যে পুরোনো জায়গা খুঁজে বার করা যায়—সবই যেন একরকম। অনেকবার হয়রান হয়ে শেষে আমরা রূপোর খনির আশা ত্যাগ করে গুয়াই নদীর দিকে চললাম। জিম্ কার্টার আমাকে আর ছাড়লে না, তার মৃত্যু পর্যন্ত আমার সঙ্গেই ছিল। তার সে শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভাবলে এখনও আমার কষ্ট হয়।

তৃষ্ণার কষ্টই এই ভ্রমণের সময় সব কষ্টের চেয়ে বেশি বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে। তাই এখন থেকে আমরা নদীপথ ধরে চলবো, এই স্থির করা গেল। বনের জন্তু শিকার করে খাই, আর মাঝে মাঝে কাফির বস্তি যদি পাই, সেখান থেকে মিষ্টি আলু, মুরগী প্রভৃতি সংগ্রহ করি।

একবার অরেঞ্জ নদী পার হয়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী একটা কাফির বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছি, সেই দিন দুপুরের পরে কাফির বস্তির মোড়লের মেয়ে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমরা দেখতে গেলাম—পাঁচ ছ' বছরের একটা ছোট্ট উলঙ্গ মেয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে—তার পেটে নাকি ভয়ানক ব্যথা। সবাই কাঁদছে ও দাপাদাপি করছে। মেয়েটার ঘাড়ে নিশ্চয়ই দানো চেপেছে—ওকে মেরে না ফেলে ছাড়বে না। তাকে ও তার বাপ মাকে জিজ্ঞাসা করে এইটুকু জানা গেল, সে বনের ধারে গিয়েছিল—তার পর থেকে তাকে ভূতে পেয়েছে। আমি ওর অবস্থা দেখে বুঝলাম কোনো বনের ফল বেশি পরিমাণে খেয়ে ওর পেট কামড়াচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোনো বনের ফল সে খেয়েছিল কিনা? সে বললে—হ্যাঁ, খেয়েছিল। কাঁচা ফল? মেয়েটা বললে—ফল নয়, ফলের বীজ। সে ফলের বীজই খাদ্য।

এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধে তার ভূত ছেড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে ওষুধের বাক্স

wapsip.com

ছিল। গ্রামে আমাদের খাতির হয়ে গেল খুব। পনেরো দিন আমরা সে গ্রামের সর্দারের অতিথি হয়ে রইলাম। ইলান্ড হরিণ শিকার করি আর রাত্রে কাফ্রিদের মাংস খেতে নিমন্ত্রণ করি। বিদায় নেবার সময় কাফ্রি সর্দার বললে—তোমরা সাদা পাথর খুব ভালবাস—না? বেশ খেলবার জিনিস। নেবে সাদা পাথর? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। একটু পরে সে একটা ডুমুর ফলের মত বড় সাদা পাথর আমাদের হাতে এনে দিলে। জিম্ ও আমি বিস্ময়ে চমকে উঠলাম—জিনিসটা হীরক! ...খনি বা খনির ওপরকার উপলাকীর্ণ মৃত্তিকাস্তর থেকে প্রাপ্ত পালিশ-না-করা হীরক খণ্ড!

কাফ্রি সর্দার বললে—এটা তোমরা নিয়ে যাও। ঐ যে দূরের বড় পাহাড় দেখছ, ধোঁয়া ধোঁয়া—এখান থেকে হেঁটে গেলে একটা চাঁদের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবে। ঐ পাহাড়ের মধ্যে এ রকম সাদা পাথর অনেক আছে বলে শুনেছি। আমরা কখনো যাই নি, জায়গা ভাল নয়, ওখানে বুনিপ বলে উপদেবতা থাকে। অনেক চাঁদ আগেকার কথা, আমাদের গ্রামের তিনজন সাহসী লোক কারও বারণ না শুনে ঐ পাহাড়ে গিয়েছিল, আর ফেরে নি। আর একবার একজন তোমাদের মত সাদা মানুষ এসেছিল, সেও অনেক, অনেক চাঁদ আগে। আমরা দেখি নি, আমাদের বাপ ঠাকুরদাদাদের আমলের কথা। সে গিয়ে আর ফেরে নি।

কাফ্রি গ্রাম থেকে বার হয়েই পথে আমরা ম্যাপ মিলিয়ে দেখলাম—দূরের ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট ব্যাপারটা হচ্ছে রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড পর্বতশ্রেণী—দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা বন্য, অজ্ঞাত, বিশাল ও বিপদসঙ্কুল অঞ্চল। কোনো সভ্য মানুষ সে অঞ্চলে পদার্পণ করে নি—দু-একজন দুর্ধর্ষ দেশ-আবিষ্কারক বা ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞ ছাড়া। ঐ বিস্তীর্ণ বনপর্বতের অধিকাংশ স্থানই সম্পূর্ণ অজানা, তার ম্যাপ নেই, তার কোথায় কি আছে কেউ বলতে পারে না।

জিম্ কার্টার ও আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল—আমরা দুজনেই তখনই স্থির করলাম ওই অরণ্য ও পর্বতমালা আমাদেরই আগমন প্রতীক্ষায় তার বিপুল রত্নভাণ্ডার লোকচক্ষুর আড়ালে গোপন করে রেখেছে। আমরা ওখানে যাবোই।

কাফ্রি গ্রাম থেকে রওনা হবার প্রায় সতেরো দিন পরে আমরা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশের নিবিড় বনে প্রবেশ করলাম।

পূর্বেই বলেছি দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যন্ত দুর্গম প্রদেশে এই পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। জঙ্গলের কাছাকাছি কোনো কাফ্রি বস্তি পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ল না। জঙ্গল দেখে মনে হল কাঠুরিয়ার কুঠার আজ পর্যন্ত এখানে প্রবেশ করে নি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা জঙ্গলের ধারে এসে পৌঁছেছিলাম। জিম্ কার্টারের পরামর্শ মত সেখানেই আমরা রাত্রের বিশ্রামের জন্য তাঁবু খাটালাম। জিম্ জঙ্গলের কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বাললে—আমি লাগলুম রান্নার কাজে। সকালের দিকে একজোড়া পাখি মেরেছিলাম, সেই পাখি ছাড়িয়ে তার রোস্ট করবো এই ছিল মতলব। পাখি ছাড়ানোর কাজে একটু ব্যস্ত আছি—এমন সময় জিম্ বললে—পাখি রাখো। দু পেয়ালা কফি করো তো আগে।

আগুন জ্বালাই ছিল। জল গরম করতে দিয়ে আবার পাখি ছাড়াতে বসেছি, এমন সময় সিংহের গর্জন একেবারে অতি নিকটে শোনা গেল। জিম্ বন্দুক নিয়ে বেরুল, আমি বললাম—অন্ধকার হয়ে আসছে, বেশি দূর যেও না। তার পরে আমি পাখি ছাড়াচ্ছি—কিছু দূরে জঙ্গলের বাইরেই দু-বার বন্দুকের আওয়াজ শুনলুম। একটুখানি থেমে আবার আর একটা

wapsip.com

আওয়াজ। তার পরেই সব চুপ। মিনিট দশ কেটে গেল, জিম্ আসে না দেখে আমি নিজের রাইফেলটা নিয়ে যেদিকে থেকে আওয়াজ এসেছিল, সেদিকে একটু যেতেই দেখি জিম্ আসছে—পেছনে কি একটা ভারী মত টেনে আনছে। আমায় দেখে বললে—ভারি চমৎকার ছালখানা। জঙ্গলের ধারে ফেলে রাখলে হায়নাতে সাবাড় করে দেবে। তাঁবুর কাছে টেনে নিয়ে যাই চলো।

দুজনে টেনে সিংহের প্রকাণ্ড দেহটা তাঁবুর আগুনের কাছে নিয়ে এসে ফেললাম। তার পর ক্রমে রাত হল। খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা শুয়ে পড়লুম।

অনেক রাত্রে সিংহের গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল। তাঁবু থেকে অল্প দূরেই সিংহ ডাকছে। অন্ধকারে বোঝা গেল না ঠিক কতদূরে। আমি রাইফেল নিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। জিম্ শুধু একবার বললে—সন্ধ্যাবেলার সেই সিংহটার জুড়ি।

বলেই সে নির্বিকারভাবে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তাঁবুর বাইরে এসে দেখি আগুন নিবে গিয়েছে, পাশে কাঠকুটো ছিল, তাই দিয়ে আবার জোর আগুন জ্বাললাম। তারপরে আবার এসে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলাম। কিছুদূর গিয়ে জনকয়েক কাফিরের সঙ্গে দেখা হোল। তারা হরিণ শিকার করতে এসেছে। আমরা তাদের তামাকের লোভ দেখিয়ে কুলী ও পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নিতে চাইলাম।

তারা বললে—তোমরা জানো না তাই ও কথা বলছ। এ জঙ্গলে মানুষ আসে না। যদি বাঁচতে চাও তো ফিরে যাও। ঐ পাহাড়ের শ্রেণী অপেক্ষাকৃত নীচু, ওটা পার হয়ে মধ্যে খানিকটা সমতল জায়গা আছে, ঘন বনে ঘেরা, তার ওদিকে আবার এর চেয়েও উঁচু পর্বতশ্রেণী। ঐ বনের মধ্যের সমতল জায়গাটা বড় বিপজ্জনক, ওখানে বুনিপ্ থাকে। বুনিপের হাতে পড়লে আর ফিরে আসতে হবে না। ওখানে কেউ যায় না। আমরা তামাকের লোভে ওখানে যাবো মরতে? ভাল চাও তো তোমরাও যেও না।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—বুনিপ্ কি?

তারা জানে না। তবে তারা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে বুনিপ্ কি, না জানলেও সে কি অনিষ্ট করতে পারে সেটা তারা খুব ভাল রকমই জানে।

ভয় আমাদের ধাতে ছিল না, জিম্ কার্টারের তো একেবারেই না। সে আরও বিশেষ করে জেদ ধরে বসল। এই বুনিপের রহস্য তাকে ভেদ করতেই হবে—হীরা পাই বা না পাই। মৃত্যু যে তাকে অলক্ষিতে টানছে, তখনও যদি বুঝতে পারতাম।

বৃদ্ধ এই পর্যন্ত বলে একটু হাঁপিয়ে পড়ল। শঙ্করের মনে তখন অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে, এ ধরনের কথা সে কখনও আর শোনে নি। মুমূর্ষু ডিয়েগো আল্ভারেজের জীর্ণ পরিচ্ছদ ও শিরাবহুল হাতের দিকে চেয়ে, তার পাকা ভুরু জোড়ার নীচেকার ইস্পাতের মত নীল দীপ্তিশীল চোখ দুটোর দিকে চেয়ে, শঙ্করের মন শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় ভরে উঠল।

সত্যিকার মানুষ বটে একজন!

আল্ভারেজ্ বললে—আর একগ্লাস জল—

জন পান করে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করলে—

হ্যাঁ তার পরে শোনো! ঘোর বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম। কত বড় বড় গাছ বড় বড় ফার্ন, কত বিচিত্র বর্ণের অর্কিড ও লায়ানা, স্থানে স্থানে সে বন নিবিড় ও দুষ্প্রবেশ্য। বড় বড় গাছের নীচেকার জঙ্গল এতই ঘন। বঁড়শির মত কাঁটা গাছের গায়ে, মাথার ওপর কার

wapsip.com

পাতায় পাতায় এমন জড়াজড়ি যে সূর্যের আলো কোনো জন্মে সে জঙ্গলে প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ। আকাশ দেখা যায় না। অত্যন্ত বেবুনের উৎপাত জঙ্গলের সর্বত্র, বড় গাছের ডালে দলে দলে শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা নানারকমের বেবুন বসে আছে—অনেক সময় দেখলাম মানুষের আগমন তারা গ্রাহ্য করে না। দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখায়—দু একটা বুড়ো সর্দার বেবুন সত্যিই হিংস্র প্রকৃতির, হাতে বন্দুক না থাকলে তারা অনায়াসেই আমাদের আক্রমণ করত। জিম্ কার্টার বললে—অন্তত আমাদের খাদ্যের অভাব হবে না কখনো এ জঙ্গলে।

সাত-আটদিন সেই নিবিড় জঙ্গলে কাটল। জিম্ কার্টার ঠিকই বলেছিল, প্রতিদিন একটা করে বেবুন আমাদের খাদ্য যোগান দিতে দেহপাত করত। উঁচু পাহাড়টা থেকে জঙ্গলের নানাস্থানে ছোট বড় ঝরনা নেমে এসেছে, সুতরাং জলের অভাবও ঘটল না। একবার কিন্তু এতে বিপদও ঘটেছিল। একটা ঝরনার ধারে দুপুরবেলা এসে আগুন জ্বেলে বেবুনের দাপ্না ঝালসাবার ব্যবস্থা করছি, জিম্ গিয়ে তৃষ্ণার ঝোঁকে ঝরনার জল পান করলে। তার একটু পরেই তার ক্রমাগত বমি হতে শুরু করল। পেটে ভয়ানক ব্যথা। আমি একটু বিজ্ঞান জানতাম, আমার সন্দেহ হওয়াতে ঝরনার জল পরীক্ষা করে দেখি, জলে খনিজ আর্সেনিক মেশানো আছে। ওপর পাহাড়ের আর্সেনিকের স্তর ধুয়ে ঝরনা নেমে আসছে নিশ্চয়ই। হোমিওপ্যাথিক বাক্স থেকে প্রতিষেধক ওষুধ দিতে সন্ধ্যার দিকে জিম্ সুস্থ হয়ে উঠল।

বনের মধ্যে ঢুকে কেবল এক বেবুন ও মাঝে মাঝে দু-একটা বিষধর সাপ ছাড়া অন্য কোনো বন্যজন্তুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় নি! পাখির কথা আর প্রজাপতির কথা অবশ্য বাদ দিলাম। কারণ এই সব ট্রপিক্যাল জঙ্গল ছাড়া এত বিচিত্র বর্ণের ও শ্রেণীর পাখি ও প্রজাপতি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে বন্যজন্তু বলতে যা বোঝায়, তারা সে পর্যায়ে পড়ে না।

প্রথমেই রিখ্টারস্‌ভেল্ড্ পর্বতশ্রেণীর একটা শাখা পর্বত আমাদের সামনে পড়ল, সেটা মূল ও প্রধান পর্বতের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিচু। সেটা পার হয়ে আমরা একটা বিস্তীর্ণ বনময় উপত্যকায় নেমে তাঁবু ফেললাম। একটা ক্ষুদ্র নদী উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে। নদী দেখে আমার ও জিমের আনন্দ হল, এই সব নদীর তীর থেকেই অনেক সময় খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

নদীর নানাদিকে আমরা বালি পরীক্ষা করে বেড়াই, কিছুই কোথাও পাওয়া যায় না। সোনার একটা রেণু পর্যন্ত নেই নদীর বালিতে। আমরা ক্রমে হতাশ হয়ে পড়লুম। তখন প্রায় কুড়ি-বাইশ দিন কেটে গিয়েছে। সন্ধ্যার সময় কফি খেতে খেতে জিম্ বললে, দেখো, আমার মন বলছে এখানে আমরা সোনার সন্ধান পাবো। থাকো এখানে আর কিছুদিন।

আরও কুড়িদিন কাটল। বেবুনের মাংস অসহ্য ও অত্যন্ত অরুচিকর হয়ে উঠেছে। জিমের মত লোকও হতাশ হয়ে পড়ল। আমি বললাম—আর কেন জিম্, চলো ফিরি এবার। কাফির গ্রামে আমাদের ঠকিয়েছে। এখানে কিছু নেই।

জিম্ বললে—এই পর্বতশ্রেণীর নানা শাখা আছে, সবগুলো না দেখে যাবো না।

একদিন পাহাড়ী নদীটার খাতের ধারে বসে বালি চালতে চালতে পাথরের নুড়ির রাশির মধ্যে অর্ধপ্রোথিত একখানা হলদে রঙের ছোট পাথর আমি ও জিম্ একসঙ্গেই দেখতে পেলাম। দুজনেই তাড়াতাড়ি সেটা খুঁড়ে তুললাম। আমাদের মুখ আনন্দে ও বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জিম বললে—ডিয়েগো, পরিশ্রম এতদিনে সার্থক হল— চিনেছ তো?

আমিও বুঝেছিলাম। বললাম—হ্যাঁ। কিন্তু নদীস্রোতে ভেসে আসা জিনিসটা। খনির

wapsip.com

অস্তিত্ব নেই এখানে।

পাথরখানা দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত হলদে রঙের হীরকের জাত। অবশ্য খুব আনন্দের কোনো কারণ ছিল না, কারণ এতে মাত্র এটাই প্রমাণ হয় যে, এই বিশাল পর্বতশ্রেণীর কোনো অজ্ঞাত, দুর্গম অঞ্চলে হলদে হীরকের খনি আছে। নদীস্রোতে ভেসে এসেছে তা থেকে একটা স্তরের একটা টুকরো। সে মূল খনি খুঁজে বার করা অমানুষিক পরিশ্রম, ধৈর্য ও সাহস-সাপেক্ষ।

সে পরিশ্রম, সাহস ও ধৈর্যের অভাব আমাদের ঘটত না, কিন্তু যে দৈত্য ঐ রহস্যময় বনপর্বতের অমূল্য হীরকখনির প্রহরী, সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের বাধা দিলে।

একদিন আমরা বনের মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গায় বসে সন্ধ্যার দিকে বিশ্রাম করছি, আমাদের সামনে পরিষ্কার জায়গাতে একটা তাল গাছ, তালগাছের তলায় গুঁড়িটা ঘিরে খুব ঘন বন-ঝোপ। হঠাৎ আমরা দেখলাম কিসে যেন অত বড় তালগাছটা এমন নাড়া দিচ্ছে যে, তার ওপরকারের শুকনো ডালপালাগুলো খর্ খর্ করে নড়ে উঠছে, যেমন নড়ে ঝড় লাগলে। গাছটাও সেইসঙ্গে নড়ছে।

আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বাতাস নেই কোনোদিকে, অথচ তালগাছটা নড়ছে কেন? আমাদের মনে হল কে যেন তালগাছের গুঁড়িটা ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে। জিম্ তখুনি ব্যাপারটা কি দেখতে গুঁড়ির তলায় সেই জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকলো।

সে ওর মধ্যে ঢুকবার অল্পক্ষণ পরেই আমি একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়ে রাইফেল নিয়ে ছুটে গেলুম—ঝোপের মধ্যে ঢুকে দেখি জিম্ রক্তাক্ত দেহে বনের মধ্যে পড়ে আছে—কোন্ ভীষণ বলবান জন্তুতে তার মুখের সামনে থেকে বুক পর্যন্ত ধারালো নখ দিয়ে চিরে ফেঁড়ে ফেলেছে—যেমন পুরানো বালিশ ফেঁড়ে তুলো বার করে, তেমনি। জিম্ শুধু বললে—সাক্ষাৎ শয়তান—মূর্তিমান শয়তান—

হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললে—পালাও—পালাও—

তারপরেই জিম্ মারা গেল। তালগাছের গায়ে দেখি যেন কিসের মোটা ও শক্ত চোঁচ লেগে আছে। আমার মনে হল কোন ভীষণ বলবান জানোয়ার তালগাছের গায়ে গা ঘষছিল, গাছটা ওরকম নড়ছিল সেই জন্যেই। জন্তুটার কোনো পাত্তা পেলাম না। জিমের দেহ ফাঁকা জায়গায় বার করে আমি রাইফেল হাতে ঝোপের ওপারে গেলুম। সেখানে গিয়ে দেখি মাটির ওপরে কোনো অজ্ঞাত জন্তুর পায়ের চিহ্ন, তার মোটে তিনটে আঙুল পায়ে,—কিছুদূর গেলুম পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে, জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর গিয়ে একটা গুহার মুখে পদচিহ্নটা ঢুকে গেল। গুহার প্রবেশ-পথের কাছে শুকনো বালির ওপরে ওই অজ্ঞাত ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার বড় বড় তিন-আঙুলে থাবার দাগ রয়েছে।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। সেই জনহীন অরণ্যভূমি ও পর্বত-বেষ্টিত অজ্ঞাত উপত্যকায় একা দাঁড়িয়ে আমি এক অজ্ঞাততর ভীষণ বলবান জন্তুর অনুসরণ করছি। ডাইনে চেয়ে দেখি প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় সুউচ্চ ব্যাসাল্টের দেওয়াল খাড়া উঠেছে প্রায় চার হাজার ফুট, বনে বনে নিবিড়, খুব উঁচুতে পর্বতের বাঁশবনের মাথায় সামান্য যেন একটু রাঙা রোদ—কিম্বা হয়তো আমার চোখের ভুল, অনন্ত আকাশের আভা পড়ে থাকবে।

ভাবলাম, এ সময় গুহার মধ্যে ঢোকা বা এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বিবেচনার কাজ হবে না। জিমের দেহ নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলুম। সারারাত তার মৃতদেহ নিয়ে আগুন জ্বেলে রাইফেল তৈরি রেখে বসে রইলুম।

wapsip.com

পরদিন জিম্‌কে সমাধিস্থ করে আবার ওই জানোয়ারটার খোঁজে বার হলাম। কিন্তু মুশকিল এই যে, সে গুহা এবং সেই তালগাছটা পর্যন্ত অনেক খুঁজেও কিছুতেই বার করতে পারলুম না। ও রকম অনেক গুহা আছে পর্বতের নানা জায়গায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন্ গুহা দেখেছিলাম কে জানে?

সঙ্গীহীন অবস্থায় সেই মহাদুর্গম রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্ পর্বতশ্রেণীর বনের মধ্যে থাকা চলে না। পনেরো দিন হেঁটে সেই কাফির বস্তিতে পৌঁছিলাম। তারা চিনতে পারলে, খুব খাতির করলে। তাদের কাছে জিমের মৃত্যু-কাহিনী বললুম।

শুনে তাদের মুখ ভয়ে কেমন হয়ে গেল—ছোট ছোট চোখ ভয়ে বড় হয়ে উঠল। বললে—সর্বনাশ! বুনিপ্। ওই ভয়েই ওখানে কেউ যায় না।

কাফির বস্তি থেকে আর পাঁচ দিন হেঁটে অরেঞ্জ নদীর ধারে একখানা ডাচ্ লঞ্চ পেলাম। তাতে করে এসে সভ্য জগতে পৌঁছুলাম।

আমি আর কখনো রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্ পর্বতের দিকে যেতে পারি নি। চেষ্টা করেছিলাম অনেক। কিন্তু বুয়র যুদ্ধ এসে পড়ল। যুদ্ধে গেলাম। আহত হয়ে প্রিটোরিয়ার হাসপাতালে অনেকদিন রইলাম। তারপর সেরে উঠে একটা কমলালেবুর বাগানে কাজ পেয়ে সেখানেই এতদিন ছিলাম।

বছর চার-পাঁচ শান্ত জীবন যাপন করবার পরে, ভাল লাগলো না, তাই আবার বার হয়েছিলাম। কিন্তু বয়েস হয়ে গিয়েছে অনেক, ইয়াংম্যান, এবার আমার চলা বোধ হয় ফুরুবে।

এই ম্যাপখানা তুমি রাখো। এতে রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্ পর্বত ও যে নদীতে আমরা হীরা পেয়েছিলাম, মোটামুটি ভাবে আঁকা আছে। সাহস থাকে, সেখানে যেও, বড় মানুষ হবে। বুয়র যুদ্ধের পর ওই অঞ্চলে ওয়াই নদীর ধারে দু-একটা ছোট বড় হীরার খনি বেরিয়েছে। কিন্তু আমরা যেখানে হীরা পেয়েছিলুম তার সন্ধান কেউ জানে না। যেও তুমি।

ডিয়েগো আল্‌ভারেজ্ গল্প শেষ করে আবার অবসন্ন ভাবে বালিশের গায়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল।

পাঁচ

শঙ্করের সেবাশুশ্রূষার গুণে ডিয়েগো আল্‌ভারেজ্ সে যাত্রা সেরে উঠল এবং দিন পনেরো শঙ্কর তাকে নিজের কাছেই রাখলে। কিন্তু চিরকাল যে পথে পথে বেড়িয়ে এসেছে, ঘরে তার মন বসে না। একদিন সে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শঙ্কর নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছিল। বললে, চল, তোমার অসুখের সময় যে-সব কথা বলেছিলে, মনে আছে? সেই হলদে হীরের খনি?

অসুখের ঝোঁকে আল্‌ভারেজ্ যে-সব কথা বলেছিল, এখন সে সম্বন্ধে বৃদ্ধ আর কোনো কথাটি বলে না। বেশির ভাগ সময় চুপ করে কি যেন ভাবে। শঙ্করের কথার উত্তরে বৃদ্ধ বললে—আমিও কথাটা যে না ভেবে দেখেছি, তা মনে কোরো না! কিন্তু আলেয়ার পেছনে ছুটবার সাহস আছে তোমার?

শঙ্কর বললে—আছে কি না দেখতে দোষ কি? আজই বলো তো মাভো স্টেশনে তার করে আমার বদলে অন্য লোক পাঠাতে বলি।

আল্‌ভারেজ্ কিছু না ভেবেই বললে—করো তার। কিন্তু আগে বুঝে দেখো। যারা

wapsip.com

সোনা বা হীরা খুঁজে বেড়ায় তারা সব সময় তা পায় না। আমি আশি বছরের এক বুড়ো লোককে জানতাম, সে কখনো কিছু পায় নি—তবে প্রতিবারই বলতো, এইবার ঠিক সন্ধান পেয়েছি, এইবার পাবো! আজীবন অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে আর আফ্রিকার ভেল্‌ড়ে প্রসপেক্‌টিং করে বেড়িয়েছে।

আরও দিন দশেক পরে দুজনে কিসুমু গিয়ে ভিক্টোরিয়া নায়াগ্রা হ্রদে স্টীমার চড়ে দক্ষিণ মুখে মোয়ান্‌জার দিকে যাকে ঠিক করলে।

পথে এক জায়গায় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাজার হাজার জেব্রা, জিরাফ, হরিণ চরতে দেখে শঙ্কর তো অবাক, এমন দৃশ্য সে আর কখনো দেখে নি। জিরাফগুলো মানুষকে আদৌ ভয় করে না, পঞ্চাশ গজ তফাতে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

আল্‌ভারেজ্‌ বলল—আফ্রিকার জিরাফ মারবার জন্যে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বিশেষ লাইসেন্স নিতে হয়। যে সে মারতে পারে না। সেজন্যে মানুষকে এদের তত ভয় নেই।

হরিণের দল কিন্তু বড় ভীরু, এক এক দলে দু-তিন শো হরিণ চরছে, ওদের দেখে ঘাস খাওয়া ফেলে মুখ তুলে একবার চাইলে, তার পরক্ষণেই মাঠের দূর প্রান্তের দিকে সবাই চার পা তুলে দৌড়।

কিসুমু থেকে স্টীমার ছাড়ল—এটা ব্রিটিশ স্টীমার, ওদের পয়সা নেই বলে ডেকে যাচ্ছে। নিগ্রো মেয়েরা পিঠে ছেলেমেয়ে বেঁধে মুরগী নিয়ে স্টীমারে উঠেছে। মাসাই কুলীরা ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে—সঙ্গে নাইরোবি শহর থেকে কাঁচের পুঁতি, কম দামের খেলো আয়না ছুরি প্রভৃতি নানা জিনিস।

স্টীমার থেকে নেমে আবার ওরা পথ চলে। ভিক্টোরিয়া হ্রদের যে বন্দরে ওরা নামলে—তার নাম মোওয়ান্‌জা—এখান থেকে তিন শো মাইল দূরে ট্যাবোরা, সেখানে পৌঁছে কয়েক দিন বিশ্রাম করে ওরা যাবে টাঙ্গানিয়াকা হ্রদের তীরবর্তী উজিজি বন্দরে।

এই পথে যাবার সময় আল্‌ভারেজ্‌ বললে—টাঙ্গানিয়াকার মধ্য দিয়ে যাওয়া বড় বিপজ্জনক ব্যাপার। এখানে এক রকম মাছি আছে, তা কামড়ালে স্লিপিং সিকনেস হয়। স্লিপিং সিকনেসের মড়কে টাঙ্গানিয়াকা জনশূন্য হয়ে পড়েছে। মোওয়ান্‌জা থেকে ট্যাবোরার পথে সিংহের ভয়ও খুব বেশি। প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার এই অঞ্চলও 'সিংহের রাজ্য' বলা চলে।

শহর থেকে দশ মাইল দূরে পথের ধারে একটা ছোট খড়ের বাংলো। সেখানে এক ইউরোপীয় শিকারী আশ্রয় নিয়েছে। আল্‌ভারেজ্‌কে সে খুব খাতির করলে। শঙ্করকে দেখে বললে—একে পেলে কোথায়? এ তো হিন্দু! তোমার কুলী?

আল্‌ভারেজ্‌ বললে—আমার ছেলে।

সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললে—কি রকম?

আল্‌ভারেজ্‌ আনুপূর্বিক সব বর্ণনা করলে, তার রোগের কথা, শঙ্করের সেবাশুশ্রূষার কথা। কেবল বললে না কোথায় যাচ্ছে ও কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।

সাহেব হেসে বললে—বেশ ভালো। ওর মুখ দেখে মনে হয় ওর মনে সাহস ও দয়া দুইই আছে। ইস্ট ইন্ডিজের হিন্দুরা লোক হিসেবে ভালোই বটে। একবার ইউগান্ডাতে একজন শিখ আমার প্রতি এমন সুন্দর আতিথ্য দেখিয়েছিল, তা কখনো ভুলতে পারবো না। আজ তোমরা এসো, রাত সামনে, আমার এখানেই রাত্রি যাপন করো। এটা গভর্নমেন্টের ডাকবাংলো। আমিও তোমাদের মত সারাদিন পথ চলে বিকেলের দিকে এসে উঠেছি।

সাহেবের একটা ছোট গ্রামোফোন আছে, সন্ধ্যার পরে টিনবন্দী বিলাতী টোমাটোর

wapsip.com

ঝোল ও সার্ডিন মাছ সহযোগে সান্ধ্যভোজন সমাপ্ত করার পরে সবাই বাংলোর বাইরে ক্যাম্প চেয়ারে শুয়ে রেকর্ড শুনে যাচ্ছে, এমন সময় অল্প দূরে সিংহের গর্জন শোনা গেল। বোধ হল, মাটির কাছে মুখ নামিয়ে সিংহ গর্জন করছে—কারণ মাটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। সাহেব বললে—টাঙ্গানিয়াকায় বেজায় সিংহের উপদ্রব আর বড় হিংস্র এরা। প্রায় অধিকাংশ সিংহই মানুষখেকো। মানুষের রক্তের আস্বাদ একবার পেয়েছে, এখন মানুষ ছাড়া আর কিছু চায় না।

শঙ্কর ভাবলে খুব সুসংবাদ বটে। ইউগান্ডা রেলওয়ে তৈরি হবার সময়ে সে সিংহের উপদ্রব কাকে বলে খুব ভালই দেখেছে।

পরদিন সকালে ওরা আবার রওনা হল, সাহেব বলে দিলে সূর্য উঠে গেলে খুব সাবধান থাকবে। স্লিপিং সিকনেসের মাছি রোদ উঠলেই জাগে। গায়ে যেন না বসে।

দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে সুঁড়িপথ। আল্‌ভারেজ্ বললে—খুব সাবধান, এই সব ঘাসের বনেই সিংহের আড্ডা। বেশি পেছনে থেকো না।

আল্‌ভারেজের বন্দুক আছে, এই একটা ভরসা। আর একটা ভরসা এই যে আল্‌ভারেজ্, যাকে বলে 'ক্র্যাক্ শট্' তাই। অর্থাৎ তার গুলি বড় একটা ফস্কায় না। কিন্তু অত বড় অব্যর্থ-লক্ষ্য শিকারীর সঙ্গে থেকেও শঙ্কর বিশেষ ভরসা পেলে না, কারণ ইউগান্ডার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, সিংহ যখন যাকে নেবে, এমন সম্পূর্ণ অতর্কিতেই নেবে, যে পিঠের রাইফেলের চামড়ার স্ট্র্যাপ খোলবার অবকাশ পর্যন্ত দেবে না।

সেদিন সন্ধ্যা হবার ঘণ্টাখানেক আগে দূরবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে রাত্রের বিশ্রামের জন্য স্থান নির্বাচন করে নিতে হল। আল্‌ভারেজ্ বললে—সামনে কোন গ্রাম নেই—অন্ধকারের পর এখানে পথ চলা ঠিক নয়।

একটা সুবৃহৎ বাওবাব্ গাছের তলায় দু-টুকরো কেম্বিস ঝুলিয়ে ছোট্ট একটু তাঁবু খাটানো হল। কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাত্রে খাবার তৈরি করতে বসল শঙ্কর। তারপর সমস্তদিন পরিশ্রমের পরে দুজনেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে আল্‌ভারেজ্ ডাকলে—শঙ্কর, ওঠো।

শঙ্কর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল।

আল্‌ভারেজ্ বললে—কি একটা জানোয়ার তাঁবুর চারিপাশে ঘুরছে—বন্দুক বাগিয়ে রাখো।

সত্যিই একটা কোনো অজ্ঞাত বৃহৎ জন্তুর নিঃশ্বাসের শব্দ তাঁবুর পাতলা কেম্বিসের পর্দার বাইরেই শোনা যাচ্ছে বটে। তাঁবুর সামনে সন্ধ্যায় যে আগুন করা হয়েছিল—তার স্বল্পাবশিষ্ট আলোকে সুবৃহৎ বাওবাব্ গাছটা একটা ভীষণদর্শন দৈত্যের মত দেখাচ্ছে। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে বিছানা থেকে নামবার চেষ্টা করতে বৃদ্ধ বারণ করলে।

পরক্ষণেই জানোয়ারটা হুড়মুড় করে তাঁবুটা ঠেলে তাঁবুর মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর পর্দার ভেতর থেকেই আল্‌ভারেজ্ পর পর দুবার রাইফেল ছুঁড়লে। শব্দটা লক্ষ্য করে শঙ্করও সেই মুহূর্তে বন্দুক ওঠালে। কিন্তু শঙ্কর ঘোড়া টেপবার আগে আল্‌ভারেজের রাইফেল আর একবার আওয়াজ করে উঠল।

তারপরেই সব চুপ।

ওরা টর্চ জ্বেলে সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে এসে দেখলে তাঁবুর পুবদিকের পর্দার বাইরে পর্দাটা খানিকটা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে এক প্রকাণ্ড সিংহ।

wapsip.com

সেটা তখনও মরে নি, কিন্তু সাংঘাতিক আহত হয়েছে। আরও দুবার গুলি খেয়ে সেটা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

আল্‌ভারেজ্ আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে বললে—রাত এখনো অনেক। ওটা এখানে পড়ে থাক। চলো আমরা আমাদের ঘুম শেষ করি।

দুজনেই এসে শুয়ে পড়ল—একটু পরে শঙ্কর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে আল্‌ভারেজের নাসিকা-গর্জন শুরু হয়েছে। শঙ্করের চোখে ঘুম এল না।

আধঘণ্টা পরে শঙ্করের মনে হল, আল্‌ভারেজের নাসিকা-গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে টাঙ্গানিয়াকা অঞ্চলের সমস্ত সিংহ যেন একযোগে ডেকে উঠল। সে কি ভয়ানক সিংহের ডাক। ...আগেও শঙ্কর অনেকবার সিংহগর্জন শুনেছে, কিন্তু এ রাত্রের সে ভীষণ বিরাট গর্জন তার চিরকাল মনে ছিল। তা ছাড়া ডাক তাঁবু থেকে বিশ হাতের মধ্যে।

আল্‌ভারেজ্ আবার জেগে উঠল। বললে—নাঃ, রাত্রে দেখছি একটু ঘুমুতে দিলে না। আগের সিংহটার জোড়া। সাবধান থাকো। বড় পাজী জানোয়ার।

কি দুর্যোগের রাত্রি! তাঁবুর আগুনও তখন নিবু-নিবু। তার বাইরে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাতলা কেম্বিসের চটের মাত্র ব্যবধান—তার ওদিকে সাথীহারা পশু। বিরাট গর্জন করতে করতে সেটা একবার তাঁবু থেকে দূরে যায়, আবার কাছে আসে, কখনও তাঁবু প্রদক্ষিণ করে।

ভোর হবার কিছু আগে সিংহটা সরে পড়ল। ওরাও তাঁবু তুলে আবার যাত্রা শুরু করলে।

ছয়

দিন পনেরো পরে শঙ্কর ও আল্‌ভারেজ্ উজিজি বন্দর থেকে স্টীমারে টাঙ্গানিয়াকা হ্রদের বক্ষে ভাসল। হ্রদ পার হয়ে আলবার্টভিল্ বলে একটা ছোট শহরে কিছু আবশ্যকীয় জিনিস কিনে নিল। এই শহর থেকে কাবালো পর্যন্ত বেলজিয়ম গভর্নমেন্টের রেলপথ আছে। সেখান থেকে কঙ্গো নদীতে স্টীমারে চড়ে তিনদিনের পথ সান্‌কিনি যেতে হবে, সান্‌কিনি নেমে কঙ্গোনদীর পথ ছেড়ে, দক্ষিণ মুখে অজ্ঞাত বনজঙ্গল ও মরুভূমির দেশে প্রবেশ করতে হবে।

কাবালো অতি অপরিষ্কার স্থান, কতকগুলো বর্ণসঙ্কর পর্তুগিজ ও বেলজিয়ানের আড্ডা।

স্টেশনের বাইরে পা দিয়েছে এমন সময় একজন পর্তুগিজ ওর কাছে এসে বললে—হ্যালো, কোথায় যাবে, দেখছি নতুন লোক, আমায় চেনো না নিশ্চয়ই। আমার নাম আলবুকার্ক!

শঙ্কর চেয়ে দেখলে আল্‌ভারেজ্ তখনও স্টেশনের মধ্যে।

লোকটার চেহারা যেমন কর্কশ, তেমনি কদাকার। কিন্তু সে ভীষণ জোয়ান, প্রায় সাতফুটের কাছাকাছি লম্বা, শরীরের প্রত্যেকটি মাংসপেশী গুনে নেওয়া যায়, এমনি সুদৃঢ় ও সুগঠিত।

শঙ্কর বললে—তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।

লোকটা বললে—তুমি দেখছি কালা আদমি, বোধ হয় ঈস্ট ইন্ডিজের। আমার সঙ্গে পোকার খেলবে চলো।

শঙ্কর ওর কথা শুনে চটেছিল, বললে—তোমার সঙ্গে পোকার খেলবার আমার আগ্রহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে এটাও বুঝলে, লোকটা পোকার খেলবার ছলে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করতে চায়। পোকার একরকম তাসের জুয়াখেলা—শঙ্কর নাম জানলেও সে খেলা কখনো

wapsip.com

জীবনে দেখেও নি, নাইরোবিতে সে জানতো বদমাইশ জুয়াড়ীরা পোকার খেলার ছল করে নতুন লোকের সর্বনাশ করে। এটা এক ধরনের ডাকাতি।

শঙ্করের উত্তর শুনে পর্তুগিজ বদমাইশটা রেগে লাল হয়ে উঠল। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুতে চাইল । সে আরও কাছে ঘেঁষে এসে, দাঁতে দাঁত চেপে, অতি বিকৃত সুরে বললে—কি? নিগার, কি বললি? ঈস্ট ইণ্ডিজের তুলনায় তুই অত্যন্ত ফাজিল দেখছি। তোর ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্যে তোকে জানিয়ে দিই যে, তোর মত কালা আদমিকে আলবুকার্ক এই রিভলভারের গুলিতে কাদাখোঁচা পাখির মত ডজনে ডজনে মেরেছে। আমার নিয়ম হচ্ছে এই শোন। কাবালোতে যারা নতুন লোক নামবে, তারা হয় আমার সঙ্গে পোকার খেলবে, নয়তো আমার সঙ্গে রিভলভারে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবে।

শঙ্কর দেখলে এই বদমাইশ লোকটার সঙ্গে রিভলভারের লড়াইয়ে নামলে মৃত্যু অনিবার্য। বদমাইশটা হচ্ছে একজন ক্র্যাক্-শট্ গুণ্ডা, আর সে কি? কাল পর্যন্ত রেলের নিরীহ কেরানী ছিল। কিন্তু যুদ্ধ না করে যদি পোকারই খেলে তবে সর্বস্ব যাবে।

হয়তো আধমিনিট কাল শঙ্করের দেরী হয়েছে উত্তর দিতে, লোকটা কোমরের চামড়ার হোলস্টার থেকে নিমেষের মধ্যে রিভলভার বার করে শঙ্করের পেটের কাছে উঁচিয়ে বললে—যুদ্ধ না পোকার?

শঙ্করের মাথায় রক্ত উঠে গেল। ভীরুর মত সে পাশবিক শক্তির কাছে মাথা নিচু করবে না, হোক মৃত্যু।

সে বলতে যাচ্ছে—যুদ্ধ, এমন সময় পেছন থেকে ভয়ানক বাঁজখাই সুরে কে বললে—এই! সামলাও, গুলিতে মাথার চাঁদি উড়ল! দুজনেই চমকে উঠে পেছনে চাইলে। আল্‌ভারেজ্ তার উইনচেস্টার রিপিটারটা বাগিয়ে উঁচিয়ে পর্তুগিজ বদমাইশটার মাথা লক্ষ্য করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে। শঙ্কর সুযোগ বুঝে চট করে পিস্তলের নলের উল্টোদিকে ঘুরে গেল। আল্‌ভারেজ্ বললে—বালকের সঙ্গে রিভলভার ডুয়েল? ছোঃ, তিন বলতে পিস্তল ফেলে দিবি—এক—দুই—তিন—

আলবুকার্কের শিথিল হাত থেকে পিস্তলটা মাটিতে পড়ে গেল।

আল্‌ভারেজ্ বললে—বালককে একা পেয়ে খুব বীরত্ব জাহির করছিলি না?

শঙ্কর ততক্ষণ পিস্তলটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে। আলবুকার্ক একটু বিস্মিত হল, আল্‌ভারেজ্ যে শঙ্করের দলের লোক, তা সে ভাবেও নি। সে হেসে বললে—আচ্ছা মেট্, কিছু মনে কোরো না, আমারই হার। দাও, আমার পিস্তলটা দাও ছোকরা। কোনো ভয় নেই, দাও। এসো, হাতে হাত দাও। তুমিও মেট্। আলবুকার্ক রাগ পুষে রাখে না। এসো, কাছেই আমার কেবিন, এক এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে নাও।

আল্‌ভারেজ্ নিজের জাতের লোকের রক্ত চেনে! ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে আল্‌বুকার্কের কেবিনে গেল। শঙ্কর বিয়ার খায় না শুনে তাকে কফি করে দিলে। প্রাণ-খোলা হাসি হেসে কত গল্প করলে, যেন কিছুই হয়নি।

শঙ্কর বাস্তবিকই লোকটার দিকে আকৃষ্ট হল। কিছুক্ষণ আগের অপমান ও শত্রুতা যে এখন বেমালুম ভুলে গিয়ে, যাদের হাতে অপমান হয়েছে, তাদেরই সঙ্গে এমনি ধারা দিলখোলা হেসে খোশগল্প করতে পারে, পৃথিবীতে সে ধরনের লোক বেশি নেই।

পরদিন ওরা কাবালো থেকে স্টীমারে উঠল কঙ্গোনদী বেয়ে দক্ষিণ মুখে যাবার জন্যে।

wapsip.com

নদীর দুই তীরের দৃশ্যে শঙ্করের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

এরকম অদ্ভুত বনজঙ্গলের দৃশ্য জীবনে কখনো সে দেখে নি। এতদিন সে যেখানে ছিল, আফ্রিকার সে অঞ্চলে এমন বন নেই—সে শুধু বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রধানত ঘাসের বন, মাঝে মাঝে বাবলা ও ইউকা গাছ। কিন্তু কঙ্গোনদী বেয়ে স্টীমার যত অগ্রসর হয়, দুধারে নিবিড় বনানী, কত ধরনের মোটা মোটা লতা, বনের ফুল; বন্যপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী, আপনার সৌন্দর্যে ও নিবিড় প্রাচুর্যে আপনি মুগ্ধ।

শঙ্করের মধ্যে যে সৌন্দর্যপ্রিয় ভাবুক মনটি ছিল, (হাজার হোক সে বাংলার মাটির ছেলে, ডিয়েগো আল্‌ভারেজের মত শুধু কঠিন-প্রাণ স্বর্ণান্বেষী প্রস্‌পেক্টর নয়) এই রূপের মেলায় সে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে রাঙা অপরাহ্নে ও দুপুর রোদে আপন মনে কত কি স্বপ্নজাল রচনা করে।

অনেক রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, অচেনা তারাভরা বিদেশের আকাশের তলায় রহস্যময়ী, বন্য প্রকৃতি তখন যেন জেগে উঠেছে—জঙ্গলের দিক থেকে কত বন্যজন্তুর ডাক কানে আসে। শঙ্করের চোখে ঘুম নেই, এই সৌন্দর্য-স্বপ্নে ভোর হয়ে, মধ্য আফ্রিকার নৈশ শীতলতাকে তুচ্ছ করেও জেগে বসে থাকে।

ঐ জ্বলজ্বলে সপ্তর্ষিমণ্ডল—আকাশে অনেকদূরে তার ছোট্ট গ্রামের মাথায়ও আজ এমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল উঠেছে, ওই রকম এক ফালি কৃষ্ণপক্ষের-গভীর-রাত্রির চাঁদও। সে-সব পরিচিত আকাশ ছেড়ে কতদূরে সে এসে পড়েছে, আরও কতদূরে তাকে যেতে হবে, কি এর পরিণতি কে জানে?

দুদিন পরে বোট এসে সান্‌কিনি পৌঁছুলো। সেখান থেকে ওরা আবার পদব্রজে রওনা হল—জঙ্গল এদিকে বেশি নেই, কিন্তু দিগন্তপ্রসারী জনমানবহীন প্রান্তর ও অসংখ্য ছোট বড় পাহাড়, অধিকাংশ পাহাড় রুক্ষ ও বৃক্ষশূন্য, কোনো কোনো পাহাড়ে ইউফোর্বিয়া জাতীয় গাছের ঝোপ। কিন্তু শঙ্করের মনে হল, আফ্রিকার এই অঞ্চলের দৃশ্য বড় অপরূপ। এতটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে মন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, সূর্যাস্তের রঙ, জ্যোৎস্নারাত্রির মায়া, এই দেশকে রাত্রে, অপরাহ্নে রূপকথার পরীরাজ্য করে তোলে।

আল্‌ভারেজ্‌ বললে—এই ভেল্ড্‌ অঞ্চলে সব জায়গা দেখতে একরকম বলে পথ হারাবার সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশি।

কথাটা যেদিন বলা হল, সেদিনই এক কাণ্ড ঘটল। জনহীন ভেল্ডে সূর্য অস্ত গেলে ওরা একটা ছোট পাহাড়ের আড়ালে তাঁবু খাটিয়ে আগুন জ্বাললে—শঙ্কর জল খুঁজতে বেরুল। সঙ্গে আল্‌ভারেজের বন্দুকটা নিয়ে গেল, কিন্তু মাত্র দুটি টোটা। আধঘণ্টা এদিক ওদিক ঘুরে বেলাটুকু গেল, পাতলা অন্ধকারে সমস্ত প্রান্তরকে ধীরে ধীরে আবৃত করে দিলে। শঙ্কর শপথ করে বলতে পারে, সে আধঘণ্টার বেশি হাঁটে নি। হঠাৎ চারিধারে চেয়ে শঙ্করের কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হল, যেন কি একটা বিপদ আসছে, তাঁবুতে ফেরা ভাল। দূরে দূরে ছোট বড় পাহাড়, একই রকম দেখতে সব দিক, কোনো চিহ্ন নেই, সব একাকার।

মিনিট পাঁচ-ছয় হাঁটবার পরই শঙ্করের মনে হল সে পথ হারিয়েছে। তখন আল্‌ভারেজের কথাটা তার মনে পড়ল। কিন্তু তখনও সে অনভিজ্ঞতার দরুন বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলে না। হেঁটেই যাচ্ছে—একবার মনে হয় সামনে, একবার মনে হয় বাঁয়ে, একবার মনে হয় ডাইনে। তাঁবুর আগুনের কুণ্ডটা দেখা যায় না কেন? কোথায় সেই ছোট পাহাড়টা?

দু-ঘণ্টা হাঁটবার পরে শঙ্করের খুব ভয় হল। ততক্ষণে সে বুঝেছে যে, সে সম্পূর্ণরূপে

wapsip.com

পথ হারিয়েছে এবং ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। একা তাকে রোডেসিয়ার এই জনমানবশূন্য, সিংহসঙ্কুল অজানা প্রান্তরে রাত কাটাতে হবে,—অনাহারে এবং এই কনকনে শীতে বিনা কম্বলে ও বিনা আগুনে। সঙ্গে একটা দেশলাই পর্যন্ত নেই।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই দাঁড়ালো যে, পরদিন সন্ধ্যার পূর্বে অর্থাৎ পথ হারানোর চব্বিশ ঘণ্টা পরে উদ্‌ভ্রান্ত, তৃষ্ণায় মুমূর্ষু শঙ্করকে, ওদের তাঁবু থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে, একটা ইউফোর্বিয়া গাছের তলা থেকে আল্‌ভারেজ্ উদ্ধার করে তাঁবুতে নিয়ে এল।

আল্‌ভারেজ্ বললে—তুমি যে পথ ধরেছিলে শঙ্কর, তোমাকে আজ খুঁজে বার করতে না পারলে, তুমি গভীর থেকে গভীরতর মরুপ্রান্তরের মধ্যে গিয়ে পড়ে, কাল দুপুর নাগাদ তৃষ্ণায় প্রাণ হারাতে। এর আগে তোমার মত অনেকেই রোডেসিয়ার ভেল্ডে এ ভাবে মারা গিয়েছে। এ-সব ভয়ানক জায়গা। তুমি আর কখনও তাঁবু থেকে ওরকম বেরিও না, কারণ তুমি আনাড়ী। মরুভূমিতে ভ্রমণের কৌশল তোমার জানা নেই। ডাহা মারা পড়বে।

শঙ্কর বললে—আল্‌ভারেজ্, তুমি দুবার আমার প্রাণ রক্ষা করলে, এ আমি ভুলবো না।

আল্‌ভারেজ্ বললে—ইয়াং ম্যান, ভুলে যাচ্ছ যে তার আগে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তুমি না থাকলে ইউগান্ডার তৃণভূমিতে আমার হাড়গুলো সাদা হয়ে আসতো এতদিন।

মাস দুই ধরে রোডেসিয়া ও এঙ্গোলার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভেল্ড্ অতিক্রম করে, অবশেষে দূরে মেঘের মত পর্বতশ্রেণী দেখা গেল। আল্‌ভারেজ্ ম্যাপ মিলিয়ে বলল—ওই হচ্ছে আমাদের গন্তব্যস্থান, রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্ পর্বত, এখনও এখান থেকে চল্লিশ মাইল হবে। আফ্রিকার এই সব খোলা জায়গায় অনেক দূর থেকে জিনিস দেখা যায়।

এ অঞ্চলে অনেক বাওবাব্ গাছ। শঙ্করের এ গাছটা বড় ভাল লাগে—দূর থেকে যেন মনে হয় বট কি অশ্বত্থ গাছের মত, কিন্তু কাছে গেলে দেখা যায়, বাওবাব্ গাছ ছায়াবিরল অথচ বিশাল, আঁকা বাঁকা, সারা গায়ে যেন বড় বড় আঁচিল কি আব্ বেরিয়েছে, যেন আরব্য উপন্যাসের একটা বেঁটে, কুদর্শন, কুব্জ দৈত্য। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এখানে ওখানে প্রায় সর্বত্রই দূরে নিকটে বড় বড় বাওবাব্ গাছ দাঁড়িয়ে।

একদিন সন্ধ্যাবেলার দুর্জয় শীতে তাঁবুর সামনে আগুন করে বসে আল্‌ভারেজ্ বললে—এই যে দেখছ রোডেসিয়ার ভেল্ড্ অঞ্চল, এখানে হীরে ছড়ানো আছে সর্বত্র, এটা হীরের খনির দেশ। কিম্বার্লি খনির নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। আরও অনেক ছোটখাটো খনি আছে, এখানে ওখানে ছোট বড় হীরের টুকরো কত লোকে পেয়েছে, এখনও পায়!

কথা শেষ করেই বলে উঠল—ও কারা?

শঙ্কর সামনে বসে ওর কথা শুনছিল। বললে, কোথায় কে?

কিন্তু আল্‌ভারেজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার হাতের বন্দুকের গুলির মতই অব্যর্থ, একটু পরে তাঁবু থেকে দূরে অন্ধকারে কয়েকটি অস্পষ্ট মূর্তি এদিকে এগিয়ে আসছে, শঙ্করের চোখে পড়ল। আল্‌ভারেজ্ বললে—শঙ্কর, বন্দুক নিয়ে এসো, চট করে যাও, টোটা ভরে—

বন্দুক হাতে শঙ্কর বাইরে এসে দেখলে, আল্‌ভারেজ্ নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করছে, কিছুদূরে অজানা মূর্তি কয়টি এখনও অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আসছে। একটু পরে তারা এসে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের বাইরে দাঁড়ালো। শঙ্কর চেয়ে দেখলে আগন্তুক কয়েকটি কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়,—তাদের হাতে কিছু নেই, পরনে লেংটি, গলায় সিংহের লোম, মাথায় পালক—সুগঠিত চেহারা, তাঁবুর আলোয় মনে হচ্ছিল, যেন কয়েকটি ব্রোঞ্জের মূর্তি।

wapsip.com

আল্‌ভারেজ্‌ জুলু ভাষায় বললে—কি চাও তোমরা?

ওদের মধ্যে কি কথাবার্তা চলল, তার পরে ওরা সব মাটির ওপর বসে পড়ল। আল্‌ভারেজ্‌ বললে—শঙ্কর, ওদের খেতে দাও—

তার পরে অনুচ্চস্বরে বললে—বড় বিপদ। খুব হুঁশিয়ার, শঙ্কর!

টিনের খাবার খোলা হল। সকলের সামনেই খাবার রাখলে শঙ্কর। আল্‌ভারেজ্‌ও ওই সঙ্গে আবার খেতে বসলো, যদিও সে ও শঙ্কর সন্ধ্যার সময়েই তাদের নৈশ আহার শেষ করেছে। শঙ্কর বুঝলে আল্‌ভারেজের কোনো মতলব আছে, কিংবা এদেশের রীতি অতিথির সঙ্গে খেতে হয়।

আল্‌ভারেজ্‌ খেতে খেতে জুলু ভাষায় আগন্তুকদের সঙ্গে গল্প করছে, অনেকক্ষণ পরে খাওয়া শেষ করে ওরা চলে গেল। চলে যাবার আগে সবাইকে একটা করে সিগারেট দেওয়া হল।

ওরা চলে গেলে আল্‌ভারেজ্‌ বললে—ওরা মাটাবেল্‌ জাতির লোক। ভয়ানক দুর্দান্ত, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে অনেকবার লড়েছে। শয়তানকেও ভয় করে না। ওরা সন্দেহ করেছে আমরা ওদের দেশে এসেছি হীরের খনির সন্ধানে। আমরা যে জায়গাটায় আছি, ওটা ওদের একজন সর্দারের রাজ্য। কোনো সভ্য গভর্নমেন্টের আইন এখানে খাটবে না। ধরবে আর নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে মারবে। চলো আমরা তাঁবু তুলে রওনা হই।

শঙ্কর বললে—তবে তুমি বন্দুক আনতে বললে কেন?

আল্‌ভারেজ্‌ হেসে বললে—দ্যাখো, ভেবেছিলুম যদি ওরা খেয়েও না ভোলে, কিংবা কথাবার্তায় বুঝতে পারি যে, ওদের মতলব খারাপ, ভোজনরত অবস্থাতেই ওদের গুলি করবো। এই দ্যাখো রিভলভার পেছনে রেখে তবে খেতে বসেছিলাম। এ কটাকে সাবাড় করে দিতাম। আমার নাম আল্‌ভারেজ্‌, আমিও একসময়ে শয়তানকেও ভয় করতুম না, এখনও করি নে। ওদের হাতের মাছ মুখে পৌঁছোবার আগেই আমার পিস্তলের গুলি ওদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিত।

আরও পাঁচ-ছ' দিন পথ চলবার পরে একটা খুব বড় পর্বতের পাদমূলে নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানীর মধ্যে ওরা প্রবেশ করলে। স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনি বিশাল। সে বন দেখে শঙ্করের মনে হল, একবার যদি সে এর মধ্যে পথ হারায়, সারাজীবন ঘুরলেও বার হয়ে আসবার সাধ্য তার হবে না। আল্‌ভারেজ্‌ও তাকে সাবধান করে দিয়ে বললে—খুব হুঁশিয়ার শঙ্কর, বনে চলাফেরা যার অভ্যাস নেই, সে পদে পদে এইসব বনে পথ হারাবে। অনেক লোক বেঘোরে পড়ে বনের মধ্যে মারা পড়ে। মরুভূমির মধ্যে যেমন পথ হারিয়ে ঘুরেছিলে, এর মধ্যেও ঠিক তেমনিই পথ হারাতে পারো। কারণ এখানে সবই একরকম, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গাকে পৃথক করে চিনে নেবার কোনো চিহ্ন নেই। ভাল বুশম্যান না হলে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে। বন্দুক না নিয়ে এক পা কোথাও যাবে না, এটিও যেন মনে থাকে। মধ্য আফ্রিকার বন শৌখিন ভ্রমণের পার্ক নয়।

শঙ্করকে তা না বললেও চলতো, কারণ এসব অঞ্চল যে শখের পার্ক নয়, তা এর চেহারা দেখেই সে বুঝতে পেরেছে। সে জিজ্ঞেস করলে—তোমার সেই হলদে হীরের খনি কতদূরে? এই তো রিখ্‌টারসভেল্ড্‌ পর্বতমালা, ম্যাপে যতদূর বোঝা যাচ্ছে।

আল্‌ভারেজ্‌ হেসে বললে—তোমার ধারণা নেই বললাম যে। আসল রিখ্‌টারসভেল্ডের এটা বাইরের থাক্‌। এরকম আরও অনেক থাক্‌ আছে। সমস্ত অঞ্চলটা এত বিশাল যে পুবে

wapsip.com

সত্তর মাইল ও পশ্চিমদিকে একশো থেকে দেড়শো মাইল পর্যন্ত গেলেও এ বন ও পাহাড় শেষ হবে না। সর্বনিম্ন প্রস্থ চল্লিশ মাইল। সমস্ত জড়িয়ে আট ন' হাজার বর্গমাইল সমস্ত রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্ পার্বত্য অঞ্চল ও অরণ্য। এই বিশাল অজানা অঞ্চলের কোন্‌খানটাতে এসেছিলুম আজ সাত আট বছর আগে, ঠিক সে জায়গাটা খুঁজে বার করা কি ছেলেখেলা, ইয়াং ম্যান?

শঙ্কর বললে—এদিকে খাবার ফুরিয়েছে, শিকারের ব্যবস্থা দেখতে হয়, নইলে কাল থেকে বায়ুভক্ষণ ছাড়া উপায় নেই।

আল্‌ভারেজ্ বললে—কিছু ভেবো না। দেখছ না গাছে গাছে বেবুনের মেলা? কিছু না মেলে বেবুনের দাপনা ভাজা আর কফি দিয়ে দিব্যি ব্রেকফাস্ট খাবো কাল থেকে। আজ আর নয়, তাঁবু ফেলো, বিশ্রাম করা যাক।

একটা বড় গাছের নীচে তাঁবু খাটিয়ে ওরা আগুন জ্বালালে। শঙ্কর রান্না করলে, আহারাদি শেষ করে যখন দুজনে আগুনের সামনে বসেছে, তখনও বেলা আছে।

আল্‌ভারেজ্ কড়া তামাকে পাইপ টানতে টানতে বললে—জানো শঙ্কর, আফ্রিকার এইসব অজানা অরণ্যে এখনও কত জানোয়ার আছে, যার খবর বিজ্ঞানশাস্ত্র রাখে না? খুব কম সভ্য মানুষ এখানে এসেছে। ওকাপি বলে যে জানোয়ার সে তো প্রথম দেখা গেল ১৯০০ সালে। এক ধরনের বুনো শূওর আছে, যা সাধারণ বুনো শূওরের প্রায় তিনগুণ বড় আকারের। ১৮৮৮ সালে মোজেস কাউলে, পৃথিবী পর্যটক ও বড় শিকারী, সর্বপ্রথম ওই বুনো শূওরের সন্ধান পান বেলজিয়ান কঙ্গোর লুয়ালাবু অরণ্যের মধ্যে। তিনি বহু কষ্টে একটা শিকারও করেন এবং নিউইয়র্ক প্রাণীবিদ্যা সংক্রান্ত মিউজিয়মে উপহার দেন। বিখ্যাত রোডেসিয়ান মনস্টারের নাম শুনেছ?

শঙ্কর বললে—না, কি সেটা?

—শোনো তবে। রোডেসিয়ার উত্তর সীমায় প্রকাণ্ড জলাভূমি আছে। ওদেশের অসভ্য জুলুদের মধ্যে অনেকেই এক অদ্ভুত ধরনের জানোয়ারকে এই জলাভূমিতে মাঝে মাঝে দেখেছে। ওরা বলে তার মাথা কুমীরের মত, গণ্ডারের মত তার শিং আছে, গলাটা অজগর সাপের মত লম্বা ও আঁশওয়ালা দেহটা জলহস্তীর মত, লেজটা কুমীরের মত। বিরাটদেহ এই জানোয়ারের প্রকৃতিও খুব হিংস্র। জল ছাড়া কখনো ডাঙায় এ জানোয়ারকে দেখা যায় নি। তবে এই সব অসভ্য দেশী লোকের অতিরঞ্জিত বিবরণ বিশ্বাস করা শক্ত।

কিন্তু ১৮৮০ সালে জেমস মার্টিন বলে একজন প্রস্‌পেক্টর রোডেসিয়ার এই অঞ্চলে বহুদিন ঘুরেছিলেন সোনার সন্ধানে। মিঃ মার্টিন আগে জেনারেল ম্যাথিউসের এডিকং ছিলেন, নিজে একজন ভাল ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ববিদও ছিলেন। ইনি তাঁর ডায়েরীর মধ্যে রোডেসিয়ার এই অজ্ঞাত জানোয়ার দূর থেকে দেখেছেন বলে উল্লেখ করে গিয়েছেন। তিনিও বলেন, জানোয়ারটা আকৃতিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসর জাতীয় সরীসৃপের মত ও বেজায় বড়। কিন্তু তিনি জোর করে কিছু বলতে পারেন নি, কারণ খুব ভোরের কুয়াশার মধ্যে কোভিরাণ্ডো হ্রদের সীমানায় জলাভূমিতে আবছায়া ভাবে তিনি জানোয়ারটাকে দেখেছিলেন। জানোয়ারটার ঘোড়ার চিঁহিঁ ডাকের মত ডাক শুনেই তাঁর সঙ্গে জুলু চাকরগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে পালাতে বললে—সাহেব পালাও, পালাও, ডিঙ্গোনেক্! ডিঙ্গোনেক্! ডিঙ্গোনেক্ ঐ জানোয়ারটার জুলু নাম। দু-তিন বছরে এক আধবার দেখা দেয় কি না দেয়, কিন্তু সেটা এতই হিংস্র যে তার আবির্ভাব সে দেশের লোকের পক্ষে ভীষণ ভয়ের ব্যাপার। মিঃ মার্টিন বলেন,

wapsip.com

তিনি তাঁর ·৩০৩ টোটা গোটা দুই উপরি উপরি ছুঁড়েছিলেন জানোয়ারটার দিকে। অতদূর থেকে তাক হল না, রাইফেলের আওয়াজে সেটা সম্ভবত জলে ডুব দিলে।

শঙ্কর বললে—তুমি কি করে জানলে এসব? মিঃ মার্টিনের ডায়েরী ছাপানো হয়েছিল নাকি?

—না, অনেকদিন আগে বুলাওয়েও ক্রনিকল্ কাগজে মিঃ মার্টিনের এই ঘটনাটা বেরিয়েছিল। আমি তখন সবে এদেশে এসেছি। রোডেসিয়া অঞ্চলে আমিও প্রস্পেক্টিং করে বেড়াতুম বলে জানোয়ারটার বিবরণ আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। কাগজখানা অনেকদিন আমার কাছে রেখেও দিয়েছিলুম। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল। ওরাই নাম দিয়েছিল জানোয়ারটার—রোডেসিয়ান মনস্টার।

শঙ্কর বললে, তুমি কোনো কিছু অদ্ভুত জানোয়ার দ্যাখো নি?

প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এসেছে। সেই আবছায়া আলো-অন্ধকারের মধ্যে শঙ্করের মনে হল—হয়তো শঙ্করের ভুল হতে পারে—কিন্তু শঙ্করের মনে হয় সে দেখলে আল্ভারেজ্, দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক আল্ভারেজ্, দুঁদে ও অব্যর্থলক্ষ্য আল্ভারেজ্ ওর প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলো—এবং—এবং সেইটাই সকলের চেয়ে আশ্চর্য—যেন পরক্ষণেই শিউরে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে আল্ভারেজ্ যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই চারিপাশের জনমানবহীন ঘন জঙ্গল ও রহস্যভরা দুরারোহ পর্বতমালার দিকে একবার চেয়ে দেখলে, কোন কথা বললে না। যেন এই পর্বতজঙ্গলে বহুকাল পরে এসে অতীতের কোনো বিভীষিকাময়ী পুরাতন ঘটনা ওর স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে, যে স্মৃতিটা ওর পক্ষে খুব প্রীতিকর নয়।

আল্ভারেজ্ ভয় পেয়েছে।

অবাক! আল্ভারেজের ভয়! শঙ্কর ভাবতেও পারে না। কিন্তু সেই ভয়টা অলক্ষিতে এসে শঙ্করের মনেও চেপে বসলো। এই সম্পূর্ণ অজানা বিচিত্র রহস্যময়ী বনানী, এই বিরাট পর্বতপ্রাচীর যেন এক গভীর রহস্যকে যুগ যুগ ধরে গোপন করে আসছে—যে বীর হও, যে নির্ভীক হও, এগিয়ে এসো সে—কিন্তু মৃত্যুপণে ক্রয় করতে হবে সে গহন রহস্যের সন্ধান। রিখ্টারসভেল্ট্ পর্বতমালা ভারতবর্ষের দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় নয়—এদেশের মাসাই, জুলু, মাটাবেল্ প্রভৃতি আদিম জাতির মতই ওর আত্মা নিষ্ঠুর, বর্বর, নরমাংসলোলুপ। সে কাউকে রেহাই দেবে না।

সাত

তারপর দিন দুই কেটে গেল। ওরা ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলে। পথ কোথাও সমতল নয়, কেবল চড়াই আর উৎরাই, মাঝে মাঝে কর্কশ ও দীর্ঘ টুসক্ ঘাসের বন, জল প্রায় দুষ্প্রাপ্য, ঝরনা এক-আধটা যদিও বা দেখা যায়, আল্ভারেজ্ তাদের জল ছুঁতেও দেয় না। দিব্যি স্ফটিকের মত নির্মল জল পড়ছে ঝরনা বেয়ে, সুশীতল ও লোভনীয়, তৃষ্ণার্ত লোকের পক্ষে সে লোভ সম্বরণ করা বড়ই কঠিন—কিন্তু আল্ভারেজ্ জলের বদলে ঠাণ্ডা চা খাওয়াবে তবুও জল খেতে দেবে না। জলের তৃষ্ণা ঠাণ্ডা চায়ে দূর হয় না, তৃষ্ণার কষ্টই সবচেয়ে বেশি কষ্ট বলে মনে হচ্ছিল শঙ্করের। একস্থানে টুসক্ ঘাসের বন বেজায় ঘন। তার ওপরে ওদের চারিধারে ঘিরে সেদিন কুয়াশাও খুব গভীর। হঠাৎ বেলা

wapsip.com

উঠলে নীচের কুয়াশা সরে গেল—সামনে চেয়ে শঙ্করের মনে হল, খুব বড় একটা চড়াই তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে, কত উঁচু সেটা তা জানা সম্ভব নয়, কারণ নিবিড় কুয়াশা কিংবা মেঘে তার ওপরে দিকটা সম্পূর্ণরূপে আবৃত। আল্‌ভারেজ্‌ বললে—রিখ্‌টারস্‌ভেল্ডের আসল রেঞ্জ।

শঙ্কর বললে—এটা পার হওয়া কি দরকার?

আল্‌ভারেজ্‌ বললে—এইজন্যে দরকার যে সেবার আমি আর জিম্‌ দক্ষিণ দিক থেকে এসেছিলুম এই পর্বতশ্রেণীর পাদমূলে, কিন্তু আসল রেঞ্জ পার হই নি। যে নদীর ধারে হলদে হীরে পাওয়া গিয়েছিল, তার গতি পুব থেকে পশ্চিমে। এবার আমরা যাচ্ছি উত্তর থেকে দক্ষিণে। সুতরাং পর্বত পার হয়ে ওপারে না গেলে কি করে সেই নদীটার ঠিকানা করতে পারি?

শঙ্কর বললে—আজ যে রকম কুয়াশা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি, তাতে একটু অপেক্ষা করা যাক না কেন? আর একটু বেলা বাড়ুক।

তাঁবু ফেলে আহারাদি সম্পন্ন করা হল। বেলা বাড়লেও কুয়াশা তেমন কাটল না। শঙ্কর ঘুমিয়ে পড়ল তাঁবুর মধ্যে। ঘুম যখন ভাঙল, বেলা তখন নেই। চোখ মুছতে মুছতে তাঁবুর বাইরে এসে সে দেখলে, আল্‌ভারেজ্‌ চিন্তিত-মুখে ম্যাপ খুলে বসে আছে। শঙ্করকে দেখে বললে—শঙ্কর, আমাদের এখনও অনেক ভুগতে হবে। সামনে চেয়ে দেখো।

আল্‌ভারেজের কথার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে চাইতেই এক গম্ভীর দৃশ্য শঙ্করের চোখ পড়ল। কুয়াশা কখন কেটে গেছে, তার সামনে বিশাল রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্‌ পর্বতের প্রধান থাক্‌ ধাপে ধাপে উঠে মনে হয় যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। পাহাড়ের কটিদেশ নিবিড় বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জে আবৃত কিন্তু উচ্চতম শিখররাজি অস্তমান সূর্যের রাঙা আলোয় দেবলোকের কনকদেউলের মত বহুদূর নীলশূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু সামনের পর্বতাংশ সম্পূর্ণ দুরারোহ—শুধুই খাড়া খাড়া উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ—কোথাও একটু ঢালু নেই। আল্‌ভারেজ্‌ বললে—এখান থেকে পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়, শঙ্কর। দেখেই বুঝেছ নিশ্চয়। পাহাড়ের কোলে কোলে পশ্চিম দিকে চলো। যেখানে ঢালু এবং নিচু পাবো, সেখান দিয়েই পাহাড় পার হতে হবে। কিন্তু এই দেড়শো মাইল লম্বা পর্বতশ্রেণীর মধ্যে কোথায় সে-রকম জায়গা আছে, এ খুঁজতেই তো এক মাসের ওপর যাবে দেখছি।

কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পশ্চিম দিকে যাওয়ার পরে এমন একটা জায়গা পাওয়া গেল, যেখানে পর্বতের গা বেশ ঢালু, সেখান দিয়ে পর্বতে ওঠা চলতে পারে।

পরদিন খুব সকাল থেকে পর্বতারোহণ শুরু হল। শঙ্করের ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে ছ'টা। সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতে শঙ্কর আর চলতে পারে না। যে জায়গাটা দিয়ে তারা উঠছে—সেখানে পর্বতের চার মাইলের মধ্যে উঠেছে ছ'হাজার ফুট, সুতরাং পথটা ঢালু হলেও কী ভীষণ দুরারোহ তা সহজেই বোঝা যাবে। তা ছাড়া যতই ওপরে উঠছে অরণ্য ততই নিবিড়তর, ঘন অন্ধকার চারিদিক, বেলা হয়েছে, রোদ উঠেছে, অথচ সূর্যের আলো ঢোকেনি জঙ্গলের মধ্যে—আকাশই চোখে পড়ে না তার সূর্যের আলো।

পথ বলে কোনো জিনিস নেই। চোখের সামনে শুধুই গাছের গুঁড়ি যেন ধাপে ধাপে আকাশের দিকে উঠে চলেছে। কোথা থেকে জল পড়ছে কে জানে, পায়ের নীচের প্রস্তর আর্দ্র ও পিচ্ছিল, প্রায় সর্বত্রই পাথরের ওপর শেওলা-ধরা। পা পিছলে গেলে গড়িয়ে নীচের দিকে বহুদূর চলে গিয়ে তীক্ষ্ণ শিলাখণ্ডে আহত হতে হবে।

wapsip.com

শঙ্কর বা আল্‌ভারেজ্‌ কারও মুখে কথা নেই। এই উত্তুঙ্গ পথে ওঠবার কষ্টে দুজনেই অবসন্ন; দুজনেরই ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। শঙ্করের কষ্ট আরও বেশি, বাংলার সমতলভূমিতে আজন্ম মানুষ হয়েছে, পাহাড়ে ওঠার অভ্যাসই নেই কখনো।

শঙ্কর ভাবছে, আল্‌ভারেজ্‌ কখন বিশ্রাম করতে বলবে? সে আর উঠতে পারছে না, কিন্তু যদি সে মরেও যায়, একথা আল্‌ভারেজকে সে কখনই বলবে না যে, সে আর পারছে না। হয়তো তাতে আল্‌ভারেজ্‌ ভাববে, ইস্ট ইন্ডিজের মানুষগুলো দেখছি নিতান্ত অপদার্থ। এই মহাদুর্গম পর্বত ও অরণ্যে সে ভারতের প্রতিনিধি—এমন কোনো কাজ সে করতে পারে না যাতে তার মাতৃভূমির মুখ ছোট হয়ে যায়।

বড় চমৎকার বন, যেন পরীর রাজ্য, মাঝে মাঝে ছোটখাটো ঝরনা বনের মধ্যে দিয়ে খুব ওপর থেকে নীচে নেমে যাচ্ছে। গাছের ডালে ডালে নানা রঙের টিয়াপাখি চোখ ঝলসে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বড় বড় ঘাসের মাথায় সাদা সাদা ফুল, অর্কিডের ফুল ঝুলছে গাছের ডালের গায়ে, গুঁড়ির গায়ে।

হঠাৎ শঙ্করের চোখ পড়ল, গাছের ডালে মাঝে মাঝে লম্বা দাড়ি-গোঁপওয়ালা বালখিল্য মুনিদের মত ও কারা বসে রয়েছে! তারা সবাই চুপচাপ বসে, মুনিজনোচিত গাম্ভীর্যে ভরা। ব্যাপার কি?

আল্‌ভারেজ্‌ বললে—ও কলোবাস জাতীয় মাদী বানর। পুরুষ জাতীয় কলোবাস বানরের দাড়ি-গোঁপ নেই, স্ত্রী জাতির কলোবাস বানরের হাতখানেক লম্বা দাড়ি-গোঁপ গজায় এবং তারা বড় গম্ভীর, দেখেই বুঝতে পাচ্ছ।

ওদের কাণ্ড দেখে শঙ্কর হেসেই খুন।

পায়ের তলায় মাটিও নেই, পাথরও নেই—তাদের বদলে আছে শুধু পচা পাতা ও শুকনো গাছের গুঁড়ির স্তূপ। এই সব বনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাতার রাশি ঝরছে, পচে যাচ্ছে, তার ওপরে শেওলা পুরু হয়ে উঠছে, ছাতা গজাচ্ছে, তার ওপরে আবার নতুন-ঝরা পাতার রাশি, আবার পড়ছে গাছের ডাল-পালা, গুঁড়ি। জায়গার জায়গায় ষাট-সত্তর ফুট গভীর হয়ে জমে রয়েছে এই পত্রস্তূপ।

আল্‌ভারেজ্‌ ওকে শিখিয়ে দিলে, এসব জায়গায় খুব সাবধানে পা ফেলে চলতে হবে। এমন জায়গা আছে, যেখানে মানুষে চলতে চলতে ওই ঝরা পাতার রাশির মধ্যে ভুস করে ঢুকে যেতে পারে, যেমন অতর্কিতে পথ চলতে চলতে প্রাচীন কূপের মধ্যে পড়ে যায়। উদ্ধার করা সম্ভব না হলে সে-সব ক্ষেত্রে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু অনিবার্য।

শঙ্কর বললে—পথের গাছপালা না কাটলে আর তো ওঠা যাচ্ছে না, বড় ঘন হয়ে উঠছে।

ক্ষুরের মত ধারালো চওড়া এলিফ্যান্ট্‌ ঘাসের বন—যেন রোমান যুগের দ্বি-ধার তলোয়ার। তার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় দুজনের কেউই নিরাপদ বলে ভাবছে না নিজেকে, দু-হাত তফাতে কি আছে দেখা যায় না যখন, তখন সব রকম বিপদের সম্ভাবনাই তো রয়েছে। থাকতে পারে বাঘ, থাকতে পারে সিংহ, থাকতে পারে বিষাক্ত সাপ।

শঙ্কর লক্ষ্য করছে মাঝে মাঝে ডুগডুগি বা ঢোল বাজনার মত একটা শব্দ হচ্ছে কোথায় যেন বনের মধ্যে। কোনো অসভ্য জাতির লোক ঢোল বাজাচ্ছে নাকি? আল্‌ভারেজ্‌কে সে জিজ্ঞেস করলে।

আল্‌ভারেজ্‌ বললে—ঢোল নয়, বড় বেবুন কিংবা বনমানুষে বুক চাপড়ে ওই রকম শব্দ

wapsip.com

করে। মানুষ এখানে কোথা থেকে আসবে?

শঙ্কর বললে—তুমি যে বলেছিলে এ বনে গরিলা নেই?

—গরিলা সম্ভবত নেই। আফ্রিকার মধ্যে বেল্‌জিয়ান কঙ্গোর কিভু অঞ্চল, রাওয়েন্‌জরী আল্পস্‌ বা ভিরুঙ্গা আগ্নেয় পর্বতের অরণ্য ছাড়া কোথাও গরিলা আছে বলে তো জানা নেই। গরিলা ছাড়াও অন্য ধরনের বনমানুষে বুক চাপড়ে ওই রকম আওয়াজ করতে পারে।

ওরা সাড়ে চার হাজার ফুটের ওপর উঠেছে। সেদিনের মত সেখানেই রাত্রির বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলা হল। একটা বিশাল সত্যিকার ট্রপিক্যাল অরণ্যের রাত্রিকালীন শব্দ এত বিচিত্র ধরনের ও এত ভীতিজনক যে সারারাত শঙ্কর চোখের পাতা বোজাতে পারলে না। শুধু ভয় নয়, ভয়মিশ্রিত একটা বিস্ময়।

কত রকমের শব্দ—হায়েনার হাসি, কলোবাস বানরের কর্কশ চীৎকার, বনমানুষের বুক চাপড়ানোর আওয়াজ, বাঘের ডাক—প্রকৃতির এই বিরাট নিজস্ব পশুশালায় রাত্রে কেউ ঘুমোয় না। সমস্ত অরণ্যটা এই গভীর রাত্রে যেন হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছে। বছর কয়েক আগে খুব বড় একটা সার্কাসের দল এসে ওদের স্কুল-বোর্ডিংয়ের পাশের মাঠে তাঁবু ফেলেছিল, তাদের জানোয়ারদের চীৎকারে বোর্ডিংয়ের ছেলেরা রাত্রে ঘুমুতে পারতো না—শঙ্করের সেই কথা এখন মনে পড়ল। কিন্তু এসবের চেয়েও মধ্যরাত্রে একদল বন্য হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি তাঁবুর অত্যন্ত নিকটে শুয়ে শঙ্কর এমন ভয় পেয়ে গেল যে, আল্‌ভারেজ্‌কে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠালে। আল্‌ভারেজ্‌ বললে—আগুন জ্বলছে তাঁবুর বাইরে, কোনো ভয় নেই, ওরা ঘেঁষবে না এদিকে।

সকালে উঠে আবার ওপরে ওঠা শুরু। উঠছে, উঠছে—মাইলের পর মাইল বন্য বাঁশের অরণ্য, তার তলায় বুনো আদা। ওদের পথের একশো হাতের মধ্যে বাঁদিকের বাঁশবনের তলা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড হস্তীযূথ কচি বাঁশের কোঁড় মড় মড় করে ভাঙতে ভাঙতে চলে গেল।

পাঁচ হাজার ফুট ওপরে কত কি বন্য পুষ্পের মেলা—টকটকে লাল ইরিথ্রিনা প্রকাণ্ড গাছে ফুটেছে। পুষ্পিত ইপোমিয়া লতার ফুল দেখতে ঠিক বাংলাদেশের বনকলমী ফুলের মত কিন্তু রঙটা অত গাঢ় বেগুনি নয়। সাদা ভেরোনিকা ঘন সুগন্ধে বাতাসকে ভারাক্রান্ত করেছে। বন্য কফির ফুল, রঙিন বেগোনিয়া। মেঘের রাজ্যে ফুলের বন, মাঝে মাঝে সাদা বেলুনের মত মেঘপুঞ্জ গাছপালার মগডালে এসে আটকাচ্ছে—কখনও বা আরও নেমে এসে ভেরোনিকার বন ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

সাড়ে সাত হাজার ফুটের ওপর থেকে বনের প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল। এই পর্যন্ত উঠতে ওদের আরও দু'দিন লেগেছে। আর অসহ্য কষ্ট, কোমর পিঠ ভেঙে পড়ছে। এখানে বনানীর মূর্তি বড় অদ্ভুত, প্রত্যেক গাছের গুঁড়ি ও শাখাপ্রশাখা পুরু শেওলায় আবৃত, প্রত্যেক ডাল থেকে শেওলা ঝুলছে—সে শেওলা কোথাও কোথাও এত লম্বা যে, গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকবার মত হয়েছে—বাতাসে সেগুলো আবার দোল খাচ্ছে, তার ওপর কোথাও সূর্যের আলো নেই, সব সময়ই যেন গোধূলি। আর সবটা ঘিরে বিরাজ করছে এক অপার্থিব ধরনের নিস্তব্ধতা—বাতাস বইছে তারও শব্দ নেই, পাখির কূজন নেই সে বনে—মানুষের গলার সুর নেই, কোনো জানোয়ারের ডাক নেই। যেন কোন্‌ অন্ধকার নরকে দীর্ঘশ্মশ্রু প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়েছে ওরা।

সেদিন অপরাহ্ণে যখন আল্‌ভারেজ্‌ তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করবার হুকুম দিলে—তখন

wapsip.com

তাঁবুর বাইরে বসে এক পাত্র কফি খেতে খেতে শঙ্করের মনে হল, এ যেন সৃষ্টির আদিম যুগের অরণ্যানী, পৃথিবীর উদ্ভিদজগৎ যখন কোনো একটা সুনির্দিষ্ট রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করে নি, যে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরাটকায় সরীসৃপের দল জগৎজোড়া বনজঙ্গলের নিবিড় অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতো—সৃষ্টির সেই অতীত প্রভাবে সে যেন কোন্ জাদুমন্ত্রের বলে ফিরে গিয়েছে—

সন্ধ্যার পরেই সমগ্র বনানী নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হল। তাঁবুর বাইরে ওরা আগুন করেছে—সেই আলোর মণ্ডলীর বাইরে আর কিছু দেখা যায় না। এ বনের আশ্চর্য নিস্তব্ধতা শঙ্করকে বিস্মিত করছে। বনানীর সেই বিচিত্র নৈশ শব্দ এখানে স্তব্ধ কেন? আল্‌ভারেজ্ চিন্তিত মুখে ম্যাপ দেখছিল। বললে—শোনো শঙ্কর, একটা কথা ভাবছি। আট হাজার ফুট উঠলাম, কিন্তু এখনও পর্বতের সেই খাঁজটা পেলাম না যেটা দিয়ে আমরা রেঞ্জ পার হয়ে ওপারে যাবো। আর কত ওপরে উঠবো? যদি ধরো এই অংশে স্যাডল্‌টা নাই থাকে?

শঙ্করের মনেও এ খটকা যে না জেগেছে তা নয়। সে আজই ওঠবার সময় মাঝে মাঝে ফিল্ড্ গ্লাস দিয়ে ওপরের দিকে দেখবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ঘন মেঘে বা কুয়াশায় ওপরের দিকটা সর্বদাই আবৃত থাকায় তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সত্যিই তো, তারা কত উঠবে আর, সমতল খাঁজ যদি না পাওয়া যায়? আবার নীচে নামতে হবে, আবার অন্য জায়গা বেয়ে উঠতে হবে। দফা সারা।

সে বললে—ম্যাপে কি বলে?

আল্‌ভারেজের মুখ দেখে মনে হল ম্যাপের ওপর সে আস্থা হারিয়েছে? বললে—এ ম্যাপ অত খুঁটিনাটি ভাবে তৈরি নয়। এ পর্বতে উঠেছে কে যে ম্যাপ তৈরি হবে? এই যে দেখছ—এখানা সার ফিলিপো ডি ফিলিপির তৈরি ম্যাপ, যিনি পর্তুগিজ পশ্চিম আফ্রিকার ফার্ডিনান্ডো পো শৃঙ্গ আরোহণ করে খুব নাম করেন, এবং বছর কয়েক আগে বিখ্যাত পর্বত আরোহণকারী পর্যটক ডিউক অফ আব্রুৎসির অভিযানেও যিনি ছিলেন। কিন্তু রিখ্‌টারস্‌ভেল্ডে তিনি ওঠেন নি, এ ম্যাপে পাহাড়ের যে কন্টুর আঁকা আছে, তা খুব নিখুঁত বলে মনে তো হয় না। ঠিক বুঝছি নে।

হঠাৎ শঙ্কর বলে উঠল—ও কি?

তাঁবুর বাইরে প্রথমে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ, এবং পরক্ষণেই একটা কষ্টকর কাশির শব্দ পাওয়া গেল—যেন থাইসিসের রোগী খুব কষ্টে কাতর ভাবে কাশছে। একবার··· দুবার···তার পরেই শব্দটা থেমে গেল। কিন্তু সেটা মানুষের গলার শব্দ নয়, শোনবা মাত্রেই শঙ্করের সে কথা মনে হল।

রাইফেল নিয়ে সে ব্যস্তভাবে তাঁবুর বার হতে যাচ্ছে, আল্‌ভারেজ্ তাড়াতাড়ি উঠে ওর হাত ধরে বসিয়ে দিলে।

শঙ্কর আশ্চর্য হয়ে বললে—কেন, কিসের শব্দ ওটা?

কথা বলে আল্‌ভারেজে্র দিকে চাইতেই ও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে আল্‌ভারেজে্র মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। শব্দটা শুনেই কি!

সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের মণ্ডলীর বাইরে নিবিড় অন্ধকারে একটা ভারী অথচ লঘুপদ জীব যেন বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে বেশ মনে হল।

দুজনেই খানিকটা চুপচাপ, তার পরে আল্‌ভারেজ্ বললে—আগুনে কাঠ ফেলে দাও। বন্দুক দুটো ভরা আছে কি না দেখো। ওর মুখের ভাব দেখে শঙ্কর ওকে আর কোনো প্রশ্ন

wapsip.com

করতে সাহস করলে না।

রাত্রি কেটে গেল।

পরদিন সকালে শঙ্করেরই আগে ঘুম ভাঙল। তাঁবুর বাইরে এসে কফি করবার আগুন জ্বালতে সে তাঁবু থেকে কিছুদূরে কাঠ ভাঙতে গেল। হঠাৎ তার নজর পড়ল ভিজে মাটির ওপর একটা পায়ের দাগ—লম্বায় দাগটা এগারো ইঞ্চির কম নয়, কিন্তু তিনটে মাত্র পায়ের আঙুল। তিন আঙুলেরই দাগ স্পষ্ট। পায়ের দাগ ধরে সে এগিয়ে গেল—আরও অনেকগুলো সেই পায়ের দাগ আছে, সবগুলোতেই সেই তিন আঙুল।

শঙ্করের মনে পড়ল ইউগান্ডার স্টেশন ঘরে আল্‌ভারেজের মুখে শোনা জিম্ কার্টারের মৃত্যুকাহিনী। গুহার মুখে বালির ওপর সেই অজ্ঞাত হিংস্র জানোয়ারের তিন আঙুলওয়ালা পায়ের দাগ। কাফির গ্রামের সর্দারের মুখে শোনা গল্প।

আল্‌ভারেজের কাল রাত্রের বিবর্ণ মুখও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল। আর একদিনও আল্‌ভারেজ্ ঠিক এই রকমই ভয় পেয়েছিল, যেদিন পর্বতের পাদমূলে ওরা প্রথম এসে তাঁবু পাতে।

বুনিপ্! কাফির সর্দারের গল্পের সেই বুনিপ্! রিখ্‌টারসভেল্ড্ পর্বত ও অরণ্যের বিভীষিকা, যার ভয়ে শুধু অসভ্য মানুষ কেন, অন্য কোনো বন্য জন্তু পর্যন্ত এই আট হাজার ফুটের ওপরকার বনে আসে না। কাল রাত্রে কোনো জানোয়ারের শব্দ পাওয়া যায় নি কেন, এখন তা শঙ্করের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আল্‌ভারেজ্ পর্যন্ত ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল ওর গলার শব্দ শুনে। বোধ হয় ও শব্দের সঙ্গে আল্‌ভারেজের পূর্বে পরিচয় ঘটেছে।

আল্‌ভারেজের ঘুম ভাঙতে সেদিন একটু দেরি হল। গরম কফি এবং কিছু খাদ্য গলাধঃকরণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার সেই নির্ভীক ও দুর্ধর্ষ আল্‌ভারেজ্, যে মানুষকেও ভয় করে না, শয়তানকেও না। শঙ্কর ইচ্ছে করেই আল্‌ভারেজকে ঐ অজ্ঞাত জানোয়ারের পায়ের দাগটা দেখালে না—কি জানি যদি আল্‌ভারেজ্ বলে বসে—এখনও পাহাড়ের স্যাডল্ পাওয়া গেল না, তবে নেমে যাওয়া যাক।

সকালে সেদিন খুব মেঘ করে ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামলো। পর্বতের ঢালু বেয়ে যেন হাজার ঝরনার ধারায় বৃষ্টির জল গড়িয়ে নীচে নামছে। এই বন ও পাহাড় চোখে কেমন যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, এতটা উঠেছে ওরা কিন্তু প্রতি হাজার ফুট ওপর থেকে নীচের অরণ্যের গাছপালার মাথা দেখে সেগুলিকে সমতলভূমির অরণ্য বলে ভ্রম হচ্ছে—কাজেই প্রথমটা মনে হয় যেন কতটুকুই বা উঠেছি, ঐটুকু তো।

বৃষ্টি সেদিন থামলো না—বেলা দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আল্‌ভারেজ্ ওঠবার হুকুম দিলে। শঙ্কর এটা আশা করে নি। এখানে শঙ্কর কর্মী শ্বেতাঙ্গচরিত্রের একটা দিক লক্ষ্য করলে। তার মনে হচ্ছিল, কেন এই বৃষ্টিতে মিছে মিছে বার হওয়া? একটা দিনে কি এমন হবে? বৃষ্টি-মাথার পথ চলে লাভ?

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যে ঘন অরণ্যানী ভেদ করে সেদিন ওরা সারাদিন উঠল। উঠছে, উঠছে, উঠছেই—শঙ্কর আর পারে না। কাপড়-চোপড় জিনিসপত্র, তাঁবু সব ভিজে একশা, একখানা রুমাল পর্যন্ত শুকনো নেই কোথাও—শঙ্করের কেমন একটা অবসাদ এসেছে দেহে ও মনে—সন্ধ্যার দিকে যখন সমগ্র পর্বত ও অরণ্য মেঘের অন্ধকারে ও সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকার হয়ে ভীমদর্শন ও গম্ভীর হয়ে উঠল, ওর তখন মনে হল—এই অজানা দেশে অজানা পর্বতের মাথায় ভয়ানক হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বনের মধ্যে দিয়ে, বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায়, কোন্

wapsip.com

অনির্দেশ্য হীরকখানি বা তার চেয়েও অজানা মৃত্যুর অভিমুখে সে চলেছে কোথায়? আল্‌ভারেজ্ কে তার? তার পরামর্শে কেন সে এখানে এল? হীরার খনিতে তার দরকার নেই। বাংলা দেশের খড়ে ছাওয়া ঘর, ছায়াভরা শান্ত গ্রাম্য পথ, ক্ষুদ্র নদী, পরিচিত পাখিদের কাকলী—সে-সব যেন কতদূরের কোন্ অবাস্তব স্বপ্ন-রাজ্যের জিনিস, আফ্রিকার কোনো হীরকখনি তাদের চেয়ে মূল্যবান নয়।

কিন্তু তার এ ভাব কেটে গেল অনেক রাত্রে, যখন নির্মেঘ আকাশে চাঁদ উঠল। সে অপার্থিব জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর বর্ণনা নেই। শঙ্কর আর পৃথিবীতে নেই, বাংলা বলে কোনো দেশ নেই। সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েছে—সে আর কোথাও ফিরতে চায় না, হীরা চায় না—পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বহু ঊর্ধে এক কৌমুদী-শুভ্র দেবলোকের এখন সে অধিবাসী, তার চারিধারে যে সৌন্দর্য, কোনো মানুষের চোখ এর আগে তা কখনো দেখে নি। সে. গহন নিস্তব্ধতা, এর আগে কোনো মানুষ অনুভব করে নি। জনমানবহীন বিশাল রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্ পর্বত ও অরণ্য এই গভীর নিশীথে মেঘলোকে আসন পেতে আপনাতে আপনি আত্মস্থ, ধ্যানস্তিমিত—পৃথিবীর মানুষের সেখানে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য ক্বচিৎ ঘটে।

সেই রাত্রে ঘুম থেকে ও ধড়মড়িয়ে উঠল আল্‌ভারেজের ডাকে। আল্‌ভারেজ্ ডাকছে—শঙ্কর, শঙ্কর, ওঠো বন্দুক বাগাও—

—কি-কি—

তারপর ও কান পেতে শুনলে—তাঁবুর চারিপাশে কে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ বেশ শোনা যাচ্ছে, তাঁবুর মধ্যে থেকে। চাঁদ ঢলে পড়েছে, তাঁবুর বাইরে অন্ধকারই বেশি, জ্যোৎস্নাটুকু গাছের মগডালে উঠে গিয়েছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাঁবুর দরজার মুখে আগুন তখনও একটু একটু জ্বলছে—কিন্তু তার আলোর বৃত্ত যেমন ছোট, আলোর জ্যোতিও ততোধিক ক্ষীণ, তাতে দেখবার সাহায্য কিছুই হয় না।

হুড়্‌মুড় করে একটা শব্দ হল—গাছপালা ভেঙে একটা ভারী জানোয়ার হঠাৎ ছুটে পালালো যেন। যেন তাঁবুর সকলে সজাগ হয়ে উঠেছে, এখন আর অতর্কিত শিকারের সুবিধে হবে না, বাইরের জানোয়ারটা তা বুঝতে পেরেছে।

জানোয়ারটা যাই হোক না কেন, তার যেন বুদ্ধি আছে, বিচারের ক্ষমতা আছে, মস্তিষ্ক আছে।

আল্‌ভারেজ্ রাইফেল হাতে টর্চ জ্বেলে বাইরে গেল। শঙ্করও গেল ওর পেছনে পেছনে। টর্চের আলোয় দেখা গেল, তাঁবুর উত্তর-পূর্ব কোণের জঙ্গলের চারা গাছপালার ওপর দিয়ে যেন একটা ভারী স্টীম রোলার চলে গিয়েছে। আল্‌ভারেজ্ সেইদিকে বন্দুকের নল উঁচিয়ে বার দুই দ্যাওড় করলো।

কোনো দিকে কোনো শব্দ পাওয়া গেল না।

তাঁবুতে ফেরবার সময় তাঁবুর ঠিক দরজার মুখে আগুনের কুণ্ডের অতি নিকটেই একটা পায়ের দাগ দুজনেরই চোখে পড়ল। তিনটে মাত্র আঙুলের দাগ ভিজে মাটির ওপর সুস্পষ্ট।

এতে প্রমাণ হয়, জানোয়ারটা আগুনকে ডরায় না। শঙ্করের মনে হল, যদি ওদের ঘুম না ভাঙতো, তবে সে অজ্ঞাত বিভীষিকাটি তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে একটুও দ্বিধা করতো না—এবং তার পরে কি ঘটত তা কল্পনা করে কোনো লাভ নেই। আল্‌ভারেজ্ বললে—শঙ্কর, তুমি তোমার ঘুম শেষ করো, আমি জেগে আছি।

শঙ্কর বললে—না, তুমি ঘুমোও আল্‌ভারেজ্।

wapsip.com

আল্‌ভারেজ্ ক্ষীণ হাসি হেসে বললে—পাগল, তুমি জেগে কিছু করতে পারবে না, শঙ্কর। ঘুমিয়ে পড়ো, ঐ দেখো দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আবার ঝড়বৃষ্টি আসবে, রাত শেষ হয়ে আসছে, ঘুমোও। আমি বরং একটু কফি খাই।

রাত ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে এল মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বিদ্যুৎ, তেমনি মেঘগর্জন। সে বৃষ্টি চলল সমানে সারাদিন, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। শঙ্করের মনে হল, পৃথিবীতে আজ প্রলয়ের বর্ষণ হয়েছে শুরু, প্রলয়ের দেবতা সৃষ্টি ভাসিয়ে দেবার সূচনা করেছেন বুঝি। বৃষ্টির বহর দেখে আল্‌ভারেজ্ পর্যন্ত দমে গিয়ে তাঁবু ওঠাবার নাম মুখে আনতে ভুলে গেল।

বৃষ্টি থামল যখন, তখন বিকাল পাঁচটা। বোধ হয়, বৃষ্টি না থামলেই ভাল ছিল, কারণ অমনি আল্‌ভারেজ্ চলা শুরুর করবার হুকুম দিলে। বাঙালী ছেলের স্বভাবতই মনে হয়—এখন অবেলায় যাওয়া কেন? এত কি সময় বয়ে যাচ্ছে? কিন্তু আল্‌ভারেজের কাছে দিন, রাত, বর্ষা, রৌদ্র, জ্যোৎস্না, অন্ধকার সব সমান। সে রাত্রে বর্ষাস্নাত বনভূমির মধ্যে দিয়ে মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার আলোয় দুজনে উঠছে, উঠছে—এমন সময় আল্‌ভারেজ্ পেছন থেকে বলে উঠল—শঙ্কর দাঁড়াও, ঐ দেখো—

আল্‌ভারেজ্ ফিল্ড গ্লাস দিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নালোকে বাঁ পাশের পর্বতশিখরের দিকে চেয়ে দেখছে। শঙ্কর ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। হ্যাঁ, সমতল খাঁজটা পাওয়া গিয়েছে! বেশি দূরেও নয়, মাইল দুইয়ের মধ্যে, বাঁদিক ঘেঁষে!

আল্‌ভারেজ্ হাসিমুখে বললে—দেখেছ স্যাডলটা? থামবার দরকার নেই, চলো আজ রাত্রেই স্যাডলের ওপর পৌঁছে তাঁবু ফেলবো। শঙ্কর আর সত্যিই পারছে না। এ দুর্ধর্ষ পর্তুগিজটার সঙ্গে হীরার সন্ধানে এসে সে কি ঝকমারি না করেছে! শঙ্কর জানে অভিযানের নিয়মানুযায়ী দলপতির হুকুমের ওপর কোনো কথা বলতে নেই। এখানে আল্‌ভারেজ্ই দলপতি, তার আদেশ অমান্য করা চলবে না। কোথাও আইনে লিপিবদ্ধ না থাকলেও, পৃথিবীর ইতিহাসের বড় বড় অভিযানে সবাই এই নিয়ম মেনে চলে। সেও মানবে।

অবিশ্রান্ত হাঁটবার পরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওরা এসে স্যাডলে যখন উঠল—শঙ্করের তখন আর এক পাও চলবার শক্তি নেই।

স্যাডলটার বিস্তৃতি তিন মাইলের কম নয়, কখনো বা দুশো ফুট খাড়া উঠছে, কখনো বা চার-পাঁচশো ফুট নেমে গেল এক মাইলের মধ্যে, সুতরাং বেশ দুরারোহ—যতটুকু সমতল, ততটুকু শুধুই বড় বড় বনস্পতির জঙ্গল, ইরিথ্রিনা, পেনসিয়ানা, রিঠাগাছ, বাঁশ বন্য আদা। বিচিত্র বর্ণের অর্কিডের ফুল ডালে ডালে। বেবুন ও কালোবাস বানর সর্বত্র।

আরোও দুদিন ধরে ক্রমাগত নামতে নামতে ওরা রিখ্‌টারসভেল্ড্ পর্বতের আসল রেঞ্জের ওপারের উপত্যকায় গিয়ে পদার্পণ করলো। শঙ্করের মনে হল, এদিকে জঙ্গল যেন আরও বেশি দুর্ভেদ্য ও বিচিত্র। আটলান্টিক মহাসাগরের দিক থেকে সমুদ্রবাষ্প উঠে কতক ধাক্কা খায় পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরুন পর্বতে, বাকিটা আটকায় বিশাল রিখ্‌টারসভেল্ডের দক্ষিণ সানুতে—সুতরাং বৃষ্টি এখানে হয় অজস্র, গাছপালায় তেজও তেমনি।

দিন পনেরো ধরে সে বিরাট অরণ্যাকীর্ণ উপত্যকার সর্বত্র দুজনে মিলে খুঁজেও আল্‌ভারেজ্ বর্ণিত পাহাড়ী নদীর কোনো ঠিকানা বার করতে পারলে না। ছোটখাটো ঝরনা দু-একটা উপত্যকার ওপর দিয়ে বইছে বটে—কিন্তু আল্‌ভারেজ্ কেবলই ঘাড় নাড়ে আর বলে—এসব নয়।

wapsip.com

শঙ্কর বলে—তোমার ম্যাপ দ্যাখো না ভাল করে? কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আল্‌ভারেজের ম্যাপের কোনো নিশ্চয়তা নেই। আল্‌ভারেজ্‌ বলে—ম্যাপ কি হবে? আমার মনে গভীর ভাবে আঁকা আছে সে নদী ও সে উপত্যকার ছবি—সে একবার দেখতে পেলেই তখুনি চিনে নেবো। এ সে জায়গাই নয়, এ উপত্যকাই নয়।

নিরুপায়। খোঁজো তবে।

একমাস কেটে গেল। পশ্চিম আফ্রিকায় বর্ষা নামল মার্চ মাসের প্রথমে। সে কী ভয়ানক বর্ষা! শঙ্কর তার কিছু নমুনা পেয়ে এসেছে রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্‌ পার হবার সময়ে। উপত্যকা ভেসে গেল পাহাড় থেকে নানা বড় বড় পার্বত্য ঝরনার জলধারায়। তাঁবু ফেলবার স্থান নেই। একরাত্রে হঠাৎ অতিবর্ষণের ফলে ওদের তাঁবুর সামনে একটা নিরীহ ক্ষীণকায় ঝরনাধারা ভীমমূর্তি ধারণ করে তাঁবুসুদ্ধ ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবার যোগাড় করেছিল—আল্‌ভারেজের সজাগ ঘুমের জন্যে সে-যাত্রা বিপদ কেটে গেল।

কিন্তু দিন যায় তো ক্ষণ যায় না। শঙ্কর একদিন ঘোর বিপদে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। সে বিপদটাও বড় অদ্ভুত ধরনের!

সেদিন আল্‌ভারেজ্‌ রাইফেল পরিষ্কার করছিল, সেটা শেষ করে রান্না করবে কথা ছিল। শঙ্কর রাইফেল হাতে বনের মধ্যে শিকারের সন্ধানে বার হয়েছে।

আল্‌ভারেজ্‌ বলে দিয়েছে তাকে এ বনে খুব সতর্ক হয়ে সাবধানে চলাফেরা করতে—আর বন্দুকের ম্যাগাজিনে সব সময় যেন কার্ট্রিজ ভরা থাকে। আর একটা খুব মূল্যবান উপদেশ দিয়েছে, সেটা এই—বনের মধ্যে বেড়াবার সময় হাতের কব্জিতে কম্পাস সর্বদা বেঁধে নিয়ে বেড়াবে এবং যে পথ দিয়ে যাবে, সে পথের ধারে গাছপালায় কোনো চিহ্ন রেখে যাবে, যাতে ফেরবার সময় সেই সব চিহ্ন ধরে আবার ঠিক ফিরতে পারো। নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

এদিন শঙ্কর স্প্রিংবক হরিণের সন্ধানে গভীর বনে চলে গিয়েছে। সকালে বেরিয়েছিল, ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এক জায়গায় একটা বড় গাছের তলায় সে একটু বিশ্রামের জন্যে বসল।

সেখানটাতে চারিধারেই বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতির মেলা, আর সব গাছেই গুঁড়ি ও ডালপালা বেয়ে একপ্রকারের বড় বড় লতা উঠে তাদের ছোট ছোট পাতা দিয়ে এমনি নিবিড় ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে গাছগুলো জড়িয়েছে যে গুঁড়ির আসল রং দেখা যায় না। কাছেই একটা ছোট্ট জলার ধারে ঝাড়ে ঝাড়ে মারিপোসা লিলি ফুটে রয়েছে।

খানিকটা সেখানে বসবার পরে শঙ্করের মনে হল তার কি একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কি ধরনের অস্বস্তি তা সে কিছু বুঝতে পারলে না—অথচ জায়গাটা ছেড়ে উঠে যাবারও ইচ্ছে হল না—সে ক্লান্তও বটে, আর জায়গাটাও বেশ আরামেরও বটে!

কিন্তু এ তার কি হল। তার সমস্ত শরীরে এত অবসাদ কোথা থেকে এল? ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরল নাকি?

অবসাদটা কাটাবার জন্যে সে পকেট হাতড়ে একটা চুরুট বার করে ধরালে। কিসের একটা মিষ্টি মিষ্টি সুগন্ধ বাতাসে—শঙ্করের বেশ ভাল লাগছে গন্ধটা। একটু পরে দেশলাইটা মাটি থেকে কুড়িয়ে পকেটে রাখতে গিয়ে মনে হল, হাতটা যেন তার নিজের নয়—যেন আর কারও হাত, তার মনের ইচ্ছায় সে হাত নড়ে না!

ক্রমে তার সর্বশরীর যেন বেশ একটা আরামদায়ক অবসাদে অবশ হয়ে পড়তে চাইল।

wapsip.com

কি হবে আর বৃথা ভ্রমণে, আলেয়ার পিছু পিছু বৃথা ছুটে, এই রকম বনের ঘন ছায়ায় নিভৃত লতাবিতানে অলস স্বপ্নে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার চেয়ে সুখ আর কি আছে?

একবার তার মনে হল, এই বেলা উঠে তাঁবুতে যাওয়া যাক, নতুবা তার কোনো একটা বিপদ ঘটবে যেন। একবার সে ওঠবার চেষ্টাও করতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তার দেহমনব্যাপী অবসাদের জয় হল। অবসাদ নয়, যেন একটা মৃদুমধুর নেশার আনন্দ। সমস্ত জগৎ তার কাছে তুচ্ছ। সে নেশাটাই তার সারাদেহ অবশ করে আনছে ক্রমশ।

শঙ্কর গাছের শিকড়ে মাথা দিয়ে ভাল করেই শুয়ে পড়ল। বড় বড় কটন উড গাছের ডালে শাখায় আলোছায়ার রেখা বড় অস্পষ্ট, কাছেই কোথাও বন্য পেচকের ধ্বনি অনেকক্ষণ থেকে শোনা যাচ্ছিল, ক্রমে যেন তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তারপরে কি হল শঙ্কর আর কিছু জানে না।

আল্‌ভারেজ্‌ যখন বহু অনুসন্ধানের পর ওর অচৈতন্য দেহটা কটন উড জঙ্গলের ছায়ায় আবিষ্কার করলে, তখন বেলা বেশি নেই। প্রথমটা আল্‌ভারেজ, মনে ভাবলে, এ নিশ্চয়ই সর্পাঘাত—কিন্তু দেহটা পরীক্ষা করে সর্পাঘাতের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। হঠাৎ মাথার ওপরকার ডালপালা ও চারিধারে গাছপালার দিকে নজর পড়তেই অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী আল্‌ভারেজ্‌ ব্যাপারটা সব বুঝতে পারলে। সেখানটাতে সর্বত্র অতিমারাত্মক বিষ-লতার বন (Poison Ivy) যার রসে আফ্রিকার অসভ্য মানুষেরা তীরের ফলা ডুবিয়ে নেয়। যার বাতাস এমনি বেশ সুগন্ধ বহন করে, কিন্তু নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেশি মাত্রায় গ্রহণ করলে, অনেক সময় পক্ষাঘাত পর্যন্ত হতে পারে, মৃত্যু ঘটাও আশ্চর্য নয়।

তাঁবুতে এসে শঙ্কর দু-তিন দিন শয্যাগত হয়ে রইল। সর্বশরীর ফুলে ঢোল। মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে আর সর্বদাই তৃষ্ণায় গলা কাঠ। আল্‌ভারেজ্‌ বলে—যদি তোমাকে সারা রাত ওখানে থাকতে হত—তা হলে সকালবেলা তোমাকে বাঁচানো কঠিন হত।

একদিন একটা ঝরনার জলধারার বালুময় তীরে শঙ্কর হলদে রঙের কি দেখতে পেলে। আল্‌ভারেজ্‌ পাকা প্রস্‌পেক্টর, সে এসে বালি ধুয়ে সোনার রেণু বার করলে—কিন্তু তাতে সে বিশেষ উৎসাহিত হল না। সোনার পরিমাণ এত কম যে মজুরি পোষাবে না—এক টন বালি ধুয়ে আউন্স তিনেক সোনা পাওয়া হয়তো যেতে পারে।

শঙ্কর বললে—বসে থেকে লাভ কি, তবু যা সোনা পাওয়া যায়, তিন আউন্স সোনার দামও তো কম নয়।

সে যেটাকে অত্যন্ত অদ্ভুত জিনিস বলে মনে করেছে, অভিজ্ঞ প্রস্‌পেক্টর আল্‌ভারেজের কাছে সেটা কিছুই নয়। তা ছাড়া শঙ্করের মজুরির ধারণার সঙ্গে আল্‌ভারেজের মজুরির ধারণা মিল খায় না। শেষ পর্যন্ত ও কাজ শঙ্করকে ছেড়ে দিতে হল।

ইতিমধ্যে ওরা মাসখানেক ধরে জঙ্গলের নানা অঞ্চলে বেড়ালে। আজ এখানে দুদিন তাঁবু পাতে, সেখান থেকে আর আর এক জায়গায় উঠে যায়, সেখানে কিছুদিন তন্ন তন্ন করে চারিধার দেখবার পরে আর এক জায়গায় উঠে যায়। সেদিন অরণ্যের একটা স্থানে ওরা পৌঁছে নতুন তাঁবু পেতেছে। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে দু-একটা পাখি শিকার করে সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে এসে দেখলে, আল্‌ভারেজ্‌ বসে চুরুট টানছে, তার মুখ দেখে মনে হল সে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত।

শঙ্কর বললে—আমি বলি আল্‌ভারেজ্‌, তুমিই যখন বার করতে পারলে না, তখন চলো ফিরি।

আল্‌ভারেজ্‌ বললে—নদীটা তো উড়ে যায় নি, এই বন পর্বতের কোনো না কোনো

wapsip.com

অঞ্চলে সেটা নিশ্চয়ই আছে।

—তবে আমরা বার করতে পারছি নে কেন?

—আমাদের খোঁজা ঠিকমত হচ্ছে না।

—বল কি আল্‌ভারেজ্‌, ছ'মাস ধরে জঙ্গল চষে বেড়াচ্ছি, আবার কাকে খোঁজা বলে?

আল্‌ভারেজ্‌ গম্ভীর মুখে বললে—কিন্তু মুশকিল হয়েছে কোথায় জানো, শঙ্কর? তোমাকে এখনও কথাটা বলি নি, শুনলে হয়তো খুব দমে যাবে বা ভয় পাবে। আচ্ছা, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, এসো আমার সঙ্গে।

শঙ্কর অধীর আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে ওর পেছনে পেছনে চললো। ব্যাপারটা কি?

আল্‌ভারেজ্‌ একটু দূরে গিয়ে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বললে—শঙ্কর, আমরা আজই এখানে এসে তাঁবু পেতেছি, ঠিক তো?

শঙ্কর অবাক হয়ে বললে—এ কথার মানে কি? আজই তো এখানে এসেছি না আবার কবে এসেছি?

—আচ্ছা, এই গাছের গুঁড়ির কাছে সরে এসে দ্যাখো তো?

শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে দেখলে, গুঁড়ির নরম ছাল ছুরি দিয়ে খুদে কে 'D A' লিখে রেখেছে—কিন্তু লেখাটা টাটকা নয়, অন্তত মাসখানেকের পুরোনো।

শঙ্কর ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলে না। আল্‌ভারেজের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আল্‌ভারেজ্‌ বললে—বুঝতে পারলে না? এই গাছে আমিই মাসখানেক আগে আমার নামের অক্ষর দুটি খুদে রাখি। আমার মনে একটু সন্দেহ হয়। তুমি তো বুঝতে পারো না, তোমার কাছে সব বনই সমান। এর মানে এখন বুঝেছ? আমরা চক্রাকারে বনের মধ্যে ঘুরছি। এসব জায়গায় যখন এরকম হয়, তখন তা থেকে উদ্ধার পাওয়া বেজায় শক্ত।

এতক্ষণে শঙ্কর বুঝলে ব্যাপারটা। বললে—তুমি বলতে চাও মাসখানেক আগে আমরা এখানে এসেছিলাম?

—ঠিক তাই। বড় অরণ্যে বা মরুভূমিতে এই বিপদ ঘটে। একে বলে death circle, আমার মনে মাসখানেক আগে প্রথমে সন্দেহ হয় যে, হয়তো আমার death circle-এ পড়েছি। সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই গাছের ছালে ঐ অক্ষর খুদে রাখি। আজ বনের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ চোখে পড়ল।

শঙ্কর বললে—আমাদের কম্পাসের কি হল? কম্পাস থাকতে দিক ভুল হচ্ছে কি ভাবে রোজ রোজ?

আল্‌ভারেজ্‌ বললে—আমার মনে হয় কম্পাস খারাপ হয়ে গিয়েছে। রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্‌ পার হবার সময় সেই যে ভয়ানক ঝড় ও বিদ্যুৎ হয়, তাতেই কি ভাবে ওর চৌম্বক শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

—তা হলে আমাদের কম্পাস এখন অকেজো?

—আমার তাই ধারণা।

শঙ্কর দেখলে অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। ম্যাপ ভুল, কম্পাস অকেজো, তার ওপর ওরা পড়েছে এক ভীষণ দুর্গম গহনারণ্যের বিষম মরণ ঘূর্ণিতে। জনমানুষ নেই, খাবার নেই, জলও নেই বললেই হয়; কারণ যেখানকার সেখানকার জল যখন পানের উপযুক্ত নয়। থাকার মধ্যে আছে এক ভীষণ অজ্ঞাত মৃত্যুর ভয়। জিম্‌ কার্টার এই অভিশপ্ত অরণ্যানীর মধ্যে রত্নের লোভে এসে প্রাণ দিয়েছিল, এখানে কারও মঙ্গল হবে বলে মনে হয় না।

wapsip.com

আল্‌ভারেজ্ কিন্তু দমে যাবার পাত্রই নয়। সে দিনের পর দিন চলল বনের মধ্যে দিয়ে। বনের কোনো কূলকিনারা পায় না শঙ্কর, আগে যাও বা ছিল, ঘুর্ণিপাকে তারা ঘুরছে শোনা অবধি, শঙ্করের দিক সম্বন্ধে জ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে।

দিন তিনেক পরে ওরা একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হল, সেখানে রিখ্‌টারস্‌ভেল্ডের একটি শাখা আসল পর্বতমালার সঙ্গে সমকোণ করে উত্তরদিকে লম্বালম্বি হয়ে আছে। খুব কম হলেও সেটা ৪০০০ হাজার ফুট উঁচু! আরও পশ্চিমদিকে একটা খুব উঁচু পর্বতচূড়া ঘন মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে। দুই পাহাড়ের মধ্যেকার উপত্যকা তিন মাইল বিস্তীর্ণ হবে এবং এই উপত্যকা খুব ঘন জঙ্গলে ভরা।

বনে গাছপালার যেন তিনটে চারটে থাক্। সকলের ওপরের থাকে শুধুই পরগাছা ও শেওলা, মাঝের থাকে ছোট বড় বনস্পতির ভিড়, নীচের থাকে ঝোপঝাপ, ছোট ছোট গাছ। সূর্যের আলোর বালাই নেই বনের মধ্যে।

আল্‌ভারেজ্ বনের মধ্যে না ঢুকে বনের ধারেই তাঁবু ফেলতে বললে। সন্ধ্যার সময় ওরা কফি খেতে খেতে পরামর্শ করতে বসল যে, এখন কি করা যাবে। খাবার একদম ফুরিয়েছে, চিনি অনেকদিন থেকেই নেই, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে আর দু-এক দিন পরে কফিও শেষ হবে। সামান্য কিছু ময়দা এখনও আছে—কিন্তু আর কিছুই নেই। ময়দা এই জন্যে আছে, যে ওরা ও জিনিসটা কালেভদ্রে ব্যবহার করে। ওদের প্রধান ভরসা বন্য জন্তুর মাংস কিন্তু সঙ্গে যখন ওদের গুলি বারুদের কারখানা নেই, তখন শিকারের ভরসাই বা চিরকাল করা যায় কি করে?

কথা বলতে বলতে শঙ্কর দূরের যে পাহাড়ের চূড়াটা মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে, সেদিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছিল। এই সময়ে অল্পক্ষণের জন্যে মেঘ সম্পূর্ণরূপে সরে গেল। চূড়াটার অদ্ভুত চেহারা, যেন একটা কুলপী বরফের আগার দিকটা কে এক কামড়ে খেয়ে ফেলেছে।

আল্‌ভারেজ্ বললে—এখান থেকে দক্ষিণ পূর্বদিকে বুলাওয়েও কি সল্‌সবেরি চারশো থেকে পাঁচশো মাইলের মধ্যে। মধ্যে শ-দুই মাইল মরুভূমি। পশ্চিম দিকে উপকূল তিনশো মাইলের মধ্যে বটে, কিন্তু পর্তুগিজ পশ্চিম আফ্রিকা অতি ভীষণ দুর্গম জঙ্গলে ভরা, সুতরাং সেদিকের কথা বাদ দাও। এখন আমাদের উপায় হচ্ছে, হয় তুমি নয় আমি সল্‌সবেরি কি বুলাওয়েও চলে গিয়ে টোটা ও খাবার কিনে আনি। কম্পাসও চাই।

আল্‌ভারেজের মুখের এই কথাটা বড় শুভক্ষণে শঙ্কর শুনেছিল। দৈব মানুষের জীবনে যে কত কাজ করে, তা মানুষে কি সব সময়ে বোঝে? দৈবক্রমে 'বুলাওয়েও' ও 'সল্‌সবেরি' দুটো শহরের নাম, তাদের অবস্থানের দিক ও এই জায়গাটা থেকে তাদের আনুমানিক দূরত্ব শঙ্করের কানে গেল। এর পর যে কতবার মনে মনে আল্‌ভারেজ্‌কে ধন্যবাদ দিয়েছিল, এই নাম দুটো বলবার জন্যে।

কথাবার্তা সেদিন বেশি অগ্রসর হল না। দুজনেই পরিশ্রান্ত ছিল, সকাল সকাল শয্যা আশ্রয় করলে।

আট

মাঝরাত্রে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল! কি একটা শব্দ হচ্ছে ঘন বনের মধ্যে, কি একটা কাণ্ড কোথায় ঘটেছে বনে। আল্‌ভারেজ্‌ও বিছানায় উঠে বসেছে। দুজনেই কান-খাড়া করে শুনলে—বড় [illegible]। কি হচ্ছে বাইরে?

wapsip.com

শঙ্কর তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে বাইরে আসছিল, আল্‌ভারেজ্ বারণ করলে। বললে—এসব অজানা জঙ্গলে রাত্রিবেলা ওরকম তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে যেও না, তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি। বিনা বন্দুকেই বা যাচ্ছ কোথায়?

তাঁবুর বাইরে রাত্রি ঘুটঘুটে অন্ধকার! দুজনেই টর্চ ফেলে দেখলে—

বন্য জন্তুর দল গাছপালা ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে উন্মত্তের মত দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পশ্চিমের সেই ভীষণ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে, পুবদিকে পাহাড়টার দিকে চলেছে! হায়েনা, বেবুন, বুনো মহিষ। দুটো চিতাবাঘ তো ওদের গা ঘেঁষে ছুটে পালালো। আরও আসছে ···দলে দলে আসছে···ধাড়ী ও মাদী কলোবাস বাঁদর দলে দলে ছানাপোনা নিয়ে ছুটেছে। সবাই যেন কোনো আকস্মিক বিপদের মুখ থেকে প্রাণের ভয়ে ছুটেছে।··· আর সঙ্গে সঙ্গে দূরে কোথায় একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে—চাপা, গম্ভীর, মেঘগর্জনের মত শব্দটা—কিংবা দূরে কোথাও হাজারটা জয়ঢাক যেন এক সঙ্গে বাজছে!

ব্যাপার কি! দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলে। দুজনেই অবাক। আল্‌ভারেজ্ বললে—শঙ্কর, আগুনটা ভাল করে জ্বালো—নয়তো বন্যজন্তুর দল আমাদের তাঁবুসুদ্ধ ভেঙে মাড়িয়ে চলে যাবে।

জন্তুদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল যে! মাথার ওপরেও পাখির দল বাসা ছেড়ে পালাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা স্প্রিংবক হরিণের দল ওদের দশগজের মধ্যে এসে পড়ল।

কিন্তু ওরা দুজনে তখন এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে ব্যাপার দেখে যে, এত কাছে পেয়েও গুলি করতে ভুলে গেল। এমন ধরনের দৃশ্য ওরা জীবনে কখনো দেখেনি!

শঙ্কর আল্‌ভারেজ্‌কে কি একটা জিজ্ঞাসা করতে যাবে, তার পরেই—প্রলয় ঘটল। অন্তত শঙ্করের তো তাই বলেই মনে হল। সমস্ত পৃথিবীটা দুলে এমন কেঁপে উঠল যে, ওরা দুজনেই টলে পড়ে গেল মাটিতে, সঙ্গে সঙ্গে হাজারটা বাজ যেন নিকটেই কোথায় পড়ল। মাটি যেন চিরে ফেঁড়ে গেল—আকাশটাও যেন সেই সঙ্গে ফাটলো।

আল্‌ভারেজ মাটি থেকে ওঠবার চেষ্টা করতে করতে বললে—ভূমিকম্প!

কিন্তু পরক্ষণেই তারা দেখে বিস্মিত হল, রাত্রির অমন ঘুটঘুটে অন্ধকার হঠাৎ দূর হয়ে, পঞ্চাশ হাজার বাতির এমন বিজলি আলো জ্বলে উঠল কোথা থেকে?

তারপর তাদের নজর পড়ল, দূরের সেই পাহাড়ের চূড়াটার দিকে। সেখানে যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিলীলা শুরু হয়েছে। রাঙা হয়ে উঠেছে সমস্ত দিগন্ত সেই প্রলয়ের আলোয়, আগুন-রাঙা মেঘ ফুঁসিয়ে উঠছে পাহাড়ের চুড়ো থেকে দু-হাজার আড়াই হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচুতে—সঙ্গে সঙ্গে কি বিশ্রী গন্ধকের উৎকট নিঃশ্বাস-রোধকারী গন্ধ বাতাসে!

আল্‌ভারেজ্ সেদিকে চেয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে বলে উঠল—আগ্নেয়গিরি! সান্টা আনা গ্রাৎসিয়া ডা কর্ডোভা!

কি অদ্ভুত ধরনের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য! কেউ চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না ওরা খানিকক্ষণ। লক্ষটা তুবড়ি এক সঙ্গে জ্বলছে, লক্ষটা রঙমশালে একসঙ্গে আগুন দিয়েছে, শঙ্করের মনে হল। রাঙা আগুনের মেঘ মাঝে মাঝে নীচু হয়ে যায়, হঠাৎ যেমন আগুনে ধুনো পড়লে দপ করে জ্বলে ওঠে, অমনি দপ করে হাজার ফুট ঠেলে ওঠে। আর সেই সঙ্গে হাজারটা বোমা ফাটার আওয়াজ।

এদিকে পৃথিবী এমন কাঁপছে, যে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না—কেবল টলে টলে পড়তে হয়। শঙ্কর তো টলতে টলতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকলো—ঢুকে দেখে একটা ছোট কুকুর ছানার মত

wapsip.com

জীব তার বিছনায় এক সঙ্গে গুটিসুটি হয়ে ভয়ে কাঁপছে। শঙ্করের টর্চের আলোয় সেটা থতমত খেয়ে আলোর দিকে চেয়ে রইল, আর তার চোখ দুটো মণির মত জ্বলতে লাগল। আল্‌ভারেজ্ তাঁবুতে ঢুকে দেখে বললে—নেকড়ে বাঘের ছানা। রেখে দাও, আমাদের আশ্রয় নিয়েছে যখন প্রাণের ভয়ে।

ওরা কেউ এর আগে প্রজ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি দেখে নি, তা থেকে বিপদ আসতে পারে ওদের জানা নেই—কিন্তু আল্‌ভারেজের কথা ভাল করে শেষ হতে না হতে, হঠাৎ কি প্রচণ্ড ভারী জিনিসের পতনের শব্দে ওরা আবার তাঁবুর বাইরে গিয়ে যখন দেখলে যে, একখানা পনেরো সের ওজনের জ্বলন্ত কয়লার মত রাঙা পাথর অদূরে একটা ঝোপের ওপর এসে পড়েছে—সঙ্গে সঙ্গে ঝোপটাও জ্বলে উঠেছে—তখন আল্‌ভারেজ্ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে—পালাও, পালাও; শঙ্কর—তাঁবু ওঠাও—শীগগির—

ওরা তাঁবু ওঠাতে ওঠাতে আরও দু-পাঁচখানা আগুন-রাঙা জ্বলন্ত ভারী পাথর এদিক ওদিকে সশব্দে পড়ল। নিঃশ্বাস তো এদিকে বন্ধ হয়ে আসে, এমনি ঘন গন্ধকের ধূম বাতাসে ছড়িয়েছে।

দৌড়···দৌড়···দৌড়। দু ঘণ্টা ধরে ওরা জিনিসপত্র কতক টেনে হিঁচড়ে, কতক বয়ে নিয়ে পুবদিকের সেই পাহাড়ের নীচে গিয়ে পৌছুলো। সেখানে পর্যন্ত গন্ধকের গন্ধ বাতাসে। আধঘণ্টা পরে সেখানেও পাথর পড়তে শুরু করল। ওরা পাহাড়ের ওপর উঠল, সেই ভীষণ জঙ্গল আর রাত্রির অন্ধকার ঠেলে। ভোর যখন হল, তখন আড়াই হাজার ফুট উঠে পাহাড়ের ঢালুতে বড় গাছের তলায়, দুজনেই হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল।

সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাতের সে ভীষণ সৌন্দর্য অনেকখানি কমে গেল, কিন্তু শব্দ ও পাথর-পড়া যেন বাড়লো। এবার শুধু পাথর নয়, তার সঙ্গে খুব মিহি ধূসরবর্ণের ছাই আকাশ থেকে পড়ছে···গাছপালা লতাপাতার ওপর দেখতে দেখতে পাতলা একপুরু ছাই জমে গেল।

সারাদিন সমানভাবে অগ্নিলীলা চললো—আবার রাত্রি এল। নিম্নের উপত্যকা ভূমির অত বড় হেমলক গাছের জঙ্গল দাবানলে ও প্রস্তরবর্ষণে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। রাত্রিতে আবার সেই ভীষণ সৌন্দর্য কতদুর পর্যন্ত বন ও আকাশ, কতদূরের দিগন্ত লাল হয়ে উঠেছে পর্বতের অগ্নিকটাহের আগুনে—তখন পাথর পড়াটা একটু কেবল কমেছে। কিন্তু সেই রাঙা আগুনভরা বাষ্পের মেঘ তখনও সেই রকমই দীপ্ত হয়ে আছে।

রাত দুপুরের পরে একটা বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে ওদের তন্দ্রা ছুটে গেল—ওরা সভয়ে চেয়ে দেখলে জ্বলন্ত পাহাড়ের চূড়ার মুণ্ডটা উড়ে গিয়েছে—নীচের উপত্যকাতে ছাই, আগুন ও জ্বলন্ত পাথর ছড়িয়ে পড়ে অবশিষ্ট জঙ্গলটাকেও ঢাকা দিলে। আল্‌ভারেজ্ পাথরের ঘায়ে আহত হল। ওদের তাঁবুর কাপড়ে আগুন ধরে গেল। পেছনের একটা উঁচু গাছের ডাল ভেঙে পড়ল পাথরের চোট খেয়ে।

শঙ্কর ভাবছিল—এই জনহীন অরণ্য অঞ্চলে এত বড় একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে ঘটে গেল, তা কেউ দেখতেও পেতো না, যদি তারা না থাকতো। সভ্য জগৎ জানেও না আফ্রিকার গহন অরণ্যের এ আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব। কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না হয়তো।

সকালে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল, মোমবাতি হাওয়ার মুখে জ্বলে গিয়ে যেমন মাথার দিকে অসমান খাঁজের সৃষ্টি করে, পাহাড়ের চূড়াটার তেমনি চেহারা হয়েছে। কুলপী বরফটাতে ঠিক যেন কে আর একটা কামড় বসিয়েছে।

wapsip.com

আল্‌ভারেজ্ ম্যাপ দেখে বললে—এটা আগ্নেগিরি বলে ম্যাপে দেওয়া নেই। সম্ভবত বহু বৎসর পরে এই এর প্রথম অগ্ন্যুৎপাত। কিন্তু এর যে নাম ম্যাপে দেওয়া আছে, তা খুব অর্থপূর্ণ।

শঙ্কর বললে—কি নাম?

আল্‌ভারেজ্ বললে—এর নাম লেখা আছে 'ওল্‌ডোনিও লেঙ্গাই'—প্রাচীন জুলু ভাষায় এর মানে 'অগ্নিদেবের শয্যা'। নামটা দেখে মনে হয়, এ অঞ্চলের প্রাচীন লোকদের কাছে এ পাহাড়ের আগ্নেয়-প্রকৃতি অজ্ঞাত ছিল না। বোধ হয় তার পর দু-একশো বছর কিংবা তারও বেশিকাল এটা চুপচাপ ছিল।

ভারতবর্ষের ছেলে শঙ্করের দুই হাত আপনা-আপনি প্রণামের ভঙ্গিতে ললাট স্পর্শ করলে। প্রণাম, হে রুদ্রদেব, প্রণাম। আপনার তাণ্ডব দেখবার সুযোগ দিয়েছিলেন, এজন্যে প্রণাম গ্রহণ করুন, হে দেবতা। আপনার এ রূপের কাছে শত হীরকখনি তুচ্ছ হয়ে যায়। আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হল।

নয়

আগ্নেয় পর্বতের অত কাছে বাস করা আল্‌ভারেজ্ উচিত বিবেচনা করলে না। ওল্‌ডোনিও লেঙ্গাই পাহাড়ের ধূমায়িত শিখরদেশের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে, তারা আরও পশ্চিম ঘেঁষে চলতে লাগল। সেদিকের গহন অরণ্যে আগুনের আঁচটিও লাগে নি, বর্ষার জলে সে অরণ্য আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে, ছোট ছোট গাছপালার ও লতাঝোপের সমাবেশে। ছোট বড় কত ঝরনাধারা ও পার্বত্য নদী বয়ে চলেছে—তাদের মধ্যে একটাও আল্‌ভারেজের পূর্ব পরিচিত নয়।

এইবার এক জায়গায় ওরা এসে উপস্থিত হল, যেখানে চারিদিকেই চুনাপাথর ও গ্রানাইটের ছোট বড় পাহাড় ও প্রত্যেক পাহাড়ের গায়েই নানা আকারের গুহা। স্থানটার প্রাকৃতিক দৃশ্য রিখ্‌টারস্‌ভেল্ডের সাধারণ দৃশ্য থেকে একটু অন্যরকম। এখানে বন তত ঘন নয়, কিন্তু খুব বড় বড় গাছ চারিদিকে, আর যেখানে সেখানে পাহাড় ও গুহা।

একটা উঁচু ঢিবির মত গ্রানাইটের পাহাড়ের ওপর ওরা তাঁবু ফেলে রইল। এখানে এসে পর্যন্ত শঙ্করের মনে হয়েছে জায়গাটা ভাল নয়। কি একটা অস্বস্তি, মনের মধ্যে কি একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা, তা সে না পারে ভাল করে নিজে বুঝতে, না পারে আল্‌ভারেজ্‌কে বোঝাতে।

একদিন আল্‌ভারেজ বলল—সব মিথ্যে শঙ্কর, আমরা এখনও বনের মধ্যে ঘুরছি। আজ সেই গাছটা আবার দেখেছি,—সেই D.A. লেখা। অথচ তোমার মনে আছে, আমরা যতদূর সম্ভব পশ্চিমদিক ঘেঁষেই চলেছি আজ পনেরো দিন। কি করে আমরা আবার সেই গাছের কাছে আসতে পারি?

শঙ্কর বললে—তবে এখন কি উপায়?

—উপায় আছে। আজ রাত্রে একটা বড় গাছের মাথায় উঠে নক্ষত্র দেখে দিকনির্ণয় করতে হবে। তুমি তাঁবুতে থেকো।

শঙ্কর একটা কথা বুঝতে পারছিল না। তারা যদি চক্রাকারে ঘুরছে, তবে এই অনুচ্চ শৈলমালা ও গুহার দেশে কি করে এল? এ অঞ্চলে তো কখনো আসে নি বলেই মনে হয়। আল্‌ভারেজ্ এর উত্তরে বললে, গাছটাতে নাম খোদাই দেখে সে আর কখনো তার পূর্বে

wapsip.com

আসবার চেষ্টা করে নি। পূর্বদিকে মাইল দুই এলেই এই স্থানটাতে ওরা পৌঁছুতো।

সে রাত্রে শঙ্কর একা তাঁবুতে বসে বঙ্গিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' পড়ছিল। এই একখানাই বাংলা বই সে দেশ থেকে আসবার সময় সঙ্গে করে আনে, এবং বহুবার পড়লেও সময় পেলেই আবার পড়ে।

কতদূরে ভারতবর্ষ, তার মধ্যে চিতোর, মেওয়ার, মোগল-রাজপুতের বিবাদ! এই অজানা মহাদেশের অজানা মহাঅরণ্যানীর মধ্যে বসে সে-সব যেন অবাস্তব বলে মনে হয়।

তাঁবুর বাইরে হঠাৎ যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শঙ্কর প্রথমটা ভাবলে, আল্‌ভারেজ্ গাছ থেকে নেমে ফিরে আসছে বোধ হয়—কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, এ মানুষের স্বাভাবিক পায়ের শব্দ নয়, কেউ দু-পায়ে থলে জড়িয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাটিতে পা ঘেঁষে ঘেঁষে টেনে টেনে চললে যেন এমন ধরনের শব্দ হওয়া সম্ভব। আল্‌ভারেজ্‌র উইনচেস্টার রিপিটারটা হাতের কাছেই ছিল, ও সেটা তাঁবুর দরজার দিকে বাগিয়ে বসলো। বাইরে পদশব্দটা একবার থেমে গেল—পরেই আবার তাঁবুর দক্ষিণ পাশ থেকে বাঁদিকে এল। একটা কোনো বড় প্রাণীর যেন ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া গেল—ঠিক যেমন পর্বত পার হবার সময় এক রাত্রে ঘটেছিল, ঠিক এই রকমই। শঙ্কর একটু ভয় খেয়ে সংযম হারিয়ে ফেলে রাইফেল ছুঁড়ে বসলো। একবার··· দুবার—

সঙ্গে সঙ্গে মিনিট দুই পরে দূরের গাছের মাথা থেকে প্রত্যুত্তরে দুবার রিভলভারের আওয়াজ পাওয়া গেল। আল্‌ভারেজ্ মনে ভেবেছে, শঙ্করের কোনো বিপদ উপস্থিত, নতুবা রাত্রে খামোকা বন্দুক ছুঁড়বে কেন? বোধ হয় সে তাড়াতাড়ি নেমেই আসছে।

এদিকে চারিদিক থেকে বন্দুকের আওয়াজে জানোয়ারটা বোধ হয় পালিয়েছে, আর তার সাড়াশব্দ নেই। শঙ্কর টর্চ জ্বেলে তাঁবুর বাইরে এসে ভাবলে, আল্‌ভারেজ্‌কে সঙ্কেতে গাছ থেকে নামতে বারণ করবে, এমন সময় কিছুদূরে বনের মধ্যে হঠাৎ আবার দুবার পিস্তলের আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে একটা অস্পষ্ট চীৎকার শুনতে পাওয়া গেল।

শঙ্কর পিস্তলের আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে গেল। কিছুদূরে গিয়েই দেখলে বনের মধ্যে একটা বড় গাছের তলায় আল্‌ভারেজ্ শুয়ে। টর্চের আলোয় তাকে দেখে শঙ্কর শিউরে উঠল ভয়ে বিস্ময়ে—তার সর্বশরীর রক্তমাখা, মাথাটা বাকি শরীরের সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেছে, গায়ের কোটটা ছিন্নভিন্ন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি ওর পাশে গিয়ে বসে ওর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলে। ডাকলে—আল্‌ভারেজ্! আল্‌ভারেজ্!

আল্‌ভারেজের সাড়া নেই। তার ঠোঁট দুটো একবার যেন নড়ে উঠল, কি যেন বলতে গেল, সে শঙ্করের দিকে চেয়েই আছে, অথচ সে চোখে যেন দৃষ্টি নেই, অথবা কেমন যেন নিস্পৃহ, উদাস দৃষ্টি।

শঙ্কর ওকে বহন করে তাঁবুতে নিয়ে এল। মুখে জল দিল, তারপর গায়ের কোটটা খুলতে গিয়ে দেখে, গলার নীচে কাঁধের দিকে খানিকটা জায়গার মাংস কে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। সারা পিঠটার সেই অবস্থা। কোন এক অসাধারণ বলশালী জন্তু তীক্ষ্ণধার নখে বা দন্তে পিঠখানা চিরে ফালা ফালা করেছে।

পাশেই নরম মাটিতে কোনো জন্তুর পায়ের দাগ।

তিনটে মাত্র আঙুল সে পায়ে।

সারারাত্রি সেই ভাবেই কাটল, আল্‌ভারেজের সাড়া নেই, সংজ্ঞা নেই। সকাল হবার

wapsip.com

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন তার চেতনা ফিরে এল। শঙ্করের দিকে বিস্ময়ের ও অচেনার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে, যেন এর আগে সে কখনো শঙ্করকে দেখে নি। তারপর আবার চোখ বুজল। দুপুরের পর খুব সম্ভবত নিজের মাতৃভাষায় কি সব বলতে শুরু করল, শঙ্কর এক বর্ণও বুঝতে পারলে না। বিকেলের দিকে সে হঠাৎ শঙ্করের দিকে চাইলে। চাইবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের মনে হল, সে ওকে চিনতে পেরেছে। এইবার ইংরাজিতে বললে—শঙ্কর! এখনও বসে আছ। তাঁবু ওঠায়—চল যাই—। তারপর অপ্রকৃতিস্থের মত নির্দেশহীন ভঙ্গিতে হাত তুলে বললে—রাজার ঐশ্বর্য লুকোনো রয়েছে ঐ পাহাড়ের গুহার মধ্যে—তুমি দেখতে পাচ্ছ না—আমি দেখতে পাচ্ছি। চল আমরা যাই—তাঁবু ওঠাও—দেরি কোরো না।

এই আল্‌ভারেজের শেষ কথা।

তারপর কতক্ষণ শঙ্কর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সন্ধ্যা হল, একটু একটু করে সমগ্র বনানী ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল।

শঙ্করের তখন চমক ভাঙল। সে তাড়াতাড়ি উঠে আগে আগুন জ্বাললে, তারপর দুটো রাইফেলে টোটা ভরে, তাঁবুর দোরের দিকে বন্দুকের নল বাগিয়ে, আল্‌ভারেজের মৃতদেহের পাশে একখানা শতরঞ্জির ওপর বসে রইল।

তার পর সে রাত্রে আবার নামলো তেমনি ভীষণ বর্ষা। তাঁবুর কাপড় ফুঁড়ে জল পড়ে জিনিসপত্র ভিজে গেল। শঙ্কর তখন কিন্তু এমন হয়ে গিয়েছে যে, তার কোনো দিকে দৃষ্টি নেই। এই ক'মাসে সে আল্‌ভারেজকে সত্যিই ভালবেসেছিল, তার নির্ভীকতা, তার সঙ্কল্পে অটলতা, তার পরিশ্রম করবার অসাধারণ শক্তি, তার বীরত্ব—শঙ্করকে মুগ্ধ করেছিল। সে আল্‌ভারেজ্‌কে নিজের পিতার মত ভালবাসতো। আল্‌ভারেজ্‌ও তাকে তেমনি স্নেহের চোখেই দেখতো।

কিন্তু এসবের চেয়েও শঙ্করের মনে হচ্ছে বেশি যে, আল্‌ভারেজ্ মারা গেল শেষকালে সেই অজ্ঞাত জানোয়ারটারই হাতে। ঠিক জিম্ কার্টারের মতই।

রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তার মন ভয়ে আকুল হয়ে উঠল। সম্মুখে ভীষণ অজানা মৃত্যুদূত—ঘোর রহস্যময় তার অস্তিত্ব। কখন সে আসবে, কখন বা যাবে, কেউ তার সন্ধান দিতে পারবে না। ঘুমে ঢুলে না পড়ে, শঙ্কর মনের বলে জেগে বসে রইল সারা রাত।

ওঃ সে কি ভীষণ রাত্রি! যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন এ রাত্রির কথা সে ভুলবে না। গাছে গাছে, ডালে ডালে, হাজার ধারায় বৃষ্টি-পতনের শব্দে ও একটানা ঝড়ের শব্দে অরণ্যানীর অন্য সকল নৈশ শব্দকে আজ ডুবিয়ে দিয়েছে, পাহাড়ের ওপর বড় গাছ মড়্ মড়্ করে ভেঙে পড়ছে। এই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে সে একা এই ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে! কালো গাছের গুঁড়িগুলো যেন প্রেতের মত দেখাচ্ছে, অত বড় বৃষ্টিতেও জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে। সম্মুখে বন্ধুর মৃতদেহ। ভয় পেলে চলবে না! সাহস আনতেই হবে মনে, নতুবা ভয়েই সে মারা যাবে। সাহস আনবার প্রাণপণ চেষ্টায় সে রাইফেল দুটির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে। একটা উইনচেস্টার, অপরটি ম্যানলিকার—দুটোরই ম্যাগাজিনে টোটা ভর্তি। এমন কোনো শরীর-ধারী জীব নেই, যে এই দুই শক্তিশালী অতি ভয়ানক মারণাস্ত্রকে উপেক্ষা করে আজ রাত্রে অক্ষতদেহে তাঁবুতে ঢুকতে পারে।

ভয় ও বিপদ মানুষকে সাহসী করে। শঙ্কর সারারাত সজাগ পাহারা দিল। পরদিন সকালে আল্‌ভারেজের মৃতদেহ সে একটা বড় গাছের তলার সমাধিস্থ করলে এবং দু-খানা

wapsip.com

গাছের ডাল ক্রুশের আকারে শক্ত লতা দিয়ে বেঁধে সমাধির ওপর তা পুঁতে দিলে।

আল্‌ভারেজের কাগজপত্রের মধ্যে ওপর্টো খনি-বিদ্যালয়ের একটা ডিপ্লোমা ছিল ওর নামে। তাদের শেষ পরীক্ষায় আল্‌ভারেজ্ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। ওর কথাবার্তায় অনেক সময়ই শঙ্করের সন্দেহ হত যে, সে নিতান্ত মূর্খ, ভাগ্যান্বেষী, ভবঘুরে নয়।

লোকালয় থেকে বহুদূরে এই জনহীন, গহন অরণ্যে ক্লান্ত আল্‌ভারেজের রত্নানুসন্ধান শেষ হল। তার মত লোকেরা রত্নের কাঙাল নয়, বিপদের নেশায় পথে পথে ঘুরে বেড়ানোই তাদের জীবনের পরম আনন্দ, কুবেরের ভাণ্ডারও তাকে এক জায়গায় চিরকাল আটকে রাখতে পারতো না।

দুঃসাহসিক ভবঘুরের উপযুক্ত সমাধি বটে। অরণ্যের বনস্পতিদল ছায়া দেবে সমাধির ওপর। সিংহ, গরিলা, হায়েনা সজাগ রাত্রি যাপন করবে, আর সবারই ওপরে, সবাইকে ছাপিয়ে বিশাল রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্ পর্বতমালা অদূরে দাঁড়িয়ে মেঘলোকে মাথা তুলে খাড়া পাহারা রাখবে চিরযুগ।

দশ

সেদিন সে-রাত্রিও কেটে গেল। শঙ্কর এখন দুঃসাহসে মরীয়া হয়ে উঠেছে। যদি তাকে প্রাণ নিয়ে এ ভীষণ অরণ্য থেকে উদ্ধার পেতে হয়, তবে তাকে ভয় পেলে চলবে না। দু-দিন সে কোথাও না গিয়ে তাঁবুতে বসে মন স্থির করে ভাববার চেষ্টা করলে, সে এখন কি করবে। হঠাৎ তার মনে হল, আল্‌ভারেজের সেই কথাটা—সল্‌সবেরি ···এখান থেকে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে আন্দাজ পাঁচ-ছশো মাইল···

সল্‌সবেরি। ···দক্ষিণ রোডেসিয়ার রাজধানী সল্‌সবেরি। যে করে হোক, পৌঁছুতেই হবে তাকে সল্‌সবেরিতে। সে এখনও অনেকদিন বাঁচবে, তার জন্মকোষ্ঠিতে লেখা আছে। এ জায়গায় বেঘোরে সে মরবে না।

শঙ্কর ম্যাপগুলো খুব ভাল করে দেখলে। পর্তুগিজ গভর্নমেন্টের ফরেস্ট্ সার্ভের ম্যাপ, ১৮৭৩ সালের রয়েল মেরিন সার্ভের তৈরি উপকূলের ম্যাপ, ভ্রমণকারী স্যার ফিলিপো ডি ফিলিপির ম্যাপ, এ বাদে আল্‌ভারেজের হাতে আঁকা ও জিম্ কার্টারের সইযুক্ত একখানা জীর্ণ বিবর্ণ খসড়া নক্সা। আল্‌ভারেজ্ বেঁচে থাকতে সে এই সব ম্যাপ বুঝতে একবারও ভাল করে চেষ্টা করে নি, এখন এদের বোঝার ওপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। সল্‌সবেরির সোজা রাস্তা বার করতে হবে। এ স্থান থেকে তার অবিস্থিতি-বিন্দুর দিক নির্ণয় করতে হবে, রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্ অরণ্যের এ গোলকধাঁধা থেকে তাকে উদ্ধার পেতে হবে—সবই এই ম্যাপগুলির সাহায্যে।

অনেক দেখবার শোনবার পরে ও বুঝতে পারলে এই অরণ্য পর্বতমালার সম্বন্ধে কোনো ম্যাপেই বিশেষ কিছুই দেওয়া নেই—এক আল্‌ভারেজের ও জিম্ কার্টারের খসড়া ম্যাপখানা ছাড়া। তাও এত সংক্ষিপ্ত এবং তাতে এত সাঙ্কেতিক ও গুপ্তচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে যে, শঙ্করের পক্ষে তা প্রায় দুর্বোধ্য। কারণ এদের সব সময়েই ভয় ছিল যে ম্যাপ অপরের হাতে পড়লে, পাছে আর কেউ এসে ওদের ধনে ভাগ বসায়।

চতুর্থ দিন শঙ্কর সে-স্থান ত্যাগ করে আন্দাজ মত পুবদিকে রওনা হল। যাবার আগে কিছু বনের ফুলের মালা গেঁথে আল্‌ভারেজের সমাধির ওপর অর্পণ করলে।

wapsip.com

'বুশ্ ক্র্যাফ্‌ট' বলে একটা জিনিস আছে। সুবিস্তীর্ণ, বিজন, গহন অরণ্যানীর মধ্যে ভ্রমণ করবার সময়ে এ বিদ্যা জানা না থাকলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আল্‌ভারেজের সঙ্গে এতদিন ঘোরাঘুরি করার ফলে, শঙ্কর কিছু কিছু 'বুশ্ ক্র্যাফ্‌ট' শিখে নিয়েছিল, তবুও তার মনে সন্দেহ হল যে, এই বন একা পাড়ি দেবার যোগ্যতা সে কি অর্জন করেছে? শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে তাকে চলতে হবে, ভাগ্য ভাল হয় বন পার হতে পারে, ভাগ্য প্রসন্ন না হয়—মৃত্যু।

দুটো তিনটে ছোট পাহাড় সে পার হয়ে চলল। বন কখনো গভীর, কখনো পাতলা। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতির আর শেষ নেই। শঙ্করের জানা ছিল যে, দীর্ঘ এলিফ্যান্ট্ ঘাসের জঙ্গল এলে বুঝতে হবে যে বনের প্রান্তসীমায় পৌঁছানো গিয়েছে। কারণ গভীর জঙ্গলে কখনো এলিফ্যান্ট্ বা টুসক্ ঘাস জন্মায় না। কিন্তু এলিফ্যান্ট্ ঘাসের চিহ্ন নেই কোনোদিকে—শুধুই বনস্পতি আর নিচু বনঝোপ।

প্রথম দিন শেষ হল নিবিড়তর অরণ্যের মধ্যে। শঙ্কর জিনিসপত্র প্রায় সবই ফেলে দিয়ে এসেছিল, কেবল আল্‌ভারেজের ম্যানলিকার রাইফেলটা, অনেকগুলো টোটা, জলের বোতল, টর্চ, ম্যাপগুলো, কম্পাস, ঘড়ি, একখানা কম্বল ও সামান্য কিছু ঔষধ সঙ্গে নিয়েছিল—আর নিয়েছিল একটা দড়ির দোলনা। তাঁবুটা যদিও খুব হাল্কা, কিন্তু তা সে বয়ে আনা অসম্ভব বিবেচনায় ফেলেই এসেছে।

দুটো গাছের ডালে মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে সে দড়ির দোলনা টাঙালে এবং হিংস্র জন্তুর ভয়ে গাছতলায় আগুন জ্বালালে। দোলনায় শুয়ে বন্দুক হাতে জেগে রইল কারণ ঘুম অসম্ভব। একে ভয়ানক মশা, তার ওপর সন্ধ্যার পর থেকেই গাছতলার কিছু দূর দিয়ে একটা চিতাবাঘ যাতায়াত শুরু করলে। গভীর অন্ধকারে তার চোখ জ্বলে যেন দুটো আগুনের ভাঁটা, শঙ্কর টর্চের আলো ফেলে, পালিয়ে যায়, আবার আধঘণ্টা পরে ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। শঙ্করের ভয় হল, ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো বা লাফ দিয়ে দোলনায় উঠে আক্রমণ করবে। চিতাবাঘ অতি ধূর্ত জানোয়ার। কাজেই সারারাত্রি শঙ্কর চোখের পাতা বোজাতে পারলে না। তার ওপর চারিধারে নানা বন্য জন্তুর রব। একবার একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ কাছেই কোথাও একদল বালকবালিকার খিলখিল হাসির রবে তন্দ্রা ছুটে গিয়ে ও চমকে জেগে উঠল। ছেলেমেয়েরা হাসে কোথায়? এই জনমানবহীন অরণ্যে বালকবালিকাদের যাতায়াত করা বা এত রাত্রে হাসা উচিত নয় তো? পরক্ষণেই তার মনে পড়ল একজাতীয় বেবুনের ডাক ঠিক ছেলেপুলের হাসির মত শোনায়, আল্‌ভারেজ্ একবার গল্প করেছিল। প্রভাতে সে গাছ থেকে নেমে রওনা হল। বৈমানিকেরা যাকে বলেন 'ফ্লাইং ব্লাইন্ড'—সে সেইভাবে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, সম্পূর্ণ ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে, দু চোখ বুজে। এই দুদিন চলেই সে সম্পূর্ণভাবে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে—আর তার উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম জ্ঞান নেই। সে বুঝলে কোনো মহারণ্যে দিক ঠিক রেখে চলা কি ভীষণ কঠিন ব্যাপার? তোমার চারিপাশে সব সময়েই গাছের গুঁড়ি, অগণিত, অজস্র, তার লেখাজোখা নেই। তোমার মাথার ওপর সব সময় ডালপালা লতাপাতার চন্দ্রাতপ। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্যের আলোও কম, সব সময়েই যেন গোধূলি। ক্রোশের পর ক্রোশ যাও, ঐ একই ব্যাপার। এদিকে কম্পাস অকেজো, কি করে দিক ঠিক রাখা যায়?

পঞ্চম দিনে একটা পাহাড়ের তলায় এসে সে বিশ্রামের জন্যে থামল। কাছেই একটা প্রকাণ্ড গুহার মুখ, একটা ক্ষীণ জলস্রোত গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে বনের মধ্যে এঁকে-

wapsip.com

বেঁকে অদৃশ্য হয়েছে।

অত বড় গুহা কখনো না দেখার দরুন, একটা কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই সে জিনিসপত্র বাইরে রেখে গুহার মধ্যে ঢুকলো। গুহার মুখে খানিকটা আলো—ভেতরে বড় অন্ধকার, টর্চ জ্বেলে সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে, সে ক্রমশ এমন এক জায়গায় এসে পৌছুলো, যেখানে ডাইনে বাঁয়ে আর দুটো মুখ। ওপরের দিকে টর্চ উঠিয়ে দেখলে ছাদটা অনেকটা উঁচু। সাদা শক্ত নুনের মত ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সরু মোটা ঝুরি ছাদ থেকে ঝাড় লণ্ঠনের মত ঝুলছে।

গুহার দেওয়ালগুলো ভিজে, গা বেয়ে অনেক জায়গায় জল খুব ক্ষীণ ধারায় ঝরে পড়ছে শঙ্কর ডাইনের গুহায় ঢুকলো, সেটা ঢুকবার সময় সরু, কিন্তু ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে গিয়েছে। পায়ে পাথর নয়, ভিজে মাটি। টর্চের আলোয় ওর মনে হল, গুহাটা ত্রিভুজাকৃতি। ত্রিভুজের ভূমির এক কোণে আর একটা গুহামুখ। সেটা দিয়ে ঢুকে শঙ্কর দেখলে সে যেন দুধারে পাথরের উঁচু দেওয়াল-ওয়ালা একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে এসেছে। গলিটা আঁকা-বাঁকা, একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে সাপের মত এঁকে বেঁকে চলেছে—শঙ্কর অনেক দূর চলে গেল গলিটা ধরে।

ঘণ্টা দুই এতে কাটলো। তারপর সে ভাবলে, এবার ফেরা যাক। কিন্তু ফিরতে গিয়ে সে আর কিছুতেই সেই ত্রিভুজাকৃতি গুহাটা খুঁজে পেল না। কেন, এই তো সেই গুহা থেকেই এই সরু গুহাটা বেরিয়েছে, সরু গুহা তো শেষ হয়েই গেল—তবে সে ত্রিভুজ গুহা কই?

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর শঙ্করের হঠাৎ কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হল। সে গুহার পথ হারিয়ে ফেলে নি তো? সর্বনাশ!

সে বসে আতঙ্ক দূর করবার চেষ্টা করলে, ভাবলে—না, ভয় পেলে তার চলবে না। স্থির বুদ্ধি ভিন্ন এ বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় নেই। মনে পড়ল, আল্‌ভারেজ্ তাকে বলে দিয়েছিল, অপরিচিত স্থানে বেশিদূর অগ্রসর হবার সময়ে পথের পাশে সে যেন কোন চিহ্ন রেখে যায়, যাতে আবার সেই চিহ্ন ধরে ফিরতে পারে। এ উপদেশ সে ভুলে গিয়েছিল। এখন উপায়?

টর্চের আলো জ্বালতে তার আর ভরসা হচ্ছে না। যদি ব্যাটারি ফুরিয়ে যায়, তবে নিরুপায়। গুহার মধ্যে অন্ধকার সূচীভেদ্য। সেই দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে এক পা অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। পথ খুঁজে বার করা তো দূরের কথা।

সারাদিন কেটে গেল—ঘড়িতে সন্ধ্যা সাতটা? এদিকে টর্চের আলো রাঙা হয়ে আসছে ক্রমশ। ভীষণ গুমট গরম গুহার মধ্যে, তা ছাড়া পানীয় জল নেই। পাথরের দেওয়াল বেয়ে যে জল চুঁয়ে পড়ছে, তার আস্বাদ—কষা, ক্ষার, ঈষৎ লোনা। তার পরিমাণও বেশি নয়। জিব দিয়ে চেটে খেতে হয় দেওয়ালের গা থেকে।

বাইরে অন্ধকার হয়েছে নিশ্চয়ই, সাড়ে সাতটা বাজলো। আটটা, নটা, দশটা। তখনও শঙ্কর পথ হাতড়াচ্ছে, টর্চের পুরোনো ব্যাটারি জ্বলছে সমানে বেলা তিনটে থেকে, এইবার সে এত ক্ষীণ হয়ে এসেছে যে, শঙ্কর ভয়ে আরও উন্মাদের মত হয়ে উঠল। এই আলো যতক্ষণ তার প্রাণের ভরসাও ততক্ষণ—নতুবা এ রৌরব নরকের মত মহা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাবার কোনো আশা নেই—স্বয়ং আল্‌ভারেজ্‌ও পারতো না।

টর্চ নিবিয়ে, ও চুপ করে একখানা পাথরের ওপর বসে রইল। এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতেও পারতো, যদি আলো থাকতো—কিন্তু অন্ধকারে সে কি করে এখন? একবার ভাবলে

wapsip.com

রাত্রিটা কাটুক না, দেখা যাবে এখন। পরক্ষণেই মনে হল—তাতে আর কি সুবিধে হবে? এখানে দিন রাত্রি সমান।

অন্ধকারেই সে দেওয়াল ধরে ধরে চলতে লাগলো। হায়, হায়, কেন গুহায় ঢুকবার সময় দুটো নতুন ব্যাটারি সঙ্গে নেয় নি! অন্তত একটা দেশলাই।

ঘড়ি হিসেবে সকাল হল। গুহার চির অন্ধকারে আলো জ্বললো না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে ওর। বোধ হয়, এই গুহার অন্ধকারে ওর সমাধি অদৃষ্টে লেখা আছে, দিনের আলো আর দেখতে হবে না। আল্‌ভারেজের বলি গ্রহণ করে আফ্রিকার রক্ততৃষ্ণা মেটে নি, তাকেও চাই।

তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল। শঙ্কর জুতোর সুকতোলা চিবিয়ে খেয়েছে, একটা আরসুলা কি ইঁদুর, কি কাঁকড়াবিছে—কোনো জীব নেই গুহার মধ্যে যে সে ধরে খায়। মাথা ক্রমশ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে আসছে. তার জ্ঞান নেই সে কি করছে বা তার কি ঘটছে—কেবল এইটুকু মাত্র জ্ঞান রয়েছে যে তাকে এ গুহা থেকে যে করে হোক বেরুতেই হবে, দিনের আলোর মুখ দেখতেই হবে। তাই সে অবসন্ন নির্জীব দেহেও অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়েই বেড়াচ্ছে, হয়তো মরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ওইরকমই হাতড়াবে।

একবার সে অবসন্ন দেহে ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ পরে সে জেগে উঠল, তা সে জানে না; দিন, রাত্রি, ঘণ্টা, ঘড়ি, দণ্ড, পল মুছে গিয়েছে এই ঘোর অন্ধকারে। হয়তো বা তার চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছে, কে জানে?

ঘুমোবার পরে সে যেন একটু বল পেল। আবার উঠল, আবার চলল, আল্‌ভারেজের শিষ্য সে, নিশ্চেষ্ট ভাবে হাত-পা কোলে করে বসে কখনই মরবে না। ···সে পথ খুঁজবে, খুঁজবে, যতক্ষণ বেঁচে আছে।

আশ্চর্য, সে নদীটাই বা কোথায় গেল? ···গুহার মধ্যে গোলকধাঁধায় ঘোরবার সময়ে জলধারাকে সে কোথায় হারিয়ে ফেলেছে। নদী দেখতে পেলে হয়তো উদ্ধার পাওয়াও যেতে পারে, কারণ তার এক মুখ যেদিকেই থাক, একটা মুখ আছে গুহার বাইরে। কিন্তু নদী তো দূরের কথা, একটা অতি ক্ষীণ জলধারার সঙ্গেও আজ তিন দিন পরিচয় নেই। জল অভাবে শঙ্কর মরতে বসেছে. কষা, লোনা, বিস্বাদ জল চেটে চেটে তার জিব ফুলে উঠেছে, তৃষ্ণা তাতে বেড়েছে ছাড়া কমে নি।

পাথরের দেওয়াল হাতড়ে শঙ্কর খুঁজতে লাগল, ভিজে দেওয়ালের গায়ে কোথাও শেওলা জন্মেছে কি না—খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে। না, তাও নেই! পাথরের দেওয়াল সর্বত্র অনাবৃত—মাঝে মাঝে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পাতলা সর পড়েছে, একটা ব্যাঙের ছাতা, কি শেওলাজাতীয় উদ্ভিদও নেই। সূর্যের আলোর অভাবে উদ্ভিদ এখানে বাঁচতে পারে না।

আরও একদিন কেটে রাত এল। এত ঘোরাঘুরি করেও কিছু সুবিধে হচ্ছে বলে তো বোধ হয় না। ওর মনে হতাশা ঘনিয়ে এসেছে। আরও সে কি চলবে, কতক্ষণ চলবে? এতে কোনো ফল নেই, এ চলার শেষ নেই। কোথায় সে চলেছে এই গাঢ় নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারে, এই ভয়ানক নিস্তব্ধতার মধ্যে! উঃ, কি ভয়ানক অন্ধকার, আর কি ভয়ানক নিস্তব্ধতা! পৃথিবী যেন মরে গিয়েছে, সৃষ্টিশেষের প্রলয়ে সোমসূর্য নিভে গিয়েছে, সেই মৃত পৃথিবীর জনহীন, শব্দহীন, সময়হীন শ্মশানে সে-ই একমাত্র প্রাণী বেঁচে আছে।

আর বেশিক্ষণ এ-রকম থাকলে সে ঠিক পাগল হয়ে যাবে।

wapsip.com

এগারো

শঙ্কর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধহয়, কিম্বা হয়তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে থাকবে। মোটের ওপর যখন আবার জ্ঞান ফিরে এল, তখন ঘড়িতে বারোটা—সম্ভবত রাত বারোটাই হবে। ও উঠে আবার চলতে শুরু করলে। এক জায়গায় তার সামনে একটা পাথরের দেওয়াল পড়ল—তার রাস্তা যেন আটকে রেখেছে। টর্চের রাঙা আলো একটিবার মাত্র জ্বালিয়ে সে দেখলে, যে দেওয়াল ধরে সে এতক্ষণ যাচ্ছিল, তারই সঙ্গে সমকোণ করে এ দেওয়ালটা আড়াআড়িভাবে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ সে কান খাড়া করলে···অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন ক্ষীণ জলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না?···

হ্যাঁ ঠিক জলের শব্দই বটে···কুলু, কুলু, কুলু, কুলু-ঝরনা-ধারার শব্দ—যেন পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে বেধে জল বইছে কোথাও। ভাল করে শুনে ওর মনে হল, জলের শব্দটা হচ্ছে এই পাথরের দেওয়ালের ওপারে। দেওয়ালে কান পেতে শুনে ওর সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। দেওয়াল ফুঁড়ে যাবার উপযুক্ত ফাঁক আছে কিনা, টর্চের রাঙা আলোয় সন্ধান করতে করতে এক জায়গায় খুব নিচু ও সংকীর্ণ প্রাকৃতিক রন্ধ্র দেখতে পেলে। সেখান দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অনেকটা গিয়ে হাতে জল ঠেকলো। সন্তর্পণে ওপরের দিকে হাত দিয়ে বুঝলো, সেখানটাতে দাঁড়ানো যেতে পারে। দাঁড়িয়ে উঠে ঘন অন্ধকারের মধ্যে কয়েক পা যেতেই, স্রোতযুক্ত বরফের মত ঠাণ্ডা জলে পায়ের পাতা ডুবে গেল।···

ঘন অন্ধকারের মধ্যেই নিচু হয়ে, ও প্রাণ ভরে ঠাণ্ডা জল পান করে নিলে! তারপর টর্চের ক্ষীণ আলোয় জলের স্রোতের গতি লক্ষ্য করলে। এ ধরনের নির্ঝরের স্রোতের উজান দিকে গুহার মুখ সাধারণত হয় না। টর্চ নিবিয়ে সেই মহা নিবিড় অন্ধকারে পায়ে পায়ে জলের ধারা অনুভব করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে চললো। নির্ঝর চলেছে এঁকে বেঁকে, কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। এক জায়গায় যেন সেটা তিন-চারটে ছোট বড় ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে এদিক ওদিক চলে গিয়েছে ওর মনে হল।

সেখানে এসে সে দিশাহারা হয়ে পড়ল। টর্চ জ্বেলে দেখলে স্রোত নানামুখী। আল্‌ভারেজের কথা মনে পড়ল, পথে চিহ্ন রেখে না গেলে, এখানে আবার গোল পাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

নিচু হয়ে চিহ্ন রেখে যাওয়ার উপযোগী কিছু খুঁজতে গিয়ে দেখলে, স্বচ্ছ, নির্মল জলধারায় এপারে ওপারে দুপারেই এক ধরনের পাথরের নুড়ি বিস্তর পড়ে আছে। সেই ধরনের পাথরের নুড়ির ওপর দিয়েও প্রধান জলধারা বয়ে চলেছে।

অনেকগুলো নুড়ি পকেটে নিয়ে, সে প্রত্যেক শাখাটা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করবে ভেবে দুটো নুড়ি ধারার পাশে রাখতে গেল। একটা স্রোত থেকে খানিকদূর গিয়ে আবার অনেকগুলো ফেকড়ি বেরিয়েছে। প্রত্যেক সংযোগ-স্থলে ও নুড়ি সাজিয়ে একটা 'S' অক্ষর তৈরি করে রাখলে।

অনেকগুলো স্রোতশাখা আবার ঘুরে শঙ্কর যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই যেন ঘুরে গেল। পথে চিহ্ন না রেখে গিয়েই শঙ্করের মাথা গোলমাল হয়ে যাবার যোগাড় হল। একবার শঙ্করের পায়ে খুব ঠাণ্ডা কি ঠেকতেই, সে আলো জ্বেলে দেখলে, জলের ধারে এক

wapsip.com

প্রকাণ্ডকায় অজগর পাইথন কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পাইথন ওর স্পর্শে আলস্য পরিত্যাগ করে মাথাটা উঠিয়ে কড়ির দানার মত চোখে চাইতেই টর্চের আলোয় দিশাহারা হয়ে গেল—নতুবা শঙ্করের প্রাণসংশয় হয়ে উঠতো। শঙ্কর জানে অজগর সর্প অতি ভয়ানক জন্তু—বাঘ সিংহের মুখ থেকেও হয়তো পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, অজগর সর্পের নাগপাশ থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। একটিবার লেজ় ছুঁড়ে পা জড়িয়ে ধরলে আর দেখতে হত না।

এবার অন্ধকারে চলতে ওর ভয়ানক ভয় করছিল। কি জানি, আবার কোথায় কোন্ পাইথন সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে! দুটো তিনটে স্রোতশাখা পরীক্ষা করে দেখবার পরে ও তার কৃত চিহ্নের সাহায্যে পুনরায় সংযোগস্থলে ফিরে এল। প্রধান সংযোগস্থলে ও নুড়ি দিয়ে একটা ক্রুশচিহ্ন করে রেখে গিয়েছিল। এবার ওরই মধ্যে যেটাকে প্রধান বলে মনে হল, সেটা ধরে চলতে গিয়ে দেখলে সেও সোজামুখে যায় নি। তারও নানা ফেঁকড়ি বেরিয়েছে কিছুদূরে গিয়েই। এক-এক জায়গায় গুহার ছাদ এত নিচু হয়ে নেমে এসেছে যে কুঁজো হয়ে, কোথাও বা মাজা দুমড়ে, অশীতিপর বৃদ্ধের ভঙ্গিতে চলতে হয়।

হঠাৎ এক জায়গায় টর্চ জ্বেলে সেই অতি ক্ষীণ আলোতেও শঙ্কর বুঝতে পারলে গুহাটা সেখানে ত্রিভুজাকৃতি—সেই ত্রিভুজ গুহা, যাকে খুঁজে বার না করতে পেরে, মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। একটু পরেই দেখলে বহুদূরে যেন অন্ধকারের ফ্রেমে আঁটা কয়েকটি নক্ষত্র জ্বলছে। গুহার মুখ! এবার আর ভয় নেই। এ-যাত্রার মত সে বেঁচে গেল।

শঙ্কর যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন রাত তিনটে। সেখানটায় গাছপালা কিছু কম, মাথার ওপর নক্ষত্রভরা আকাশ দেখা যায়। রৌরবের মহা অন্ধকার থেকে বার হয়ে এসে রাত্রির নক্ষত্রালোকিত স্বচ্ছ অন্ধকার তার কাছে দীপালোকখচিত নগরপথের মত মনে হল। প্রাণভরে সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলে, এ অপ্রত্যাশিত মুক্তির জন্যে।

ভোর হল। সূর্যের আলো গাছের ডালে ডালে ফুটলো। শঙ্কর ভাবলে এ অমঙ্গলজনক স্থানে আর একদণ্ডও সে থাকবে না। পকেটে একখানা পাথরের নুড়ি তখনও ছিল, ফেলে না দিয়ে গুহার বিপদের স্মারক স্বরূপ সেখানা সে কাছে রেখে দিলে।

পরদিন এলিফ্যান্ট্ ঘাস দেখা গেল বনের মধ্যে, সেদিনই সন্ধ্যার পূর্বে অরণ্য শেষ হয়ে খোলা জায়গা দেখা দিল। রাত্রে শঙ্কর অনেকক্ষণ বসে ম্যাপ দেখলে। সামনে যে মুক্ত প্রান্তরবৎ দেশ পড়ল, এখান থেকে এটা প্রায় তিনশো মাইল বিস্তৃত, একেবারে জাম্বেসী নদীর তীর পর্যন্ত। এই তিনশো মাইলের খানিকটা পড়েছে বিখ্যাত কালাহারি মরুভূমির মধ্যে, প্রায় ১৭৫ মাইল, অতি ভীষণ, জনমানবহীন, জলহীন, পথহীন মরুভূমি। মিলিটারি ম্যাপ থেকে আল্‌ভারেজ্ নোট করেছে যে, এই অঞ্চলের উত্তরপূর্ব কোণ লক্ষ্য করে একটি বিশেষ পথ ধরে না গেলে, মাঝামাঝি পার হতে যাওয়ার মানেই মৃত্যু। ম্যাপে এর নাম দিয়েছে 'তৃষ্ণার দেশ' (Thirstland Trek)। রোডেসিয়া পৌঁছুতে পারলে যাওয়া অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে, কারণ সে-সব স্থানে মানুষ আছে।

শঙ্কর এখানে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিলে। পথের এই ভয়ানক অবস্থা জেনে-শুনেও সে দমে গেল না, হাত-পা-হারা হয়ে পড়ল না। এই পথে আল্‌ভারেজ্ একা গিয়ে সল্‌সবেরি থেকে টোটা ও খাবার কিনে আনবে বলেছিল। বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ যা পারবে বলে স্থির করেছিল, সে তা থেকে পিছিয়ে যাবে?

wapsip.com

কিন্তু সাহস ও নির্ভীকতা এক জিনিস, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। ম্যাপ দেখে গন্তব্যস্থানের দিক নির্ণয় করার ক্ষমতা শঙ্করের ছিল না। সে দেখলে ম্যাপের সে কিছুই বোঝে না। মিলিটারি ম্যাপগুলোতে দুটো মরুমধ্যস্থ কূপের অবস্থান-স্থানের ল্যাটিচিউড্ লিঙ্গিচিউড্ দেওয়া আছে, 'ম্যাগনেটিক নর্থ' আর 'ট্রু নর্থ' ঘটিত কি একটা গোলমালে অঙ্ক কষে বার করতো আল্ভারেজ্, শঙ্কর দেখেছে কিন্তু শিখে নেয় নি।

সুতরাং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি? অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেই শঙ্কর এই দুস্তর মরুভূমিতে পাড়ি দিতে প্রস্তুত হল। ফলে, দুদিন যেতে না যেতেই শঙ্কর সম্পূর্ণ দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ম্যাপ দৃষ্টে যে কোনো অভিজ্ঞ লোক যে জলাশয় চোখ বুজে খুঁজে বার করতে পারতো—শঙ্কর তার তিন মাইল উত্তর দিয়ে চলে গেল, অথচ তখন তার জল ফুরিয়ে এসেছে। নতুন পানীয় জল সংগ্রহ করে না নিলে জীবন বিপদাপন্ন হবে।

প্রথমত শুধু প্রান্তর আর পাহাড়, কাকটাস ও ইউফোর্বিয়ার বন, মাঝে মাঝে গ্রানাইটের স্তূপ। তার পর কি ভীষণ কষ্টের সে পথ-চলা! খাদ্য নেই, জল নেই, পথ ঠিক নেই, মানুষের মুখ দেখা নেই। দিনের পর দিন শুধু সুদূর, শূন্য-দিগ্বলয় লক্ষ্য করে সে হতাশ পথ-যাত্রা—মাথার ওপর আগুনের মত সূর্য, পায়ের নীচে বালি পাথর যেন জ্বলন্ত অঙ্গার, সূর্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে—নক্ষত্র উঠছে, চাঁদ উঠছে—আবার অস্ত যাচ্ছে। মরুভূমির গিরগিটি একঘেয়ে সুরে ডাকছে, ঝিঁঝি ডাকছে—সন্ধ্যায়, গভীর নিশীথে।

মাইল-লেখা পাথর নেই, কত মাইল অতিক্রম করা হল তার হিসেব নেই। খাদ্য দু-একটা পাখি, কখনো বা মরুভূমির বুজার্ড শকুনি, যার মাংস জঠুর ও বিস্বাদ। এমন কি একদিন একটা পাহাড়ী বিষাক্ত কাঁকড়া বিছে, যার দংশনে মৃত্যু—তাও যেন পরম সুখাদ্য মিললে মহা সৌভাগ্য।

দুদিন ঘোর তৃষ্ণার কষ্ট পাবার পরে পাহাড়ের ফাটলে একটা জলাশয় পাওয়া গেল। কিন্তু জলের চেহারা লাল, কতকগুলো কি পোকা ভাসছে জলে—ডাঙায় একটা কি জন্তু মরে পচে ঢোল হয়ে আছে। সেই জলই আকণ্ঠ পান করে শঙ্কর প্রাণ বাঁচালে।

দিনের পর দিন কাটছে—মাস গেল, কি সপ্তাহ গেল, কি বছর গেল, হিসেব নেই। শঙ্কর রোগা হয়ে গিয়েছে শুকিয়ে। কোথায় চলেছে তার কিছু ঠিক নেই—শুধু সামনের দিকে যেতে হবে এই জানে। সামনের দিকেই ভারতবর্ষ—বাংলা দেশ।

তার পর পড়ল আসল মরু, কালাহারি মরুভূমির এক অংশ। দূর থেকে তার চেহারা দেখে শঙ্কর ভয়ে শিউরে উঠলো। মানুষে কি করে পার হতে পারে এই অগ্নিদগ্ধ প্রান্তর! শুধু বালির পাহাড়, তাম্রাভ কটা বালির সমুদ্র। ধু ধু করে যেন জ্বলছে দুপুরের রোদে। মরুর কিনারায় প্রথম দিনেই ছায়ায় ১২৭ ডিগ্রী উত্তাপ উঠল থার্মোমিটারে।

ম্যাপে বার বার লিখে দিয়েছে, উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁষে ছাড়া কেউ এই মরুভূমি মাঝামাঝি পার হতে যাবে না। গেলেই মৃত্যু, কারণ সেখানে জল একদম নেই। জল যে উত্তরপূর্ব ধারে আছে তাও নয়, তবে ত্রিশ মাইল, সত্তর মাইল ও নব্বই মাইল ব্যবধানে তিনটি স্বাভাবিক উণুই আছে—যাতে জল পাওয়া যায়। ঐ উণুইগুলি প্রায়ই পাহাড়ের ফাটলে, খুঁজে বার করা বড়ই কঠিন। এইজন্যে মিলিটারি ম্যাপে ওদের অবস্থান-স্থানের অক্ষ ও দ্রাঘিমা দেওয়া আছে।

শঙ্কর ভাবলে, ওসব বার করতে পারবো না। সেক্সটান্ট্ আছে, নক্ষত্রের চার্ট আছে কিন্তু তাদের ব্যবহার সে জানে না। যা হয় হবে, ভগবান ভরসা। তবে যতদূর সম্ভব উত্তর-পূর্ব কোণ

wapsip.com

ঘেঁষে যাবার চেষ্টা সে করলে।

তৃতীয় দিনে নিতান্ত দৈববলে সে একটা উণুই দেখতে পেল। জল কাদাগোলা, আগুনের মত গরম, কিন্তু তাই তখন অমৃতের মত দুর্লভ। মরুভূমি ক্রমে ঘোরতর হয়ে উঠল। কোন প্রকার জীবের বা উদ্ভিদের চিহ্ন ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল। আগে রাত্রে আলো জ্বাললে দু-একটা কীটপতঙ্গ আলোয় আকৃষ্ট হয়ে আসতো, ক্রমে তাও আর আসে না।

দিনে উত্তাপ যেমন ভীষণ, রাত্রে তেমনি শীত। শেষ রাত্রে শীতে হাত-পা জমে যায় এমন অবস্থা, অথচ ক্রমশ আগুন জ্বালবার উপায় গেল, কারণ জ্বালানি কাঠ একেবারেই নেই। কয়েকদিনের মধ্যে সঞ্চিত জল গেল ফুরিয়ে। সে সুবিস্তীর্ণ বালুকা-সমুদ্রে একটি পরিচিত বালুকণা খুঁজে বার করা যতদূর অসম্ভব, তার চেয়ে অসম্ভব ক্ষুদ্র এক হাত-দুই ব্যাসবিশিষ্ট জলের উণুই বার করা।

সেদিন সন্ধ্যার সময় তৃষ্ণার কষ্টে শঙ্কর উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠল। এতক্ষণে শঙ্কর বুঝেছে যে, এ ভীষণ মরুভূমি একা পার হওয়ার চেষ্টা করা আত্মহত্যার শামিল। সে এমন জায়গায় এসে পড়েছে, যেখান থেকে ফেরবার উপায়ও নেই।

একটা উঁচু বালিয়াড়ির ওপর উঠে সে দেখলে, চারিধারে শুধু কটা বালির পাহাড়, পূর্বদিকে ক্রমশ উঁচু হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমে সূর্য ডুবে গেলেও সারা আকাশ সুর্যাস্তের আভায় লাল। কিছুদূরে একটা ছোট ঢিবির মত পাহাড় এবং দূর থেকে মনে হল একটা গুহাও আছে। এ ধরনের গ্রানাইটের ছোট ঢিবি এদেশে সর্বত্র—ট্রান্সভাল ও রোডেসিয়ায় এদের নাম 'Kopje' অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাহাড়। রাত্রে শীতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে শঙ্কর সেই গুহায় আশ্রয় নিলে।

এইখানে এক ব্যাপার ঘটল।

বারো

গুহার মধ্যে ঢুকে শঙ্কর টর্চ জ্বেলে (নতুন ব্যাটারি তার কাছে তখনও ডজন-দুই ছিল) দেখলে গুহাটা ছোট, মেজেটাতে ছোট ছোট পাথর ছড়ানো, বেশ একটা ছোটখাটো ঘরের মত। গুহার এক কোণে ওর চোখ পড়তেই অবাক হয়ে রইল। একটা ছোট্টকাঠের পিপে! এখানে কি করে এল কাঠের পিপে!

এগিয়ে দু-পা গিয়েই চমকে উঠল। গুহার দেওয়ালের ধার ঘেঁষে শায়িত অবস্থায় একটা সাদা নরকঙ্কাল, তার মুণ্ডটা দেওয়ালের দিকে ফেরানো। কঙ্কালের আশে-পাশে কালো কালো থলে-ছেঁড়ার মত জিনিস, বোধ হয় সেগুলো পশমের কোটের অংশ। দুখানা বুট জুতো কঙ্কালের পায়ে এখনও লাগানো। একপাশে একটা মরচে পড়া বন্দুক।

পিপেটার পাশে একটা ছিপি-আঁটা বোতল। বোতলের মধ্যে একখানা কাগজ। ছিপিটা খুলে কাগজখানা বার করে দেখলে, তাতে ইংরিজিতে কি লেখা আছে।

পিপেটাতে কি আছে দেখবার জন্যে যেমন সে সেটা নাড়াতে গিয়েছে, অমনি পিপের নীচে থেকে একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে ওর শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সাপ মাটি থেকে হাত তিনেক উঁচু হয়ে ঠেলে উঠল। বোধ হয়, ছোবল মারবার আগে সাপটা এক সেকেন্ড দেরি করেছিল। সেই এক সেকেন্ডের দেরি করার জন্যে শঙ্করের প্রাণ রক্ষা হল। পরমুহূর্তেই শঙ্করের ৪৫ অটোমেটিক কোল্ট্ গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে

wapsip.com

অতবড় ভীষণ বিষধর 'স্যান্ড্ ভাইপার'-এর মাথাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে রক্তমাংস খানিকটা পিপের গায়ে, খানিকটা পাথরের দেওয়ালে ছিটকে লাগল। আল্‌ভারেজ্ ওকে শিখিয়েছিল, পথে সর্বদা হাতিয়ার তৈরি রাখবে। এ উপদেশ অনেকবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

অদ্ভুত পরিত্রাণ! সব দিক থেকে। পিপেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল, সেটাতে অল্প একটু জল তখনও আছে। খুব কালো শিউ গোলার মত রং বটে, তবুও জল। ছোট পিপেটা উঁচু করে ধরে, পিপের ছিপি খুলে ঢক ঢক করে শঙ্কর সেই দুর্গন্ধ কালো কালির মত জল আকণ্ঠ পান করলে। তারপর সে টর্চের আলোতে সাপটা পরীক্ষা করলে। পুরো পাঁচ হাত লম্বা সাপটা, মোটাও বেশ। এ ধরনের সাপ মরুভূমির বালির মধ্যে লুকিয়ে শুধু মুণ্ডটা ওপরে তুলে থাকে—অতি মারাত্মক রকমের বিষাক্ত সর্প!

এইবার বোতলের মধ্যের কাগজখানা খুলে মন দিয়ে পড়লে। যে ছোট পেন্সিল দিয়ে এটা লেখা হয়েছে—বোতলের মধ্যে সেটাও পাওয়া গেল। কাগজখানাতে লেখা আছে···

"আমার মৃত্যু নিকট। আজই আমার শেষ রাত্রি। যদি আমার মরণের পরে, কেউ এই ভয়ঙ্কর মরুভূমির পথে যেতে যেতে এই গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে সম্ভবত এই কাগজ তাঁর হাতে পড়বে।

আমার গাধাটা দিন দুই আগে মরুভূমির মধ্যে মারা গিয়েছে। এক পিপে জল তার পিঠে ছিল, সেটা আমি এই গুহার মধ্যে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছি, যদিও জ্বরে আমার শরীর অবসন্ন। মাথা তুলবার শক্তি নেই। তার ওপর অনাহারে শরীর আগের থেকেই দুর্বল।

আমার বয়স ২৬ বৎসর। আমার নাম আত্তিলিও গাত্তি। ফ্লোরেন্সের গাত্তি বংশে আমার জন্ম। বিখ্যাত নাবিক রিওলিনো কাভালকান্তি গাত্তি—যিনি লেপান্টোর যুদ্ধে তুর্কীদের সঙ্গে লড়েছিলেন, তিনি আমার একজন পূর্বপুরুষ।

রোম ও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভবঘুরে হয়ে গেলাম সমুদ্রের নেশায়,—যা আমাদের বংশগত নেশা।

ডাচ্ ইন্ডিজ যাবার পথে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে জাহাজ-ডুবি হল।

আমরা সাতজন লোক অতিকষ্টে ডাঙা পেলাম। ঘোর জঙ্গলময় অঞ্চল আফ্রিকার এই পশ্চিম উপকূল! জঙ্গলের মধ্যে শেফুজাতির এক গ্রামে আমরা আশ্রয় নিই এবং প্রায় দু-মাস সেখানে থাকি। এখানেই দৈবাৎ এক অদ্ভুত হীরার খনির গল্প শুনলাম। পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড পর্বত ও ভীষণ আরণ্য অঞ্চলে নাকি এই হীরার খনি অবস্থিত।

আমরা সাতজন ঠিক করলাম এই হীরার খনি যে করে হোক, বার করতে হবেই। আমাকে ওরা দলের অধিনায়ক করলে—তার পর আমরা দুর্গম জঙ্গল ঠেলে চললাম সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পার্বত্য অঞ্চলে। সে গ্রামের কোন লোক পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজী হল না। তারা বলে, তারা কখনও সে জায়গায় যায় নি, কোথায় তা জানে না, বিশেষত এক উপদেবতা নাকি সে বনের রক্ষক। সেখান থেকে হীরা নিয়ে কেউ আসতে পারবে না।

আমরা দমবার পাত্র নই। পথে যেতে যেতে ঘোর কষ্টে বেঘোরে দুজন সঙ্গী মারা গেল। বাকি চারজন আর অগ্রসর হতে চায় না। আমি দলের অধ্যক্ষ, গাত্তি বংশে আমার জন্ম, পিছু হটতে জানি না। যতক্ষণ প্রাণ আছে, এগিয়ে যেতে হবে এই জানি। আমি ফিরতে চাইলাম না।

শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। আজ রাত্রেই আসবে সে নিরবয়ব মৃত্যুদূত। বড় সুন্দর আমাদের ছোট্ট হ্রদ সেরিনো লাগ্রানো, ওরই তীরে আমার পৈতৃক প্রাসাদ, কাস্টোলি

wapsip.com

রিওলিনি। এতদূর থেকেও আমি সেরিনো লাগ্রানোর তীরবর্তী কমলালেবুর বাগানের লেবুফুলের সুগন্ধ পাচ্ছি। ছোট যে গির্জাটি পাহাড়ের নীচেই, তার রূপোর ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজ পাচ্ছি।

না, এসব কি আবোল-তাবোল লিখছি জ্বরের ঘোরে। আসল কথাটা বলি। কতক্ষণই বা আর লিখবো?

আমরা সে পর্বতমালা, সে মহাদুর্গম অরণ্যে গিয়েছিলাম। সে খনি বার করেছিলাম। যে নদীর তীরে হীরা পাওয়া যায়, এক বিশাল ও অতি ভয়ানক গুহার মধ্যে সে নদীর উৎপত্তি স্থান। আমিই সেই গুহার মধ্যে ঢুকে এবং নদীর জলের তীরে ও জলের মধ্যে পাথরের নুড়ির মত অজস্র হীরা ছড়ানো দেখতে পাই। প্রত্যেক নুড়িটি টেট্রাহেড্রন ক্রিস্ট্যাল, স্বচ্ছ ও হরিদ্রাভ; লন্ডন ও আমস্টার্ডামের বাজারে এমন হীরা নেই।

এই অরণ্য ও পর্বতের সে উপদেবতাকে আমি এই গুহার মধ্যে দেখেছি—ধুনোর কাঠের মশালের আলোয়, দূর থেকে আবছায়া ভাবে। সত্যিই ভীষণ তার চেহারা! জ্বলন্ত মশাল হাতে ছিল বলেই সেদিন আমার কাছে সে ঘেঁষে নি। এই গুহাতেই সে সম্ভবত বাস করে। হীরার খনির সে রক্ষক, এই প্রবাদের সৃষ্টি সেই জন্যেই বোধ হয় হয়েছে।

কিন্তু কি কুক্ষণেই হীরার সন্ধান পেয়েছিলাম এবং কি কুক্ষণেই সঙ্গীদের কাছে তা প্রকাশ করেছিলাম। ওদের নিয়ে আবার যখন সে গুহায় ঢুকি, হীরার খনি খুঁজে পেলাম না। একে ঘোর অন্ধকার, মশালের আলোয় সে অন্ধকার দূর হয় না, তার ওপরে বহুমুখী নদী, কোন্ স্রোতটার ধারা হীরার রাশির ওপর দিয়ে বইছে, কিছুতেই বার করতে পারলাম না আর।

আমার সঙ্গীরা বর্বর, জাহাজের খালাসী। ভাবলে, ওদের ফাঁকি দিলাম বুঝি। আমি একা নেবো এই বুঝি আমার মতলব। ওরা কি ষড়যন্ত্র আঁটলে জানি নে, পরদিন সন্ধ্যাবেলা চারজনে মিলে অতর্কিতে ছুরি খুলে আমায় আক্রমণ করলে। কিন্তু তারা জানতো না আমাকে, আত্তিলিও গাত্তিকে। আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত বইছে, আমার পূর্বপুরুষ রিওলিনি কাভালকান্তি গাত্তির, যিনি লেপান্টোর যুদ্ধে ওরকম বহু বর্বরকে নরকে পাঠিয়েছিলেন। সান্টা কাটালিনার সামরিক বিদ্যালয়ে যখন আমি ছাত্র, আমাদের অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ Fencer এন্টোনিও ড্রেফুসকে ছোরার ডুয়েলে জখম করি। আমার ছোরার আঘাতে ওরা দুজন মরে গেল, দুজন সাংঘাতিক ঘায়েল হল, নিজেও আমি চোট পেলাম ওদের হাতে। আহত বদমাইশ দুটোও সেই রাত্রেই ভবলীলা শেষ করল । ভেবে দেখলাম এখন এই গুহার গোলকধাঁধার ভেতর থেকে খুনি খুঁজে হয়তো বার করতে পারবো না। তা ছাড়া আমি সাংঘাতিক আহত, আমায় সভ্যজগতে পৌছুতেই হবে। পূর্বদিকের পথে ডাচ্ উপনিবেশে পৌঁছুবো বলে রওনা হয়েছিলুম। কিন্তু এ পর্যন্ত এসে আর অগ্রসর হতে পারলুম না। ওরা তলপেটে ছুরি মেরেছে, সেই ক্ষতস্থান উঠল বিষিয়ে। সেই সঙ্গে জ্বর। মানুষের কি লোভ তাই ভাবি। কেন ওরা আমাকে মারলে? ওরা আমার সঙ্গী, একবারও তো ওদের ফাঁকি দেওয়ার কথা আমার মনে আসেনি!

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরক খনির মালিক আমি, কারণ নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তা আমি আবিষ্কার করেছি। যিনি আমার এ লেখা পড়ে বুঝতে পারবেন, তিনি নিশ্চয়ই সভ্য মানুষ ও খ্রীস্টান। তাঁর প্রতি আমার অনুরোধ, আমাকে তিনি যেন খ্রীস্টানের উপযুক্ত কবর দেন। এই অনুগ্রহের বদলে ঐ খনির স্বত্ব আমি তাঁকে দিলাম। রানী শেবার ধনভাণ্ডারও এ খনির কাছে কিছু নয়!

wapsip.com

প্রাণ গেল, যাক, কি করবো? কিন্তু কি ভয়ানক মরুভূমি এ! একটা ঝিঁঝি পোকার ডাক পর্যন্ত নেই কোনোদিকে! এমন সব জায়গাও থাকে পৃথিবীতে! আমার আজ কেবলই মনে হচ্ছে, পপ্‌লার ঘেরা সেরিনো লাগ্রানো হ্রদ আর দেখবো না, তার ধারে যে চতুর্দশ শতাব্দীর গির্জাটি, তার সেই বড় রূপোর ঘণ্টার পবিত্র ধ্বনি, পাহাড়ের ওপরে আমাদের যে প্রাচীন প্রাসাদ কাস্টেলি রিওলিনি, মুরদের দুর্গের মত দেখায়··· দূরে আমব্রিয়ার সবুজ মাঠ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে ছোট্ট ডোরা নদী বয়ে যাচ্ছে···যাক, আবার কি প্রলাপ বকছি।

গুহার দুয়ারে বসে আকাশে অগণিত তারা প্রাণভরে দেখছি শেষবারের জন্যে।···সাধু ফ্রাঙ্কোর সেই সৌর স্তোত্র মনে পড়ছে—প্রস্তুত হোন প্রভু মোর, পবন সঞ্চার তরে, স্থির বায়ু তরে, ভগিনী মেদিনী তরে, নীল মেঘ তরে, আকাশের তরে, তারকা-সমূহ তরে, সুদিন কুদিন তরে, দেহের মরণ তরে।

আর একটা কথা। আমার দুই পায়ের জুতোর মধ্যে পাঁচখানা বড় হীরা লুকানো আছে, তোমায় তা দিলাম হে অজানা পথিক বন্ধু। আমার শেষ অনুরোধটি ভুলো না। জননী মেরী তোমার মঙ্গল করুন।

কম্যান্ডার আন্তিলিও গাত্তি
১৮৮০ সাল! সম্ভবত মার্চ মাস।

হতভাগ্য যুবক!

তার মৃত্যুর পরে সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর চলে গিয়েছে, এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এ পথে হয়তো কেউ যায় নি, গেলেও গুহাটার মধ্যে ঢোকে নি। এতকাল পরে তার চিঠিখানা মানুষের হাতে পড়ল।

আশ্চর্য এই যে কাঠের পিপেটাতে ত্রিশবছর পরেও জল ছিল কি করে?

কিন্তু কাগজখানা পড়েই শঙ্করের মনে হল, এই লেখায় বর্ণিত ঐটেই সেই গুহা—সে নিজে যেখানে পথ হারিয়ে মারা যেতে বসেছিল! তারপরে সে কৌতূহলের সঙ্গে কঙ্কালের পায়ের জুতো টান দিয়ে খসাতেই পাঁচখানা বড় বড় পাথর বেরিয়ে পড়ল। এ অবিকল সেই পাথরের নুড়ির মত, যা এক-পকেট কুড়িয়ে অন্ধকারে, গুহার মধ্যে সে পথে চিহ্ন করেছিল এবং যার একখানা তার কাছে রয়েছে। এ পাথরের নুড়ি তো রাশি রাশি সে দেখেছে গুহার মধ্যের সেই অন্ধকারময়ী নদীর জলস্রোতের নীচে, তার দুই তীরে! কে জানতো যে হীরার খনি খুঁজতে সে ও আল্‌ভারেজ্ সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসে, ছ'মাস ধরে রিখটারস্‌ভেল্ড্ পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গিয়েছে—এমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সে সেখানে গিয়ে পড়বে! হীরা যে এমন রাশি রাশি পড়ে থাকে পাথরের নুড়ির মত—তাই বা কে ভেবেছিল! আগে এসব জানা থাকলে, পাথরের নুড়ি সে দু-পকেট ভরে কুড়িয়ে বাইরে নিয়ে আসতো!

কিন্তু তারচেয়েও খারাপ কাজ হয়ে গিয়েছে যে, সে রত্নখনির গুহা যে কোথায়, কোন্ দিকে তার কোনো নক্সা করে আনে নি বা সেখানে কোনো চিহ্ন রেখে আসে নি, যাতে আবার তাকে খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। সেই সুবিস্তীর্ণ পর্বত ও অরণ্য অঞ্চলের কোন্ জায়গায় সেই গুহাটা দৈবাৎ সে দেখেছিল, তা কি তার ঠিক আছে, না ভবিষ্যতে সে আবার সে জায়গা বার করতে পারবে? এ যুবকও তো কোনো নক্সা করে নি, কিন্তু এ সাংঘাতিক আহত

wapsip.com

হয়েছিল রত্নখনি আবিষ্কার করার পরেই, এর ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। হয়তো এ যা বার করতে পারতো নক্সা না দেখে—সে তা পারবে না।

হঠাৎ আল্‌ভারেজের মৃত্যুর পূর্বের কথা শঙ্করের মনে পড়ল। সে বলেছিল—চলো যাই, শঙ্কর, গুহার মধ্যে রাজার ভাণ্ডার লুকোনো আছে! তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্ছি।

শঙ্কর তার পরে গুহার মধ্যেই নরকঙ্কালটা সমাধিস্থ করলে। পিপেটা ভেঙে ফেলে তারই দুখানা কাঠে মরচে-পড়া পেরেক ঠুকে ক্রুশ তৈরি করলে ও সমাধির ওপর সেই ক্রুশটা পুঁতলে। এ ছাড়া খ্রীস্টধর্মাচারীকে সমাধিস্থ করবার অন্য কোনো রীতি তার জানা নেই। তারপরে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে, এই মৃত যুবকের আত্মার শান্তির জন্য।

এসব শেষ করতে সারাদিনটা কেটে গেল। রাত্রে বিশ্রাম করে পরদিন আবার সে রওনা হল। কঙ্কালের চিঠিখানা ও হীরাগুলি যত্ন করে সঙ্গে নিল।

তবে তার মনে হয়, ওই অভিশপ্ত হীরার খনির সন্ধানে যে গিয়েছে, সে আর ফেরে নি, আত্তিলিও গাত্তি ও তার সঙ্গীরা মরেছে, জিম্ কার্টার মরেছে, আল্‌ভারেজ্ মরেছে। এর আগেই বা কত লোক মরেছে, তার ঠিক কি? এইবার তার পালা। এই মরুভূমিতেই তার শেষ, এই বীর ইটালিয়ান যুবকের মত।

তেরো

দুপুরের রোদে যখন দিকে দিগন্তে আগুন জ্বলে উঠল, একটা ছোট্ট পাথরের ঢিবির আড়ালে সে আশ্রয় নিলে। ১৩৫° ডিগ্রি উত্তাপ উঠেছে তাপমান যন্ত্রে, রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে এ উত্তাপে পথ হাঁটা চলে না। যদি সে কোন রকমে এই ভয়ানক মরুভূমির হাত এড়াতে পারতো, তবে হয়তো জীবন্ত অবস্থায় মানুষের আবাসে পৌঁছুতেও পারতো। সে ভয় করে শুধু এই মরুভূমি, সে জানে কালাহারি মরু বড় বড় সিংহের বিচরণভূমি, কিন্তু তার হাতে রাইফেল আছে—রাতদুপুরেও একা যত সিংহই হোক, সম্মুখীন হতে সে ভয় করে না—কিন্তু ভয় হয় তৃষ্ণা-রাক্ষসীকে। তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। দুপুরে সে দু-বার মরীচিকা দেখলে। এতদিন মরুপথে আসতেও এ আশ্চর্য নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে নি, বইয়েই পড়েছিল মরীচিকার কথা। একবার উত্তর-পূর্ব কোণে, একবার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, দুই মরীচিকাই কিন্তু প্রায় একরকম—অর্থাৎ একটা বড় গম্বুজওয়ালা মসজিদ বা গির্জা, চারিপাশে খর্জুরকুঞ্জ, সামনে বিস্তৃত জলাশয়। উত্তর-পূর্ব কোণের মরীচিকাটা বেশি স্পষ্ট।

সন্ধ্যার দিকে দূরদিগন্তে মেঘমালার মত পর্বতমালা দেখা গেল। শঙ্কর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না। পূর্বদিকে একটাই মাত্র বড় পর্বত, এখান থেকে দেখা পাওয়া সম্ভব, দক্ষিণ রোডেসিয়ার প্রান্তবর্তী চিমানিমানি পর্বতমালা। তাহলে কি বুঝতে হবে যে, সে বিশাল কালাহারি পদব্রজে পার হয়ে প্রায় শেষ করতে চলেছে। না ও-ও মরীচিকা?

কিন্তু রাত দশটা পর্যন্ত পথ চলেও জ্যোৎস্নারাত্রে সে দূর-পর্বতের সীমারেখা তেমনি স্পষ্ট দেখতে পেল। অসংখ্য ধন্যবাদ হে ভগবান, মরীচিকা নয় তবে। জ্যোৎস্নারাত্রে কেউ কখনো মরীচিকা দেখে নি।

তবে কি প্রাণের আশা আছে? আজ পৃথিবীর বৃহত্তম রত্নখনির মালিক সে। নিজের পরিশ্রমে ও দুঃসাহসের বলে সে তার স্বত্ব অর্জন করেছে। দরিদ্র বাংলা মায়ের বুকে সে যদি

wapsip.com

আজ্ঞ বেঁচে ফেরে!

দুদিনের দিন বিকালে সে এসে পর্বতের নীচে পৌঁছুলো। তখন সে দেখলে পর্বত পার হওয়া ছাড়া ওপারে যাওয়ার কোনো সহজ উপায় নেই। নইলে পঁচিশ মাইল মরুভূমিতে পাড়ি দিয়ে পর্বতের দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে আসতে হবে। মরুভূমির মধ্যে সে আর কিছুতেই যেতে রাজি নয়। সে পাহাড় পার হয়েই যাবে।

এইখানে সে প্রকাণ্ড একটা ভুল করলে। সে ভুলে গেল যে সাড়ে বারো হাজার ফুট একটা পর্বতমালা ডিঙিয়ে ওপারে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্ পার হওয়ার মতই শক্ত। তার চেয়েও শক্ত, কারণ সেখানে আল্‌ভারেজ্ ছিল, এখানে সে একা।

শঙ্কর ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝতে পারলে না, ফলে চিমানিমানি পর্বত উত্তীর্ণ হতে গিয়ে প্রাণ হারাতে বসলো, ভীষণ প্রজ্বলন্ত কালাহারি পার হতে গিয়েও সে এমন ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয় নি।

চিমানিমানি পর্বতের জঙ্গল খুব বেশি ঘন নয়। শঙ্কর প্রথম দিন অনেকটা উঠল—তার পর একটা জায়গায় গিয়ে পড়ল, সেখান থেকে কোনদিকে যাবার উপায় নেই। কোন্ পথটা দিয়ে উঠেছিল সেটাও আর খুঁজে পেলে না—তার মনে হল, সে সমতলভূমির যে জায়গা দিয়ে উঠেছিল, তার ত্রিশ ডিগ্রী দক্ষিণে চলে এসেছে। কেন যে এমন হল, এর কারণ কিছুতেই সে বার করতে পারলে না। কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেল, কখনও উঠছে, কখনও নামছে, সুর্য দেখে ঠিক করে নিচ্ছে, কিন্তু সাত-আট মাইল পাহাড় উত্তীর্ণ হতে এতদিন লাগছে কেন?

তৃতীয় দিনে আর একটা নতুন বিপদ ঘটল। তার আগের দিন একখানা আলগা পাথর গড়িয়ে তার পায়ে চোট লেগেছিল। তখন তত কিছু হয় নি, পরদিন সকালে আর সে শয্যা ছেড়ে উঠতে পারে না। হাঁটু ফুলেছে, বেদনাও খুব। দুর্গম পথে নামা-ওঠা করা এ অবস্থায় অসম্ভব। পাহাড়ের একটা ঝরনা থেকে ওঠবার সময় জল সংগ্রহ করে এনেছিল, তাই একটু একটু করে খেয়ে চালাচ্ছে। পায়ের বেদনা কমে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। বেশিদূর যাওয়া চলবে না। সামান্য একটু-আধটু চলাফেরা করতেই হবে খাদ্য ও জলের চেষ্টায়, ভাগ্যে পাহাড়ের এই স্থানটা যেন খানিকটা সমতলভূমির মত, তাই রক্ষা।

এই সব অবস্থায়, এই মনুষ্যবাসহীন পাহাড়ে বিপদ তো পদে পদেই। একা এ পাহাড় টপকাতে গেলে যে কোনো ইউরোপীয় পর্যটকেরও ঠিক এই রকম বিপদ ঘটতে পারতো।

শঙ্কর আর পারে না। ওর হৃৎপিণ্ডে কি একটা রোগ হয়েছে, একটু হাঁটলেই ধড়াস ধড়াস করে হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরায় ধাক্কা মারে। অমানুষিক পথশ্রমে, দুর্ভাবনায় অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে, কখনও বা অনাহারের কষ্টে, ওর শরীরে কিছু নেই।

চারদিনের দিন সন্ধ্যাবেলা অবসন্ন দেহে সে একটা গাছের তলার আশ্রয় নিলে। খাদ্য নেই কাল থেকে। রাইফেল সঙ্গে আছে, কিন্তু একটা বন্য জন্তুর দেখা নেই। দুপুরে একটা হরিণকে চরতে দেখে ভরসা হয়েছিল, কিন্তু রাইফেলটা তখন ছিল পঞ্চাশ গজ তফাতে একটা গাছে ঠেস দেওয়া, আনতে গিয়ে হরিণটা পালিয়ে গেল। জল খুব সামান্যই আছে, চামড়ার বোতলে। এ অবস্থায় নেমে সে ঝরনা থেকে জল আনবেই বা কি করে? হাঁটুটা আরও ফুলেছে। বেদনা এত বেশি যে, একটু চলাফেরা করলেই মাথার শির পর্যন্ত ছিঁড়ে পড়ে যন্ত্রণায়।

পরিষ্কার আকাশতলে আর্দ্রতাশূন্য বায়ুমণ্ডলের গুণে অনেকদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

wapsip.com

দিকচক্রবালে মেঘলা করে ঘিরেছে নীল পর্বতমালা দূরে দূরে। দক্ষিণ-পশ্চিমে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ কালাহারি। দক্ষিণে ওয়াহকুহকু পর্বত, তারও অনেক পেছনে মেঘের মত দৃশ্যমান পল ক্রুগার পর্বতমালা—সল্‌সবেরির দিকে কিছু দেখা যায় না, চিমানিমানি পর্বতের এক উচ্চতর শৃঙ্গ সেদিকে দৃষ্টি আটকেছে।

আজ দুপুর থেকে ওর মাথার ওপর শকুনির দল উড়েছে। এতদিন এত বিপদেও শঙ্করের যত হয় নি, আজ শকুনির দল মাথার ওপর উড়তে দেখে শঙ্করের সত্যই ভয় হয়েছে। ওরা তাহলে কি বুঝেছে যে শিকার জোটবার বেশি দেরি নেই?

সন্ধ্যার কিছু পরে কি একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখলে, পাশের শিলাখণ্ডের আড়ালে একটা ধূসর রঙের নেকড়ে বাঘ—নেকড়ের লম্বা ছুঁচালো কান দুটো খাড়া হয়ে আছে, সাদা সাদা দাঁতের ওপর দিয়ে রাঙা জিবটা অনেকখানি বার হয়ে লক লক করছে। চোখে চোখ পড়তেই সেটা চট করে পাথরের আড়াল থেকে সরে দূরে পালালো।

নেকড়ে বাঘটাও তাহলে কি বুঝেছে? পশুরা নাকি আগে থেকে অনেক কথা জানতে পারে।

হাড় ভাঙা শীত পড়লো রাত্রে। ও কিছু কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বাললে। অগ্নিকুণ্ডের আলো যতটুকু পড়েছে তার বাইরে ঘন অন্ধকার।

কি একটা জন্তু এসে অগ্নিকুণ্ড থেকে কিছু দূরে অন্ধকারে দেহ মিশিয়ে চুপ করে বসলো। কোয়োট, বন্যকুকুর জাতীয় জন্তু। ক্রমে আর একটা, আর দুটো, আর তিনটে। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দশ-পনেরোটা এসে জমা হল। অন্ধকারে তার চারিধার ঘিরে নিঃশব্দে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে যেন কিসের প্রতীক্ষা করছে।

কি সব অমঙ্গলজনক দৃশ্য।

ভয়ে ওর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। সত্যিই কি এতদিনে তারও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। এতদিন পরে এল তা হলে! সে-ও পারলে না রিখ্‌টারসভেল্ড্ থেকে হীরে নিয়ে পালিয়ে যেতে!

উঃ, আজ কত টাকার মালিক সে। হীরের খনি বাদ যাক, তার সঙ্গে যে ছ'খানা হীরে রয়েছে, তার দাম অন্তত দু-তিন লক্ষ টাকা নিশ্চয় হবে। তার গরিব গ্রামে, গরিব বাপমায়ের বাড়ি যদি এই টাকা নিয়ে গিয়ে উঠতে পারতো··· কত গরিবের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারতো, গ্রামে কত দরিদ্র কুমারীকে বিবাহের যৌতুক দিয়ে ভাল পাত্রে বিবাহ দিত, কত সহায়হীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার শেষ দিন ক'টা নিশ্চিন্ত করে তুলতে পারতো···

কিন্তু সে-সব ভেবে কি হবে, যা হবার নয়? তার চেয়ে এই অপূর্ব রাত্রির নক্ষত্রালোকিত আকাশের শোভা, এই বিশাল পর্বত ও মরুভূমির নিস্তব্ধ গম্ভীর রূপ, মৃত্যুর আগে শঙ্করও চায় চোখ ভরে দেখতে, সেই ইটালিয়ান যুবক গাত্তির মত। ওরা যে অদৃষ্টের এক অদৃশ্য তারে গাঁথা সবাই, আত্তিলিও গাত্তি ও তার সঙ্গীরা, জিম্ কার্টার, আল্‌ভারেজ্, সে···

রাত গভীর হয়েছে। কি ভীষণ শীত!··· একবার সে চেয়ে দেখলে, কোয়োটগুলো এরই মধ্যে কখন আরও নিকটে সরে এসেছে। অন্ধকারের মধ্যে আলো পড়ে তাদের চোখগুলো জ্বলছে। শঙ্কর একখানা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই ওরা সব দূরে সরে গেল—কিন্তু কি নিঃশব্দ ওদের গতিবিধি আর কি অসীম তাদের ধৈর্যও! শঙ্করের মনে হল, ওরা জানে শিকার ওদের হাতের মুঠোয়, হাতছাড়া হবার কোনো উপায় নেই।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যাবেলায় সেই ধূসর নেকড়ে বাঘটাও দু-দুবার এসে কোয়োটদের পেছনে

wapsip.com

অন্ধকারে বসে দেখে গিয়েছে।

একটুও ঘুমুতে ভরসা হল না ওর। কি জানি কোয়োট আর নেকড়ের দল হয়তো তা হলে জীবন্তই তাকে ছিঁড়ে খাবে মৃত মনে করে। অবসন্ন, ক্লান্ত দেহে জেগেই বসে থাকতে হবে তাকে। ঘুমে চোখ ঢুলে আসলেও উপায় নেই। মাঝে মাঝে কোয়োটগুলো এগিয়ে এসে বসে, ও জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই সরে যায়···দু-একটা হায়েনাও এসে ওদের দলে যোগ দিলে···হায়েনাদের চোখগুলো অন্ধকারে কি ভীষণ জ্বলছে!

কি ভয়ানক অবস্থাতে পড়েছে। জনবিরল বর্বর দেশের জনশূন্য পর্বতের সাড়ে তিন হাজার ফুট উপরে সে চলৎশক্তিহীন অবস্থায় বসে···গভীর রাত, ঘোর অন্ধকার···সামান্য আগুন জ্বলছে···মাথার ওপর জলকণাশূন্য স্তব্ধ বায়ুমণ্ডলের গুণে আকাশের অগণ্য তারা জ্বল্ জ্বল্ করছে যেন ইলেকট্রিক আলোর মত···নীচে তার চারিধার ঘিরে অন্ধকারে মাংসলোলুপ নীরব কোয়োট, হায়েনার দল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার এটাও মনে হল, বাংলার পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়ায় ধুঁকে সে মরছে না। এ মৃত্যু বীরের মৃত্যু। পদব্রজে কালাহারি মরুভূমি পার হয়েছে সে—একা। মরে গিয়ে চিমানিমানি পর্বতের শিলায় নাম খুদে রেখে যাবে। সে একজন বিশিষ্ট ভ্রমণকারী ও আবিষ্কারক। অতবড় হীরের খনি সে-ই তো খুঁজে বার করেছে! আল্ভারেজ্ মারা যাওয়ার পরে, সেই বিশাল অরণ্য ও পর্বত অঞ্চলের গোলকধাঁধা থেকে তো সে একাই বার হতে পেরে এতদূর এসেছে! এখন সে নিরুপায়, অসুস্থ, চলৎশক্তি-রহিত। তবুও সে যুঝছে, ভয় তো পায় নি, সাহস তো হারায় নি। কাপুরুষ, ভীরু নয় সে। জীবন মৃত্যু তো অদৃষ্টের খেলা। না বাঁচলে আর তার দোষ কি?

* * * *

দীর্ঘ রাত্রি কেটে গিয়ে পুবদিকে ফরসা হল। সঙ্গে সঙ্গে বন্য জন্তুর দল কোথায় পালালো। বেলা বাড়ছে, আবার নির্মম সূর্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে শুরু করছে দিক্‌বিদিক্। সঙ্গে সঙ্গে শকুনির দল কোথা থেকে এসে হাজির। কেউ মাথার ওপর ঘুরছে, কেউ বা দূরে দূরে গাছের ডালে কি পাথরের ওপরে বসেছে। খুব ধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে। ওরা যেন বলছে—কোথায় যাবে বাছাধন? যে ক'দিন লাফালাফি করবে, করে নাও। আমরা বসি, এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই আমাদের।

শঙ্করের খিদে নেই। খাবার ইচ্ছেও নেই। তবুও সে গুলি করে একটা শকুনি মারলে! রৌদ্র ভীষণ চড়েছে। আগুন-তাতা পাথরের গায়ে পা রাখা যায় না! এ পর্বতও মরুভূমির সামিল, খাদ্য এখানে মেলে না, জলও না। সে মরা শকুনিটা নিয়ে আগুন জ্বেলে ঝলসাতে বসলো। এর আগে মরুভূমির মধ্যেও সে শকুনির মাংস খেয়েছে। এরাই এখন প্রাণধারণের একমাত্র উপায়, আজ ও খাচ্ছে ওদের, কাল ওরা খাবে ওকে। শকুনিগুলো এসে আবার মাথার ওপর জুটেছে।

তার নিজের ছায়া পড়েছে পাথরের গায়ে, সে নির্জন স্থানে শঙ্করের উদ্‌ভ্রান্ত মনে ছায়াটা যেন আর একজন সঙ্গী মনে হল। বোধ হয়, ওর মাথা খারাপ হয়ে আসছে··· কারণ বেঘোর অবস্থায় ও কতবার নিজের ছায়ার সঙ্গে কথা বলতে লাগল··· কতবার পরক্ষণের সচেতন মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝে নিজেকে সামলে নিলে।

সে পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি? জ্বর হয় নি তো? ···তার মাথার মধ্যে ক্রমশ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব। আল্ভারেজ্ ···হীরের খনি···পাহাড়, পাহাড়, বালির সমুদ্র···আত্তিলিও

wapsip.com

গাত্তি...কাল রাত্রে ঘুম হয়নি...আবার রাত আসছে, সে একটু ঘুমিয়ে নেবে।

কিসের শব্দে ওর তন্দ্রা ছুটে গেল। একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ আসছে কোন্ দিক থেকে? কোন পরিচিত শব্দের মত নয়। কিসের শব্দ? কোন্ দিক থেকে শব্দটা আসছে তাও বোঝা যায় না। কিন্তু ক্রমশ কাছে আসছে সেটা।

হঠাৎ আকাশের দিকে শঙ্করের চোখ পড়তেই সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল...তার মাথার ওপর দিয়ে আকাশের পথে বিকট শব্দ করে কি একটা জিনিস যাচ্ছে। ওই কি এরোপ্লেন? সে বইয়ে ছবি দেখেছে বটে।

এরোপ্লেন যখন ঠিক মাথার ওপর এল, শঙ্কর চীৎকার করলে, কাপড় ওড়ালে, গাছের ডাল ভেঙে নাড়লে, কিন্তু কিছুতেই পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে না। দেখতে দেখতে এরোপ্লেনখানা সুদূরে ভায়োলেট রঙের পল্ ক্রুগার পর্বতমালার মাথার ওপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

হয়তো আরও এরোপ্লেন যাবে এ পথ দিয়ে। কি আশ্চর্য দেখতে এরোপ্লেন জিনিসটা। ভারতবর্ষে থাকতে সে একখানাও দেখে নি।

শঙ্কর ভাবলে, আগুন জ্বালিয়ে কাঁচা ডাল পাতা দিয়ে সে যথেষ্ট ধোঁয়া করবে। যদি আবার এ পথে যায়, পাইলটের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে ধোঁয়া দেখে। একটা সুবিধে হয়েছে, এরোপ্লেনের বিকট আওয়াজে শকুনির দল কোন্ দিকে ভেগেছে।

সেদিন কাটল। দিন কেটে রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের দুর্ভোগ হল শুরু। আবার গত রাত্রির পুনরাবৃত্তি। সেই কোয়োটের দল আবার এল। আগুনের চারিধারে তারা আবার তাকে ঘিরে বসলো। নেকড়ে বাঘটা সন্ধ্যা না হতেই দূর থেকে একবার দেখে গেল। গভীর রাত্রে আর একবার এল।

কিসে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? আওয়াজ করতে ভরসা হয় না—টোটা মাত্র দুটি বাকি। টোটা ফুরিয়ে গেলে তাকে অনাহারে মরতে হবে। মরতে তো হবেই, তবে দুদিন আগে আর পিছে; যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

কিন্তু আওয়াজ তাকে করতেই হল। গভীর রাত্রে হায়েনাগুলো এসে কোয়োটদের সাহস বাড়িয়ে দিলে। তারা আরও এগিয়ে সরে এসে তাকে চারধার থেকে ঘিরলে। পোড়াকাঠ ছুঁড়ে মারলে আর ভয় পায় না।

একবার একটু তন্দ্রামত এসেছিল—বসে বসেই ঢুলে পড়েছিল। পর মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠে দেখলে, নেকড়ে বাঘটা অন্ধকার থেকে পা টিপে টিপে তার অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে। ওর ভয় হল; হয়তো ওটা ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভয়ের চোটে একবার গুলি ছুঁড়লে, আর একবার শেষ রাত্রের দিকে ঠিক এ রকমই হল। কোয়োটগুলোর ধৈর্য অসীম, সেগুলো চুপ করে বসে থাকে মাত্র, কিছু বলে না। কিন্তু নেকড়ে বাঘটা ফাঁক খুঁজছে।

রাত ফরসা হবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্নের মত অন্তর্হিত হয়ে গেল কোয়োট, হায়েনা ও নেকড়ের দল। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও আগুনের ধারে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা কিসের শব্দে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল।

খানিকটা আগে খুব বড় একটা আওয়াজ হয়েছে কোনো কিছুর। শঙ্করের কানে তার রেশ এখনও লেগে আছে।

কেউ কি বন্দুকের আওয়াজ করেছে? কিন্তু তা অসম্ভব। এই দুর্গম পর্বতের পথে কোন্ মানুষ আসবে?

wapsip.com

একটিমাত্র টোটা অবশিষ্ট আছে। শঙ্কর ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে সেটা খরচ করে একটা আওয়াজ করলে। যা থাকে কপালে, মরেছেই তো। উত্তরে দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল।

আনন্দে ও উত্তেজনায় শঙ্কর ভুলে গেল যে তার পা খোঁড়া, ভুলে গেল যে সে একটানা বেশিদূরে যেতে পারে না। তার আর টোটা নেই—সে আর বন্দুকের আওয়াজ করতে পারলে না—কিন্তু প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল, গাছের ডাল ভেঙে নাড়তে লাগল, আগুন জ্বালাবার কাঠকুটোর সন্ধানে চারিদিকে আকুল-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগল।

* * * *

ক্রুগার ন্যাশন্যাল পার্ক জরীপ করবার দল, কিম্বার্লি থেকে কেপ টাউন যাবার পথে, চিমানিমানি পর্বতের নীচে কালাহারি মরুভূমির উত্তর-পূর্ব কোণে তাঁবু ফেলেছিল। সঙ্গে সাতখানা ডবল টায়ার ক্যাটারপিলার চাকা বসানো মোটর গাড়ি। এদের দলে নিগ্রো কুলী ও চাকর-বাকর বাদে ন'জন ইউরোপীয়। জন চারেক হরিণ শিকার করতে উঠেছিল চিমানিমানি পর্বতের প্রথম ও নিম্নতম থাক্‌টাতে।

হঠাৎ এ জনহীন অরণ্যপ্রদেশে সভ্য রাইফেলের আওয়াজে ওরা বিস্মিত হয়ে উঠল। কিন্তু ওদের পুনরায় আওয়াজের প্রত্যুত্তর না পেয়ে ইতস্তত খুঁজতে বেরিয়ে দেখতে পেলে, সামনের একটা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর চূড়া থেকে, এক জীর্ণ ও কঙ্কালসার কোটরগতচক্ষু প্রেতমূর্তি উন্মাদের মত হাত পা নেড়ে তাদের কি বোঝাবার চেষ্টা করছে। তার পরনে ছিন্নভিন্ন অতি মলিন ইউরোপীয় পরিচ্ছদ।

ওরা ছুটে গেল। শঙ্কর আবোল-তাবোল কি বকলে, ওরা ভাল বুঝতে পারলে না। যত্ন করে ওকে নামিয়ে পাহাড়ের নীচে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল। ওর জিনিসপত্রও নামিয়ে আনা হয়েছিল। তখন ওকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু এই ধাক্কায় শঙ্করকে বেশ ভুগতে হল। ক্রমাগত অনাহারে, কষ্টে, উদ্বেগে, অখাদ্য কুখাদ্য ভক্ষণের ফলে, তার শরীর খুব জখম হয়েছিল—সেই রাত্রেই তার বেজায় জ্বর এল।

* * * *

জ্বরে সে অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়ল—কখন যে মোটর গাড়ি ওখান থেকে ছাড়লো, কখন যে তারা সল্‌সবেরিতে পৌঁছলো শঙ্করের কিছুই খেয়াল নেই। সেই অবস্থায় পনেরো দিন সে সল্‌সবেরির হাসপাতালে কাটিয়ে দিলে। তারপর ক্রমশ সুস্থ হয়ে মাসখানেক পরে একদিন সকালে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরের রাজপথে এসে দাঁড়ালো।

চোদ্দ

সল্‌সবেরি! কত দিনের স্বপ্ন!...

আজ সে সত্যিই একটা বড় ইউরোপীয় ধরনের শহরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। বড় বড় বাড়ি, ব্যাঙ্ক, হোটেল, দোকান, পিচঢালা চওড়া রাস্তা, একপাশ দিয়েই ইলেকট্রিক ট্রাম চলেছে, জুলু রিকশাওয়ালা রিকশা টানছে, কাগজওয়ালা কাগজ বিক্রী করছে। সবই যেন নতুন, যেন এসব দৃশ্য জীবনে কখনো দেখে নি।

লোকালয়ে তো এসেছে, কিন্তু সে একেবারে কপর্দকশূন্য। এক পেয়ালা চা খাবার পয়সাও তার নেই। কাছে একটা ভারতীয় দোকান দেখে তার বড় আনন্দ হল। কতদিন যে

wapsip.com

দেখে নি স্বদেশবাসীর মুখ! দোকানদার মেমন্ মুসলমান, সাবান ও গন্ধদ্রব্যের পাইকারী বিক্রেতা! খুব বড় দোকান। শঙ্করকে দেখেই সে বুঝলে এ দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত। নিজে দু টাকা সাহায্য করলে ও একজন বড় ভারতীয় সওদাগরের সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলে।

টাকা দুটি পকেটে নিয়ে শঙ্কর আবার পথে এসে দাঁড়ালো। আসবার সময় বলে এল—অসীম ধন্যবাদ টাকা দুটির জন্যে, এ আমি আপনার কাছে ধার নিলাম, আমার হাতে পয়সা এলে আপনাকে কিন্তু এ টাকা নিতে হবে। সামনেই একটা ভারতীয় রেস্টুরেন্ট। সে ভাল কিছু খাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। কতদিন সভ্য খাদ্য মুখে দেয় নি। সেখানে ঢুকে এক টাকার পুরী, কচুরী হালুয়া, মাংসের চপ, পেট ভরে খেলে। সেই সঙ্গে দু-তিন পেয়ালা কফি।

চায়ের টেবিলে একখানা পুরোনো খবরের কাগজের দিকে তার নজর পড়ল। তাতে একটা জায়গার বড় বড় অক্ষরের হেড লাইনে লেখা আছে—

National Park Survey Party's Singular Experience
A lonely Indian found in the desert
Dying of thirst and Exhaustion
His Strange story

শঙ্কর দেখলে, তার একটা ফটোও কাগজে ছাপা হয়েছে। তার মুখে একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক গল্পও দেওয়া হয়েছে। এরকম গল্প সে কারও কাছে করে নি।

খবরের কাগজখানার নাম 'সল্সবেরি ডেলি ক্রনিকল্'। সে খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলে। তার চারিপাশে ভিড় জমে গেল। ওকে খুঁজে বার করবার জন্যে রিপোর্টারের দল অনেক চেষ্টা করেছিল জানা গেল। সেখানে চিমানিমানি পর্বতে পা-ভেঙে পড়ে থাকার গল্প বলে ও ফটো তুলতে দিয়ে শঙ্কর পঞ্চাশ টাকা পেলে। ও থেকে সে আগে সেই সহৃদয় মুসলমান দোকানদারের টাকা দুটি দিয়ে এল।

ওদের দৃষ্ট আগ্নেয়গিরিটার সম্বন্ধে সে কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখলে। তাতে আগ্নেয়গিরিটার ও নামকরণ করলে মাউন্ট আল্ভারেজ্। তবে মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যে লুকানো একটা এত বড় আস্ত জীবন্ত আগ্নেয়গিরির এই গল্প কেউ বিশ্বাস করলে, কেউ করলে না। অবিশ্যি রত্নের গুহার বাষ্পও যে কাউকে জানতে দেয় নি। দলে দলে লোক ছুটবে ওর সন্ধানে।

তার পরে একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে সে এক রাশ ইংরেজি বই ও মাসিক পত্রিকা কিনলে। বই পড়েনি কতকাল! সন্ধ্যায় একটা সিনেমায় ছবি দেখলে। কতকাল পরে রাত্রে হোটেলের ভাল বিছানায় ইলেকট্রিক আলোর তলায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে সে মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে নীচের প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর স্ট্রীটের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। ট্রাম যাচ্ছে নীচে দিয়ে, জুলু রিকশাওয়ালা রিকশা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ভারতীয় কফিখানায় ঠুনঠুন করে ঘণ্টা বাজছে, মাঝে মাঝে দু-চারখানা মোটরও যাচ্ছে।...এর সঙ্গে মনে হল আর একটা ছবি—সামনে আগুনের কুণ্ড, কিছুদূরে বৃত্তাকারে ঘিরে বসে আছে কোয়োট ও হায়েনার দল। ওদের পিছনে নেকড়েটার দুটো গোল গোল চোখ আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে অন্ধকারের মধ্যে।

কোন্‌টা স্বপ্ন?...চিমানিমানি পর্বতে যাপিত সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি, না আজকের এই রাত্রি?

ইতিমধ্যে সল্সবেরিতে সে একজন বিখ্যাত লোক হয়ে গেল। রিপোর্টারের ভিড়ে তার

wapsip.com

হোটেলের হল্ সব সময় ভর্তি। খবরের কাগজের লোক আসে তার ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাপাবার কন্ট্রাক্ট করতে, কেউ আসে ফটো নিতে।

আত্তিলিও গাত্তির কথা সে ইটালিয়ান কনসাল্ জেনারেলকে জানালে। তাঁর আপিসের পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটে জানা গেল, আত্তিলিও গাত্তি নামে একজন সম্ভ্রান্ত ইটালিয়ান যুবক ১৮৭৯ সালের আগস্ট মাসের পর্তুগিজ পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে জাহাজডুবি হবার পরে নামে। তার পর যুবকটির আর কোনো পাত্তা পাওয়া যায় নি। তার আত্মীয়-স্বজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক। ১৮৯০-৯৫ সাল পর্যন্ত তারা তাদের নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয়ের সন্ধানের জন্যে পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকার কনসুলেট আপিসকে জ্বালিয়ে খেয়েছিল, পুরস্কার ঘোষণা করাও হয়েছিল তার সন্ধানের জন্যে। ১৮৯৫ সাল থেকে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

পূর্বোক্ত মুসলমান দোকানদারটির সাহায্যে সে ব্ল্যাকমুন স্ট্রিটের বড় জহুরী রাইডাল ও মর্সবির দোকানে চারখানা পাথর সাড়ে বত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রী করলে। বাকি দুখানার দর আরও বেশি উঠেছিল, কিন্তু শঙ্কর সে দুখানা পাথর তার মাকে দেখাবার জন্যে দেশে নিয়ে যেতে চায়। এখন বিক্রি করতে তার ইচ্ছে নেই।

* * * *

নীল সমুদ্রে!···

বম্বেগামী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে পর্তুগিজ পূর্ব-আফ্রিকার বেইরা বন্দরের নারিকেল-বনশ্যাম তীরভূমিতে মিলিয়ে যেতে দেখতে দেখতে, শঙ্কর ভাবছিল তার জীবনের এই অ্যাডভেঞ্চারের কথা। এই তো জীবন, এইভাবেই তো জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছিল সে। মানুষের আয়ু মানুষের জীবনের ভুল মাপকাঠি। দশ বৎসরের জীবন উপভোগ করেছে সে এই দেড় বছরে। আজ সে শুধু একজন ভবঘুরে পথিক নয়, একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সহ-আবিষ্কারক। মাউন্ট আল্‌ভারেজ্‌কে সে জগতে প্রসিদ্ধ করবে। দূরে ভারত মহাসমুদ্রের পারে জননী জন্মভূমি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের জন্য এখন মন তার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার মনটি উৎসুক হয়ে আছে, কবে দূর থেকে দৃশ্যমান বোম্বাইয়ের রাজাবাই টাওয়ারের উঁচু চুড়োটা মাতৃভূমির উপকূলের সান্নিধ্য ঘোষণা করবে···তারপর বাউলকীর্তনগান-মুখরিত বাংলাদেশের প্রান্তে তাদের শ্যামল ছোট্ট পল্লী···সামনে আসছে বসন্ত কাল ···পল্লীপথে যখন একদিন সজনে ফুলের দল পথ বিছিয়ে পড়ে থাকবে, বৌ কথা-ক ডাকবে ওদের বড় বকুল গাছটায়···নদীর ঘাটে গিয়ে লাগবে ওর ডিঙি।

বিদায়! আল্‌ভারেজ্ বন্ধু!···স্বদেশে ফিরে যাওয়ার এই আনন্দের মুহূর্তে তোমার কথাই আজ মনে হচ্ছে। তুমি সেই দলের মানুষ, সারা আকাশ যাদের ঘরের ছাদ, সারা পৃথিবী যাদের পায়ে চলার পথ—আশীর্বাদ কোরো তোমার মহারণ্যের নির্জন সমাধি থেকে, যেন তোমার মত হতে পারি জীবনে, অমনি সুখ-দুঃখে নিস্পৃহ, অমনি নির্ভীক।

বিদায় বন্ধু আত্তিলিও গাত্তি। অনেক জন্মের বন্ধু ছিলে তুমি।

তোমরা সবাই মিলে শিখিয়েছ চীন দেশে প্রচলিত সেই প্রাচীন ছড়াটির সত্যতা—

ছাদের আল্‌সের দিব্যি চৌরস একখানা টালি হয়ে অনড় অবস্থায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার চেয়ে স্ফটিক প্রস্তর হয়ে ভেঙে যাওয়াও ভাল, ভেঙে যাওয়াও ভাল, ভেঙে যাওয়াও ভাল।

আবার তাকে আফ্রিকায় ফিরতে হবে। এখন জন্মভূমির টান বড় টান। জন্মভূমির কোলে এখন সে কিছুদিন কাটাবে। তারপর দেশেই সে কোম্পানি গঠন করবার চেষ্টা করবে—

wapsip.com

আবার সুদূর রিখ্‌টারস্‌ভেল্ড্‌ পর্বতে ফিরবে রত্নখনির পুনর্বার অনুসন্ধানে—খুঁজে সে বার করবেই।

তততদিন—বিদায়!

পরিশিষ্ট

সল্‌সবেরি থাকতে সে সাউথ রোডেসিয়ান মিউজিয়ামের কিউরেটর প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ ডাঃ ফিট্‌জেরাল্ডের সঙ্গে দেখা করেছিল, বিশেষ করে বুনিপের কথাটা তাঁকে বলবার জন্যে। দেশে আসবার কিছুদিন পরে ডঃ ফিটজেরাল্ড-এর কাছ থেকে শঙ্কর নিম্নলিখিত পত্রখানা পায়।

The South Rhodesian Museum
Salisbury, Rhodesia
South Africa
January 12, 1991

Dear Mr. Choudhuri,

I am writing this letter to fulfil my promise to you to let you know what I thought about your report of a strange three-toed monster in the wilds of the Richtersveldt Mountains. On looking up my files I find other similar accounts by explorers who had been to the region before you, specially by Sir Robert McCulloch, the famous naturalist, whose report has not yet been published, owing to his sudden and untimely death last year. On thinking the matter over, I am inclined to believe that the monster you saw was nothing more then a species of anthropoid ape, closely related to the gorilla, but much bigger in size and more savage that the specimens found in the Ruwenzori and Virunga Mountains. This species is becoming rarer And rarer every day, and such numbers as do exist are not easily to be got at on account of their shyness and the habit of hiding themselves in the depths of the high-altitude rain forests of the Richtersveldt. It is only the very fortunate traveller who gets glimpses of them, and I should think that in meeting them he runs risks proportionate to his good luck.

Congratulating you on both your luck And pluck,

I remain
Yours Sincerely
J.G.Fitzgerald

wapsip.com

wapsip.com

wapsip.com

wapsip.com

চাঁদপাল ঘাট থেকে রেঙ্গুনগামী মেল স্টীমার ছাড়চে। বহু লোকজনের ভিড়। পুজোর ছুটির ঠিক পরেই। বর্মা প্রবাসী দু'চারজন বাঙালী পরিবার রেঙ্গুনে ফিরচে। কুলীরা মালপত্র তুলচে। দড়াদড়ি ছোঁড়াছুঁড়ি, হৈ হৈ। ডেকযাত্রীদের গোলমালের মধ্যে জাহাজ ছেড়ে গেল। যারা আত্মীয়-স্বজনকে তুলে দিতে এসেছিল, তারা তীরে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়তে লাগলো।

সুরেশ্বরকে কেউ তুলে দিতে আসেনি। কারণ কলকাতায় তার জানাশোনা বিশেষ কেউ নেই! সবে চাকরিটা পেয়েচে, একটা বড় ঔষধ-ব্যবসায়ী ফার্মের ক্যানভাসার হয়ে সে যাচ্ছে রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর।

সুরেশ্বরের বাড়ি হুগলি জেলার একটা গ্রামে। বেজায় ম্যালেরিয়ায় দেশটা উচ্ছন্ন গিয়েচে, গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত বনজঙ্গল, পোড়ো বাড়ির ইট স্তূপাকার হয়ে পথে যাতায়াত বন্ধ করেচে, সন্ধ্যার পর সুরেশ্বরদের পাড়ায় আলো জ্বলে না।

ওদের পাড়ায় চারিদিকে বনজঙ্গল ও ভাঙা পোড়ো বাড়ির মধ্যে একমাত্র অধিবাসী সুরেশ্বররা। কোনো উপায় নেই বলেই এখানে পড়ে থাকা—নইলে কোন্ কালে উঠে গিয়ে শহর-বাজারের দিকে বাস করতো ওরা।

সুরেশ্বর বি. এস-সি. পাস করে এতদিন বাড়িতে বসে ছিল। চাকরি মেলা দুর্ঘট আর কে-ই বা করে দেবে—এই সব জন্যেই সে চেষ্টা পর্যন্ত করেনি। তার বাবা সম্প্রতি পেনসন নিয়ে বাড়ি এসে বসেছেন, খুব সামান্যই পেনসন—সে আয়ে সংসার চালানো কায়ক্লেশে হয়; কিন্তু তাও পাড়াগাঁয়ে। শহরে সে আয়ে চলে না। বছর খানেক বাড়ি বসে থাকবার পরে সুরেশ্বর গ্রামে আর থাকতে পারলে না। গ্রামে নেই লোকজন। তার সমবয়সী এমন কোনো ভদ্রলোকের ছেলে নেই যার সঙ্গে দু'দণ্ড কথাবার্তা বলা যায়। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়াই গ্রামের নিয়ম। তারপর কোনোদিকে সাড়া শব্দ নেই।

ক্রমশ এ জীবন সুরেশ্বরের অসহ্য হয়ে উঠল। সে ঠিক করলে কলকাতায় এসে টুইশানি করেও যদি চালায়, তবুও তো শহরে থাকতে পারবে এখন।

আজ মাস পাঁচ-ছয় আগে সুরেশ্বর কলকাতায় আসে এবং দেশের একজন পরিচিত লোকের মেসে ওঠে। এতদিন এক আধটা টুইশানি করেই চালাচ্ছিল, সম্প্রতি এই চাকরিটা পেয়েচে, তারই এক ছাত্রের পিতার সাহায্যে ও সুপারিসে। সঙ্গে তিন বাক্স ঔষধ-পত্রের নমুনা আছে বলে তাদের ফার্মের মোটর গাড়ি ওকে চাঁদপাল ঘাটে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল।

এই প্রথম চাকরি এবং এই প্রথম দূর বিদেশে যাওয়া—সুরেশ্বরের মনে খানিকটা আনন্দ ও খানিকটা বিষাদ মেশানো এক অদ্ভুত ভাব। একদল মানুষ আছে, যারা অজানা দূর বিদেশে নতুন নতুন বিপদের সামনে পড়বার সুযোগ পেলে নেচে ওঠে—সুরেশ্বর ঠিক সে দলের নয়। সে নিতান্তই ঘরকুনো ও নিরীহ ধরনের মানুষ—তার মতো লোক নিরাপদে চাকরি করে আর দশজন বাঙালী ভদ্রলোকের মতো নির্বিঘ্নে সংসার-ধর্ম পালন করতে পারলে সুখী হয়।

তাকে যে বিদেশে যেতে হচ্ছে—তাও যে সে বিদেশ নয়, সমুদ্র পারের দেশে পাড়ি দিতে হচ্ছে—সে নিতান্তই দায়ে পড়ে। নইলে চাকরি থাকে না! সে চায় নি এবং ভেবেও রেখেছে এইবার নিরাপদে ফিরে আসতে পারলে অন্য চাকরির চেষ্টা করবে।

কিন্তু জাহাজ ছাড়বার পরে সুরেশ্বরের মন্দ লাগছিল না। ধীরে ধীরে বোটানিক্যাল গার্ডেন, দুই তীর-ব্যাপী কল-কারখানা পেছনে ফেলে রেখে প্রকাণ্ড জাহাজখানা সমুদ্রের দিকে

wapsip.com

এগিয়ে চলেছে। ভোর ছ'টায় জাহাজ ছেড়েছিল, এখন বেশ রৌদ্র উঠেছে, ডেকের একদিকে অনেকখানি জায়গায় যাত্রীরা ডেক-চেয়ার পেতে গল্পগুজব জুড়ে দিয়েছে, স্টীমারের একজন কর্ম্মচারী সবাইকে বলে গেল পাইলট নেমে যাওয়ার আগে যদি ডাঙায় কোনো চিঠি পাঠানো দরকার হয় তা যেন লিখে রাখা হয়।

বয় এস বললে—আপনাকে চায়ের বদলে আর কিছু দেবো?

সুরেশ্বর সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী, সে চা খায় না, এখবর আগেই জানিয়েছিল এবং কিছু আগে সকলকে চা দেওয়ার সময়ে চায়ের পেয়ালা সে ফেরত দিয়েছে।

সুরেশ্বর বললে—না, কিছু দরকার নেই।

বয় চলে গেল।

এমন সময় কে একজন বেশ মার্জ্জিত ভদ্র সুরেও পেছনের দিক থেকে জিজ্ঞেস করলে—মাপ করবেন, মশায় কি বাঙালী।

সুরেশ্বর পেছনে ফিরে বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলে এইমাত্র একজন নব আগন্তুক যাত্রী তার ডেকচেয়ার পাতবার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়েছে ও তাকে প্রশ্ন করছে। আর বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি নয়, একহারা, দীর্ঘ সুঠাম চেহারা। সুন্দর মুখশ্রী, চোখ দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল—সবসুদ্ধ মিলিয়ে বেশ সুপুরুষ।

সুরেশ্বর উত্তর দেওয়ার আগেই সে লোকটি হাসিমুখে বললে—কিছু মনে করবেন না, একসঙ্গেই কদিন থাকতে হবে আপনার সঙ্গে, একটু আলাপ করে নিতে চাই। প্রথমটা বুঝতে পারি নি আপনি বাঙালী কি না।

সুরেশ্বর হেসে বললে—এর আর মনে করবার কি? ভালই তো হোল আমার পক্ষেও। সেকেন্ড ক্লাসে আর কি বাঙালী নেই?

—না, আর যাঁরা যাচ্ছেন—সবাই ডেকে। একজন কেবল ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী। আপনি কতদূর যাবেন—রেঙ্গুনে?

—আপাতত তাই বটে—সেখানে থেকে যাবো সিঙ্গাপুর।

—বেশ, বেশ, খুব ভাল হোল। আমিও তাই। সরে এসে বসুন এদিকে, আপনার সঙ্গে একটু ভাল করে আলাপ জমিয়ে নিই। বাঁচলুম আপনাকে পেয়ে।

সুরেশ্বর শীঘ্রই তার সঙ্গীটির বিষয়ে তার নিজের মুখেই অনেক কথা শুনলে। ওর নাম বিমলচন্দ্র বসু, সম্প্রতি মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে ডাক্তারি করবার চেষ্টায় সিঙ্গাপুর যাচ্ছে। বিমলের বাড়ি কলকাতায়, ওদের অবস্থা বেশ ভালই। ওদের পাড়ার এক ভদ্রলোকের বন্ধু সিঙ্গাপুরে ব্যবসা করেন, তাঁর নামে বিমল চিঠি নিয়ে যাচ্ছে।

কথাবার্তা শুনে সুরেশ্বরের মনে হোল বিমল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী। নতুন দেশে নতুন জীবনের মধ্যে যাবার আনন্দেই সে মশগুল। সে বেশ সবল যুবকও বটে। অবশ্যি সুরেশ্বর নিজেও গায়ে ভালই শক্তি ধরে, এক সময়ে রীতিমত ব্যায়াম ও কুস্তি করতো, তারপর গ্রামে অনেকদিন থাকার সময়ে সে মাটি-কোপানো, কাঠ-কাটা প্রভৃতি সংসারের কাজ নিজের হাতে করতো বলে হাত পা যথেষ্ট শক্ত ও কর্ম্মক্ষম।

ক্রমে বেলা বেশ পড়ে এল। সুরেশ্বর ও বিমল ডেকে বসে নানারকম গল্প করছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে হঠাৎ বিমল বললে—আমি একবার কেবিন থেকে আসি, আপনি বসুন। ডায়মন্ডহারবার ছাড়িয়েছে, এখুনি পাইলট নেমে যাবে। আমার চিঠিপত্র দিতে হবে ওর সঙ্গে। আপনি যদি চিঠিপত্র দেন তবে এই বেলা লিখে রাখুন।

wapsip.com

সাগর-পয়েন্টের বাতিঘর দূর থেকে দেখা যাওয়ার কিছু আগেই কলকাতা বন্দরের পাইলট জাহাজ থেকে নেমে একখানা স্টীমলঞ্চে কলকাতার দিকে চলে গেল।

সাগর-পয়েন্ট ছাড়িয়ে কিছু পরেই সমুদ্র—কোনো দিকে ডাঙা দেখা যায় না—ঈষৎ ঘোলা ও পাটকিলে রঙের জলরাশি চারিধারে। সন্ধ্যা হয়েছে, সাগর পয়েন্টের বাতিঘরে আলো ঘুরে ঘুরে জ্বলছে, কতকগুলো সাদা গাঙচিল জাহাজের বেতারের মাস্তুলের ওপর উড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত করছে বলে বিমল কেবিন থেকে ওভার-কোটটা আনতে গেল, সুরেশ্বর ডেকে বসে রইল।

জ্যোৎস্না রাত। ডেকের রেলিং-এর ধারে চাঁদের আলো এসে পড়েছে, সুরেশ্বরের মন এই সন্ধ্যায় খুবই খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ বাড়ির কথা ভেবে, বৃদ্ধ বাপমায়ের কথা ভেবে, আসবার সময়ে বোন প্রভার অশ্রুসজল করুণ মুখখানির কথা ভেবে।

পূর্বেই বলেছি সুরেশ্বর নিরীহ প্রকৃতির ঘরোয়া ধরনের লোক। বিদেশে যাচ্ছে তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, চাকরির খাতিরে। বিমল যদিও সুরেশ্বরের মত ঘরকুনো নয়, তবুও তার সিঙ্গাপুরে যাবার মধ্যে কোন দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ছিল না। সে চিঠি নিয়ে যাচ্ছে পরিচিত বন্ধুর নিকট থেকে সেখানকার লোকের নামে, তারা ওকে সন্ধান বলে দেবে, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে; তারপর বিমল সেখানে একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়ে গেটের গায়ে নাম-খোদাই পেতলের পাত বসিয়ে শান্ত ও সুবোধ বালকের মত ডাক্তারি আরম্ভ করে দেবে—এই ছিল তার মতলব। যেমন পাঁচজনে দেশে বসে করছে, সে না হয় গিয়ে করবে সিঙ্গাপুরে।

কিন্তু দুজনেই জানতো না একটা কথা।

তারা জানতো না যে নিরুপদ্রব, শান্তভাবে ডাক্তারি ও ওষুধের ক্যানভাসারি করতে তারা যাচ্ছে না—তাদের অদৃষ্ট তাদের দুজনকে একসঙ্গে গেঁথে নিয়ে চলেছে এক বিপদসঙ্কুল পথযাত্রার এবং তাদের দুজনের জীবনের এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার দিকে।

জাহাজ সমুদ্রে পড়েছে। বিস্তীর্ণ জলরাশি ও অনন্ত নীল আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

একদিন দুপুরে বিমল সুরেশ্বরকে উত্তেজিত সুরে ডাক দিয়ে বললে—চট্ করে চলে আসুন, দেখুন, কি একটা জন্তু!

জন্তুটা আর কিছু নয়, উড্ডীয়মান মৎস্য। জাহাজের শব্দে জল থেকে উঠে খানিকটা উড়ে আবার জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম সুরেশ্বর উড্ডীন মৎস্য দেখলে; ছেলেবেলায় চারুপাঠে ছবি দেখেছিল বটে।

মাঝে মাঝে অন্য অন্য জাহাজের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। প্রায়ই কলিকাতাগামী জাহাজ।

ওরা জাহাজের নাম পড়ছে—ওরা কেন, সবাই। এ অকূল জলরাশির দেশে অন্য একখানা জাহাজ ও অন্য লোকজন দেখতে পাওয়া যেন কত অভিনব দৃশ্য? শত শত যাত্রী ঝুঁকে পড়েছে সাগ্রহে রেলিংয়ের ওপর, নাম পড়ছে, কত কী মন্তব্য করছে। ওরাও নাম পড়লে—একখানার নাম ড্যালহাউসি, একখানার নাম ইরাবতী, একখানার নামের কোন মানে হয় না—কিলাওয়াজা—অন্তত ওরা তো কোনো মানে খুঁজে পেলে না। একখানা জাপানী এন. ওয়াই. কে লাইনের জাহাজ হিদ্‌জুমারু, উদীয়মান সূর্য আঁকা পতাকা ওড়ানো।

দুদিনের দিন রাত্রে বেসিন লাইট হাউসের আলো ঘুরে ঘুরে জ্বলতে দেখা গেল।

সুরেশ্বর সমুদ্র-পীড়ায় কাতর হয়ে পড়েছে, কিন্তু বিমল ঠিক খাড়া আছে, যদিও তার

wapsip.com

খাওয়ার ইচ্ছা প্রায় লোপ পেয়েছে। সুরেশ্বর তো কিছুই খেতে পারে না, যা খায় পেটে তলায় না, দিনরাত কেবিনে শুয়ে আছে, মাথা তুলবার ক্ষমতা নেই।

জাহাজের স্টুয়ার্ড এসে দেখে গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে চলে যায়।

কি বিশ্রী জিনিস এই পরের চাকরি! এত হাঙ্গামা পোয়ানো কি ওর পোষায়? দিব্যি ছিল, বাড়িতে খাচ্ছিল দাচ্ছিল। চাকরির খাতিরে বিদেশে বেরিয়ে কি ঝকমারি দেখো তো!

বিমল আপন মনে ডেকে বসে বই পড়ে, স্ফূর্তিতে শিস্ দেয়, গান করে। সুরেশ্বরকে ঠাট্টা করে বলে—হোয়াট্ এ গুড্ সেলার ইউ আর!

তিন দিন দুই রাত্রি ক্রমাগত জাহাজে চলবার পরে তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় এলিফ্যান্ট-পয়েন্টের লাইট হাউস দেখা গেল।

বেলাভূমি যদিও দেখা যায় না, তবুও সমুদ্রের জলের ঘোর নীল রং ক্রমশ সবুজ হয়ে ওঠাতে বোঝা গেল যে ডাঙা বেশি দূরে নেই। ডাঙার গাছপালা মাঝে মাঝে জলে ভাসতে দেখা যাচ্ছে।

সন্ধ্যার অল্প পরেই জাহাজ ইরাবতীর মোহনায় প্রবেশ করলে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সাইরেন্ বেজে উঠল, রয়েল মেলের নিশান উঠিয়ে দেওয়া হোল মাস্তুলে। সন্ধ্যাকাশ তখনও যেন লাল। সন্ধ্যাতারার সঙ্গে চাঁদ উঠেছে পশ্চিমাকাশে—ইরাবতীবক্ষে চাঁদের ছায়া পড়েছে।

জাহাজ কিছুদূর গিয়ে নোঙর ফেললে। রাত্রে ইরাবতী নদীতে বড় জাহাজ চালানোর নিয়ম নেই। রেঙ্গুনের পাইলট রাত্রে জাহাজে থাকবে সকালে ইরাবতী বক্ষে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে।

ভোরবেলায় কেবিন থেকে ঘুম চোখে বেরিয়ে এসে সুরেশ্বর দেখলে জাহাজ চলছে ইরাবতীর দুই তীরের সমতলভূমি ও ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। যতদূর চোখ যায় নিম্ন বঙ্গের মত শস্যশ্যামলা ঘন সবুজ ভূমি, কাঠের ঘর বাড়ি। তারপরেই রেঙ্গুনে পৌঁছে গেল জাহাজ।

সুরেশ্বর বা বিমল কেউই রেঙ্গুনে নামবে না। সুরেশ্বরের রেঙ্গুনে কাজ আছে বটে কিন্তু সে ফিরবার মুখে। ওরা দুজনেই এ জাহাজ থেকে সিঙ্গাপুরগামী জাহাজে ওদের জিনিসপত্র রেখে শহর বেড়াতে বেরুল।

বেশি কিছু দেখবার সময় নেই। দুপুরের পরেই সিঙ্গাপুরের জাহাজ ছাড়বে, জাহাজের 'পার্সার' বলে দিলে বেলা সাড়ে বারোটার আগেই ফিরে আসতে।

নতুন দেশ, নতুন মানুষের ভিড়। ওরা যা কিছু দেখছে, বেশ লাগছে ওদের চোখে। লেক্, পার্ক ও সোয়েডাগোং প্যাগোডা দেখে ওরা জাহাজে ফিরবার কিছু পরেই জাহাজ ছেড়ে দিলে।

আবার অকূল সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি।

একদিন সুরেশ্বর বিমলকে বললে—দেখ বিমল, কাল রাত্রে বড় একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি—এ কয়দিনের মেলামেশায় তাদের পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা 'তুমি'তে পৌঁচেছে।

—কি স্বপ্ন?

—তুমি আর আমি ছোট একটা অদ্ভুত গড়নের বজরা নৌকা করে সমুদ্রে কোথায় যাচ্ছি। সে ধরনের বজরা আমি ছবিতে দেখেছি, ঠিক বোঝাতে পারছি নে এখন। তারপর ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, খালি ধোঁয়া—বিশ্রী কালো ধোঁয়া—

—আমরা বাঁচলাম তো! না খসলাম?

কথা শেষ করে বিমল হো হো করে হেসে উঠলো। সুরেশ্বর চুপ করে রইল।

wapsip.com

বিমল বললে—আমি একটা প্রস্তাব করি শোনো। চলো দুজনে সিঙ্গাপুর গিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে ডাক্তারখানা খুলি। তুমি তোমার কোম্পানিকে বলে ওষুধ আনাবে। বেশ ভাল হবে। আমি ডাক্তারি করবো।

রেঙ্গুন থেকে জাহাজ ছেড়ে দুইদিন দুই রাত অনবরত যাওয়ার পরে চতুর্থ দিন ভোরে জমি দেখা গেল! রেঙ্গুনের মত সমতলভূমি নয়, উঁচু নিচু, যেদিকে চাও সেদিকে পাহাড়। উপকূলের চতুর্দিকেই মাছ ধরবার বিপুল আয়োজন, বড় বড় কালো রঙের খুঁটি দিয়ে ঘেরা, জাল ফেলা। জেলেদের থাকবার টিনের ঘর। পালতোলা জেলে-ডিঙিতে অহরহ তীর আচ্ছন্ন।

পিনাং বন্দরে জাহাজ ঢুকবামাত্রই অসংখ্য সাম্পান এসে জাহাজের চারিধারে ঘিরলে। মাঝিরা সকলেই চীনেম্যান।

ওরা সাম্পানে করে বন্দরে নেমে শহর দেখতে বার হোল। ঘণ্টা হিসাবে দুজনে একখানা রিকশা করলে—ঘণ্টা-পিছু কুড়ি সেন্ট্ ভাড়া।

পিনাঙে ঠিক সমুদ্রতীরে একটু সমতলভূমি, চারিদিকেই পাহাড়, অনেকগুলো ছোট নদী এই সব পাহাড় থেকে বার হয়ে শহরে মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে।

ওরা একটা পাহাড়ের ওপর চীনা মঠ দেখতে গেল। পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি, বাগান পুরোহিতের ঘর, দেবমন্দির স্তরে স্তরে উঠেছে। বাগানের চারিদিকে নালার ঝরনার স্রোতে কত পদ্ম গাছ। মন্দিরের মধ্যে টেওস্ট ধর্মজ দেবমূর্তি।

এদের মধ্যে একটি মূর্তি দেখে সুরেশ্বর চমকে দাঁড়িয়ে গেল।

কোন্ চীনা দেবতার মূর্তি, ভ্রূকুটি-কুটিল, কঠিন, রুক্ষ মুখ। হাতে অস্ত্র, দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত আক্রোশপূর্ণ। সমস্ত পৃথিবী যেন ধ্বংস করতে উদ্যত।

বিমল বললে—কি, দাঁড়ালে যে?

—দেখছো মূর্তিটা? মুখচোখের কি ভয়ানক নিষ্ঠুর ভাব দেখেছো?

মন্দিরের পুরোহিতদের জিগ্যেস করে জানা গেল ওটি টেওস্ট রণ দেবতার মূর্তি।

হঠাৎ সুরেশ্বর বললে—চলো, এখান থেকে চলে যাই।

বিস্মিত বিমল বললে—ওকি। পাহাড়ের উপরে যাবে না?

সুরেশ্বর আর উঠতে অনিচ্ছুক দেখে বিমল ওকে নিয়ে জাহাজে ফিরলো।

পথে বললে—তোমার কি হোল হে সুরেশ্বর? ও রকম মুখ গম্ভীর করে মনমরা হয়ে পড়লে কেন?

সুরেশ্বর বললে—কই না, ও কিছু নয়, চলো।

জাহাজে ফিরে এসেও কিন্তু সুরেশ্বরের সে ভাব দূর হোল না। ভাল করে কথা কয় না, কি যেন ভাবছে। নৈশভোজের টেবিলে ও ভাল করে খেতেও পারলে না।

রাত ন'টার পরে পিনাং থেকে জাহাজ ছাড়লে সুরেশ্বর যেন কিছু স্বস্তি অনুভব করলে। পিনাং বন্দরের জেটির আলোকমালা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, ওরা ডেকে এসে বসেছে নৈশভোজের পরে।

হঠাৎ সুরেশ্বর বলে উঠলো—উঃ কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম ওই চীনাদেবতার মূর্তিটা দেখে!

বিমল হেসে বললে—আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু, সত্যি তুমি এত ভীতু তা তো জানি নে! স্বীকার করি মূর্তিটা অবিশ্যি কমনীয় নয়, তবুও—

wapsip.com

সুরেশ্বর গম্ভীর মুখে বললে—আমার মনে হচ্ছে কি জানো বিমল? আমরা যেন এই দেবতার কোপদৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছি। সব সময় সব জায়গায় যেতে নেই। আমরা সন্ধ্যাবেলা ঐ চীনে মন্দিরে গিয়ে ভাল কাজ করিনি।

পিনাং থেকে ছাড়বার তিন দিন পরে জাহাজ সিঙ্গাপুর পৌঁছুলো।

দূর থেকে সিঙ্গাপুরের দৃশ্য দেখে বিমল ও সুরেশ্বর খুব খুশি হয়ে উঠলো। শুধু মালয় উপদ্বীপ কেন সমগ্র এশিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুর একটি প্রধান বন্দর, বন্দরে ঢুকবার সময়েই তার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল!

অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড় জলের মধ্য থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তাদের ওপর সুদৃশ্য ঘরবাড়ি—চারিদিকে পিনাং-এর মত মাছ ধরবার প্রকাণ্ড আড্ডা। নীল রং-এ চিত্রিত চক্ষু ড্রাগন, ঝোলানা পাল-তোলা সেই চীনা জাঙ্ক ও সাম্পানে সমুদ্রবক্ষ আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বন্দরে ঢুকবার মুখেই একখানা বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ প্রায় মাঝ-দরিয়ায় নোঙর করে আছে কয়লা নেবার জন্যে। তার প্রকাণ্ড ফোকরওয়ালা দুই কামান ওদের দিকে মুখ হাঁ করে আছে যেন ওদের গিলবার লোভে। আরও নানা ধরনের জাহাজ, স্টীমলঞ্চ, সাম্পানে, মালয় নৌকার ভিড়ে বন্দরের জল দেখা যায় না। যে দিকে চোখ পড়ে শুধু নৌকো আর জাহাজ, বিমলের মনে হোল কলকাতা এর কাছে কোথায় লাগে? তার চেয়ে অন্তত দশগুণ বড় বন্দর।

চারিধারেই বারসমুদ্র, বন্দরের মুখে ছোট-বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে আর দু'খানা বড় যুদ্ধ-জাহাজ ওদের চোখে পড়লো। বন্দরে উত্তর-পূর্ব কোণে তিন মাইলের পরে বিখ্যাত নৌ-বহরের আড্ডা। দূর থেকে দেখা যায়, বড় বড় ইস্পাতের খুঁটি, বেতারের মাস্তুলে সেদিকটা অরণ্যের সৃষ্টি করেছে।

জাহাজের কয়লা নেবার একটা প্রধান আড্ডা সিঙ্গাপুর। পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে পূর্বগামী সব রকম জাহাজকেই এখানে দাঁড়াতে হবে কয়লার জন্যে। এর বিপুল ব্যবস্থা আছে, বহুদূর ধরে পর্বতাকারে কয়লা রক্ষিত হয়েছে, যেন সমুদ্রের ধারে ধারে অনেক দূর পর্যন্ত একটা অবিচ্ছিন্ন কয়লার পাহাড়ের সারি চলে গিয়েছে।

বন্দরে জাহাজ এসে থামলে সুরেশ্বর ও বিমল চীনে কুলি দিয়ে মালপত্র এনে দুখানা রিকশা ভাড়া করলে। ওরা দুজনেই একটা ভারতীয় হোটেল দেখে নিয়ে সেখানে উঠলো। বিকালের দিকে সুরেশ্বর তার ওষুধের ফার্মের কাজে কয়েক জায়গায় ঘুরে এল, বিমল যে ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সন্ধ্যার পূর্বে সুরেশ্বর জিগ্যেস করলে, কি হয়েছে? অমনভাবে বসে কেন?

বিমল বললে—ভাই এতদূরে পয়সা খরচ করে আসাই মিথ্যে হোল। আমি যা ভেবে এখানে এলুম তা হবার কোনো আশা নেই। যে ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিলাম, তাঁর নিজের ভাগনে ডাক্তার হয়ে এসে বসেছে। আমার কোনা আশাই নেই।

সুরেশ্বর বললে—তাতে কি হয়েছে? এতবড় সিঙ্গাপুর শহরে দুজন বাঙালী ডাক্তারের স্থান হবে না? ক্ষেপেছ তুমি? আমি ওষুধের দোকান খুলছি, তুমি সেখানে ডাক্তার হয়ে বোসো। দেখো কি হয় না হয়।

হঠাৎ সুরেশ্বরের মনে হোল তাদের ঘরের বাইরে জানালার কাছে কে যেন একজন ওদের কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে।

বিমল বললে—ও কে?

wapsip.com

সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে। তার মনে হোল একজন যেন বারান্দার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে ফিরে এসে বললে—ও কিছু না, কে একজন গেল।

তারপর ওরা দুজনে অনেক রাত পর্যন্ত সিঙ্গাপুরের ভারতীয় পাড়ায় একখানা ওষুধের দোকান খুলবার সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করলে। বিমল হাজারখানেক টাকা এখন ঢালতে প্রস্তুত আছে, সুরেশ্বর নিজেদের ফার্মকে বলে ওষুধের যোগাড় করবে।

বড় ডাকঘরের ক্লক্ টাওয়ারে ঢং ঢং করে রাত এগারোটা বাজলো। হোটেলের চাকর এসে দুজনের খাবার দিয়ে গেল। শিখের হোটেল, মোটা মোটা সুস্বাদু রুটি ও মাংস, আস্ত মাসকলায়ের ডাল ও আলুর তরকারি—এই আহার্য। সারাদিনের ক্লান্তির পরে তা অমৃতের মত লাগলো ওদের।

আহারাদি সেরে সুরেশ্বর শোবার যোগাড় করতে যাচ্ছে এমন সময় বিমল হঠাৎ দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে।

সুরেশ্বর বললে—কি?

বিমল ফিরে এসে বিছানায় বসলো। বললে—আমার ঠিক মনে হোল কে একজন জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কাউকে দেখলুম না কিন্তু—

সুরেশ্বরের কি রকম সন্দেহ হোল। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, নানা রকম বিপদের আশঙ্কা এখানে পদে পদে। সে বললে—সাবধান থাকাই ভাল। দরজা বেশ বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়। রাতও হয়েছে অনেক।

সুরেশ্বরের ঘুম ছিল সজাগ। তা অনেক রাত্রে একটা কিসের শব্দে ও ঘুম ভেঙে বিছানার ওপর উঠে বসলো সন্দিগ্ধ মন নিয়ে।

বিছানার শিয়রের দিকে জানলাটা খোলা ছিল। বিছানা ও জানলার মধ্যে একটা ছোট টেবিলের দিকে নজর পড়াতে সুরেশ্বর দেখলে টেবিলটার ওপর ঢিল জড়ানো একটুকরো কাগজ। এটাই বোধ হয় একটু আগে জানলা দিয়ে এসে পড়েছে, তার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ঘরে আলো জ্বালাই ছিল। কাগজের টুকরোটা ও পড়লে, তাতে ইংরাজিতে লেখা রয়েছে—

আপনারা ভারতীয়! যতদূর জানতে পেরেছি সিঙ্গাপুরে আপনারা নবাগত ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী। কাল দুপুর বেলা বোটানিক্যাল গার্ডেনে অর্কিডের ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে যে বড় ডুরিয়ান্ ফলের গাছ আছে, তার নিচে অপেক্ষা করবেন দুজনেই। আপনাদের দুজনের পক্ষেই লাভজনক কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। আসতে ইতস্তত করবেন না।

লেখার নিচে নাম-সই নেই।

বিমলও কাগজখানা পড়লে।

ব্যাপার কি? এ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব।

সুরেশ্বর প্রথমে কথা বললে। বললে—কেউ তামাশা করেছে বলে মনে হচ্ছে, কি বলো? কিন্তু তাই বা করবে কে, আমাদের চেনেই বা কে?

বিমল চিন্তিত মুখে বললে—কিছু বুঝতে পারছি নে। কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না কি?

—কি খারাপ উদ্দেশ্য? আমরা যে খুব বড় লোক নই, তার প্রমাণ ভিক্টোরিয়া হোটেল বা এম্পায়ার হোটেলে না উঠে এখানে উঠেছি। টাকা-কড়ি সঙ্গে নিয়েও যাচ্ছিনে। সুতরাং কি করতে পারে আমাদের?

wapsip.com

সে রাত্রের মত দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে বিমল বললে—চল যাওয়াই যাক। এত ভয় কিসের? বোটানিক্যাল গার্ডেন তো আর নির্জন মরুভূমি নয়, সেখানে কত লোক বেড়ায় নিশ্চয়ই। দুজনকে খুন করে দিনের আলোয় টাকাকাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে, এত ভরসা কারু হবে না।

দুপুরের পরে হোটেল থেকে বেরিয়ে কুয়ালা জোহোর স্ট্রীটের মোড় থেকে একখানা রিকশা ভাড়া করলে। ম্যাসিডন কোম্পানির সোডাওয়াটারের দোকানের সামনে একজন চীনা ভদ্রলোক ওদের রিকশা থামিয়ে চীনে রিকশাওয়ালাকে কি জিগ্যেস করলে। তারপর উত্তর পেয়ে লোকটি চলে গেল। বিমল রিকশাওয়ালাকে ইংরিজিতে জিগ্যেস করলে—কি বললে তোমাকে হে?

রিকশাওয়ালা বললে—জিগ্যেস করলে সওদাগরী কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—তুমি কি বললে?

—আমি কিছু বলিনি। বলবার নিয়ম নেই আমাদের। সিঙ্গাপুর খারাপ জায়গা, মিস্টার।

বোটানিক্যাল গার্ডেন শহর ছাড়িয়ে প্রায় দু'মাইল দূরে। শহর ছাড়িয়েই প্রকাণ্ড একটা কিসের কারখানা। তারপর পথের দু'ধারে ধনী মালয়, ইউরোপীয় ও চীনাদের বাগানবাড়ি। এমন ঘন সবুজ গাছপালার সমাবেশ ও শোভা, বিমল ও সুরেশ্বর বাংলাদেশের ছেলে হয়েও দেখেনি—কারণ বিষুব রেখার নিকটবর্তী এই সব স্থানের মত উদ্ভিদ সংস্থান ও প্রাচুর্য পৃথিবীর অন্য কোথাও হওয়া সম্ভব নয়।

মাঝে মাঝে রবারের বাগান।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৌঁছে ওরা রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় করলে। প্রকাণ্ড বড় বাগান। কত ধরনের গাছপালা, বেশির ভাগই মালয় উপদ্বীপজাত। বড় বড় রুটিফলের গাছ, ডুরিয়ান্ পাকবার সময় বলে ডুরিয়ান্ ফলের গাছের নিচে দিয়ে যেতে পাকা ডুরিয়ান্ ফলের দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

সিঙ্গাপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের নারিকেলকুঞ্জ একটি অদ্ভুত সৌন্দর্যময় স্থান। এত উঁচু উঁচু নারিকেল গাছের এমন ঘন সন্নিবেশ ওরা কোথাও দেখে নি। নিস্তব্ধ দুপুরে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর মাথায় কি পাখি ডাকছে সুস্বরে, আকাশ সুনীল, জায়গাটা বড় ভাল লাগলো ওদের। অর্কিড হাউস খুঁজে বার করে তার উত্তর-পূর্ব কোণে সত্যই খুব বড় একটা ডুরিয়ান্ ফলের গাছ দেখা গেল। সে গাছেরও ফল পেকে যথারীতি দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

বিমল বললে—একটু সতর্ক থাকো। দেখা যাক না কি হয়!

সবুজ টিয়ার ঝাঁক গাছের ডালে ডালে উড়ে বসছে। একটা অপূর্ব শান্তি চারিদিকে—ওরা দুজনে ডুরিয়ান্ গাছের ছায়ায় শুকনো তালপাতা পেতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

মিনিট তিনও হয়নি, এমন সময় কিছুদূরে এক মাদ্রাজী ও একজন চীনা ভদ্রলোককে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল।

সুরেশ্বর ও বিমল দুজনেই উঠে দাঁড়ালো।

ওরা কাছে এসে অভিবাদন করলে। মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুবেশ, তিনি বেশ পরিষ্কার ইংরাজিতে বললেন—আপনারা ঠিক এসেছেন তাহলে। তিনি মিঃ আ-চিন স্থানীয় কনসুলেট অপিসের মিলিটারি অ্যাটাসে। আমার নাম সুব্বা রাও।

পরস্পরের অভিবাদন-বিনিময় শেষ হবার পর চারজনই সেই ডুরিয়ান্ গাছের তলায় বসলো। সমগ্র বোটানিকেল গার্ডেনে এর চেয়ে নির্জন স্থান আছে কিনা সন্দেহ।

wapsip.com

সুব্বা রাও বললেন—প্রথমেই একটা কথা জিগ্যেস করি—আপনারা দুজনেই উপাধিকারী ডাক্তার তো? সুরেশ্বর বললে, সে ডাক্তার নয়, ঔষধ-ব্যবসায়ী। বিমল পাসকরা ডাক্তার।

এ কথার উত্তরে আ-চিন বললে—দুজনকেই আমাদের দরকার। একটা কথা প্রথমেই বলি, আমাদের দেশ ঘোর বিপন্ন। আমরা ভারতের সাহায্য চাই। জাপান অন্যায়ভাবে আমাদের আক্রমণ করছে, দেশে খাদ্য নেই, ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই। আমরা গোপনে ডাক্তারি ইউনিটি গঠন করে দেশে পাঠাচ্ছি। কারণ আইনত বিদেশ থেকে আমরা তা সংগ্রহ করতে পারি না। আপনারা বুদ্ধের দেশের লোক, আমরা আপনাদের মন্ত্রশিষ্য। আমাদের সাহায্য করুন। এর বদলে আমাদের দরিদ্র দেশ দুশো ডলার মাসিক বেতন ও অন্যান্য খরচ দেবে। এখন আপনারা বিবেচনা করে বলুন আপনাদের কি মত?

সুরেশ্বর বললে—যদি রাজী হই, কবে যেতে হবে।

—এক সপ্তাহের মধ্যে। লুকিয়ে যেতে হবে, কারণ এখন হংকং যাবার পাসপোর্ট আপনারা পাবেন না। আমার গভর্নমেন্ট সে ব্যবস্থা করবেন ও আপনাদের এখানে এই এক সপ্তাহ থাকার খরচ বহন করবেন। আপনারা যদি রাজী হন, আমার গভর্নমেন্ট আপনাদের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবেন।

সুব্বা রাও বললেন—জবাব এখুনি দিতে হবে না। ভেবে দেখুন আপনারা। আজ সন্ধ্যাবেলা জোহোর স্ট্রীটের বড় পার্কের ব্যান্ড স্ট্যান্ডের কাছে আমি ও আ-চিন থাকবো। কিন্তু দয়া করে কাউকে জানাবেন না।

ওরা চলে গেলে বিমল বললে—কি বল সুরেশ্বর, শুনলে তো সব ব্যাপার?

সুরেশ্বর বললে—চল যাই। এখন আমাদের বয়স কম, দেশবিদেশে যাবার তো এই সময়। একটা বড় যুদ্ধের সময় মেডিক্যাল ইউনিটে থাকলে ডাক্তার হিসাবে তোমারও অনেক জ্ঞান হবে। চীনদেশটাও দেখা হয়ে যাবে পরের পয়সায়।

বিমল বললে—আমার তো খুবই ইচ্ছে, শুধু তুমি কি বল তাই ভাবছিলুম।

সন্ধ্যাবেলায় ওরা এসে জোহোর স্ট্রীটের পার্কের ব্যান্ড-স্ট্যান্ডের কোণে আ-চিন ও সুব্বা রাওয়ের সাক্ষাৎ পেলে। ওদের সব কথাবার্তা শুনে আ-চিন বললে—তা হোলে আপনাদের রওনা হতে হবে কাল রাত্রে। ক'দিনে আপনাদের হোটেলের বিল যা হয়েছে তা কাল বিকালেই চুকিয়ে দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে আপনারা এইখানে অপেক্ষা করবেন। বাকি ব্যবস্থা আমি করবো। আর এই নিন—

কথা শেষ করে বিমলের হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে আ-চিন ও সুব্বা রাও চলে গেলেন।

বিমল খুলে দেখলে কাগজখানা একশো ডলারের নোট।

পরদিন সকাল থেকে ওরা বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা, কিছু কিছু জিনিসপত্র কেনা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত রইল। বৈকালে নির্দেশমত আবার ব্যান্ড স্ট্যান্ডের কোণে এসে দাঁড়ালো।

একটু পরেই আ-চিন এলেন। বিমলকে জিগ্যেস করলেন—

—আপনাদের জিনিসপত্র?

—হোটেলেই আছে।

—হোটেলে রেখে ভাল করেন নি। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে গিয়ে জিনিসপত্র তুলে এখানে নিয়ে আসুন। আমি এখানেই থাকি। পার্কের কোণে ছোট রাস্তাটার ওপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে হর্ন দিতে বলবেন। আপনাদের আর কিছু লাগবে?

wapsip.com

—না, ধন্যবাদ। যা দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট।

আধঘণ্টার মধ্যেই বিমল ও সুরেশ্বর ট্যাক্সিতে ফিরে পার্কের কোণে দাঁড়িয়ে হর্ন দিতে লাগলো।

আ-চিন এসে ওদের গাড়িতে উঠে মালয় ভাষায় ড্রাইভারকে কি বললেন। সে ট্যাক্সি বড় পোস্ট আফিসের সামনে এসে দাঁড় করালো।

বিমল বললে—এখানে কি হবে?

বিমলের কথা শেষ হতে না হতে ওদের ট্যাক্সির পাশে একখানা নীল রংয়ের হুইপেট্ গাড়ি এসে দাঁড়ালো। স্টিয়ারিং ধরে আছে একজন চীনা ড্রাইভার।

আ-চিন বললেন—উঠুন পাশের গাড়িতে।

পরে তাঁর ইঙ্গিত মত দুজন ড্রাইভার মিলে জিনিসপত্র সব নতুন গাড়িখানায় তুলে দিলে। গাড়ি যখন তীরবেগে সিঙ্গাপুরের অজানা বড় রাস্তা বেয়ে চলেছে, তখন বিমল বললে—অত সদরে দাঁড়িয়ে ও ব্যবস্থা করলেন কেন? কেউ যদি টের পেয়ে থাকে?

আ-চিন বললেন—কেউ করবে না জানি বলেই ঐ ব্যবস্থা। এ সময়ে চীনা ডাক নিতে রোজ কনসুলেট আপিসের লোক ওখানে আসবে সকলেই জানে। আমার পরনে কনসুলেট ইউনিফর্ম, আমি লুকিয়ে কোনো কাজ করতে গেলেই সন্দেহের চোখে লোকে দেখবে। সদরে কেউ কিছু হঠাৎ মনে করবে না।

একটু পরেই সমুদ্র চোখে পড়লো—নারিকেল শ্রেণীর আড়ালে। শহর ছাড়িয়ে একটু দূরে একটা নিভৃত স্থানে এসে গাড়ি একটা বাংলোর কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকলো। পাশেই নীল সমুদ্র।

আ-চিন বললেন—এখানে নামতে হবে।

বাংলোর একটা ঘরে ওদের বসিয়ে আ-চিন বললেন—আমি যাই। এখানে নিশ্চিন্তমনে থাকুন। কোনো ভয় নেই। যথাসময়ে আপনাদের খাবার দেওয়া হবে। বাকি ব্যবস্থা সব রাত্রে।

তিনি চলে গেলেন। একটু পরে জনৈক চীনা ভৃত্য ছোট ছোট পেয়ালায় সবুজ চা ও কুমড়োর বিচির কেক নিয়ে ওদের সামনে রাখলে।

বিমল বললে—এ আবার কি চিজ বাবা? ইঁদুর ভাজা-টাজা নয় তো?

সুরেশ্বর বললে—ইঁদুর নয়, কুমড়োর বিচি, তা স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে। তবে ইঁদুর খাওয়া অভ্যেস করতে হবে, নইলে হরিমটর খেয়ে থাকতে হবে চীন দেশে।

কিন্তু কেকগুলো ওদের মন্দ লাগলো না। চা পানের পরে ওরা বাংলোর চারিধারে একটু ঘুরে বেড়ালে। সিঙ্গাপুরের উপকণ্ঠে নির্জন স্থানে সমুদ্রতীরে বাংলোটি অবস্থিত। সমুদ্রের দিকে এক সারি ঝাউ অপরাহ্ণের বাতাসে সোঁ সোঁ করছিল। দূরে সমুদ্র বক্ষে অস্তসূর্যের আভা পড়ে কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

সুরেশ্বর ভাবছিল হুগলি জেলার তাদের সেই গ্রাম, তাদের পুরানো বাড়ি—বাপ-মায়ের কথা। জীর্ণ, সান-বাঁধানো পুকুরের ঘাটের পৈঁঠা বেয়ে মা পুকুরে গা ধুতে নামছেন এতক্ষণ।

জীবনের কি সব অদ্ভুত পরিবর্তনও ঘটে! তিন মাস মাত্র আগে সেও এমনি সন্ধ্যায় ঐ গ্রামের খালের ধারটিতে একা পায়চারী করে বেড়াতো ও কি ভাবে কোথায় গেলে চাকরি পাওয়া যায় সেই ভাবনাতে ব্যস্ত থাকতো। আর আজ কোথায় কতদূরে এসে পড়েছে!

বিমল মুগ্ধ হয়েছিল এই সুদূর-প্রসারী শ্যামল সমুদ্র-বেলার সান্ধ্যশোভার দৃশ্যে। সে

wapsip.com

ভাবছিল কবি ও ঔপন্যাসিকদের পক্ষে এমন বাংলো তো স্বর্গ—মাথার ওপরকার নীল আকাশ—এই সবুজ ঝাউয়ের সারি—ঐ সমুদ্রবক্ষের ছোট ছোট পাহাড়—সত্যিই স্বর্গ—

গভীর রাত্রে আ-চিন এসে ওদের ওঠালেন। একখানা মোটরে আধ মাইল আন্দাজ গিয়ে সমুদ্রতীরের একটা নির্জন স্থানে ওরা জিনিসপত্র সমেত ছোট একটা জালি বোটে উঠলো। দূরে বন্দরের আলোর সারি দেখা যাচ্ছে—অন্ধকার রাত্রি, নির্জন সমুদ্র বক্ষ। কিছুদূরে একটা চীনা জাঙ্ক অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল—জালিবোট গিয়ে জাঙ্কের গায়ে লাগলো।

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওরা জাঙ্কে উঠলো।

পাটাতনের নিচে একটা ছোট কামরা ওদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। কামরাতে একটা চীনা মাদুর বিছানো, বেতের বালিশ, চীনা লণ্ঠন, রঙীন গালার পুতুল, কাঁচকড়ার ফুলের টবে নার্সিসাস ফুলগাছ—এমন কি ছোট খাঁচাসমেত একটি ক্যানারি পাখি।

আ-চিন বললেন—কামরা আপনাদের পছন্দ হয়েছে তো?

সুরেশ্বর বললে—সুন্দর সাজানো কামরা। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আ-চিন গম্ভীর ভাবে বললেন—ধন্যবাদ আপনাদের। আমাদের বিপন্ন দেশকে দয়া করে আপনারা সাহায্য করবার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করে অজানা ভবিষ্যতের দিকে চলেছেন। ভগবান বুদ্ধের দেশের লোক আপনারা—সব সময়েই আপনারা আমাদের নমস্য। ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদ আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক।

সুরেশ্বর বললে—আপনি তো সঙ্গে যাবেন না—এ নৌকো ঠিক জায়গায় আমাদের নিয়ে যাবে তো?

—সে বিষয় ভাববেন না। এ চীন গভর্নমেন্টের বেতনভোগী জাঙ্ক। তিন দিন পরে একখানা চীনা জাহাজ আপনাদের তুলে নেবে। কারণ সামনে দুস্তর চীন সমুদ্র। জাঙ্কে সে সমুদ্র পার হওয়া তো যাবে না।

আ-চিন বিদায় নেবার পরে নৌকা নোঙর ওঠালে। জাঙ্কের সুসজ্জিত কামরায় মোমবাতির আলো জ্বলছে। অনুকূল বায়ুভরে চীন সমুদ্র বেয়ে নৌকা চলেছে—ঘন অন্ধকার কেবল আলোকোৎক্ষেপক ঢেউগুলি যেন জোনাকির ঝাঁকের মত জ্বলছে।

বিমল বললে—এখান থেকে হংকং সতেরোশো আঠেরোশো মাইল দূর। এক ভীষণ চীনসমুদ্র—আর এই জাঙ্ক তো এখানে মোচার খোলা। প্রাণ নিয়ে এখন ডাঙায় পা দিতে পারলে তো হয়।

সুরেশ্বর বললে—এসে ভাল করনি, বিমল। ঝোঁকের মাথায় তখন দুজনেই আ-চিনের কথায় ভুলে গেলুম কেমন—দেখলে? এই জাঙ্কে যদি তোমায় আমায় খুন করে এরা জলে ভাসিয়ে দেয়, এদের কে কি করবে? কেউ জানে না আমরা কোথায় আছি। কেউ একটা খোঁজ পর্যন্ত করবে না।

বিমল বললে—ও সব কথা ভেবে কেন মন খারাপ কর? বাইরে যেয়ে সমুদ্রের দৃশ্যটা একবার দেখ। ফস্‌ফোরেসেন্ট ঢেউগুলো কি চমৎকার দেখাচ্ছে? মাঝে মাঝে কেমন একপ্রকার শব্দ হচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে। ওগুলো কি? ওরা কাউকে কিছু বলতে পারে না, ইংরাজি ভাষা কে জানে নৌকায়, তা ওদের জানা নেই। রাত্রে ওদের ঘুম হোল না। ক্রমে পুবদিক ফর্সা হয়ে এল, রাত ভোর হয়ে গেল। একটু পরে সূর্য উঠল।

সকাল থেকে নৌকা ভয়ানক নাচুনি ও দুলুনি শুরু করে দিল। চীন সমুদ্র অত্যন্ত বিপজ্জনক, সর্বদা চঞ্চল, ঝড় তুফান লেগেই আছে। ওরা সমুদ্রপীড়ায় কাতর হয়ে কামরার

wapsip.com

মধ্যে ঢুকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। আহার বিহারে রুচি রইল না।

সেদিন বিকেলে এক মস্ত ঢেউয়ের মাথায় একটি কাটল্ ফিস এসে পড়লে জাঙ্কের পাটাতনে। সেটা তখনও জ্যান্ত, পালাবার আগেই চীনা মাঝিরা ধরে ফেললে।

জাঙ্কে যা খাবার দেয়, সে ওদের মুখে ভাল লাগে না। ভাত ও সুঁটকি মাছের তরকারি। সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত দুটি বাঙালী যাত্রীর পক্ষে চীনা ভাত তরকারি খাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সুরেশ্বর বললে—ঝকমারি করেছি এসে, ভাই। না খেয়ে তো দেখছি আপাতত মরতে হবে।

তৃতীয় দিন দুপুরে দূরে দিগ্বলয়ে একখানা বড় স্টীমারের ধোঁয়া দেখা গেল। ওরা দেখলে জাঙ্কের সারেং দূরবীন দিয়ে সেদিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন মুখে কি আদেশ দিলে, মাঝি মাল্লারা পাল নামিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আবার উল্টোদিকে যাবে নাকি? ব্যাপার কি?

সুরেশ্বর সারেঙকে জিজ্ঞেস করলে—নৌকা ঘোরাচ্ছে কেন?

সারেং দূরের অস্পষ্ট জাহাজটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বললে—ইংলিশ ক্রুজার, মিস্টার, ভেরি বিগ্‌ক্রুজার—বিগ্ গান—

সুরেশ্বর বললে—তাতে তোমাদের ভয় কি? ওরা তোমাদের কিছু বলতে যাবে কেন?

কিন্তু সুরেশ্বর জানতো না সারেং-এর আসল ভয়ের কারণ কোন্‌খানে। চীনা সমুদ্রে চীনা বোম্বেটের উপদ্রব নিবারণের জন্যে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ সর্বপ্রকার চীনা নৌকা, জাহাজ ও জাঙ্কের ওপর—বিশেষ করে বন্দর থেকে দূরে বার সমুদ্র দিয়ে যে সব যায়—তাদের ওপর খরদৃষ্টি রাখে। ওদের জাঙ্ককে দেখে সন্দেহ হলেই থামিয়ে থানাতল্লাস করবেই। তা হলে এ জাঙ্কে যে বেআইনি আফিম রয়েছে পাটাতনের নিচে লুকোনো—তা ধরা পড়ে যাবে।

চীনা মাঝিগুলো অতিশয় ধূর্ত। যুদ্ধ জাহাজ দূর থেকে যেমনি দেখা, অমনি জাঙ্ক মাঝ সমুদ্রে ঝুপ করে নোঙর নামিয়ে দিলে ও পাটাতনের নিচে থেকে মাছ ধরার জাল বার করে সমুদ্রে ফেলতে লাগলো—দেখতে দেখতে জাঙ্কখানা একখানি চীনা জেলে-ডিঙিতে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

বিমল বললে—উঃ কি চালাক দেখেছ!

সুরেশ্বর বললে—চালাক তাই রক্ষে—নইলে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ এসে যদি আমাদের ধরতো—বিনা পাসপোর্টে ভ্রমণ করার অপরাধে তোমায় আমায় জেল খাটতে হবে, সে হুঁশ আছে?

ধূসরবর্ণের বিরাটকায় ব্রিটিশ ক্রুজারখানা ক্রমেই নিকটে এসে পড়ছে। এখন তার বড় ফোকরওয়ালা কামানগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রে বুকে একটা ধূসরবর্ণের পর্বত যেন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে।

যদি কোনো সন্দেহ করে একটি বড় কামান তাদের দিকে দাগে—আর ওদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে?

চীনা মাঝিমাল্লাগুলো মহা উৎসাহে ততক্ষণ জাল ফেলে মাছ ধরছে। সুরেশ্বর ও বিমলের বুক ঢিপ ঢিপ করছে উদ্বেগে ও উত্তেজনায়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যুদ্ধজাহাজখানা ওদের দিকে লক্ষ্যই করলে না। ওদের প্রায় একমাইল দূরে দিয়ে সোজা পূর্ণবেগে সিঙ্গাপুরের দিকে চলে গেল।

জাঙ্ক সুদ্ধ লোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

দুপুরের পরে দূরে একটি ছোট দ্বীপ দেখা গেল।

wapsip.com

জাঙ্ক গিয়ে ক্রমে দ্বীপের পাশে নোঙর করলে। বিমল ও সুরেশ্বর শুনলে নৌকার জল ফুরিয়ে গেছে—এবং এখানে মিষ্ট জল পাওয়া যায়।

ওরা সেখানে থাকতে থাকতে আর একখানা বড় জাঙ্ক বিপরীত দিক থেকে এসে ওদের কাছেই নোঙর করলে।

বিমলদের জাঙ্কের মাঝিরা বেশ একটু ভীত হয়ে পড়লো নবাগত নৌকাখানা দেখে। সকলেই ঘন ঘন চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে চায়— যদিও ভয়ের কারণ যে কি তা সুরেশ্বর বা বিমল কেউ বুঝতে পারলে না।

কিন্তু একটু পরে সেটা খুব ভাল করেই বোঝা গেল।

ও নৌকা থেকে দশ বারোজন গুণ্ডা ও বর্বর আকৃতির চীনেম্যান এসে ওদের জাঙ্ক ঘিরে ফেললে। সকলের হাতেই বন্দুক, কারও হাতে ছোরা।

ওদের জাঙ্কের কেউ কোনো রকম বাধা দিলে না—দেওয়া সম্ভবও ছিল না। দস্যুরা দলে ভারী, তাছাড়া অত বন্দুক এ নৌকায় ছিল না। সকলের মুখ বেঁধে ওরা নৌকায় যা কিছু ছিল, সব কেড়ে নিয়ে নিজেদের জাঙ্কে ওঠালে। বিমল ও সুরেশ্বরের কাছে যা ছিল, সব গেল। আ-চিন প্রদত্ত একশো ডলারের নোটখানা পর্যন্ত—কারণ সেখানা ভাঙাবার দরকার না হওয়ায় ওদের বাক্সেই ছিল।

চীন সমুদ্রের বোম্বেটের উপদ্রব সম্বন্ধে বিমল ও সুরেশ্বর অনেক কথা শুনেছিল। সিঙ্গাপুরে আরও শুনেছিল যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন হওয়ায় সমস্ত হংকং-এর নিকটবর্তী সমুদ্রে জড়ো হচ্ছে—এদিকে সুতরাং বোম্বেটেদের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত।

চীন ও মালয় জলদস্যুরা শুধু লুঠপাট করেই ছেড়ে দেয় না—যাত্রীদের প্রাণনষ্টও করে। কারণ এরা বেঁচে ফিরে গিয়ে অত্যাচারের সংবাদ সিঙ্গাপুর বা হংকং-এ প্রচার করলেই চীন ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কড়াকড়ি পাহারা বসাবে সমুদ্রে। 'মরা মানুষ কোনো কথা বলে না'—এ প্রাচীন নীতি অনেক ক্ষেত্রেই বড় কাজ দেয়।

দেখা গেল বর্তমান দস্যুরা এ নীতি ভাল ভাবেই জানে। কারণ জিনিসপত্র ওদের জাঙ্কে রেখে এসে ওরা আবার ফিরে এল বিমলদের নৌকায়—যেখানে পাটাতনের ওপর মাঝি মল্লার দল সারি সারি মুখ ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

বিমল ছিল নিজের কামরায়। সুরেশ্বর কোথায় বিমল তা জানে না। একজন বদমাইশকে ছোরা হাতে ওর কামরায় ঢুকতে দেখে বিমল চমকে উঠলো।

লোকটা সম্ভবত চীনাম্যান। বয়স আন্দাজ ত্রিশ, সার্কাসের পালোয়ানের মত জোয়ান—নীল ইজের আর একটি বুক কাটা কোর্তা গায়ে। মুখখানা দেখতে খুব কুশ্রী নয়, কিন্তু কঠিন ও নিষ্ঠুর। ওর হাতে অস্ত্রখানা বিমল লক্ষ্য করে দেখলে ঠিক ছোরা নয়, মালয় উপদ্বীপে যাকে 'ক্রিস্' বলে তাই। যেমনি চকচকে তেমনি সেখানা ক্ষুরধার বলে মনে হোল!

সে ক্রিস্খানা বিমলের সামনে উঁচু করে তুলে ধরে দেখিয়ে বললে—আমি তোমাকে একটু বিরক্ত করতে এসেছি, কিছু মনে কোরো না।

বিমলের মুখ বাঁধা, সে কি কথা বলবে?

লোকটা পকেট থেকে একটা চামড়ার থলি বার করে সেটার মুখ খুলে বিমলের চোখের সামনে মেলে ধরলে। শুকনো আমচুরের মত কতকগুলো কি জিনিস তার মধ্যে রয়েছে! বিমল অবাক হয়ে ভাবছে এ জিনিসগুলো কি, বা তাকে এগুলি দেখানোর সার্থকতাই বা কি—এমন সময় লোকটা একটা শুকনো আমচুর বার করে ওর নাকের সামনে ধরে

wapsip.com

বলে—চিনতে পারলে না কি জিনিস?

বিমল এতক্ষণে জিনিসটা চিনতে পারলে এবং চিনে ভয়ে ও বিস্ময়ে শিউরে উঠলো। সেটা একটা কাটা শুকনো কান, মানুষের কান! লোকটা হা হা করে নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে—বুঝেছ এবার? হাঁ, ওটা আমার একটা বাতিক—মানুষের কান সংগ্রহ করা। তোমাকেও তোমার কান দুটির জন্যে একটুখানি কষ্ট দেবো। আশা করি মনে কিছু করবে না। এসো, একটু এগিয়ে এসো দেখি।

বিমল নিরুপায়, মুখ দিয়ে একটা কথা বার করবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই তার। এক মুহূর্তে তার মনে হোল হয়তো সুরেশ্বরের সমানই অবস্থা ঘটেছে, এতক্ষণে তারও অশেষ দুর্দশা হচ্ছে এই পীতবর্ণ বর্বরদের হাতে।

বুদ্ধদেবের ধর্মকে এরা বেশ আয়ত্ত করেছে বটে!

লোকটা সময়ের মূল্য বোঝে, কারণ কথা শেষ করেই বুদ্ধশিষ্যের এই বিচিত্র নমুনাটি চকচকে ক্রিস্‌খানা হাতে করে এগিয়ে এল—বিমলের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল—মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ বার হতে চেয়েও হোল না, সে প্রাণপণে দুই চোখ বুঁজলে।

তীক্ষ্ণ ক্রিসের স্পর্শ খুব ঠাণ্ডা—কতটা ঠাণ্ডা, খু-উব ঠাণ্ডা কি? ক্রিসের স্পর্শ এল না, এল তার পরিবর্তে দূর থেকে একটা অস্পষ্ট গম্ভীর আওয়াজ—প্রস্তরময় কূলে সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রবল বেগে আছড়ে পড়ার শব্দের মত গম্ভীর।

কতকগুলো ব্যস্ত মানুষের সম্মিলিত দ্রুত পদশব্দ বিমলের কানে গেল—বিস্মিত বিমল চোখ খুলে চেয়ে দেখলে লোকটা ছুটে কামরার বাইরে চলে গেল—চারিদিকে একটি সাড়া শোরগোল, কাঠের পাটাতনের ওপর অনেকগুলো পলায়নপর মানুষের দ্রুত পায়ের শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে।

কি ব্যাপার? এ আবার কি নতুন কাণ্ড?

পরক্ষণেই বিমলের মনে হোল তাদের জাঙ্কখানা একটা প্রকাণ্ড দুলুনি খেয়ে একেবারে কাত হয়ে পড়বার উপক্রম করেই পরমুহূর্তে ঢেউয়ের তালে যেন আকাশে ঠেলে উঠলো—নোঙরের শিকলে কড়্ কড়্ শব্দে টান ধরলো—মজবুত শেকল না হলে সেই হেঁচকাটানে ছিঁড়ে যেত নিশ্চয়ই। একটু পরে বিমলদের নৌকার একজন জোয়ান মাঝি ওর কামরায় ঢুকে হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিলে।

তখনও পাশে কোথায় খুব হৈ চৈ হচ্ছে।

বিমল বললে—ব্যাপার কি বল তো? আমার বন্ধুটি কোথায়?

মাঝি বললে—সে ভালই আছে।

—বলেই সে বাইরে চলে গেল। বেশি কথা বলে না এদেশের লোক।

বিমল তাড়াতাড়ি কামরার বাইরে এসে দেখলে সামনে এক অদ্ভুত ব্যাপার। নবাগত বোম্বেটে জাঙ্কখানা কঠিন প্রস্তরময় ডাঙায় ধাক্কা খেয়ে জখম হয়েছে। আর অল্প দূরেই সমুদ্রবক্ষে এমন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলে যা জীবনে কখনও দেখে নি।

আকাশ থেকে কালো মোটা থামের মত একটা জিনিস নেমে সমুদ্রের জলে মিশে গিয়েছে—সে জিনিসটা আবার চলনশীল—হালকা রবারের বেলুন বা ফানুসের মত অত বড় কালো মোটা থামটা বায়ুর গতির সঙ্গে ধীরে উত্তর থেকে দক্ষিণে ভেসে চলেছে।

এই সময় সুরেশ্বর ও জাঙ্কের সারেং এসে ওদের পাশে দাঁড়ালো।

সারেং বললে—উঃ কত বড় জোড়া জলস্তম্ভ, মিস্টার! চীন সমুদ্রে প্রায়ই জলস্তম্ভ হয়

wapsip.com

বটে কিন্তু এমন জোড়া জলস্তম্ভ আমি কখনো দেখিনি! ঐ জলস্তম্ভটা আজ আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে!

ঐকালো মোটা থামের মত ব্যাপারটা তাহলে জলস্তম্ভ। ছবিতে দেখেছে বটে। কিন্তু বিমল বা সুরেশ্বর জীবনে এই প্রথম জিনিসটা দেখলে।

কিন্তু ব্যাপারটা ওরা ঠিকমত বুঝতে পারে নি। জলস্তম্ভ ওদের জীবন বাঁচাল কী করে?

বেশি দেরি হোল না ব্যাপারটা বুঝতে। যখন ওরা দেখলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সুদক্ষ সারেং নোঙর উঠিয়ে জাঙ্কখানা ডাঙা থেকে প্রায় একশো গজ এনে ফেলেছে এবং প্রতিমুহূর্তেই তীর ও সমুদ্র উভয়ের ব্যবধান বাড়ছে। সারেং ও মাঝিদের মুখে শোনা গেল এই জলস্তম্ভের জোড়াটি দ্বীপের অদূরে ভেঙে গিয়ে বিপুল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে—তাতে বোম্বেটেদের জাঙ্কখানাকে ঊর্ধ্বে উঠিয়ে সবেগে আছাড় মেরেছে ডাঙার গায়ে। জাঙ্কখানা জখম তো হয়েছেই এবং বোধ হচ্ছে ওদের কতকগুলি লোককেও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মেরেছে।

সারেং বললে—জলস্তম্ভ ভয়ানক জিনিস, মিস্টার। অনেক সময় জাহাজ পর্যন্ত বিপদে পড়ে যায়—বড় বড় জাহাজ দূর থেকে কামান দেগে জলস্তম্ভ ভেঙে দেয়। আর বিশেষ করে এই চীন সমুদ্রে সপ্তাহে দু-একটা বালাই লেগেই আছে।

দ্বীপ ছেড়ে জাঙ্কটা বহুদূর চলে এসেছে।

আবার অকূল সমুদ্র!

বোম্বেটে জাহাজ ও জলস্তম্ভ স্বপ্নের মত মিলিয়ে গিয়েছে দিগন্তবিস্তৃত নীলিমার মধ্যে। সুরেশ্বর ও বিমল চুপ করে সমুদ্রের অপরূপ রঙের দিক চেয়ে বসে আছে।

সারেং এসে বললে,—মিস্টার, আমরা হংকং থেকে আর আর বেশি দূরে নেই। কিন্তু হংকং যাবো না।

সুরেশ্বর বললে—কোথায় যাবো তবে?

—হংকং থেকে পঞ্চাশ মাইল আন্দাজ দূরে ইয়ান-চাউ বলে একটা ছোট দ্বীপ আছে। সেখানে আপনাদের নামিয়ে দেবার আদেশ আছে আমার ওপর। হংকং-এর কাছে গেলে ব্রিটিশ মানোয়ারী জাহাজ আমাদের নৌকো তল্লাস করবে। তোমরা ধরা পড়ে যাবে মিস্টার!

পরদিন দুপুরের পরে ইয়ান-চাউ পৌঁছে গেল ওদের নৌকো। ক্ষুদ্র দ্বীপ। আগোগোড়া দ্বীপটি যেন একটা ছোট পাহাড়, সমুদ্রের জল থেকে মাথা তুলে জেগে রয়েছে। এখানে চীন গভর্নমেন্টের একটা বেতারের স্টেশন আছে।

সমস্ত দ্বীপে আর কোন অধিবাসী নেই। ঐ বেতারের স্টেশনের জনকয়েক চীনা কর্মচারী ছাড়া।

দুদিন ওরা সেখানে বেতারের আড্ডায় কর্মচারীদের অতিথি হয়ে রইল। তৃতীয় দিন খুব সকালে ক্ষুদ্র একখানা জাঙ্কে ওদের দশ মাইল দূরবর্তী উপকূলে নিয়ে যাওয়া হোল।

বেতারে এই রকম আদেশই নাকি এসেছে।

এই চীন দেশ! যদি ঢেউ-খেলানো ছাদ-আঁটা চীনা বাড়ি না থাকতো, তবে চীন দেশের প্রথম দৃশ্যটা বাংলাদেশের সাধারণ দৃশ্য থেকে পৃথক করে নেওয়া হঠাৎ যেত না।

উপকূল থেকে পাঁচমাইল দূরে রেলওয়ে স্টেশন। অতি প্রচণ্ড কড়া রৌদ্রে পদ-ব্রজেই ওদের স্টেশনে আসতে হোল। এদেশে ওদের জামাই-আদরে কেউ রাখবে না, কঠিন সামরিক জীবন যে এখন থেকেই শুরু হোল ওদের—এ কথাটা সুরেশ্বর ও বিমল হাড়ে হাড়ে বুঝলে

wapsip.com

সেই ভীষণ রোদে বিশ্রী ধুলোভরা রাস্তা বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে।

তার ওপর বেতারের কর্মচারীটি ওদের সঙ্গে ছিল, তার মুখেই শোনা গেল এ সব অঞ্চল আদৌ নিরপাদ নয়।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থার গণ্ডগোলের সুযোগ নিয়ে চোর ডাকাত ও গুণ্ডার দল যা খুশি শুরু করেছে। তারা দিনদুপুরও মানে না। স্বদেশী বিদেশীও মানে না। কারও ধন-প্রাণ নিরাপদ নয় আজকাল। দেশ এক প্রকার অরাজক।

শীঘ্রই এর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল পথের মধ্যেই। ওরা একদলে আছে মাত্র চারজন। রৌদ্রে সুরেশ্বরের জল তেষ্টা পেয়েছিল—চীনা কর্মচারীটিকে ও ইংরাজিতে বললে—জল কোথাও পাওয়া যাবে?

রাস্তা থেকে কিছু দূরে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম বা বস্তি। খানকতক খড়ের ঘর একজায়গায় সেই জড়ো করা মাত্র। চীনা কর্মচারীর পিছু পিছু ওরা বস্তির দিকে গেল। বিমলের মনে হোল একবার বৈদ্যবাটির গঙ্গার চরে সে তরমুজ কিনতে গিয়েছিল—এ ঠিক যেন বৈদ্যবাটীর চড়ার চাষী-কৈবর্তদের গাঁ খানা। একখানা গরুর গাড়ি সামনেই ছিল—তফাতের মধ্যে চোখে পড়লো সেটার গড়ন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। গরুর গাড়ির অত মোটা চাকা বাংলাদেশে হয় না।

ওদের আসতে দেখেই কিন্তু বস্তির মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হোল। মেয়ে পুরুষ যে যার ঘর ছেড়ে ছুটে বেরুলো—এদিক ওদিক দৌড় দিল। চীনা কর্মচারীও তৎপর কম নয়—সেও ছুটে গিয়ে একটি ধাবমানা স্ত্রীলোকের পথ আগলে দাঁড়ালো।

স্ত্রীলোকটি দুহাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ে জড়সড় হয়ে আর্তনাদ করে উঠলো। ব্যাপারটা কি? সুরেশ্বর ও বিমল অবাক হয়ে গিয়েছে।

স্ত্রীলোকের বিপন্ন কণ্ঠের আর্তনাদ বিমল সহ্য করতে পারলে না। ও চেঁচিয়ে বললে—ওকে কিছু বলো না, মিঃ চংপে—

ততক্ষণ ওদের সঙ্গী চীনা ভাষায় কি একটা বললে স্ত্রীলোকটিকে। কথাটা এই রকম শোনাল ওদের অনভ্যস্ত কানে।

—হি চিন্-কিচিন্—চিন্-চিন্—

স্ত্রীলোকটি মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ওর দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে বললে—ই-চিন্, কি চিন্, সি চিন্—

—কি চিন্, ফি চিন্?

—সি চিন্, লি চিন্।

সুরেশ্বর ও বিমল ওদের কথা শুনে হেসেই খুন। কথাবার্তাগুলো যেন ঐ রকমই শোনাচ্ছিল।

তারপর ওরা স্ত্রীলোকটির কাছে পায়ে পায়ে গেল। আহা, যেন মূর্তিমতী দারিদ্র্যের ছবি! ভারতবর্ষীয় লোকে তবুও স্নান করে, গায় মাথায় তেল দেয়, ওরা তাও করে না—গায়ে খড়ি উড়ছে, মাথা রুক্ষ, শরীর অন্নাভাবে শীর্ণ ও জ্যোতিহীন। হতভাগ্য মহা চীন, হতভাগ্য ভারতবর্ষ! দুজনেই দরিদ্র, কেউ খেতে পায় না,—গুরু শিষ্য দুজনের অবস্থাই সমান।

বিমলের মনে মনে এই দরিদ্রা নারী, এই দরিদ্র, হতভাগ্য, উৎপীড়িত মহা চীনের এই ভয়ার্ত, অসহায় কুঁড়েঘরবাসী চাষীমজুর—এদের প্রতি একটা গভীর অনুকম্পা ও সহানুভূতি জাগলো। মানুষ যখন দুঃখকষ্ট পায়, সবদেশে সর্বকালে তারা এক। চীন, ভারতবর্ষ, রাশিয়া, আবিসিনিয়া, স্পেন, মেক্সিকো, এদের মধ্যে দেশের সীমা এখানে মুছে গিয়েছে।

wapsip.com

এই অভাগিনী ভয়ব্যাকুলা দরিদ্রা নারী সমগ্র চীনদেশের প্রতীক।

বিমল এসেছে এক হতভাগ্য দেশ থেকে—এই হতভাগ্য দেশকে সাহায্য করতে। সে তা যথাসাধ্য করবে। দরকার হলে বুকের রক্ত দিয়েও করবে।

স্ত্রীলোকটি যখন বুঝতে পারলে যে এরা ডাকাত নয় বা বিদ্রোহী রেড্ আর্মির লোকও নয়, তখন সে উঠে ঘরে গিয়ে জল নিয়ে এসে সবাইকে খাওয়ালে।

ধাতুপাত্র বা চীনা মাটির পাত্র নেই বাড়িতে, এত গরিব সাধারণ লোক। লাউয়ের খোলায় জল রেখেছে।

চীনের বিশ্ববিখ্যাত মাটির বাসন, মিং রাজত্বের অপূর্ব প্রাচীন শিল্প, পুতুল, খেলনা, বুদ্ধ, দানব, এসব এই গরিবদের জন্যে নয়।

রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে খুব ভিড়। একখানা সৈন্যবাহী ট্রেন সিন্‌কিউ থেকে সাংহাই যাচ্ছে—প্রত্যেক স্টেশনে আবার নতুন ভর্তি-করা সৈন্যদের ওই ট্রেনেই উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সুরেশ্বর বিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ট্রেনের ছাদের দিকে।

সব কামরার ছাদে কাঁচা ডালপালা চাপানো—কোনোটায় শুকনো খড় বিচালি ছাওয়া।

বিমল বললে—এরোপ্লেন পাছে বোমা ফেলে ট্রেনে, তাই ওরকম করেছে বলে মনে হয়।

সাংহাই ৪৫০ মাইল দূরে।

হঠর হঠর করে করে সারাদিন ট্রেন কৃষিক্ষেত্র, অনুচ্চ পাহাড়, গ্রাম আর বস্তি পার হয়ে চলেছে, চলেছে। ট্রেনের গতি মন্দ নয়, পুরানো আমলের ইঞ্জিন বদলে নতুন ইঞ্জিন কেনা হয়েছে, বেশ জোরেই ট্রেন যাচ্ছে।

ওদের কামরাতে সাধারণ সৈন্যদল নেই অবিশ্যি। মাত্র জন আষ্টেক লোক, সবাই অফিসার শ্রেণীর, কিন্তু কেউ ইংরিজি জানে না। মহা অসুবিধেয় পড়ে গেল ওরা—কিছু দরকার হলে চাওয়া যায় না, নতুন কিছু দেখলে জিগ্যেস করা যায় না যে সেটা কি।

দুপুরের দিকে একটা ছোট শহরে গাড়ি দাঁড়াল এবং ওদের কামরাতে একজন সাদা সরু একগুচ্ছ লম্বা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ সৌম্যমূর্তি ভদ্রলোক উঠলেন, সঙ্গে তাঁর এগারোটি তরুণ যুবা। এদের সবারই বেশ সুন্দর কমনীয় চেহারা।

বিমল বললে—গুড মর্নিং স্যার।

বৃদ্ধের মুখ দেখে মনে হয় জগতে তাঁর আপন-পর কেউ নেই। তিনি সবাইর ওপর সন্তুষ্ট, জীবনে সবাইকে ভালবেসেছেন।

তিনি হাসিমুখে ইংরিজিতে বললেন—গুড মর্নিং, আপনারা কোথায় যাবেন।

বিমল বললে—সাংহাই। আপনারা কি অনেকদূর যাবেন?

—আমরা যাচ্ছি সাংহাই। আমি এখানকার কলেজের প্রোফেসর। আমার নাম লি। আমি সেখানে যাচ্ছি যুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে। এদেরও নিয়ে যাচ্ছি, এরা সবাই আমার ছাত্র। সদানন্দ বৃদ্ধ কথা শেষ করে গর্বিত দৃষ্টিতে তাঁর এগারোটি তরুণ ছাত্রের দিকে চাইলেন। বিমল ও সুরেশ্বরের বড় অদ্ভুত মনে হোল। এই ভয়ানক দিনে ইনি মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে চলেছেন সাংহাইতে, এতগুলি বালকের জীবন বিপন্ন করে।

একটু পরে বৃদ্ধের একটি ছাত্র একটি বেতের বাক্স থেকে কি সব খাবার বার করে সবাইকে খেতে দিলে। বৃদ্ধ সুরেশ্বর ও বিমলকেও তাঁদের সঙ্গে খেতে আহ্বান করলেন।

wapsip.com

সুরেশ্বর নিম্নস্বরে বললে—খেও না বিমল। ইঁদুর ভাজা কিম্বা আরসুলা চচ্চড়ি বোধ হয়।

কিন্তু সে সব কিছু নয়। শরবতী লেবুর রস দেওয়া কুমড়োর বীচি ভাজা আর শসার আচার।

বিমল বললে, 'প্রোফেসর লি, আপনি সাংহাইতে কোথায় উঠবেন। আমাদের সঙ্গে থাকুন না, আমরা যেখানে থাকবো?' হঠাৎ এরোপ্লেনের আওয়াজ কানে গেল—গাড়িসুদ্ধ সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে জানালার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখবার চেষ্টা করলে কোন্ দিক থেকে আওয়াজটা আসছে।

ছ'খানা এরোপ্লেন সারবন্দী হয়ে উড়ে পুব থেকে পশ্চিমের দিকে আসছে। ট্রেনখানার বেগ হঠাৎ বড় বেড়ে গেল। সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে, পরস্পরের মুখের দিকে চাইছে। কিন্তু এরোপ্লেনের সারি ট্রেনের ঠিক ওপর দিয়েই উড়ে চলে গেল শান্তভাবেই।

প্রোফেসর লি দিব্যি নির্বিকার ভাবেই বসেছিলেন। তিনি বললেন—আমাদের গভর্নমেন্টের এরোপ্লেন।

একটা স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম থেকে নারীকণ্ঠের কান্না শুনে বিমল ও সুরেশ্বর মুখ বাড়িয়ে দেখলে, কতকগুলি সৈন্য একটি দরিদ্রা স্ত্রীলোকের চারিধারে ঘিরে হাসছে—স্ত্রীলোকটির সামনে একটা শূন্য ফলের ঝুড়ি—এদিকে সৈন্যদের প্রত্যেকের হাতে এক একটা খরমুজ।

বিমল বললে—প্রোফেসর লি, আমরা তো নুতন দেশে এসেছি, কিছু বুঝিনে এদেশের ভাষা। বোধ হয় খরমুজওয়ালীর সব ফল এরা কেড়ে নিয়ে দাম দিচ্ছে না। আপনি একবার দেখুন না।

বৃদ্ধ তাঁর এগারোটি ছাত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বাধা দিলেন সৈন্যদের। চীনা ভাষায় তুবড়ি ছুটলো উভয় পক্ষেই।

বৃদ্ধের ছাত্রগণও তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দরকার হলে মারামারি করবে। মারামারি একটা ঘটতো হয়তো, কিন্তু সেই সময় জনৈক চীনা সামরিক অফিসার গোলমাল দেখে সেখানে উপস্থিত হতেই সৈন্যরা খরমুজ রেখে যে যার কামরায় উঠে বসলে। খরমুজওয়ালী গোটাকতক ফল লি ও তাঁর ছাত্রদের খেতে দিলে—বৃদ্ধ তার দাম দিয়ে দিলেন, খরমুজওয়ালীর প্রতিবাদ শুনলেন না।

সন্ধ্যার সময় ট্রেন ফু-চু পৌঁছুলো।

ফু-চু থেকে অনেকগুলি সৈন্য উঠলো। ট্রেন কিন্তু ছাড়তে চায় না—খবর পাওয়া গেল, সামনের রেলপথে কি একটা গোলমালের দরুণ ট্রেন ছাড়বার আদেশ নেই।

এ দেশে সময়ের কোনো মূল্য নেই। চার পাঁচ ঘণ্টা ওদের ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। সৈন্যদল নেমে যে যার খুশি-মত স্টেশনে পায়চারি করছে, তারের বেড়া ডিঙিয়ে ওপাশের বাজারের মধ্যে ঢুকে হল্লা করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে বেড়াচ্ছে।

একটা ছোট ছেলে তারের একরকম যন্ত্র বাজিয়ে গাড়িতে গাড়িতে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিল। প্রোফেসর লি তাকে ডেকে কি জিগ্যেস করলেন, তাকে কিছু খাবার দিলেন। তাঁরই মুখে বিমল ও সুরেশ্বর শুনলে ছেলেটি অনাথ, স্থানীয় আমেরিকান মিশনে প্রতিপালিত হয়েছিল—এখন সেখানে আর থাকে না।

সন্ধ্যার আগে ট্রেন ছাড়লো। সারা রাতের মধ্যে যে কত স্টেশন পার হোল, কত স্টেশন বিনা কারণে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল—তার লেখাজোখা নেই। এই রকম ধরনের

wapsip.com

রেলভ্রমণ বিমল ও সুরেশ্বর কখনো করেনি।

ভোরের দিকে ট্রেনখানা একজায়গায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো।

বিমল ঘুমুচ্ছিল—ঝাঁকুনি খেয়ে ট্রেনখানা দাঁড়াতেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিমল দেখলে দুধারের মাঠে ঘন কুয়াশা হয়েছে, দশহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না—সামনের দিকে লাইনের ওপর আর একখানা ট্রেন যেন দাঁড়িয়ে—কুয়াশায় তার পেছনের গাড়ির লাল আলো ক্ষীণভাবে জ্বলছে।

প্রোফেসর লি-ও ইতিমধ্যে উঠেছেন।

তিনি বললেন—ব্যাপারটা কি?

বিমল বললে—সামনে দুখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে এই তো দেখছি। ঘোর কুয়াশা, বিশেষ কিছু দেখা যায় না।

ট্রেন থেকে লোকজন নেমে দেখতে গেল সামনের দিকে এগিয়ে। খুব একটা গোলমাল যেন শোনা যাচ্ছে সামনে।

সুরেশ্বরও উঠেছিল, বললে—চলো বিমল, এগিয়ে দেখে আসি।

প্রোফেসর লি-ও নামলেন ওদের সঙ্গে। দুখানা ট্রেনকে ঘন কুয়াশার মধ্যে অতিক্রম করে রেললাইনের সামনে গিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়লো তা যেমন বীভৎস, তেমনি করুণ।

সেখানে আর একখানা ছোট সৈন্যবাহী ট্রেন দাঁড়িয়ে—কিন্তু বর্তমানে সেখানাকে ট্রেন বলে চিনে নেওয়ার উপায় নেই বললেই হয়। ছাদ উড়ে গিয়েছে, মোটা মোটা লোহার দণ্ড বেঁকে দুমড়ে লাইনের পাশের খাদে ছিটকে পড়েছে—জানলা-দরজার চিহ্ন বড় একটা নেই। কেবল ইঞ্জিনের কিছু হয় নি। শোনা গেল ট্রেনখানার ওপর বোমা পড়েছে এই কিছুক্ষণ আগে—কিন্তু সুখের বিষয় গাড়িখানা একদম খালি যাচ্ছিল। এখানা কোনো টাইমটেবলভুক্ত যাত্রী বা সৈন্যবাহী ট্রেন নয়। খালি ট্রেনখানা ফু-চু থেকে সাংহাই যাচ্ছিল, ডাউন লাইনে বড়গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে এর কামরাগুলো এই উদ্দেশ্যে। গার্ড ও ড্রাইভার বেঁচে গিয়েছে। কোনো প্রাণহানি হয়নি।

লাইন পরিষ্কার করতে বেলা এগারোটা বেজে গেল। মাত্র পনেরো মাইল দূরে সাংহাই, সেখানে পৌঁছুতে বেজে গেল একটা।

সাংহাই নেমে বিমল ও সুরেশ্বর বুঝলে এ অতি বৃহৎ শহর; সাংহাই-এর রাস্তাঘাট খুব চওড়া ও আধুনিক ধরনে তৈরি, বড় বড় বাড়ি, দোকান, হোটেল, আপিস, স্কুল, কলেজ—চীনা ও ইংরাজি ভাষায় নানা সাইনবোর্ড চারিদিকে, মোটরের ও রিকশা-গাড়ির ভিড়, রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য, চায়ের দোকান, চীনা ভাতের দোকানে ছোট বড় ইঁদুর ভাজা ঝোলানো রয়েছে, ফলওয়ালী রাস্তার ধারে বসে ফল বিক্রী করছে—এত বড় শহরের লোকজন ও ব্যবসাবাণিজ্য দেখলে কেউ বলতে পারবে না যে এই সাংহাই শহরের ওপর বর্তমানে জাপানী সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করতে আসছে পিকিং থেকে।

কিছু বদলায় নি যেন, মনে হয় প্রতিদিনের জীবনযাত্রা সহজ ও উদ্বেগশূন্য ভাবেই চলেছে।

এখানে প্রোফেসর লি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। খুব বড় ধূসর রংয়ের সামরিক লরীতে চড়ে ওরা একটা বড় লম্বামতো বাড়ির সামনে নীত হোল।

বাড়িটা সামরিক বিভাগের একটা বড় দপ্তরখানা, এ ওদের বুঝতে দেরি হোল না—ইউনিফর্ম পরা সৈন্যদল ও অফিসারে ভর্তি। প্রতি কামরায় চীনা ভাষায় সাইনবোর্ড

wapsip.com

আঁটা। অফিসার দল ঢুকছে বেরুচ্ছে, সকলের মুখেই ব্যস্ততার ভাব, উদ্বেগের চিহ্ন।

দু তিন জায়গায় ওদের নাম লেখা হোল—ওদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে যে চীনা অফিসার, সে প্রত্যেক জায়গায় একটা লম্বা হলদে চীনা ভাষায় লিখিত কাগজ খুলে ধরলে টেবিলের ওপর।

তবুও আইনকানুন শেষ হোল না—অবশেষে একটা কামরার সামনে ওদের দাঁড় করালে। কামরার মধ্যে নিশ্চয় কোনো বড় কর্মচারীর আড্ডা, কারণ কামরার সামনে দর্শনপ্রার্থী সামরিক অফিসার ও অন্যান্য লোকের ভিড় লেগেছে।

ভিড় ঠেলে একটু কাছে গিয়ে বিমল পড়লে দরজার গায়ে পিতলের ফলকে ইংরিজিতে লেখা আছে—জেনারেল চু-সিন্-টে, অফিসার কমান্ডিং নাইনটিনথ্ রুট আর্মি। ওদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি—জেনারেল সাহেবের কামরায় শীঘ্রই ডাক পড়লো। বড় টেবিলের ওপাশে এক সুশ্রী, সামরিক ইউনিফর্ম পরিহিত যুবা বসে, ইনিই জেনারেল চু-টে, পূর্বে বিদ্রোহী কমিউনিস্ট সৈন্যদলের নেতা ছিলেন, বর্তমানে জেনারেল চিয়াং-কৈ-শাক-এর বিশিষ্ট সহকর্মী।

হাসিমুখে জেনারেল চু-টে মার্জিত ইংরিজিতে বললেন, গুড মর্নিং, আপনাদের কোনো কষ্ট হয় নি পথে?

এরাও হাসিমুখে কিছু সৌজন্য সূচক কথা বললে।

জেনারেল চু-টে বললেন—আমি ভারতবর্ষের লোকদের বড় ভালবাসি। আপনারা আমাদের পর নন।

বিমল বললে—আমরাও তাই ভাবি।

—মহাত্মা গান্ধী কেমন আছেন? ঐ একজন মস্ত লোক আপনাদের দেশের!

জেনারেল চু-টে'র মুখে মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনে বিমল ও সুরেশ্বর দুজনেই আশ্চর্য হয়ে গেল। তবে মহাত্মা গান্ধী তো আর ওদের বাড়ির পাশের প্রতিবেশী ছিলেন না, সুতরাং তাঁর দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ওদের কোনো জ্ঞান নেই—তার ওপর ওরা আজ দু'মাস দেশ ছাড়া।

—ভালই আছেন। ধন্যবাদ—

—মিঃ জহরলাল নেহেরু ভাল আছেন? আমি তাঁকে শীগগির একটা চিঠি লিখছি আমাদের দেশের জন্য ভারতের সাহায্য, কংগ্রেসের সাহায্য চেয়ে।

বিমল ও সুরেশ্বরের বুক গর্বে ফুলে উঠলো। একজন স্বাধীন দেশের বীর সেনানায়কের মুখে তাদের দরিদ্র ভারতের নেতাদের কথা শুনে, চীনদেশ ভারতের কাছে সাহায্যপ্রার্থী একথা শুনে ওরা যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছে।

জেনারেল চু-টে বললেন—আমার এক সময় অত্যন্ত ইচ্ছে ছিল ভারতে বেড়াতে যাবো। নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। ভারতে ভাল বৈমানিক তৈরি হচ্ছে? এরোপ্লেন চালাবার ভাল স্কুল কোথাও স্থাপিত হয়েছে?

বিমলেরা এ খবর রাখে না। দমদমায় একটা যেন ঐ ধরনের কিছু আছে—তবে তার বিশেষ কোনো বিবরণ ওরা জানে না।

চু-টে বললেন—আপনাদের ধন্যবাদ, এদেশকে আপনারা সাহায্য করতে এসেছেন। আপনাদের ঋণ কখনো চীন শোধ দিতে পারবে না। আপনারা পথ দেখিয়েছেন। আপনাদের প্রদর্শিত পথে দুই দেশের মিলন আরও সহজ হোক এই কামনা করি।

wapsip.com

বিমল বললে—এখন কি আমাদের সাংহাইতে থাকতে হবে?

—কিছুদিন। বৈদেশিক মেডিকেল ইউনিট আমেরিকান ডাক্তার ব্লুমফিল্ডের অধীনে। এখন আপনাদের থাকতে হবে মার্কিন কন্‌সেশনে—সাধারণ শহরে নয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে চীন গভর্নমেন্ট আপনাদের জীবনের জন্য দায়ী। সাধারণ শহরে বোমা পড়বে, হাতাহাতি যুদ্ধ হবে—এখানে কারও জীবন নিরাপদ নয়। আন্তর্জাতিক কন্‌সেশনে আমরা হাসপাতাল খুলেছি। সেখানে আপনারা কাজ করবেন।

—ইওর এক্সেলেন্সি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, যদি বেয়াদবি না হয়!

—বলুন?

—সাংহাই কি জাপানীরা আক্রমণ করবে বলে আপনি ভাবেন?

জেনারেল চু-টে বললেন—এ তো আন্দাজের কথা নয়—সাংহাই-এর দিকেই তো ওরা পিকিং থেকে আসছে। সেনসি হচ্ছে লুংহাউ রেলের শেষপ্রান্ত। সেখানে আমরা সৈন্য জড়ো করছি ওদের বাধা দিতে। যাতে উত্তর-পশ্চিম চীনে আর না এগুতে পারে। তবে সাংহাইতে একটা বড় যুদ্ধ হবে অল্পদিনের মধ্যেই। মেডিকেল ইউনিটের আরও সেইজন্যে সাংহাইতেই এখন দরকার।

সুরেশ্বরও বিমল অভিবাদন করে বিদায় নিলে!

সৈন্যবিভাগের দপ্তরখানা থেকে বার হয়ে ওরা মোটরে চড়ে আন্তর্জাতিক কনসেশনে পৌঁছলো। বিমল ও সুরেশ্বর লক্ষ্য করলে ব্রিটিশ প্রজা হলেও ওদের ব্রিটিশ কনসেশনে না নিয়ে গিয়ে ফরাসী কনসেশনে নিয়ে যাওয়া হোল! ওদের সঙ্গে দুজন চীনা সামরিক কর্মচারী ছিল, আবশ্যকীয় কাগজপত্র তারাই দেখালে বা সই করলে।

প্রকাণ্ড ব্যারাক। কড়া সামরিক আইন কানুন। হুকুম না নিয়ে কনসেশনের সীমার বাইরে যাবার নিয়ম নেই, ঢোকবারও নিয়ম নেই। ফরাসী সান্ত্রী রাইফেল হাতে সর্বদা পাহারা দিচ্ছে। ফরাসী জাতীয় পতাকা উড়ছে ব্যারাকের পতাকা মন্দিরে। ওদের যাবার দুদিন পরে একদল আমেরিকান যুবক কনসেশনে এসে পৌঁছুলো—এরা বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এসেছে চীন গভর্নমেন্টকে সাহায্য করতে, নিজেদের সুখ সুবিধা বিসর্জন দিয়ে, প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করে। এদের মধ্যে তিনটি তরুণী ছাত্রীও ছিল, এরা এল সেদিন সন্ধ্যাবেলা। এদের কনসেশনে ঢোকানো নিয়ে চীনা গভর্নমেন্টকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

একটি মেয়ের নাম এ্যালিস ই. হুইটবার্ন। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। বিমলের সঙ্গে সে যেচে আলাপ করলে। যেমনি সুশ্রী, তেমনি অদ্ভুত ধরনের প্রাণবন্ত, সজীব মেয়ে। কুড়ি একুশ বয়েস—চোখেমুখে বুদ্ধির কি দীপ্তি!

বিমল তাকে বললে—মিস হুইটবার্ন, তুমি ডাক্তারির ছাত্রী ছিলে?

মেয়েটি বললে—না! আমি নার্স হবো আন্তর্জাতিক রেড ক্রসে কিংবা চীনা সামরিক বিভাগের হাসপাতালে।

—তোমার বাপ-মা আছেন?

—আছেন। আমার বাবা ঘোড়ার শিক্ষক। খুব নাম-করা লোক আমাদের কাউন্টিতে।

—তাঁরা তোমাকে ছেড়ে দিলেন?

—তাঁদের বুঝিয়ে বললাম। জগতের এক হতভাগা জাতি যখন এত দুর্দশা ভোগ করছে, তখন পড়াশুনো বা বিলাসিতা কি ভাল লাগে? আমি আমার সেন্ট্ আর পাউডারের টাকা জমিয়ে, টকির পয়সা জমিয়ে, পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এদের সাহায্যের জন্যে মার্কিন

wapsip.com

রেডক্রস ফাণ্ডে। তারপর নিজেই না এসে পারলুম না—তুমিই বলো না মিঃ বোস পারা যায় থাকতে?

বিমল মুগ্ধ হয়ে গেল এই বিদেশিনী বালিকার হৃদয়ের উদারতার পরিচয় পেয়ে। স্বাধীন দেশের মেয়ে বটে! সংস্কারের পুঁটুলী নয়।

মেয়েটা বললে—আমাকে এ্যালিস বলে ডেকো। একসঙ্গে কাজ করবো, অত আড়ষ্ট ভদ্রতার দরকার নেই। আমার একখানা ফটো দেবো তোমায়, চলো তুলিয়ে আনি দোকান থেকে।

কনসেশনের মধ্যে প্রায়ই সব আমেরিকান দোকান। মেয়েটি বললে, চলো সাংহাই শহরের মধ্যে একটু বেড়িয়ে আসি—কোনো চীনা দোকানে ফটো তুলবো। ওরা দু পয়সা পাবে।

অনুমতি নিয়ে আসতে আধঘণ্টা কেটে গেল, তারপর বিমল আর এ্যালিস কনসেশনের বড় ফটক দিয়ে সাংহাইয়ে যাবার রাস্তার ওপরে উঠে একখানা রিকশা ভাড়া করলে।

কনসেশনে রাস্তাঘাটের নাম ইংরাজিতে ও ফরাসী ভাষায়। সাংহাই শহরে চীনা ভাষায়। কিছু বোঝা যায় না। ঢলঢলে নীল ইজের ও স্ট্র হ্যাট পরে চীনা রিকশাওয়ালা রিকশা টানছে কিন্তু এ অংশেও বহু বিদেশী লোক ও বিদেশী দোকান পসারের সারি। সাংহাই-এর আসল চীনাপল্লী আলাদা—রাস্তা সেখানে আরও সরু সরু—একথা বিমল ইতিমধ্যে চীনা অফিসারদের মধ্যে শুনেছিল।

এ্যালিস বললে—চলো, চীনাপাড়া দেখে আসি, মিঃ বোস।

রিক্‌শাওয়ালাকে চীনাপাড়ার কথা বলতেই সে বারণ করলে। বললে—সেখানে কেন যাবে। এ সময় সে সব জায়গা ভাল না?। বিপদে পড়তে পারো। তোমাদের সেখানে নিয়ে গেলে আমায় পুলিশে ধরবে।

এ্যালিস ভয় পাবার মেয়েই নয়। বললে—চলো, মিঃ বোস, আমরা হেঁটেই যাবো। ওকে বিপদে ফেলতে চাই নে। ওর ভাড়া মিটিয়ে দিই।

বিমল রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে দিলে, এ্যালিসকে দিতে দিলে না। কিন্তু রাস্তা দুজনে কেউই জানে না।

বিমল বললে—একখানা ট্যাক্সি নিই, এ্যালিস! সে অনেকদূর, রাস্তা না জানলে ঘুরে হয়রান হবো।

হঠাৎ এ্যালিস ওপরের দিকে চেয়ে বললে—ও কি ও, মিঃ বোস? এরোপ্লেনের শব্দ শুনছো? অনেকগুলো এরোপ্লেন একসঙ্গে আসছে যেন। কোন্‌দিকে বলো তো?

বিমলও শুনলে। বললে—গভর্নমেন্টের এরোপ্লেন।

কিন্তু চক্ষের নিমেষে একটা কাণ্ডের সূত্রপাত হোল, যা বিমলের অভিজ্ঞতার বাইরে!

সামনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির ওপর বিকট এক আওয়াজ হোল—বাজপড়ার আওয়াজের মত—সঙ্গে সঙ্গে এদিকে, ওদিকে, সামনে, পিছনে পরপর সেই রকম ভীষণ আওয়াজ। ইট, চুন, টালি চারিদিকে ছুটতে লাগালো। বিরাট শব্দ করে সামনে সেই বাড়িটার তেতলার ছাদ ধ্বসে পড়লো ফুটপাথের ওপর। বাড়িধ্বসা চুন সুরকির ধুলোয় ও কিসের ঘন শ্বাসরোধকারী ধোঁয়ায় বিমল ও এ্যালিসকে ঘিরে ফেললে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠলো মানুষের গলার আর্ত চীৎকার, গোলমাল, গোঙানি, কাতর কাকুতি অনুনয়ের শব্দ, দুড়দাড় শব্দে ছুটে চলার পায়ের শব্দ, কান্নার শব্দ, সে এক ভয়ানক কাণ্ড!

wapsip.com

বিমল প্রথমটা বুঝতে না পেরে সেই ঘন ধূম আর ধূলির মধ্যে হতভম্বের মত খানিক দাঁড়িয়ে রইল—ব্যাপার কি? তারপরেই বিদ্যুৎ চমকের মত তার মনে হল এ জাপানী এরোপ্লেনের বোমা বর্ষণ!

এ্যালিস কই? একহাতের দূরের মানুষ চোখে পড়ে না, সেই ধোঁয়া ধুলো আর গোলমালের মধ্যে। ওর কানে গেল এ্যালিসের উচ্চ ও সশঙ্ক কণ্ঠস্বর—মিঃ বোস, এসো—আমার হাত ধরো—বোমা পড়ছে—দৌড় দাও!

অন্ধকারের মধ্যে বিমল এ্যালিসের হাত শক্ত মুঠোয় ধরে বললে—কোথাও নড়ো না এ্যালিস, নড়লেই মারা যাবে। দাঁড়াও এখানে।

কিন্তু তখন আর ছুটবার বা পালাবার পথও নেই। পরবর্তী পাঁচ মিনিট কালের ঠিক হিসেব বিমল দিতে পারবে না। সে নিজেও জানে না। বাঁশঝাড়ে আগুন লাগলে যেমন গাঁটওয়ালা বাঁশ ফটফট করে একটার পর একটা ফাটে তেমনি চারিদিকে দুম দাম শুধু বোমা ফাটার বিকট আওয়াজ।

পায়ের তলায় মাটি যেন দুলছে, টলছে ভূমিকম্পের মত—ধোঁয়া, বাড়ি ধ্বসে পড়ার হুড়মুড় শব্দ, আর্তনাদ—তারপরে সব চুপচাপ, বোমার আওয়াজ থেমে গেল। বিমল চেয়ে দেখলে এরোপ্লেনগুলো মাথার ওপরে চক্রাকারে দুবার ঘুরে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে চলে গেল—বেশ যেন নিরুপদ্রব, শান্ত ভাবেই।

ধোঁয়ায় মিনিট দুই তিন কিছু দেখা গেল না—যদিও গোলমাল, চীৎকার লোক জড়ো হওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশের তীব্র হুইসল্ বেজে উঠলো একবার—দুবার, তিনবার।

ক্রমে ক্রমে ধুলো আর ধোঁয়ার আবরণ কেটে যেতেই এ্যালিস বললে—চলো এগিয়ে গিয়ে দেখি, মিঃ বোস—

সামনে একজায়গায় ফুটপাথের ওপর বেজায় লোক জড়ো হয়েছে। একটা বাড়ি পড়েছে ভেঙে। অতি বীভৎস দৃশ্য ফুটপাথের ওপর। অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ছিন্ন ভিন্ন দেহ ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে আছে সেখানটায়। বাড়িটা বোধহয় একটা চীনা স্কুল ছিল—বেলা এগারোটা, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছিল, কতক ছিল স্কুলবাড়ির মধ্যে। বাড়িখানা একেবারে হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ফুটপাথ ও রাস্তার খানিকদূর পর্যন্ত।

হর্ন বাজিয়ে দুখানা রেডক্রশ অ্যাম্বুলেন্স এল! একটা ছোট ছেলে এখনও নড়ছে—এ্যালিস ছুটে তার পাশে গিয়ে বসলো। বিমল এক চমক দেখেই বললে—কোনো আশা নেই মিস হুইটবার্ন—ও এখুনি যাবে।

বিমলের গা তখনও কাঁপছে। জীবনে এ রকম দৃশ্য কখনো দেখবার কল্পনাও সে করেনি। যুদ্ধ না শিশুপাল বধ!

এ্যালিস বিমলের কাজ অনেক সংক্ষেপ হয়ে গিয়েছিল।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আহত কেউ ছিল না—সবাই মৃত।

সব শেষ হয়ে যাবার পরে বিমল বললে—এ্যালিস, এখন কি করবে? আর কি চীনে পল্লীতে যাবে এখন?

এ্যালিস বললে—যেতাম কিন্তু এই যে বোমা-ফেলা হয়ে গেল, এর শোরগোলে অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে তো। কনসেশনের সবাই আমাদের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়বে। সুতরাং চলো ফেরা যাক।

wapsip.com

কিছুদূরে যেতেই দেখলে হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স ছুটোছুটি করছে। চীনা গভর্নমেন্টের অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্‌ট কামানগুলো চারদিক থেকে ছোঁড়া হতে লাগলো—কিন্তু তখন জাপানী বিমান কোথায়? আকাশের কোনো দিকেই তার পাত্তা নাই।

ওরা কনসেশনে ফিরে এল। সুরেশ্বরের কাছে বিমল খুব বকুনি খেল, তাকে ফেলে যাওয়ার জন্যে।

এ্যালিস বললে—ওকে বকছো কেন—আমি ভেবেছি আজ বিকেলে আবার চীনা পাড়ায় যাবার চেষ্টা করবো। তুমি চলো না, সুরেশ্বর?

এবার ওদের সঙ্গে আর একটি মেয়ে যাবে বললে। এ্যালিসের সঙ্গে পড়তো, নাম তার মিনি—মিনি বেরিংটন।

বিকেলে ওরা ট্যাক্সি আনালে। ওদের ট্যাক্সি কনসেশনের গেট পর্যন্ত এসেছে—এমন সময় একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্মচারী ওদের ট্যাক্সিখানা থামালে।

বললে—আপনারা কোথায় যাবেন?

বিমল বললে—শহর বেড়াতে।

—যাবেন না। আমরা গুপ্ত খবর পেয়েছি, জাপানী যুদ্ধ জাহাজ বন্দরের বাইরের সমুদ্র থেকে লম্বা পাল্লার কামানে গোলাবর্ষণ শুরু করবে আজ সন্ধ্যার সময়ে—সেই সঙ্গে জাপানী উড়ো জাহাজও যোগ দেবে বোমা ফেলতে।

—ধন্যবাদ। আমরা একটু ঘুরে এখুনি চলে আসবো।

একথা বললে এ্যালিস—কাজেই বিমল বা সুরেশ্বর কিছু বলতে পারলে না। শহরের মধ্যে এসে দেখলে, পুলিশ সকলের হাতে চীনা ভাষায় মুদ্রিত এক এক টুকরো কাগজ বিলি করছে। চীনা ছাত্রদের একটা লম্বা দল পতাকা উড়িয়ে মুখে কি বলতে বলতে শোভাযাত্রা করে চলেছে।

সাংহাই অতি প্রকাণ্ড শহর। এত বড় শহর বিমল দেখে নি—সুরেশ্বরও না। কলকাতা এর কাছে লাগেই না।

চীনাপল্লীর নাম চা-পেই। সে জায়গাটায় রাস্তাঘাট কিন্তু অপরিসর নয়—তবে বড় ঘিঞ্জি বসতি। প্রত্যেক মোড়ে খাবারের দোকান, ছোট বড় ইঁদুর ভাজা ঝুলছে। বাঁকে করে ফিরিওয়ালা ভাত তরকারি বিক্রি করছে।

বিমলের ভারি ভালো লাগলো এই চীনাপাড়ার জীবনস্রোত। এক জায়গায় একটা বুড়ি বসে ভিক্ষে করছে—টাকা-পয়সার বদলে সে পেয়েছে ভাত তরকারি, ওর মুখে এমন একটি উদার ভালবাসার ভাব, চোখে সন্তোষ ও তৃপ্তির দৃষ্টি। বোধ হয় আশাতীত ভাত তরকারি পেয়েছে বলে এত খুশি হয়ে উঠেছে মনে মনে। প্রাচ্য-ভূখণ্ডের দারিদ্র্য ও সহজ সরল সন্তোষের ছবি যেন এই বৃদ্ধা ভিখারিনীর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

হঠাৎ আকাশে কি একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ শুনে ওরা মুখ তুলে চাইলে। একটা চাপা 'সোঁ-ও-ও' শব্দ। মিনি সর্বপ্রথমে বলে উঠল—এ শেলের শব্দ! সর্বনাশ, এ্যালিস, চলো আমরা ফিরি —জাপানী যুদ্ধজাহাজের কামান থেকে শেল ছুঁড়ছে!

দুম! দুম!—দূরে অস্পষ্ট কামানের আওয়াজ শোনা গেল।

কাছেই কোথায় একটা ভীষণ বিস্ফোরণের আওয়াজ হোল সঙ্গে সঙ্গে। লোকজন চারিধারে ছুটতে লাগলো—ওরাও ছুটলো তাদের পিছু পিছু। বসতি যেখানে খুব ঘিঞ্জি, সেখানে একটা বাড়িতে গোলা পড়েছে। বাড়িটার সামনের অংশ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—ইট,

wapsip.com

চুন, টালিতে সামনের রাস্তাটা প্রায় বন্ধ—কে মরেছে না মরেছে বোঝা যাচ্ছে না, সেখানে লোকজনের বেজায় ভিড়।

আবার সেই রকম 'সোঁ—সোঁ—ও—ও' শব্দ!

কাছেই আর একটা জায়গায় গোলা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে সারবন্দী একদল এরোপ্লেন দেখা গেল। তারা অনেক উঁচু দিয়ে যাচ্ছে, পাছে চীনা বিমানধ্বংসী কামানের গোলা খেতে হয় এই ভয়ে।

এ্যালিস বললে—ওরা পাল্লা ঠিক করে দিচ্ছে যুদ্ধ জাহাজের গোলন্দাজদের। চলো এখানে আর থাকা নয়—এই চীনা পাড়াটা ওদের লক্ষ্য।

কিন্তু ওদের যাওয়া হোল না। এ্যালিসের কথা শেষ হতে না হতেই, যেন একটা ভীষণ ভূমিকম্পে, পায়ের তলায় মাটি দুলে উঠল এবং একসঙ্গে দু'তিনটি শেলের বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ ও সেই সঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া ও বিশ্রী শ্বাসরোধকারী কর্ডাইট-এর উগ্র গন্ধ পাওয়া গেল। তুমুল হৈ চৈ, আর্তনাদ, কলরব ও পুলিশের হুইসলের মাঝে এ্যালিসের হাত ধরলে বিমল, মিনির হাত ধরলে সুরেশ্বর, কিন্তু পালাবার পথ নেই তখন কোনো দিকেই। ওদের ট্যাক্সিখানা দাঁড়িয়ে আছে বটে, টাক্সিওয়ালার সন্ধান নেই—সে বোধ হয় পালিয়েছে।

চা-পেই পল্লীর ওপর কেন বিশেষ লক্ষ্য জাপানী তোপের, এ কথা বোঝা গেল না, কারণ এখানে চীনা গৃহস্থদের বাড়িঘর মাত্র, কোনো সামরিক ঘাঁটি তো নেই এখানে। দেখতে দেখতে বাড়িঘর ভেঙে গুঁড়ো হয়ে পড়ে সামনের পেছনের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। লোকজন আগে যা কিছু মারা পড়েছিল—এখন সবাই পালিয়েছে কেবল যারা ভাঙাবাড়ির মধ্যে আটকে পড়েছে তাদেরই আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

একটা ভগ্নস্তূপের মধ্যে যেন ছোট ছেলের কান্নার শব্দ। এ্যালিস বললে—দাঁড়াও বিমল—এখানে সবাই দাঁড়াও।

গোলাবর্ষণ তখনও চলছে, কিন্তু চীনাপল্লীর অন্য অঞ্চলে। এদিকে এখন শুধু গোঙানি, চীৎকার, হৈ-চৈ কলরব ও কাতরোক্তি।

এ্যালিস আগে চড়লো গিয়ে ধ্বংসস্তূপের ওপরে। পেছনে মিনি ও সুরেশ্বর। বিমল নিচে দাঁড়িয়ে রইল। একটা কড়িকাঠ সরিয়ে ওরা তিনজনে একটা দরজা পেলে। তারপর একটা ছোট ঘর। এ্যালিস অতি কষ্টে ঘরে ঢুকলো—সুরেশ্বর ওকে সাহায্য করলে। একটা ন-দশ মাসের শিশু সেই ঘরের মেঝেতে অক্ষত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

এ্যালিস তাকে সন্তর্পণে মেঝে থেকে তুলে সুরেশ্বরের হাতে দিলে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ঘরটার মধ্যে অন্ধকার। তিনজনে ঘরের মধ্যে থেকে ইটকাঠের স্তূপটার ওপরে উঠে শুনলে, বিমল উত্তেজিত ভাবে ডাকছে—আঃ, কোথায় গেলে তোমরা? চট করে নেমে এসো—বড় বিপদ!

চারিদিকের গোলা ফাটবার আওয়াজ ও ছুটন্ত শেলের চাপা 'সোঁ—ও—ও' রব খুব বেড়েছে। একটা একটা শেল মাঝে মাঝে আকাশেই সশব্দে ফেটে তারাবাজির মত অনেকখানি আকাশ আলো করে ছড়িয়ে পড়ছে।

এ্যালিস বললে—কি হয়েছে?

বিমল বললে—জাপানী সৈন্যদল যুদ্ধজাহাজ থেকে নেমেছে শহরে—তারা শহর আক্রমণ করছে শুনছি। এইদিকেই আসছে। তাদের হাতে পড়া আদৌ আনন্দদায়ক ব্যাপার

wapsip.com

হবে না—তোমার হাতে ওকি?

মিনি বললে—একটা ছোট্ট ছেলে। একে কোথায় রাখি বল তো এখন?

সুরেশ্বর একজন ব্যস্ত ও উত্তেজিত পুলিশম্যানকে জিগ্যেস করে জানলে— সমুদ্রের ধারে জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে চীনাদের হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। জাপানীরা নগরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে।

এ্যালিস বললে—আমরা এখন ছোট ছেলেটিকে কোথায় রাখি বল না? কনসেশনের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। ওর বাপ-মা এই অঞ্চলের অধিবাসী। ছেলের সন্ধান পাবে না কনসেশনে নিয়ে গেলে।

বিমল বললে—পুলিশম্যানদের জিম্মা করে দাও না।

এ্যালিস ও মিনি তাতে রাজি হোল না। এই সব চীনা পুলিশম্যান দায়িত্বজ্ঞানহীন, ওদের হাতে ছোট্ট ছেলেকে ওরা দেবে না।

সমস্ত গলিটা বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে—লোকজন অন্ধকারে তার মধ্যে কি সব খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন সময়ে পাশের একটা স্তূপে দু' তিনটি হারিকেন লণ্ঠন ও টর্চ জ্বালিয়ে একদল ছোকরা একটি মৃতদেহের ঠ্যাং ধরে বার করছে দেখা গেল।

বিমল উত্তেজিত সুরে বলে উঠলো—প্রোফেসর লি! প্রোফেসর লি!

তারপরেই সে ছুটে গেল ছোকরার দলের দিকে। সুরেশ্বর দেখলে ছোকরার দলের নেতা হচ্ছেন দাড়িওয়ালা একজন বৃদ্ধ—এবং তিনি তাদের পূর্বপরিচিত প্রোফেসর লি।

সেই মুমূর্ষুদের আর্তনাদ ও পথের লোকের চীৎকারের মধ্যে তিনজনের ব্যাকুল প্রশ্ন বিনিময় হোল। প্রোফেসর লি তাঁর ছাত্রদল নিয়ে নিকটেই এক সরাইখানায় ছিলেন—হঠাৎ এই বোমাবর্ষণের দুর্যোগ—এখন তিনি সেবাব্রতী, ছাত্রদের নিয়ে হতাহতদের টেনে বার করা ও তাদের হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

এ্যালিস ও মিনির সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেওয়া হোল।

বিমল বললে—প্রোফেসর লি, এই ছোট ছেলেটির কি ব্যবস্থা করা যায় বলুন তো?

সদানন্দ, সৌম্য বৃদ্ধ হাত পেতে বললেন—আমায় দাও। তোমরা ওর বাপমায়ের সন্ধান করতে পারবে না, আমি পারবো। আর কি জানো, ছেলে অনেকগুলো জমেছে—চ্যাং, এদের নিয়ে চলো তো? দেখবে এসো তোমরা—যাবার পথে একটু দূর গিয়েই বিমল বলে উঠলো—আঃ, কি ব্যাপার দেখ!

সকলেই দেখলে, সে দৃশ্য যেমন বীভৎস তেমনি করুণ। সেই বৃদ্ধা ভিখারিনী ঠ্যাং ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে—সেই জায়গাতেই। একখানা হাত প্রায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে—পাশেই তার ভিক্ষালব্ধ ভাত-তরকারিগুলো রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে! আশার জিনিসগুলো—মুখেও দিতে পারেনি হয়তো।

এ্যালিসের চোখে জল এল। বিমল ও সুরেশ্বর মাথার টুপি খুলে বসল। মিনি চোখে রুমাল দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালে। কেবল অবিচলিত রইলেন প্রোফেসর লি। তিনি ছাত্রদের বললেন, এই মড়াটাকে একটা কিছু ঢাকা দাও তো হে! এ আর কি? আমাদের দেশের এ তো রোজকার ব্যাপার! এতে বিচলিত হলে চলে না মাদাম!

নিকটেই একটা ঘরের মধ্য প্রোফেসর লি ওদের নিয়ে গেলেন। হারিকেন লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল সে ঘরের মেঝেতে পাঁচ ছয়টি নয় দশমাসের কি এক বছরের শিশু অনাবৃত মেঝের ওপর পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, কেউ কাঁদছে, কেউ হাসছে!

wapsip.com

এ্যালিস ছুটে গিয়ে তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে—'ও' ইউ পুওর ডিয়ারিজ্!

প্রোফেসর লি হেসে বললেন—সন্ধ্যা থেকে এতগুলো উদ্ধার করেছি স্তূপ থেকে। আপনাদেরটিও দিন। আমার দুটি ছাত্র এখানে পাহারা দিচ্ছে—আমরা খুঁজে এনে এখানে জড়ো করছি—রাখো এখানে।

গোলমাল ও ভিড় তখন একটু কমেছে।

প্রোফেসর লি সকলকে বললেন—আসুন, একটু চা খাওয়া যাক—রাত্রে আর ঘুম হবে না আজ, সারারাত এই রকম চলবে দেখছি—

যে ঘরে শিশুগুলিকে জড়ো করা হয়েছে, তার পার্শ্বেই একটা ছোট বাড়িতে লি থাকেন তাঁর ছাত্রবৃন্দ নিয়ে। দুজন ছাত্রকে শিশুদের কাছে রেখে বাকি সকলে ওদের নিয়ে গেল তাদের সেই বাসায়।

ছোট ছোট পেয়ালায় দুধ-চিনি-বিহীন সবুজ চা, শসার বিচি ভাজা, শরবতী লেবুর টুকরো এবং বাঙালী মেয়েদের পাঁয়জোড়ের মত দেখতে শুয়োরের চর্বিতে ভাজা এক প্রকার কি খাবার।

সুরেশ্বর ও বিমল শেষোক্ত খাবার ঠেলে রেখে দিলে, সে কি এক ধরনের বিশ্রী গন্ধ খাবারে!

প্রোফেসর লি বললেন—আপনারা বিদেশী। আমাদের দেশকে সাহায্য করতে এসেছেন, কিন্তু আমাদের দেশের এখনও কিছুই দেখেন নি, দেখলে আপনাদের দয়া হবে। এত গরিব দেশ আর এমন হতভাগ্য—

মিনি বললে—আমাদের সব দেখাবেন দয়া করে প্রোফেসর লি। দেখতেই তো এসেছি—

এ্যালিস বললে—আর একটা দেশ আছে প্রোফেসর লি। ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুটের তলায় পড়ে আছে। ছেলেবেলা থেকে দুঃস্থ ভারতবর্ষের কথা শুনলে কষ্টে আমার বুক ফেটে যায়।

বিমল এ্যালিসের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে চাইলে—বড় ভাল লাগলো এই বিদেশিনী বালিকার এই নিষ্কপট নিঃস্বার্থ সহানুভূতি তার দরিদ্র স্বদেশের জন্যে।

এ্যালিস বললে—শিশুগুলির কে আছে? পুওর লিটল মাইটস। আমায় একটা খোকা দেবেন প্রফেসর লি?

প্রোফেসর লি হেসে বললেন—কি করবে মিস্—

এ্যালিস বললে—আমাদের নাম ধরে ডাকবেন প্রোফেসর লি, ওর নাম মিনি, আমার নাম এ্যালিস। আমরা আপনাকে দাদু বলে ডাকবো—কেমন?

এই সদানন্দ উদার, সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধকে এ্যালিসের বড় ভাল লেগে গেল। কিউরিও দোকানে বিক্রি হয় যে চিনে মাটির হাস্যমুখ বুদ্ধ—বৃদ্ধের মুখখানা ঠিক যেন তেমনি পরিপূর্ণ সন্তোষ, আনন্দ ও প্রেমের ভাব মাখানো।

প্রোফেসর লি'র মুখ উদার হাসিতে ভরে গেল। বললেন—বেশ তাই হবে।

একটা বড় রকমের আওয়াজের দিকে এই সময় প্রোফেসর লি'র জনৈক ছাত্র ওদের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলে।

বিমল বললে—বন্দরের দিকে এখনও গোলাবর্ষণ চলছে, হাতাহাতি যুদ্ধও চলছে—

ঠিক এই সময় পুলিশম্যান ঘরের দোরের কাছে এসে চীনাভাষায় কি জিজ্ঞেস

wapsip.com

করলে—লোকটা যেন খুব ব্যস্ত ও উত্তেজিত—সে চলে গেলে প্রোফেসর বললেন—ও বলে গেল খাওয়া দাওয়া শেষ করে কেউ যেন আজ ঘরের বার না হয়—বিশেষত মেয়েরা। জাপানীরা বেওনেট চার্জ করেছিল—আমাদের সৈন্যরা হটিয়ে দিয়েছে শেনসু প্রাচীরের পূর্ব কোণে। কিন্তু আজ রাত্রে আবার ওরা গোলা মারবে, বোমাও ছুঁড়বে।

চা পান শেষ হোল। বিমল বললে—প্রোফেসর লি, মেয়েরা রয়েছেন সঙ্গে, আজ যাই। কনসেশনে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

এ্যালিস বললে—দাদু, আমার একটা খোকা?

প্রোফেসর লি এ্যালিসের মাথায় হাত দিয়ে খেলার ছলে সস্নেহে বলেন—বেওয়ারিশ যদি কোনো খোকা থাকে, পাবে এ্যালিস। কিন্তু কি করবে চীনা ছেলে নিয়ে?

এ্যালিসের এ হাস্যকর অনুরোধ শুনে মিনি তো হেসেই খুন।

—চলো চলো এ্যালিস কনসেশনে একটা জ্যান্ত খোকা নিয়ে তোমায় ঢুকতেই দেবে কি?

ওরা যখন ফিরে আসছে, দূরে মাঝে মাঝে দুমদাম বিস্ফোরণের শব্দ এবং সাহায্যকারী এরোপ্লেনের হাউইয়ের সাদা অগ্নিময় ধূম দেখা যাচ্ছিল। তবে যেন পূর্বাপেক্ষা অনেক মন্দীভূত হয়ে এসেছে।

সেই রাত্রে কিসের বিষম আওয়াজে বিমলের ঘুম ভেঙে গেল—সে ধড়মড় করে উঠে বিছানার ওপর বসলো—কর্ডাইটের শ্বাসরোধকারী ধূমে ও বিশ্রী গন্ধে ঘরটা ভরে গিয়েছে।

ও ডাকলে—সুরেশ্বর—সুরেশ্বর—ওঠো—কনসেশনে বোমা পড়ছে!

সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট হৈ চৈ উঠলো চারিদিকে।

বোমা! বোমা!

ওরা জানালা দিয়ে দেখলে, যে-ঘরের মধ্যে ওরা শুয়ে ছিল—তার পুবদিকে আর একটা ঘরের দেওয়াল চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে। সেই গোলমালের মধ্যে ভিড় ঠেলে এ্যালিস ছুটতে ছুটতে ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাকলে বিমল! বিমল!

বিমল বললে—এই যে এ্যালিস, তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি? মিনি কোথায়?

বলতে বলতে মিনিও ঘরে ঢুকলো। বললে—বাইরে এসো, দেখো শিগগির—চট্ করে এসো—

ওরা বাইরে গেল। কনসেশনের পুলিশের ডেপুটি মার্শাল এসে পৌঁছেছেন দুর্ঘটনার স্থানে। সবাই আকাশের দিকে চাইলে, দুখানা এরোপ্লেন চলে যাচ্ছে—আলো নিবিয়ে। জনৈক ফরাসী কর্মচারী দেখে বললে—কাওয়াসাকি বম্বার!

বিমল বললে—এ্যালিস, কি করে চেনা গেল জিজ্ঞেস করো না?

মিনি বললে—আমি জানি। নিচের দিকে উইং-এ কালো আঁজি কাটা ছুঁচোমুখ প্লেন এই হোল জাপানীদের বিখ্যাত বোমা ফেলবার প্লেন কাওয়াসাকি বম্বার। কিন্তু কনসেশনে বোমা! এরকম তো কখনো—

সে রাত্রে আর কারও ঘুম হোল না। বিমল খুব খুশি না হয়ে পারলে না, তার মঙ্গলামঙ্গলের দিকে এ্যালিসের এত আগ্রহদৃষ্টি দেখে। সেই রাত্রে বোমা পড়েছে শুনে এ্যালিস সকলের আগে এসেছে তাঁকে দেখতে, সে কেমন আছে।

শেষ রাত্রের দিকে সবাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল কিন্তু শোরগোলে ওদের ঘুম ভেঙে গেল।

ভীষণ গোলাবর্ষণের শব্দ আসছে—সাংহাই শহরে জাপানী যুদ্ধ-জাহাজ ও এরোপ্লেন

wapsip.com

থেকে একযোগে গোলা ও বোমা বৃষ্টি হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে সাংহাই শহর থেকে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ ছেলেময়ে পালিয়ে আসছে কনসেশনে—বাক্স তোরঙ্গ, পোঁটলা পুঁটুলি নিয়ে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে। এদের সবারই মুখে ভীষণ ভয়ের চিহ্ন—এদের চক্ষু উদ্বেগে ও রাত্রি জাগরণে রক্তবর্ণ, চুল রুক্ষ; পাশব বলের কাছে মানুষের কি শোচনীয় পরাজয়!

বেলা দশটার মধ্যে ব্রিটিশ কনসেশনের হাসপাতাল ও মার্কিন রেডক্রশের বড় হাসপাতাল আহতের ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

কী ভীষণ আওয়াজ ও গোলমাল পেন্‌সু প্রাচীরের দিকে, সমুদ্রের থেকে মাইল দুই দূরে পূর্ব কোণে। সেখানে চীনা টেন্থ-রুট্ আর্মির সঙ্গে জাপানী নৌ-সৈন্যদের যুদ্ধ চলছে। কনসেশন থেকে যুদ্ধস্থলের দূরত্ব প্রায় তিন মাইল, বিমল জিজ্ঞেস করে জানলে। এ ছাড়াও গোলাবর্ষণ চলছে শহরের বিভিন্ন স্থানে।

টেলিফোনে অর্ডার এল মেডিকেল ইউনিটের বড় ডাক্তারের কাছে থেকে—বিমল, সুরেশ্বর, এ্যালিস ও মিনিকে চ্যাং-লীন অ্যাভিনিউতে চীনা সামরিক হাসপাতালে যাবার জন্যে।

ওরা আমেরিকান রেডক্রস মোটরে সামরিক হাসপাতালের দিকে ছুটলো। ড্রাইভার খুব বড় একটা রেডক্রশ পতাকা গাড়ির বনেটে উড়িয়ে দিলে—এ ছাড়া গাড়ির ছাদের বাইরের পিঠে সারা ছাদ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড লাল ক্রস আঁকা। এত সাবধানতা সত্ত্বেও ড্রাইভার বললে—যদি আপনারা হাসপাতালে পৌঁছতে পারেন, সে খুব জোর বরাত বুঝতে হবে আপনাদের।

সুরেশ্বর ও বিমল একযোগে বললে—কেন?

—কনসেশন বা রেডক্রশ কিছুই মানছে না। জাপানী বোমারু প্লেন কালও আমাদের রেডক্রশ ভ্যানে বোমা ফেলেছে—শোনেন নি আপনারা সে কথা?

সেকথা না শোনাই ভাল। ওদের মোটর কনসেশন থেকে বার হয়ে খানিকটা ফাঁকা মাঠ দিয়ে তীর বেগে ছুটলো। বিমল দেখলে ড্রাইভার মাঝে মাঝে উপরের দিকে উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে চেয়ে কি দেখছে।

বিমল বললে—কি দেখছো?

—বোমারু প্লেন আসছে কিনা দেখছি! এখন আপনাদের পৌঁছে দিতে পারবো কিনা জানিনে—তবে চেষ্টা করবো—

বলতে বলতে একখানা এরোপ্লেনের আওয়াজ শোনা গেল মাথার ওপর। বিমলের মুখ শুকিয়ে গেল—সামনে উদ্যত মৃত্যুকে কে না ভয় করে? সবাই ওপরের দিকে চাইলে। ড্রাইভার অ্যাকশিলারেটর পা দিয়ে চেপে স্পীড তুললে হঠাৎ বেজায়।

বিমল চেয়ে দেখলে এরোপ্লেনখানা যেন আরও নিচে নামলো—কিন্তু ভাগ্যের জোরেই হোক বা অন্য কারণেই হোক—শেষ পর্যন্ত সেখানা ওদের ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

ড্রাইভার বললে—জাপানী কাওয়াসাকি বম্বার—ভীষণ জিনিস—নিচু হয়ে দেখলে এ গাড়িতে চীনেম্যান আছে কিনা, থাকলে বোমা ফেলতো।

সুরেশ্বর বললে—উঃ কানের কাছ দিয়ে তীর গিয়েছে।

এতক্ষণ যেন গাড়ির সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিল, এইবার একযোগে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

wapsip.com

হাসপাতালে পৌঁছে দেখলে সেখানে এত আহত নরনারী এনে ফেলা হয়েছে যে কোথাও এতটুকু জায়গা নেই। এদের বেশির ভাগ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা। যুদ্ধের সৈন্যও আছে—তবে তাদের সংখ্যা তত বেশি নয়।

একটি দশ এগারো বছরের ফুটফুটে সুন্দর-মুখ বালকের একখানা পা একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে—আশ্চর্যের বিষয় ছেলেটি তখনও বেঁচে আছে এবং কিছুক্ষণ আগে অজ্ঞান হয়ে থাকলেও এখন তার জ্ঞান হয়েছে এবং যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করছে। বিমলের ওয়ার্ডেই সে বালকটি আছে। এ্যালিস সেই ওয়ার্ডেই নার্স।

এ্যালিস পেশাদার নার্স নয়, বয়সেও নিতান্ত তরুণী, চোখের জল রাখতে পারলে না ছেলেটির যন্ত্রণা দেখে। বিমলকে বললে—একে মরফিয়া খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখো না?

বিমল বললে—তা উচিত হবে না। ওকে এখুনি ক্লোরোফর্মে অজ্ঞান করে পা কেটে ফেলতে হবে। অপারেশন টেবিল একটাও খালি নেই, সব ভর্তি। একটা টেবিল খালি পেলেই ওকে চড়িয়ে দেবে।

এ্যালি্স বালকটির শিয়রে বসে কতরকমে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে—কিন্তু ওদের সবারই মুশকিল চীনা ভাষা সামান্য এক আধটু বুঝতে পারলেও বলতে আদৌ পারে না।

সুরেশ্বর হাসপাতালে ঔষধালয়ে সহকারী কম্পাউন্ডার হয়েছে। সে দুখানা চীনা বর্ণপরিচয় কোথা থেকে যোগাড় করে এনে ওদের দিয়েছে। এ্যালিস বললে—সুরেশ ঠিক বলছিল সেদিন, এসো তুমি, আমি, মিনি ভালো করে চীনে ভাষা শিখি, নইলে কাজ করতে পারবো না—

আর্ত বালকটির শয়নশিয়রে এ্যালিসকে যেন করুণাময়ী দেবীর মত দেখাচ্ছে, বিমল সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। এ্যালিসের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরে উঠলো।

সন্ধ্যা সাতটার সময় টেবিল খালি হোল।

বালকটিকে টেবিলে নিয়ে গিয়ে তোলা হয়েছে, কতকগুলি ডাক্তারি ছাত্র কিছুদূরে একটা গ্যালারিতে বসে আছে, হাসপাতালের সহকারী সার্জন চীনাম্যান, তিনি ছাত্রদের দিকে চেয়ে কি বলছেন আর একজন ছাত্র ক্লোরোফর্ম পাম্প করছে। বিমল ও এ্যালিস সার্জনকে সাহায্য করবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। সার্জন হেসে বললেন, সকাল থেকে অপারেশনে টেবিলে মরেছে একুশটা, টেবিল থেকে নামাবার তর সয়নি—গরম জলটা সরিয়ে দাও নার্স—

এমন সময়ে মাথার ওপরে কোথায় এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল।

বাইরে যারা ছিল, তারা দৌড়ে ভেতরে এলে, একটা ছুটোছুটি শুরু হোল চারিদিকে।

কে একজন বললে—জাপানী বম্বার!

এ্যালিস বললে—রেডক্রসের লাল আলো জ্বলছে বাইরে—হাসপাতাল বলে বুঝতে পারবে—

সার্জন হেসে বললে—নার্স, ওরা কি কিছু মানছে? শক্ত করে ধরে থাকো তুলোটা—

বালক অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। সার্জন ক্ষিপ্র ও কৌশলী হাতে ছুরি চালাচ্ছেন। বিমল নাড়ী ধরে আছে।

বুম্-ম্-ম্-ম্!—বিকট বিস্ফোরণের শব্দ কোথাও কাছেই। তুমুল গোলমাল হৈ-চৈ, আর্তনাদ, হাসপাতালের বাঁ দিকের অংশে বোমা পড়েছে। উগ্র ধোঁয়া ও নাইট্রোগ্লিসারিনের গন্ধে ঘর ভরে গেল। সার্জন, বিমল বা এ্যালিসের দৃষ্টি কোনোদিকে নেই—ওরা একমনে কাজ করছে। সার্জন দৃঢ় অবিকম্পিত হস্তে ছুরি চালিয়ে যাচ্ছেন, যেন তার অপারেশন

wapsip.com

টেবিলের থেকে এক শো গজের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড ঘটে নি, যেন তিনি মোটা ফি নিয়ে বড়লোক রোগীর বাড়ি গিয়ে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে ব্যস্ত; গরম জলের পাত্রে ডোবানো ছুরি, ফরসেপ ছুঁচ ক্ষিপ্রহস্তে একমনে সার্জনকে যুগিয়ে চলেছে এ্যালিস, একমনে ব্যান্ডেজের সারি গুছিয়ে রাখছে, পাতলা লিন্ট-কাপড়ে মলম মাখাচ্ছে। বিমল নাড়ী ধরে আছে।

বাইরে বিকট শব্দ—হুড়মুড় করে হাসপাতালের বাঁ দিকের উইং-এর ছাদ ভেঙে পড়লো। মহাপ্রলয় চলেছে সেদিকে—

সার্জন বললেন—নাড়ীর বেগ কত?

বিমল—সত্তর।

কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে বললে—স্যার, বাঁদিকের উইং গুঁড়ো হয়ে গোটা সেপটিক ওয়ার্ডের রোগী চাপা পড়েছে—এদিকেও বোমা পড়তে পারে—তিনখানা বম্বার—

সার্জন বললেন—পড়লে উপায় কি? নার্স বড় ফরসেপটা—

উগ্র ধোঁয়ায় সবারই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে! আর একটা শব্দ অন্য কোন্‌দিকে হোল—আর একটা বোমা পড়েছে—বেজায় ধোঁয়া আসছে ঘরে।

বিমল বললে—স্যার, ধোঁয়ায় রোগী দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে যে? ক্লোরোফর্মের রোগী, এ ভাবে কতক্ষণ রাখা যাবে?

সার্জন ছুরি ফেলে বললেন—হয়ে গিয়েছে। লিন্ট্‌ দাও, নার্স।

বিমল বললে—স্যার, রোগীর নাড়ী নেই। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

সার্জন এসে নাড়ী দেখলেন। এ্যালি্‌স নীরবে ওদের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

নাড়ী থেকে হাত নামিয়ে সার্জন গম্ভীর মুখে বললেন—বাইশটা পূরলো।

এ্যালিস নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললেন—চলো নার্স, স্ট্রেচারওয়ালারা এসে লাশ নিয়ে যাবে—এখন সবাই বাইরে চলো যাই—

ওপরওয়ালার আদেশ পেয়ে বিমল আগে এ্যালিসের কাছে এল এবং তাকে আস্তে আস্তে হাত ধরে ধূম্রলোক থেকে উদ্ধার করে ডানদিকের বড় দরজা দিয়ে কম্পাউন্ডের খোলা হওয়ায় নিয়ে এল।

আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেই এ্যালিসকে বললে—ঐ দেখ এ্যালিস, তিনখানা জাপানী বম্বার!—

এগারো ঘণ্টা সমানে ডিউটিতে থাকবার পরে বিমল, এ্যালিস, সুরেশ্বর ও মিনি বাইরের ফুটপাথে পা দিলে।

চ্যাং সো লীন অ্যাভিনিউ প্রসিদ্ধ দেশনায়ক চ্যাং সো লীনের নামে হয়েছে—রেডশার্টদের প্রভাবে। সাংহাইয়ের মধ্যে এটা একটি প্রসিদ্ধ রাস্তা, রাস্তার ধারে ফুটপাথে শামিয়ানার নিচে চা ও শুয়োরের মাংসের দোকান। লোকজনের বেজায় ভিড়।

এই অ্যাভিনিউয়ের ধারেই গভর্নমেন্ট হাসপাতাল। ওরা যখন ফুটপাথে পা দিলে, তখন হাসপাতালের বাঁ অংশে মহা হৈ চৈ চলছে। সেপটিক-ওয়ার্ড জাপানী বোমায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে—সম্ভবত একটা রোগীও বাঁচে নি সে ওয়ার্ডের।

মিনি দেখতে যাচ্ছিল—বিমল বারণ করলে।

—ওদিকে গিয়ে দেখে আর কি হবে মিনি? চলো আগে কোথাও একটু গরম চা খাওয়া যাক।

wapsip.com

বোমা-ফেলা ও হত্যা ব্যাপারটা দেখে দেখে কদিনে ওদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। শুধু ওদের নয়, সাংহাই-এর লোকজন, দোকানী, পথিকদেরও। নতুবা গত আধঘণ্টা ধরে হাসপাতালের ওপর বোমাবর্ষণ চলছে, চোখের সামনে এই ভীষণ প্রলয়লীলা ও মাথার ওপরে চক্রাকারে উড়নশীল তিনখানা জাপানী বম্বারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চ্যাং সো লীন অ্যাভিনিউর চায়ের দোকান, মাংসের দোকান, ভাত-তরকারির দোকান সব খোলা। লোকজনের দিব্যি ভিড়।

রাত পৌনে আটটা।

হঠাৎ এ্যালিস জিগ্যেস করলে—ছেলেটি মারা গেল, তখন ক'টা?

বিমল বললে—ঠিক সাড়ে সাতটা। ওকথা ভেবো না এ্যালিস। চলো আর একটু এগিয়ে। এক্ষুনি লাশ নিয়ে যাওয়ার ভ্যান আসবে হাসপাতালে। আমরা একটু তফাতে যাই।

একটা শামিয়ানার নিচে ওরা চা খেতে বসলো।

দোকানের মালিক একজন রোগা চেহারার চীনা স্ত্রীলোক। সে এসে পিজিন ইংলিশে বললে—কি দেবো?

বিমল বললে—খাবার কি আছে?

—ভাজা মাছ, রুটি, মাখন আর ব্যাঙের—

—থাক থাক, রুটি মাখন ভাজা মাছ নিয়ে এসো—

রুটি-মাখন অন্যত্র চীনা দোকানে পাওয়া যায় না; তবে চ্যাং সো লীন অ্যাভিনিউর দোকানগুলো কিছু শৌখীন ও বিদেশী-ঘেঁষা। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বিমল একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললে। সুরেশ্বর তো গোগ্রাসে রুটি ও মাখনের সদ্ব্যবহার করতে লাগলো, খানিকক্ষণ কারও মুখে কথা নেই।

মিনি বললে—একটা গল্প বলি শোনো সবাই। আমি তখন স্কুলে পড়ি, মেন্টোনে, কালিফোর্নিয়ায়। আমার বাবা আমায় একটা চিন্‌চিলা কিনে দিয়েছিলেন—

সুরেশ্বর বললে—সে কি?

মিনি হেসে বললে—জানো না? একরকম ছোট কাঠবিড়ালির চেয়ে একটু বড় জানোয়ার খুব চমৎকার লোম গায়ে—লোমের জন্যে ওদের শিকার করা হয়। তারপর আমার সেই পোষা চিন্‌চিলাটা—

বুম্—ম্—ম্!—বিকট আওয়াজ!

সবাই চমকে উঠলো। তিনখানা বাড়ির পরে একটা বাড়ির ওপরে জাপানী বম্বার ঘুরছে দেখা গেল—কিন্তু ধোঁয়া উড়ছে বাড়িটার সামনের রাস্তা থেকে। লোকজন দেখতে দেখতে যে যেখানে পারলে আড়ালে ঢুকে পড়লো। একটু পরে একখানা রিকশা টেনে দুজন লোককে সেদিক থেকে ওদের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখা গেল—রিকশায় আধশোয়া আধবসা অবস্থায় একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ। তার মুখটা থেঁতলে রক্ত গড়িয়ে বুকের সামনে জামাটা রাঙিয়ে দিয়েছে।

শামিয়ানার নিচে আরও তিনটি চীনা খদ্দের বসে চা খাচ্ছিল। তারা উত্তেজিত ভাবে চীনা ভাষায় দোকানীকে কি বললে। দোকানীও তার কি জবাব দিলে, তারপরে ওদের মধ্যে একজন একটা সিগারেট ধরালে।

জাপানী বোমারু প্লেন ঘর্ ঘর্ শব্দ করে যেন ওদের মাথার ওপরে ঘুরছে। বিমল একবার চেয়ে দেখলে। নাঃ, একটু দূরে বাঁদিকে। ঠিক মাথার ওপরে নয়।

wapsip.com

মিনি বললে—তারপর শোনো, আমার সেই চিন্‌চিলাটা—

এ্যালিস অধীরভাবে বললে—আঃ মিনি, থাক চিন্‌চিলার গল্প। খাও এখন ভাল করে। আমার তো বেজায় ঘুম পাচ্ছে! বিমল, দোকানীকে জিগ্যেস করো না, স্যান্ড্‌উইচ রাখে না?

বিমল বললে—ব্যাঙের মাংসের স্যান্ডউইচ বলছে এ্যালিস—দিতে বলবো?

সুরেশ্বর ও মিনি একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই ওদের খাবার জায়গাটা তীব্র সার্চলাইটের আলোয় আলো হতেই ওরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে। ভীষণ ধ্বংসের যন্ত্র সেই চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ জাপানী বম্বারখানা থেকে রাস্তায় যে অংশে ওরা বসে চা খাচ্ছে, সে দিকে সার্চলাইট ফেলেছে।

দোকানী চীনা স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে উঠে কি বললে।

সঙ্গে সঙ্গে হুড়্ হুড়্ দুড়্ দুড়্ শব্দ—তিনজন চীনা খদ্দের ও রাস্তার পথিকদের মধ্যে জন দুই ছুটে এসে বিমলদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে মাথা গুঁজে বসে পড়লো।

মিনি বললে—আঃ এগুলো কি বোকা? টেবিলের তলায় বাঁচবে এরা, আমার পেয়ালাটা উল্টে ফেলে দিলে মাঝ থেকে—

এ্যালিস বললে—আমারও। দোকানী, তোমার চায়ের দাম নিয়ে নাও, আমরা অন্য জায়গায় চা খেতে যাই—এ কি রকম উপদ্রব?

বিমল বললে—ঠিক তো। মহিলাদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে উৎপাত! বোমা খাবি রাস্তায় দাঁড়িয়ে খা ভদ্রলোকের মত—

মিনি হঠাৎ আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে বললে—ঐ দেখো, দেখো—

তিনখানা চীনা এরোপ্লেন তিন দিকে জাপানী বম্বারখানাকে তাড়া করছে। একখানা চীনা প্লেন বম্বারখানার খুব কাছে এসে পড়েছে—একটু পরেই সেখানা থেকে মেসিন গানের পট পট আওয়াজ শোনা গেল—পিছনের আর একখানা চীনা সাহায্যকারী প্লেন ওদের ওপরে নীলাভ তীব্র সার্চলাইট ফেলতেই জাপানী বম্বারখানা বেশ স্পষ্ট দেখা গেল।

ততক্ষণ সবাই আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মেরে আকাশের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা দেখছে। আরও দুজন চীনা খদ্দের অন্য টেবিলে চা খেতে বসে গেল। দোকানী স্ত্রীলোকটি তাদের খাবার দিলে। মিনি তাদের টেবিলের দিকে চেয়ে বললে—ওই ওরা ব্যাঙের স্যান্ডউইচ খাচ্ছে—

মেশিন গানের আওয়াজ তখন বড় বেড়েছে। জাপানী প্লেনখানা পাক দিয়ে ঘুরছে। হঠাৎ পালাবে না।

বিমল বললে—না; একটু নিরিবিলি চা খেতে এলাম আর অমনি মাথার ওপরে চীন-জাপানের যুদ্ধ বেধে গেল—পোড়া বরাত এমনি—

একজন ফিরিওয়ালা এসে শামিয়ানার বাইরে দাঁড়িয়ে বললে—মোমের ফুল—খুব চমৎকার মোমের ফুল—গোলাপ, ক্রিসেন্‌থিমাম্, গাঁদা—ভারি সস্তা মোমের ফুল—

এমন সময়ে একজন খবরের কাগজওয়ালা 'সাংহাই ডেলি নিউজ' বলে হেঁকে যাচ্ছে দেখে বিমল ডেকে একখানা কাগজ কিনলে। এ কাগজের একদিকে চীনা ভাষায় ও অন্যদিকে ইংরাজি ভাষায় লেখা খবর—চীনাদের পরিচালিত।

রাস্তায় লোক ভিড় করে কাগজ কিনছে, কাগজ এইমাত্র বেরিয়েছে, এ বেলায় যুদ্ধের খবর নিয়ে সবাই—যুদ্ধের খবর জানতে চায়।

এ্যালিস বললে—যুদ্ধের খবর কি?

wapsip.com

তারপর সবাই মিলে ঝুঁকে পড়ে কাগজখানা পড়ে দেখতে লাগলো। শেন্‌সু প্রাচীরের কাছ জাপানী সৈন্য চীনাদের কাছে ধাক্কা খেয়ে হটে গিয়েছে। জাপানীদের বহু সৈন্য মারা পড়েছে।

সুরেশ্বর বললে—সর্বৈব মিথ্যা। জাপানীরা জিতছে। ভুল খবর দিচ্ছে আমাদের, পাছে শহরে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দেখছো না বোমা ফেলবার কাণ্ড? চীনারা জিতছে! ফুঃ—

ওদের অত্যন্ত আশ্চর্য মনে হোল, মাত্র তিন মাইল দূরে শেন্‌সু প্রাচীরের কাছে যুদ্ধ চলছে, অথচ ওদের খবরের কাগজ পড়ে জানতে হচ্ছে যুদ্ধের ফলাফল, যেমন কলকাতায় বসে বা আমেরিকায় বসে লোকে জেনে থাকে। তিন মাইল দূরে থেকেও বোঝবার কোনো উপায় নেই যুদ্ধের আসল খবরটা কি। চীনা সামরিক কর্তৃপক্ষ যে সংবাদ পাঠাচ্ছে সেই সংবাদই ছাপা হচ্ছে। এই রকমই হয় সর্বত্রই, অথচ খবরের কাগজের পাঠকেরা তা জেনেও জানে না। খবরের কাগজে লিখিত সংবাদ বাইবেল বা পুরাণের মত অভ্রান্ত সত্য হিসেবে মেনে নেয়, এইটেই আশ্চর্য। এ সম্বন্ধে ওদের অভিজ্ঞতা আরও পরে যা হয়েছিল তা আরও অদ্ভুত।

কাগজের এক কোণে একটি সংবাদের দিকে মিনি ওদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলে। মার্শাল চিয়াং কৈ শাক্ চা-পেই পল্লীর বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে আসবেন রাত ন'টার সময়ে।

মিনি হাতঘড়ি দেখে বললে—এখন পৌনে ন'টা।

বিমল বললে—তা হলে হাসপাতালেও যাবেন, চল আমরা হাসপাতালে ফিরি। মার্শাল চিয়াংকে কখনও দেখি নি, দেখা যাবে এখন।

এমন সময়ে ওদের সামনের রাস্তায় একটা হৈ-চৈ উঠলো। রাস্তার দুধারে লোকজন সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। চীনা পুলিশম্যান রাস্তার মাঝখানের লোক হটিয়ে দিলে। এক মিনিটের মধ্যে পর পর ছ'খানা মোটরকার দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেল। রাস্তার জনতা চীনা ভাষায় চীৎকার করে বলে উঠলো—'মহাচীনের জয়! মার্শাল চিয়াং-এর জয়! টেন্‌থ রুট আর্মির জয়!'

এ্যালিস বললে—ঐই মার্শাল চিয়াং গেলেন!

বিমল বললে—তবে আর হাসপাতালে এখন ফিরে কি হবে? চল কনসেশনে ফিরি। রাত হয়েছে, এ অঞ্চল এখন রাত্রে বেড়াবার পক্ষে নিরাপদ নয়। জাপানী বোমা তো আছেই, তা ছাড়া তার চেয়েও খারাপ চীনা দস্যুদের উপদ্রব। সঙ্গে মেয়েরা—

সুরেশ্বর বললে—তা ছাড়া ঘুমুতেও তো হবে। কাল সকাল থেকে আবার ডিউটি—

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

কনসেশনে ফিরবার পথে ওদের বিপদ ঘটলো।

কনসেশনে ফিরবার পথে ওরা চ্যাং সো লীন অ্যাভিনিউ দিয়ে খানিকটা এসে পড়লো একটা জনবহুল পাড়াতে। সেখানে দু'খানা রিকশাভাড়া করে ওরা তাদের কনসেশনে যেতে বললে। তারপর ওরা গল্প ও গুজবে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে—যখন ওরা আবার রাস্তার দিকে নজর করলে তখন দেখলে রিকশা একটা নির্জন জায়গা দিয়ে যাচ্ছে। দুধারে দরিদ্র লোকেদের কাঁচা মাটির খাপরা-ছাওয়া ঘর? রাস্তা জনশূন্য—দূরে দূরে খোলা মাঠের মধ্যে কি যেন মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে।

বিমল বললে—এ কোথায় নিয়ে এসে ফেল্লে হে?

সুরেশ্বর পিজিন্ ইংলিশে একজন রিকশা-ওয়ালাকে বললে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রে? এ পথ তো নয়?

wapsip.com

রিকশাওয়ালা কোনো উত্তর না দিয়েই জোরে ছুটতে লাগলো।

বিমলের মনে সন্দেহ হলো। সে বললে—এর মনে কোনো বদমাইশি মতলব আছে মনে হচ্ছে। আমরা তো একেবারে নিরস্ত্র। সঙ্গে মেয়েরা রয়েছে—

মিনি ও এ্যালিস তখন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে। ওরাও বললে—আর গিয়ে দরকার নেই—চীনা গুণ্ডা এই সময় দেশ ছেয়ে ফেলেছে। নামো এখানে সব।

দুখানা রিকশাই পাশাপাশি যাচ্ছিল। এবার মিনিদের রিকশাখানা এগিয়ে গেল এবং বিমল কিছু বলবার পূর্বেই রিকশাখানা হঠাৎ পথের মোড় ঘুরে পাশের একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

বিমলদের রিকশাখানা কিন্তু তখন সোজা রাস্তা বেয়েই দ্রুত চলেছে। বিমলের ও সুরেশ্বরের চীৎকার সে আদৌ কর্ণপাত করলে না।

বিমল লাফ দিয়ে রিকশাওয়ালার ঘাড়ে পড়লো রিকশা থেকে। রিকশাখানা উল্টে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সুরেশ্বর রিকশার সঙ্গে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। রিকশাওয়ালাটা সেখানে বসে পড়লো—ওর ওপর বিমল!

রিকশাওয়ালাটা একটু পরেই গা ঝেড়ে উঠে, চীনা ভাষায় কি একটা দুর্বোধ্য কথা বলে উঠে, ওদের দিকে এগিয়ে এল।

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠলো—সুরেশ্বর, সাবধান!

রিকশাওয়ালার হাতে একখানা বড় চকচকে ছোরা দেখা গেল।

সুরেশ্বর পেছন থেকে তাকে জোরে এক ধাক্কা লাগালে। সে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো আবার বিমলেরই উপর। বিমলের সঙ্গে তার ভীষণ ধস্তাধ্বস্তি শুরু হোল। বিমলের রীতিমত শরীরচর্চা করা ছিল। মিনিট পাঁচ ছয়ের মধ্যে রিকশাওয়ালাকে মাটিতে ফেলে, বিমল তার হাত মুচড়ে ছোরাখানা টান দিয়ে ফেলে বললে—ওখানা তুলে নাও সুরেশ্বর—তারপর এই বদমাইশটার গলায় বসিয়ে দাও—

ছোরা হাত থেকে খসে যাওয়াতে বদমাইশটা নিরুৎসাহ ও ভীত হয়ে পড়লো—এইবার ছোরা বসানোর কথা শুনে, সে বিমলের কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিলে। সব ব্যাপারটা ঘটে গেল পাঁচ ছ' মিনিটের মধ্যে।

বিমল ঝেড়ে উঠে একটু দম নিয়ে বললে—সুরেশ্বর, মেয়েদের গাড়িখানা!

তারপর ওরা দুজনেই ছুটলো সেই গলিটার দিকে—যেটার মধ্যে মিনিদের রিকশাখানা ঢুকেছে। গলিটা নিতান্ত নোংরা, দুধারে কাঁচা টালির ছাদওয়ালা নিচু নিচু বাড়ি—কিছুদূরে একটা সাধারণ স্নানাগার—এখানে নীচশ্রেণীর মেয়ে পুরুষে সাধারণত স্নান করে না—করলেও রাত্রে করে। স্নানাগারের সামনে দু-জন চীনেম্যান দাঁড়িয়ে আছে দেখে, বিমল তাদের পিজিন ইংলিশে জিজ্ঞেস করলে—একখানা রিকশা কোন্ দিকে গেল দেখেছ?

তাদের মধ্যে একজন বললে—ওই বাড়িটার সামনে একখানা রিকশা দাঁড়িয়েছিল একটু আগে।

বিমল ও সুরেশ্বর বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ডাকাডাকি করেও কারও সাড়া পাওয়া গেল না। তখন বিমল বললে—চলো বাড়ির মধ্যে ঢুকি—

ঘরটায় ঢুকেই ওদের মনে হোল, এটা একটা চণ্ডুর আড্ডা। ঘরের মধ্যে চার-পাঁচটা চীনাবাঁশের চেয়ার, একদিকে একটি নিচু বাঁশের তক্তাপোশ। চণ্ডু খাবার লম্বা নল, ছিটেগুলি গালার বড় পাত্রে, চণ্ডুর আড্ডার সব জিনিসই মজুদ। দেওয়ালে চীনা দেবতার ভীষণ

wapsip.com

প্রতিকৃতি। ঘরটি লোকশূন্য, নির্জন। এ ধরনের চণ্ডুর আড্ডা ওরা সিঙ্গাপুরে দেখেছে! কিন্তু বাড়ির লোকজন কোথায়? বিমল ও সুরেশ্বর বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গেল।

একটা বড় ঘরের মধ্যে অনেকগুলো লোক বসে মা জং খেলছে। বিমল বুঝতে পারলে, জায়গাটা শুধু চণ্ডু নয়, নীচ শ্রেণীর জুয়াড়ীদের আড্ডাও বটে। ওদের দেখে দুজন লোক উঠে দাঁড়ালো। ওদের মধ্যে একজন কর্কশ কণ্ঠে পিজিন ইংলিশে বললে—কি চাই? কে তোমরা? বিমলের মাথায় চট করে এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে কর্তৃত্বের গ্রামভারী চালে বললে, আমরা ব্রিটিশ কনসেশনের পুলিশের লোক। আমাদের সঙ্গে দশজন কনস্টেবল গলির মোড়ে অপেক্ষা করছে। আমাদের সঙ্গে বন্দুক ও রিভলবার আছে! দুজন মেমসাহেবকে এই আড্ডায় গুম করা হয়েছে—বার করে দাও, নইলে আমরা জোর করে ভেতরে ঢুকে সন্ধান করবো। দরকার হলে গুলি চালাবো।

এবার একজন প্রৌঢ় লম্বা ধরনের লোক এককোণ থেকে বলে উঠলো—আমরা কনসেশনের পুলিশ মানি নে—সাংহাইয়ের পুলিশ মার্শালের সই করা ওয়ারেন্ট দেখাও—

বিমল বললে—তুমি জানো এটা যুদ্ধের সময়। আমরা জোর করে ঢুকবো এবং দরকার হলে এই মা জং-এর জুয়ার আড্ডার প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করে সাংহাই পুলিশের হাতে দেবো—এর জন্যে যদি কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় পুলিশ মার্শালের কাছে আমরা দেবো—তুমি মেম সাহেবদের বার করে দেবে কিনা বলো—

লোকটা বললে—কোন্ মেমসাহেবের কথা বলছো? মেমসাহেবের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? আমি ভাবছিলুম, তুমি জুয়া আর চণ্ডুর আড্ডা হিসেবে বাড়ি সার্চ করবে বলছো।

বিমল বললে—বেশি কথায় সময় নষ্ট করতে চাইনে—তাহলে আমাদের জোর করতে হোল—সুরেশ্বর কনস্টেবলদের ডাকো—

হঠাৎ চীৎকার করে সে বলে উঠলো—মাথা নিচু করে বসে পড়—বসে পড় সুরেশ।

সাঁ করে একটা শব্দ হোল এবং ঝকঝকে কি একটা জিনিস ওদের চোখের সামনে এক ঝলক খেলে গেল—ওরা তখন দুজনেই বসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের পেছনের দেওয়ালে একটা ভারী জিনিস ঠক করে লাগাবার শব্দ হোল।

সুরেশ্বর পিছন ফিরে চকিতে চেয়ে দেখলে—একখানা বাঁকা ধারালো চকচকে চীনে-ছোরা, ছুঁড়ে-মারা ছোরা, ছুঁড়ে মারবার জন্যেই এগুলি ব্যবহৃত হয়—ছোরাখানা সবেগে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে, আধখানা ফলাসুদ্ধ দেওয়ালের গায়ে গেঁথে গিয়েছে।

সুরেশ্বর শিউরে উঠলো—ওরই গলা লক্ষ্য করে ছোরাখানা ছোঁড়া হয়েছিল।

ওদের সঙ্গে সত্যিই হাতাহাতি বাধলে বা সবাই একযোগে আক্রমণ করলে নিরস্ত্র বিমল ও সুরেশের কি দশা হোত বলা যায় না, কিন্তু বিমল মাটি থেকে উঠেই দেখলে ঘরের মধ্যে আর একজন লোকও নেই।

পালায় নি—হয়তো বা ওরা লোক ডাকতে গিয়েছে! সুরেশ্বর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, খানিকটা দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। বিমল গিয়ে তার হাত ধরে টেনে তুলে বললে—সুরেশ্বর, এই বেলা উঠে বাড়িটা খুঁজি এস—এখুনি সব চলে আসতে পারে। একটা ঘর বন্ধ ছিল—বাইরে থেকে তালা দেওয়া। আর সব ঘর খোলা—সেগুলি জনশূন্য। সুরেশ্বর ও বিমল দুজনেই একযোগে ঘরের দরজায় লাথি মারতে লাগলো।

—মিনি—মিনি—এ্যালিস—এ্যালিস—

ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

wapsip.com

বিমল বললে—কি ব্যাপার! ঘরের মধ্যে কেউ নেই নাকি?

দুজনের সম্মিলিত লাথির ধাক্কাতেও দরজার কিছুই হোল না। বেজায় মজবুত সেগুন কাঠের দরজা। হঠাৎ বিমলের চোখ পড়লো ঘরের দেওয়ালের ওপরের দিকে। সেখানে একটা ছোট ঘুলঘুলি রয়েছে। কিন্তু অত উঁচুতে ওঠা এক মহা সমস্যা। বিমল খুঁজতে খুঁজতে একটা জলের টব আবিষ্কার করলে। সেটা উপুড় করে পেতে, মা জং খেলার ঘর থেকে বাঁশের চেয়ার এনে, তার ওপর চাপিয়ে উঁচু করে, বিমল তার ওপর অতি কষ্টে উঠলো। সার্কাসের খেলোয়াড় না হলে ওভাবে ওঠা এবং নিজেকে ঠিকমত দাঁড় করিয়ে রাখা অতীব কঠিন।

সুরেশ্বর টবটা ধরে রইল—বিমল সন্তর্পণে উঠে ঘুলঘুলির কাছে মুখ নিয়ে গেল। নিচে থেকে সুরেশ্বর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলে—কি দেখছ? কেউ আছে?

—ঘোর অন্ধকার—কিছু তো চোখে পড়ছে না।

—ওদের পরনে নার্সের সাদা পোশাক আছে, অন্ধকারেও তো খানিকটা ধরা যাবে—ভাল করে দেখ—

বিমল ভাল করে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করে বলে—উঁহু, কিছুই তো তেমন দেখছিনে—সাদা তো কিছুই নেই—সব কালোয় কালো। আমার মনে হচ্ছে ঘরটায় কিছুই নেই—

—উপায়?

—দাঁড়াও আগে নামি। উপায় ভাবতে হবে, তার আগে দরজা ভেঙে ফেলতে হবে যে করেই হোক।

নিচে নেমে বিমল গম্ভীর মুখে বললে—সুরেশ্বর, মিনি বা এ্যালিসকে এ ভাবে হারিয়ে আমরা কনসেশনে ফিরে যেতে পারবো না। দরকার হলে এজন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ—খুঁজে তাদের বার করতেই হবে। তবে তারা যে এই বাড়িতেই বা এই ঘরেই আছে তারও তো কোনো প্রমাণ আমরা পাই নি। তবুও এই ঘরের দরজা ভেঙে, ভেতরটা না দেখে আমরা এখান থেকে অন্য জায়গায় যাবো না। তুমি এক কাজ কর। আমি এখানে থাকি—তুমি বাইরে যাও, চীনা পুলিশকে খবর দাও। তাদের বলো কনসেশনে টেলিফোন করতে। দরকার হলে কনসেশনের পুলিশ আসুক। আজ রাতের মধ্যেই তাদের খুঁজে বার করতেই হবে—নইলে তাদের ঘোর বিপদের সম্ভাবনা। তুমি দেরি কোরো না, চট করে বাইরে চলে যাও।

সুরেশ্বর বললে—তোমাকে একা ফেলে যাবো? ওরা যদি দল পাকিয়ে আসে? তুমি নিরস্ত্র।

সেজন্যে ভেবো না। মিনি ও এ্যালিস তার চেয়েও অসহায়। সকলের আগে ওদের কথা ভাবতে হবে আমাদের।

সুরেশ্বর চলে গেল।

বিমল একা বাড়িটাতে। উত্তেজনার প্রথম মুহূর্ত কেটে গেলে বিমল এইবার ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে। মিনি আর এ্যালিস নেই! গুণ্ডারা তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে। ওর মনে হোল, কনসেশনের ডাক্তার বেডফোর্ড বলেছিলেন—চীনা-সাংহাইতে মধ্য-এশিয়ার বর্বরতার সঙ্গে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা মিলছে। এখানে কনসেশনের বাইরে মানুষের ধনপ্রাণ নিরাপদ নয়। বিশেষ করে এই যুদ্ধ দুর্দিনের সময়ে, দেশে আইন নেই, পুলিশ নেই—প্রত্যেক সবল মানুষ নিজেই পুলিশ। সাবধানে চলাফেরা না করলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা।

wapsip.com

কি ভুলই করেছে অতরাত্রে অজানা রাস্তায় অজানা চীনে রিকশাওয়ালার গাড়িতে চড়ে,—সঙ্গে যখন মেয়েরা রয়েছে! তার চেয়েও ভুল, সঙ্গে রিভলবার নিয়ে না বেরুনো।

এখন উপায় কি? যদি ওদের সন্ধান না-ই মেলে! কনসেশনে, সে আর সুরেশ্বর মুখ দেখাবে কেমন করে?

স্তব্ধ নির্জন বাড়িটা। সাড়াশব্দ নেই কোনো দিকে। মা জং খেলার ঘরে একটা চীনে লণ্ঠন ঝুলছে। আধ আলো অন্ধকারে বিকট মূর্তি চীনা দেবতার ছবিটা যেন এক হিংস্র দৈত্যের প্রতিকৃতির মত দেখাচ্ছে—সেই একমাত্র আলো সারা বাড়িটাতে। বাকিটা অন্ধকার। আশ্চর্য, কোথায় কলকাতার শাঁখারিটোলা লেন, আর কোথায় সাংহাই-এর এক নীচ শ্রেণীর জুয়াড়ীর আড্ডা! অবস্থার ফেরে কোথা থেকে মানুষকে কোথায় নিয়ে এসে ফেলে!

এ্যালিস চমৎকার মেয়ে, মিনিও চমৎকার মেয়ে; ওদের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হলে সে নিজেকে ক্ষমা করবে না। ওদের জন্যে বিমলই দায়ী। হাসপাতাল থেকে বার হয়ে কনসেশনে ফেরা উচিত ছিল।

প্রায় কুড়ি মিনিট হয়ে গিয়েছে। সুরেশ্বরের দেখা নেই। সে কি কনসেশনে ফিরে গিয়েছে নিজেই খবর দিতে?

বিমল আকাশ পাতাল ভাবছে, এমন সময় এক ব্যাপার ঘটলো। রাস্তার আলো হঠাৎ যেন নিবে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এ আবার কি কাণ্ড!

মিনিট পাঁচছয় কি দশ পরে বাইরে থেকে কে একজন উত্তেজিত গলায় চীনা ভাষায় কি বললে—কোনো সাড়া না পেয়ে আবার বললে। ঠিক যেন কাউকে ডাকছে।

বিমল অবাক হয়ে ভাবছে গুণ্ডারা ফিরে এল নাকি!

হঠাৎ দুজন চীনা ইউনিফর্ম পরা পুলিশম্যান বাড়ির মধ্যে খানিকটা ঢুকে রাগের ও গালাগালির সুরে চেঁচিয়ে কি কথা বলে উঠলো।

বিমল ভাবলে সুরেশ্বরের আনীত পুলিশম্যান বাড়ি খুঁজতে এসেছে। ও এগিয়ে যেতে পুলিশম্যান দুজন একটু আশ্চর্য হোল। তারপর পিজিন ইংলিশে উত্তেজিত কণ্ঠে মা জং খেলার ঘরের আলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—আলো এখুনি নিবোও। আমাদের বাঁশি শুনতে পাওনি? আলো জ্বেলে রেখেছ কেন?

বিমল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে বললে—আলো, জ্বেলে রেখেছি কেন?

—হ্যাঁ, আলো জ্বালিয়ে রেখেছে কেন? আলো, আলো, লণ্ঠন—যা থেকে আলো বার হয়, অন্ধকার দূর করে সেই আলো—

—আমি তো জ্বেলে রাখি নি। এ আমার বাড়ি নয়।

চীনা পুলিশম্যান দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। এ বাড়ির যে এ লোক নয়, তারা সেকথা আগেই বুঝেছিল।

বিমল এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। বললে—দাঁড়াও, তোমরা যেও না! প্রথমে বলো আলো নিবিয়ে দেবো কেন?

—মিস্টার, সাংহাই পুলিশ-মার্শালের নোটিশ দেখো নি? রাত এগারোটার পরে শহরের সব আলো নিবিয়ে দিতে হবে। ব্ল্যাক্ আউট। বোমা ফেলছে জাপানীরা। তোমার কি বাড়ি?

—আমার এ বাড়ি নয়। সব বলছি, আমি কনসেশনের লোক—যুদ্ধের ডাক্তার, ভারতবর্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। আমরা চারজনে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এইপথে রিকশা করে যাচ্ছিলুম—সঙ্গে ছিলেন দুটি মার্কিন মহিলা। রিকশাওয়ালা

wapsip.com

তাঁদের নিয়ে কোথায় পালিয়েছে। আমাদের রিকশা অন্যপথে নিয়ে গেলে আমরা এই গলির মধ্যে ঢুকে সন্ধান পাই এই বাড়িটার সামনে রিকশাটা মেয়েদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা বাড়িতে ঢুকে দেখি, এটা মা জং জুয়াড়ীদেরও চণ্ডুর আড্ডা। ওদের সঙ্গে মারামারি হয়ে যাওয়ার পরে ওরা কোথায় পালিয়েছে। আমার বন্ধু পুলিশ ডাকতে গিয়েছে। তোমরা এসেছ ভালই হয়েছে, এই তালা-বন্ধ ঘরটা খোল—আমার বিশ্বাস এরই মধ্যে মহিলা দুটিকে আটকে রেখেছে।

পুলিশম্যান দুজন আবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। তারা যে বেজায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, মা জং খেলার ঘরে চীনে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয়ও ওদের মুখ দেখে বিমলের সেটা বুঝতে দেরি হোল না। যেন ওরা কখনো ওদের ক্ষুদ্র পুলিশ জীবনে এমন একটা আজগুবি ব্যাপারের সম্মুখীন হয় নি—ভাবখানা এই রকম।

একজন পুলিশ চৌকীদার এগিয়ে বন্ধ ঘরের তালাবদ্ধ দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে বললে—এই ঘর? কই, কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো?

—না, সাড়া দেবে কে? ধরো অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছে।

পুলিশম্যান দুটির মধ্যে একজন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানের মত অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বললে—না, আমার তা মনে হয় না মিস্টার। তুমি জানো না এই-সব জুয়াড়ী ও চণ্ডুর আড্ডাধারী বদমাইশদের। এ ঘরে ওদের রাখে নি। ওদের গায়ে গহনা ছিল?

—একজনের গলায় একটা ঝুটো মুক্তোর মালা ছিল—দুজনের হাতে দুটো সোনার হাত ঘড়ি আর সোনার পাতলা বালা—

এমন সময় বাইরে মোটরের আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে বাড়িতে ঢুকলো—আগে-আগে সুরেশ্বর, পেছনে একদল চীনা পুলিশ সঙ্গে একজন কনসেশন পুলিশ।

সুরেশ্বর ঢুকেই বললে—টেলিফোন করে দিয়েছি কনসেশনে—পুলিশ মার্শালকে জানানো হয়েছে। এই একজন কনসেশনের পুলিশম্যানকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে আনলুম। এদিকে মহা মুশকিল, শহরে ব্ল্যাক-আউট, আলো জ্বালবার জো নেই—সব ঘুটঘুটে অন্ধকার।

—ভাঙো দরজা সবাই মিলে।

সকলের সমবেত চেষ্টায় ও ধাক্কায় হুড়মুড় করে দরজা ভেঙে পড়লো।

বিমল সকলের আগে ঘরে ঢুকলে। পেছনে ছ'টা পুলিশ টর্চ জ্বেলে ঢুকলো। তিনটি বড় বড় জালা ছাড়া ঘরে কিছু নেই। মানুষের চিহ্ন তো নেই-ই।

একজন পুলিশ উঁকি মেরে জালার মধ্যে দেখলে। জালাতে মানুষ তো দূরের কথা, একবিন্দু জল পর্যন্ত নেই। খালি জালা।

মাথার ওপর আকাশে আবার অনেকগুলো এরোপ্লেনের ঘর্ ঘর্ আওয়াজ শোনা গেল। দুজন পুলিশম্যান উঠোনে গিয়ে হেঁকে বললে—আলো নিবিয়ে দাও, নিবিয়ে দাও, জাপানী বম্বার—

সুরেশ্বর বললে—আরে, এরা বেশ তো! সারা সন্ধ্যেবেলা জাপানীরা বোমা ফেল্লে, তখন 'ব্ল্যাক-আউট' করলে না—আর এখন এদের হুঁশ হোল—

বিমল উপরের দিকে মুখ তুলে বললে—হাঁ, জাপানী কাওয়াসাকি বম্বার। মিনি চিনিয়ে দিয়েছিল কনসেশনে—মনে আছে?

সমস্ত সাংহাই শহর অন্ধকার। সেই আধ আলো আধ অন্ধকারের মধ্যে—কারণ নক্ষত্রের আলো সাংহাইয়ের পুলিশ মার্শালের আদেশ মানে নি—জাপানী বোমারু প্লেনগুলোর

wapsip.com

শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল, তাও সব সময় নয়। মাঝ মাঝে যেন সেগুলো কোন্ দিকে চলে যায়, আবার খানিক পরে মাথার ওপরে আসে।

বিমল ভাবছিল, জাপানী বম্বার থেকে আর বোমা ফেলছে না তো!

সুরেশ্বরকে কথাটা বলতে সে বললে—ব্ল্যাক আউটের জন্যে নিশ্চয়। সবাই লুকিয়েছে, রাস্তাঘাটে জনপ্রাণী নেই। কোনো দিকে কোনো শব্দ আছে?

দুজন চীনা পুলিশ বললে—তোমরা বোঝ নি মিস্টার। ওরা বোমা ফেলবে না, এখন সুবিধে খুঁজছে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা ফেলবার। সেই বোমা ফেলে লোকদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার পরে, যেমন সব ভয়ে রাস্তাঘাটে বেরুবে কি পালাতে যাবে, অমনি গ্যাসের বোমা ফেলবে। এখন গ্যাসের বোমা ফেললে তো মানুষ মরবে না, কারণ সব ঘরের মধ্যে জানালা দরজার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। সেখান থেকে ওদের আগে বার করবে রাস্তায়—পরে সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের বোমা ছাড়বে, এ-ই করে আসছে দেখছি আজ ক'দিন থেকে—

একটু পরে কনসেশনের পুলিশ এলো, চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল স্বয়ং এলেন বহু লোকজন নিয়ে। ওদের দিয়ে চণ্ডুর ও জুয়াড়ীদের আড্ডার ছোট্ট উঠানটা ভরে গেল।

ডেপুটি মার্শাল বললেন—শহরে ব্ল্যাক আউট, ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিধারে—এক্ষুনি জাপানীরা হাইএক্সপ্লোসিভ বম্ব ফেলবে, তারপরে ফসপেন গ্যাসের বোমায় বিষ ছাড়বে। এ অবস্থায় কি করা যায়? মেয়ে দুটিকে কোথায় আটকে রেখেছে, কি করে খুঁজি।

কনসেশন পুলিশের কর্মচারীরা বললেন—আপনার এলাকায় যত বদমাইশের আড্ডা আছে, সব হানা দিই চলুন।

—কিন্তু তাতে সময় নেবে। এখুনি যে সব ছত্রাকার হয়ে চারিদিকে ছুটে বেরিয়ে পড়বে। দেখছেন না ওপরকার অবস্থা? ওদের প্ল্যান করে নিতে যা দেরি! আচ্ছা, দেখি কতদূর কি হয়। মেয়ে দুটিকে গুণ্ডারা আটকে রেখেছে, মুক্তিপণ আদায় করবার উদ্দেশ্যে। সুতরাং তাদের প্রাণের ভয় বর্তমানে নেই একথা ঠিকই। সাংহাইতে এ রকম অনবরত হচ্ছে। এই ভদ্রলোক দুটি এত রাতে মেয়েদের নিয়ে চা-পেই পল্লীতে বেরিয়ে বড় বিবেচনার অভাব দেখিয়েছেন। যত গুণ্ডা আর বদমাইশের আড্ডা এই পাড়ায়।

পুলিশের লিস্ট দেখে কাছাকাছি দুটি বদমাইশের আড্ডায় হানা দেওয়া হোল— কিন্তু কোথাও কিছু সন্ধান মিললো না।

তারপর—রাত তখন দেড়টা—এমন এক ভীষণ ব্যাপারের সূত্রপাত হয়ে গেল যে, এর আগে যে সব বোমা ফেলার কাণ্ড সুরেশ্বর ও বিমল দেখেছে—এর কাছে সেগুলো সব একেবারে ম্লান হয়ে নিষ্প্রভ হয়ে মুছে গেল।

বিমল আর সুরেশ্বরের মনে হোল, আকাশ থেকে চারিধারে একসঙ্গে যেন দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র পড়তে শুরু হয়েছে—অসংখ্য। অনেক, অনেক—গুনে শেষ করা যায় না! সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারণের আওয়াজ, ইট টালি ছোটার শব্দ, দেওয়াল পড়ার ছাদ পড়ার শব্দ—মানুষের কলরব, হৈ-চৈ, কান্না, পুলিশের হুইস্‌ল, মাথার ওপর ঘর্ঘর শব্দ—সবসুদ্ধ মিলিয়ে একটা সুপ্ত দৈত্যপুরীর দৈত্যরা যেন হঠাৎ জেগে উঠে উন্মাদ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে!

ডেপুটি মার্শাল অর্ডার দিলেন, সব কনস্টেবল একত্র হয়ে গেল। কনসেশন পুলিশের কর্মচারীরা সাহায্য করতে চাইলে, হতাহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সেই অন্ধকারের মধ্যে টর্চ জ্বেলে অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ অনুসন্ধান করে আহত ও চাপা-পড়া মানুষের সন্ধান চলতে লাগলো। কাজ এগোয় না। ভাঙা বাড়ির ইটের রাশি পদে পদে ওদের বাধা দিতে

wapsip.com

লাগলো। একটা চীনা মন্দিরের কাছে চারজন লোক মরে পড়ে আছে। দুটি ছোট বাড়ি চুরমার হয়ে সেখানে এমন ভাবে রাস্তা আটকেছে যে, মৃতদেহগুলো টেনে বার করবার উপায়ও রাখে নি। ইটের স্তূপের ওপর উঠে আবার ওদিক দিয়ে নেমে যেতে হোল—তবে জায়গাটা পার হওয়া সম্ভব হোল।

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠলো—সামনে প্রকাণ্ড বোমার গর্ত, সাবধান!

সবাই চেয়ে দেখলে আন্দাজ ত্রিশফুট ব্যাসযুক্ত একটা প্রকাণ্ড গহ্বর থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে—এবং গর্তের ধারে এখনও ছটকানো ধাতুর খোলা-ভাঙা টুকরো পড়ে আছে, বিমল টুকরোটা হাতে তুলে নিয়েই ফেলে দিলে—গরম আগুন!

কর্ডাইটের উগ্র গন্ধ জায়গাটায়! ওরা সবাই অবাক হয়ে সেই ভীষণ গর্তটার দিকে চেয়ে রইল।

এমন সময়ে দেখা গেল, ছ'খানা জাপানী প্লেন সার বন্দী হয়ে দক্ষিণ দিক থেকে উড়ে আসছে—ওদের মাথার উপর। বোধ হয় ওদের টর্চের আলো দেখেই আসছে। চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল হেঁকে বললেন—সাবধান—! বোমার গর্তে লাফ দাও!

সবাই বুঝলে এ অবস্থায় ত্রিশফুট ব্যাসযুক্ত এবং আন্দাজ প্রায় পনেরো ফুট গভীর বোমার গর্তটাই সব চেয়ে নিরাপদ স্থান, সারা চা-পেই পল্লী অঞ্চলের মধ্যে।

ঝুপ্‌ঝাপ্! দু' সেকেন্ডের মধ্যে ওপরে আর কেউ নেই—সবাই গর্তটার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বিমল ওদের সঙ্গে লাফ দিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে ওর হাঁটু পর্যন্ত পাঁকে পুঁতে গেল, গর্তটার মধ্যে কাদা আর জল— কাদার সঙ্গে বোমার ভাঙা টুকরো মেশানো—সবাই কোনো রকমে জল কাদার মধ্যে মাথা গুঁজে রইল ধার ঘেঁষে—কারণ মাঝখানে থাকলে অনেকখানি নক্ষত্র-খচিত অন্ধকার আকাশ দেখা যায়—তখন আর নিজেকে খুব নিরাপদ বলে মনে হয় না।

ওদের মধ্যে একজন আমেরিকান পুলিশম্যান ওদের বোঝাচ্ছিল যে, এ অবস্থায় কোন এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেললে ওদের লাগবার কথা নয়—সে নাকি মাঞ্চুকুও রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে জানে—বোমার গর্তই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

আর একজন বললে—কেন, যদি মেশিন গান চালায়?

আগের লোকটা বললে—ফুঃ! মেশিন গান! এই অন্ধকারে!

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল সেই ছ'খানা প্লেন ঠিক ওদের গর্তের ওপর এসে চক্রাকারে উড়ছে এবং ক্রমে নিচু হয়ে নামছে যেন।

কে একজন বললে—আমাদের টের পেলে নাকি!

মুখের কথা সবারই ওষ্ঠাগ্রে যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে—বুকের রক্ত পর্যন্ত জমাট বেঁধে গেল সকলের। কেবল আগের পুলিশম্যানটি বলতে লাগলো—কোনো ভয় নেই—ওরা মেশিনগান ছুঁড়ে কিছু করতে পারবে না—কাওয়াসাকি বম্বারের মেশিনগানের তরিবৎ সুবিধের নয়—হোত যদি জার্মান হেঙ্কেল্ ফিফটিওয়ান, কি স্কুল্‌জ-ব্যাঙ্ক একশো এগারো—

সবাই চাপা গলায় বিষম রাগের সঙ্গে একসঙ্গে বলে উঠলো—আঃ—চুপ! সঙ্গে সঙ্গে প্লেনগুলো অনেকখানি নেমে এল এবং অকস্মাৎ এক তীব্র সার্চলাইটের আলোয় ওদের বোমার গর্ত এবং চার-পাশের আরও অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠলো—ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে পটকা বাজির মত মেশিনগান ছোঁড়ার শব্দে ওদের কানে তালা ধরবার উপক্রম হোল।

wapsip.com

একজন ফিস ফিস করে বললে—যদি বাঁচতে চাও তো সবাই মড়ার মত পড়ে থাকো—ভান করো যে সবাই মরে গিয়েছো—

আগের সেই মার্কিন পুলিশম্যানটি যুক্তিতর্কে অদম্য। সে বলে উঠলো—কিছু হবে না দেখো—হাঁ হোত যদি হেঙ্কেল্ ফিফটিওয়ান কিংবা—

—আবার!

সেই কাদাজলের মধ্যে হাত পা গুটিয়ে উপুড় হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থেকে বিমল অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো কথা ভাবছিল না। তার চিন্তা শুধু বর্তমানকে আশ্রয় করে। সংসার নেই, অতীত নেই, ভবিষ্যৎ—শুধু সে আছে, আর আছে—এই দুর্ধর্ষ, বিভীষণ, নিষ্ঠুর বর্তমান। যে কোনো মুহূর্তে মেশিনগানের গুলি ওর জীবলীলা, ওর সমস্ত চৈতন্যের অবসান করে দিতে পারে, সারা দুনিয়া ওর কাছ থেকে মুছে যেতে পারে এক মুহূর্তে—যে কোনো মুহূর্তে। কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে, চোখ বুজে ও পড়ে রইল—ওর পাশে সবাই সেইভাবেই আছে—বীরত্ব দেখাবার অবকাশ নেই, বাহুবল বা সাহস দেখাবার অবসর নেই—খোঁয়াড়ের শুয়োরের দলের মত ভয়ে কাদার মধ্যে ঘাড় গুঁজে থাকা—এর নাম বর্তমান যুগের যুদ্ধ! ওরা আজ দেশপ্রেমিক বীর সৈনিক দল হলেও এর বেশি কিছু করতে পারতো না—এই একই উপায় অবলম্বন করতেই হোত—অন্য গত্যন্তর ছিল না। অন্য কিছু করা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। কানের এত কাছে এরোপ্লেনের শব্দ বিমল কখনও পায়নি, এরোপ্লেনের বিরাট আওয়াজ কানে একেবারে তালা ধরালো যে! ওর ভয়ানক আগ্রহ হচ্ছে একবার মুখ তুলে ওপরের দিকে চোখ চেয়ে দেখে, এরোপ্লেনগুলো গর্তটার কত ওপরে এসেছে।

আওয়াজ—আওয়াজ—এরোপ্লেনের আওয়াজ, মেশিনগানের আওয়াজ। কিন্তু আওয়াজ যত হোল, কাজ তত হোল না। মেশিনগানের একটা গুলিও বোমার গর্তের মধ্যে পড়লো না। দু-তিনবার প্লেনগুলো গর্তের দিকে নেমে এল পুরো দমে, কিন্তু কিছু করতে পারলে না। আওয়াজ, কেবলই আওয়াজ। ক্রমে প্লেনগুলো সরে গেল গর্তের ওপর থেকে, হয়তো দেখে ভাবলে গর্তের লোকগুলো সব মরে গিয়েছে। মড়ার ওপর মেশিনগানের দামী গুলি চালিয়ে বৃথা অপব্যয় করা কেন?

ওরা সবাই গর্ত থেকে উঠে এল। পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখলে, কি অদ্ভুত কাদামাখা চেহারা হয়েছে সকলকার! পুলিশের স্মার্ট ইউনিফর্ম একেবারে কাদায় আর ঘোলা জলে নষ্ট হয়ে ভিজে-কাঁথা হয়ে গিয়েছে। মার্কিন পুলিশম্যানটি গর্ত থেকে ঠেলে উঠেই বললে—বলি নি তোমাদের, এরা মেশিনগান ছুঁড়ে সুবিধা করতে পারে না ও এরোপ্লেন থেকে? স্কুল্জ ব্যাঙ্কস একশো এগারো যদি হোত, তবে দেখতে একটা প্রাণীও আজ বাঁচতাম না।

মিনিট পনেরো কেটে গেল। বোমারু প্লেনগুলো আকাশের অন্যদিকে চলে গিয়েছে। কি ভীষণ আওয়াজ! বিমলের মনে পড়লো, এ্যালিস তার নরম সাদা হাত দুটি তুলে কান ঢেকে বসতো—হোয়াট-এ্যান-অ-ফুল্ রকেট! এ্যালিসের সেই ভঙ্গিটা, তার মুখের কথা মনে পড়তেই বিমলের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো।

এ্যালি্স—মিনি—বেচারি এ্যালিস!—কি ভীষণ কালরাত্রি আজ ওদের পক্ষে। সাংহাইয়ের এই দুর্যোগের রাত্রির কথা বিমল কি কখনো ভুলবে জীবনে? কোথায় সে সিঙ্গাপুরে ডাক্তারি করবে বলে বাড়ি থেকে রওয়া হোল—অদৃষ্ট তাকে কোথায় কি অবস্থায় নিয়ে এসে ফেলেছে।

হঠাৎ পিনাং-এর মন্দিরে সেই নিষ্ঠুর-মূর্তি চীনা রণদেবতার ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ মনে

wapsip.com

পড়লো ওর। রণদেবতা ওদের তাঁর ফাঁদে ফেলেছেন—

একটা প্লেন দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটা বস্তির ওপরে দুটো বোমা ফেললে—ভীষণ আওয়াজ হোল—অন্ধকারের মধ্যে একটা আগুনের শিখার চমক দেখা গেল, কিন্তু লোকজনের চেঁচামেচি শোনা গেল না। মার্কিন পুলিশম্যানটি বললে—পঞ্চাশ পাউন্ডের বোমা! দেখেছ কি কাণ্ডটা করলে বস্তিতে! লোক সব নিশ্চয় পালিয়েছে।

সুরেশ্বর বললে—ওই দেখ, আর একদল বম্বার দেখা দিয়েছে দক্ষিণপূর্ব কোণে—

অন্তত বারোখানা সারবন্দী হয়ে এগিয়ে আসছে। এরা যে এলোমেলো ভাবে বোমা ফেলছে না, তা বেশ বোঝা গেল—এদের ধ্বংস-লীলার মধ্যে প্ল্যান আছে, শৃঙ্খলা আছে, সমস্ত শহরটা এবং তার প্রান্তস্থিত এই দরিদ্র পল্লী চা-পেই ও অন্যান্য ছড়ানো গ্রামগুলোকে ওরা যেন কতকগুলো কাল্পনিক অংশে ভাগ করে নিয়েছে এবং নিয়ম করে প্রত্যেক অংশে বোমা ফেলছে—কোন অংশ পরিত্রাণ না পায়!

বিমল লক্ষ্য করলে অন্ধকারের মধ্যে বস্তির লোকজনেরা খানা-নালার মধ্যে অনেকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে—একটা লোক একটা গাছের গুঁড়িতে প্রাণপণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! অন্ধকারে কারও মুখ দেখা যায় না—মেয়ে কি পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না, যেন ভীত, সন্ত্রস্ত প্রেতমূর্তি। সন্ধ্যাবেলার সেই বেপরোয়া ভাব আর নেই।

একমুঠো ছড়ানো নক্ষত্রের মত কতকগুলো বোমা পড়লো দূরের একটা পাড়ায়—সাংহাইয়ের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র সে জায়গাটা—পুলিশম্যানগুলো বলাবলি করছে। ওদিকে সেই প্লেনগুলো আবার আসছে, তবে এবার সার্চলাইট জ্বালায় নি, অন্ধকারেই আসছে। কাছেই একটা পল্লীতে ওরা ছ'টা বোমা ফেললে, আন্দাজ এক একটা পঞ্চাশ পাউন্ড ওজনের। পুলিশের ডেপুটি মার্শালের আদেশে ওরা সবাই সেদিকে ছুটলো। সেখানে এক ভীষণ দৃশ্য! রাস্তায় লোকে লোকারণ্য, ভয়ের চোটে সতর্কতা ভুলে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়িঘর চুরমার, আয়না, মাদুর, টেবিল, ছবি সব ছিটকে রাস্তায় এসে ছত্রাকার হয়ে পড়েছে—তারই মধ্যে এক জায়গায় একটা প্রৌঢ়া মহিলার ছিন্নভিন্ন বিকৃত মৃতদেহ। কিছুদূরে একটি সুন্দরী বালিকার দেহ দু টুকরো হয়ে পড়ে আছে, তলপেটের নাড়িভুঁড়ি খানিকটা বেরিয়ে ধুলোতে লুটিয়ে পড়েছে।

এইসব বীভৎস দৃশ্যের মাঝখানে এক জায়গায় একটা ছোট মেয়ে ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চোখ বুজে ছুটে একটা ছোট মাঠ পার হয়ে পালাচ্ছিল—পুলিশের লোক ওকে ধরে ফেলল। মেয়েটির বয়স ন' বছর—সে ভয়ে এমনি দিশেহারা হয়ে পড়েছে যে প্রথম কিছুক্ষণ কথা বলতেই পারলে না।

ওর হাতে একটা পুঁটুলি। পুঁটুলির মধ্যে কিছু শুকনো শুয়োরের মাংসের টুকরো আর গোটাকতক কিশমিশ। তাকে খানিকক্ষণ ধরে জিগ্যেস করার পরে জানা গেল তাদের বাড়িতে বোমা পড়বার পরে বাড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কে কোথায় গিয়েছে তা সে জানে না। সে কিছু খাবার সংগ্রহ করে পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে পালাচ্ছে—তার বিশ্বাস, চোখ বুজে ছুটে পালালে বোমা ফেলে যারা, তারা ওকে দেখতে পাবে না। তাকে ডেকে নিয়ে প্রৌঢ়া মহিলার মৃতদেহ দেখানো হোল।

খুকী চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, ওই তার মা। পাশের বালিকাটি তার দিদি। ডেপুটি মার্শাল পাড়ার একজন লোক ডেকে মেয়েটির নাম ধাম, বাপের নাম ঠিকানা জেনে নিলেন, কারণ ছেলেমানুষ পুলিশের প্রশ্নের উত্তর ঠিকমত দিতে পারবে না। মেয়েটি পুলিশের

wapsip.com

জিম্মাতেই রইল—কারণ শোনা গেল ওর বাবা বছর-তিন মারা গিয়েছেন, বিধবা মা আর দিদি ছাড়া সংসারে ওর আর কেউ ছিল না।

একদল লোককে দেখা গেল ভাঙা বাড়িগুলো থেকে জিনিসপত্র, মৃতদেহ টেনে বার করছে। ওরা টর্চ জ্বেলে টর্চের মুখ নিচের দিকে নামিয়ে মৃতদেহ কি জ্যান্ত মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাছে ওপর থেকে বোমারু প্লেনগুলো টের পায়।

বিমল তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলে। সাগ্রহে সে ছুটে গেল—প্রোফেসর লি, প্রোফেসর লি—

অন্ধকারের মধ্যে বিমলকে উনি চিনলেন। বললেন—আমি আমার ছাত্রের দল নিয়ে বেরিয়েছি, দেখি যদি কিছু করতে পারি। আমার মেয়েরা কোথায়?

এই সৌম্যদর্শন, পরহিতব্রতী বৃদ্ধের স্নেহ-সম্ভাষণে বিমলের মন আর্দ্র হয়ে উঠলো। বললে—সে অনেক কথা। আমার মনে হয় আপনি এবং আপনার দলই এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করতে পারবেন।

প্রোফেসর লি হাসিমুখে বললেন—যুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ত্ব আলোচনা করতে এসেছিলুম জানেন তো? এর চেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র আর কোথায় পাবো সে আলোচনার?

হঠাৎ একটা প্লেন মাথার ওপর এল। সবাই কথা বন্ধ করে ওপর দিকে চাইলে।

মার্কিন পুলিশম্যানটি চেঁচিয়ে উঠল—কভার! কভার!

কোথায় আর আশ্রয় নেবে, সেই ভাঙা বাড়ির ইটকাঠের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা ছাড়া সবাই সেই দিকে ছুটলো। বিমলও চীনা খুকীটার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো সেই দিকে!

প্লেন থেকে বোমা পড়ল না। পড়লো কতকগুলো চকচকে রুপোর বাতিদানের মত লম্বা লম্বা জিনিস। প্লেনটা চলে গেলে ওরা সেগুলো দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখলে। সরু সরু রুপোর নলের মত জিনিস, হাতখানেক লম্বা। ঝকঝকে সাদা। মার্কিন পুলিশম্যান একটা হাতে তুলে নিয়ে বললে—ইনসেনডিয়ারি বম্ব্—আগুন লাগাবার বোমা—অ্যালুমিনিয়ম আর ইলেকট্রনের খোল, ভেতরে অ্যালুমিনিয়ম পাউডার আর আয়রন অক্সাইড ভর্তি। এই দেখ ছ'টা করে ফুটো টিউবের গোড়ার দিকে। এই দিয়ে আগুনের ফুলকি বার হয়ে আসবে। এ আগুন নিবোনা যায় না।

জাপানীদের মতলব এবার স্পষ্ট বোঝা গেল। হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা ফেলবার পর লোকজন ভয়ে দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পালাবে, তখন ওরা শহরে ইনসেনডিয়ারি বম্ব্ ফেলে আগুন লাগিয়ে দেবে, আগুন নিবোতে কে এগোবে তখন!

কি ভীষণ ধ্বংসের আয়োজন! বিমল সেই ঝকঝকে পালিশ করা সরু টিউবটা হাতে নিয়ে শিউরে উঠলো। এই টিউবের মধ্য সুপ্ত অগ্নিদেব এখুনি জেগে উঠে এই এত বড় সাংহাই শহরটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে, তারই আয়োজন চলছে।

মার্কিন পুলিশম্যানটি বললে—পঁয়ষট্টি গ্রাম অ্যালুমিনিয়াম পাউডার আর পঁয়ত্রিশ গ্রাম আয়রন অক্সাইড। আমাদের মার্কিন নৌবহরের উড়োজাহাজে আজকাল এর চেয়েও ভাল বোমা তৈরি হচ্ছে—আয়রন অক্সাইডের বদলে দিচ্ছে—

কাছেই আরও দু তিনটা রুপোর বাতিদান পড়লো।

দিনের বেলায় ওরা পরস্পরের ধুলো কাদা মাখা চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। প্রোফেসর লি তখনও কাজে ব্যস্ত, চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ থেকে লোকজন টেনে বার করে

wapsip.com

বেড়াচ্ছেন, তিনি আর তাঁর ছাত্রেরা। পুলিসও এসেছে, দুটো রেড ক্রসের হাসপাতাল গাড়িও এসেছে। আকাশে জাপানী বোমারু প্লেনগুলোর চিহ্ন নেই।

রাত্রিটা কেটে গিয়েছে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত। বেলা এখন দশটা—এখনও সে দুঃস্বপ্নের জের মেটে নি! বিনা কারণে এমন নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার তাণ্ডব যে চলতে পারে তা এর আগে, ভারতবর্ষে থাকতে বিমল কখনো ভেবেছিল?

কনসেশনে সেই সবজান্তা আমেরিকান পুলিশটা বলছিল—দেখবেন ওরা ইনসেনডিয়ারি বোমা ফেলে সব চেয়ে বেশি ক্ষতি করবে। এখানে অনেক বাড়িই কাঠের। তাতে আবার বোমার আগুন জলে নেবে না। বালি ছড়াতে হয় একরকম কল দিয়ে। প্রথম অবস্থায় বোমাটাকে বালি বোঝাই থলে দিয়ে চেপে ধরলেও আর স্পার্ক ছোটে না—কিন্তু সে সব করে কে?

চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল বললেন—কিন্তু সব চেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমায়। কাল সন্ধ্যা ও রাতের বোমা ফেলার দরুন চা-পেই পাড়া ও সাংহাইয়ের চ্যাং সো লীন অ্যাভিনিউতে সাত আটশো বাড়ির চিহ্ন নেই—মানুষ মারা পড়েছে তিনশোর ওপর, মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে। জখম হয়ে হাসপাতালে গিয়েছে প্রায় পাঁচশো। তাদের মধ্যে অর্ধেকের বাঁচবার আশা নেই।

প্রোফেসর লি বললেন—আমাদের সবচেয়ে ভীষণ শত্রু যে এই বোমারু প্লেনগুলো, তা ক'দিনের ব্যাপারে আমরা বুঝতে পারছি। তবুও তো এখনো ওরা সমবেত ভাবে আক্রমণ করে নি—করলেও একশোখানা প্লেনের প্রত্যেক প্লেনখানা থেকে দু টন বোমা ফেললে পাঁচ হাজার লোক কালই মেরে ফেলতো।

সবজান্তা পুলিশম্যানটি বললে—জাপানী বম্বারগুলো এক একখানা দু টন বোমা বইতে পারে না মশায়—সে পারে জার্মান ডর্নিয়ের কিংবা ইটালির কাপ্রোনি—কিংবা—

ডেপুটি মার্শাল বললেন—আহা হা, ও সব এখন থাক—ও তর্কে কি লাভ আছে? এখন আমাদের দেখতে হবে যে দুটি মার্কিন মহিলাকে কাল রাত্রে গুণ্ডারা নিয়ে গিয়েছে, তাঁদের উদ্ধারের কি উপায় করা যায়, বোমা এখন এবেলা অন্তত আর পড়বে না—

এমন সময়ে একজন চীনা পুলিশ সার্জেন্ট্ মোটর সাইকেলে ছুটে এসে সংবাদ দিলে, কনসেশন অঞ্চলে চীনা পলাতক নরনারীদের সঙ্গে কনসেশন পুলিশের ভয়ানক দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। ওরা ইয়াংসিকিয়াং-এর ব্রিজ পার হয়ে যাচ্ছিল, কনসেশন পুলিশ ব্রিজের ওমুখে মেশিনগান বসিয়েছে—তারা বলছে এত পলাতক লোক জায়গা দেবার স্থান নেই কনসেশনে। খাবার নেই, জল নেই। গেলে সেখানে দুর্ভিক্ষ হবে।

প্রোফেসর লি বললেন—কত লোক পালাচ্ছিল?

—তা বোধ হয় দশ হাজারের কম নয়। অর্ধেক সাংহাই ভেঙে মেয়ে-পুরুষ সব পালাচ্ছে কনসেশনের দিকে। আপনারা সব চলুন, একটু বোঝান ওদের । রাত্রির ব্যাপারে সব ভয় খেয়েছে বড্ড।

কনসেশনের পুলিশদলকে চলে যেতে উদ্যত দেখে বিমল বললে—আজই মেয়ে দুটির ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে—দেরি হলে ওদের খুঁজে বার করা শক্ত হবে হয় তো।

চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল বললেন—সে বিষয়ে ওঁরা কিছু সাহায্য করতে পারবেন না। আমাদের বদমাইশদের লিস্ট আমাদের কাছে আছে। আমি আজ এখুনি এর ব্যবস্থা করছি। ব্যস্ত হবেন না—বিদেশী গভর্নমেন্টের কাছে এজন্যে আমাদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি।

wapsip.com

সেদিন সারাদিন ওরা হাসপাতালে গেল না। ডাক্তার সাহেবকে জানিয়ে দিলে মিনি ও এ্যালিসের বিপদের কথা। কনসেশনে যাবার জন্যে দুবার চেষ্টা করেও কৃতকার্য হোল না। সে পথ লোকজনের ভিড়ে বন্ধ হয়ে আছে, তা ছাড়া ইয়াংসিকিয়াংয়ের পুলের ওপারের মুখে মেশিনগান বসানো।

সারাদিন ধরে কি করুণ দৃশ্য সাংহাইয়ের বাইরের বড় বড় রাজপথগুলিতে! লোকজন মোট-পুঁটুলি নিয়ে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে—সাংহাই থেকে হোনান্ যাবার রাজপথ পলাতক নরনারীতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভয়ানক গরমে এই ভিড়ে অনেকে সর্দি-গর্মি হয়ে মারাও পড়ছে।

দুখানা হাসপাতালের গাড়ি ওদের সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল—কিন্তু ভিড় ঠেলে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব দেখে গাড়ি দুখানা শহরের উপকণ্ঠে এক জায়গায় পথের ধারেই দাঁড়িয়ে রইল। একখানা গাড়ির চার্জ নিয়ে বিমল সেখানে রয়ে গেল। সুরেশ্বর রইল তার সহকর্মী হিসেবে।

শীঘ্রই কিন্তু কি ভয়ানক বিপদে পড়ে গেল দুজনেই। ওরা অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছিল এই ভীষণ ভিড়ের মধ্যে জাপানী প্লেন যদি বোমা ফেলে তবে যে কি কাণ্ড হবে তা কল্পনা করলেও শিউরে উঠতে হয়।

বেলা দুটো বেজেছে। একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্মচারী মোটরবাইকে সাংহাইয়ের দিক থেকে এসে ওদের অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির সামনে নামলো। বললে—আপনারা এখান থেকে সরে যান—

বিমল বললে—কেন?

—জাপানী সৈন্য শহরের বড় পাঁচিল ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে—এখনো দুটো পাঁচিল বাকি—কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে ওরা সমুদ্রের ধারে সমস্ত দিকটা দখল করবে। আর আমরা খবর পেয়েছি পঞ্চাশখানা বোমারু প্লেন একঘণ্টার মধ্যে শহরের ওপর আবার বোমা ফেলবে।

—এই লোকগুলোর অবস্থা তখন কি হবে?

—চীনের মহা দুর্ভাগ্য, স্যার। আপনারা বিদেশী, আপনাদের প্রাণ আমরা বিপন্ন হতে দেবো না। আমরা মরি তাতে ক্ষতি নেই। আপনারা সরে যান এখান থেকে।

একটি গাছের তলায় একটি বৃদ্ধা বসে। সঙ্গে একটা পুঁটুলি, গোটা কতক মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি। মুখে অসহায় আতঙ্কের চিহ্ন।

সামরিক কর্মচারীটি কাছে গিয়ে বললে—কোথায় যাবে?

বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে সৈনিকটির দিকে চাইলো কিন্তু চুপ করে রইলো। উত্তর দিলে না। সৈনিকটি আবার জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাবে তুমি? তোমার সঙ্গে কে আছে?

এবারও বুড়ী কিছু বললে না।

বিমল বললে—বোধ হয় কানে শুনতে পায় না। দেখছ না ওর বয়েস অনেক হয়েছে। চেঁচিয়ে বল।

তরুণ সামরিক কর্মচারী বৃদ্ধার নাতির বয়সী। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চীৎকার করে বললে—ও দিদিমা, কোথায় যাচ্ছ?

বুড়ী বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কোথায় আর যাবো? সবাই যেখানে যাচ্ছে।

—এখানে বসে থেকো না। বোমা পড়বে এক্ষুনি। সঙ্গে কেউ নেই?

wapsip.com

বোমার কথা শুনেই বুড়ী ভয়ে আড়ষ্ট হোল, ওপরের দিকে চাইলে। বললে—আমি আর হাঁটতে পারছি না, আমার আর কেউ নেই, আমাকে তোমরা একখানা গাড়ির ওপর উঠিয়ে দাও।

বিমল বললে—আমি ওকে অ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে দিচ্ছি। বড্ড বয়েস হয়েছে, এতখানি পথ ছুটোছুটি করে এসে হাঁপিয়ে পড়েছে।

দুজনে ওকে ধরাধরি করে গাড়িতে এনে ওঠালে।

এক জায়গায় একটি গৃহস্থ পরিবারের ঠিক এই অবস্থা। গৃহিণীর বয়েস প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ, সাত আটটি ছেলেমেয়ে, সকলের ছোটটি দুগ্ধপোষ্য শিশু, বাকি সব দুই, চার, পাঁচ, সাত এমনি বয়েসের। সঙ্গে একটিও পুরুষ নেই। ওরাও হাঁটতে না পেরে বসে পড়েছে।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল বাড়ির কর্তা জাহাজে কাজ করেন—জাহাজ আজ কুড়ি দিন হোল বন্দর থেকে ছেড়ে গিয়েছে। এদিকে এই বিপদ! কাজেই মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বাড়ি থেকে—কোথায় যাবেন ঠিক নেই।

এদের অসহায় অবস্থা দেখে বিমলের খুব কষ্ট হোল। কিন্তু তার কিছু করবার নেই। কত লোককে সে হাসপাতাল গাড়িতে জায়গা দেবে?

সেদিন শহরের এমন ভয়ানক অবস্থা গেল যে কে কার খোঁজ রাখে। মিনি ও এ্যালিসের উদ্ধারের কোন চেষ্টাই হোল না। সারা দিনরাত এমনি করে কাটলো।

রাত্রি শেষে জাপানী নৌসেনা সাংহাই শহরের দক্ষিণ অংশ অধিকার করলে। বিমল ও সুরেশ্বর তখন হাসপাতালে। ওরা কিছুই জানতো না। তবে ওরা এটুকু বুঝেছিল যে অবস্থা গুরুতর। সারারাত্রি ধরে জাপানী যুদ্ধ-জাহাজ থেকে গোলা বর্ষণ করলে। বোমারু প্লেনগুলোর তেমন আর দেখা নেই, কারণ শহর প্রায় জনশূন্য। পথে ঘাটে লোকজনের ভিড় নেই বললেই চলে।

রাত তিনটে। এমন সময় ওয়ার্ডের মধ্যে কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য ঢুকতে দেখে বিমল প্রথমটা বিস্মিত হোল; তারপরই ওর মনে হোল এরা চীনা নয়, জাপানী সৈন্য। ক্রমে পিল্‌পিল্ করে বিশ ত্রিশজন জাপানী সৈন্য হাসপাতালের বড় হলটার মধ্যে ঢুকলো। চারিদিকে শোরগোল শোনা গেল। রোগীর দল অধিকাংশই বোমায় আহত নাগরিক, তারা ভয়ে কাঠ হয়ে রইল জাপানী সৈন্য দেখে।

বিমল একা আছে ওয়ার্ডে। হাসপাতালের বড় ডাক্তার খানিকটা আগে চলে গিয়ছেন। ওই এখন কর্তা। দুজন চীনা নার্স ভয়ে অন্য ওয়ার্ড থেকে ছুটে এসে বিমলের পেছনে দাঁড়ালো।

হঠাৎ একজন জাপানী সৈন্য বন্দুক তুলে জমির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে ধরলে—রাইফেলের আগার ধারালো বেয়নেট ঝকঝক করে উঠলো। চক্ষের নিমেষে সে এমন একটা ভঙ্গি করলে তাতে মনে হোল বিমলদের দেশে সিঁটকি জালে মাছ ধরবার সময় জালের গোড়ার দিকের বাঁশটা যেমন কাদাজলের মধ্যে ঠেলে দেয়—তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে একটা অমানুষিক আর্তনাদ শোনা গেল। পাশের বিছানায় একটা চীনা যুবক রোগী শুয়ে ভয়ে ভয়ে ওদের দিকে চেয়ে ছিল—বেওনেট তার তলপেটটা গেঁথে ফেলেছে। চারিদিকে রোগীরা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো। রক্তে ভেসে গেল বিছানাটা। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

বিমলের মাথা হঠাৎ কেমন বেঠিক হয়ে গেল এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখে। সে এগিয়ে এসে ইংরাজিতে বললে—তোমরা কি মানুষ না পশু?

wapsip.com

জাপানী সৈন্যেরা ওর কথা বুঝতে পারলে না—কিন্তু ওর দাঁড়াবার ভঙ্গি ও গলার সুর শুনে অনুমান করলে মানে যাই হোক, প্রীতি ও বন্ধুত্বের কথা তা নয়।

অমনি সব ক'জন সৈন্য ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুললে।

বিমল চোখ বুজলে—ও-ও বুঝলে এই শেষ।

সেই দুজন চীনা তরুণী নার্স, যারা ওর পেছনে এসে আশ্রয় নিয়েছিল—তারা ভয়ে দিশাহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। হাসপাতালের সবাই বিমলকে ভালবাসতো।

এমন সময় বিমলের কানে গেল পেছন থেকে একটা সামরিক আদেশের ক্ষিপ্র, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ সুর। জাপানী ভাষায় হলেও তার অর্থ যেন কোন্ অদ্ভুত উপায়ে বুঝে ফেলে চোখ চাইলে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একজন জাপানী সামরিক কর্মচারী, লেফটেন্যান্টের ইউনিফর্ম পরা। সৈন্যেরা ততক্ষণ বেওনেট নামিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছে।

জাপানী অফিসারটি এগিয়ে এসে জাপানী ভাষাতেই কি প্রশ্ন করলে। তিন চারজন সৈন্য একসঙ্গে ওর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কি বললে।

জাপানী অফিসার বিমলের দিকে চেয়ে ভাঙা ইংরিজিতে বললে—তুমি আমার সৈন্যদের গালাগালি দিয়েছ?

বিমল বললে—তোমার সৈন্যরা কি করেছে তা আগে দেখ। এটা রেডক্রস হাসপাতাল। এখানে কেউ যোদ্ধা নেই। অকারণে তোমার সৈন্যেরা আমার ওই রোগীটিকে খুন করেছে বেওনেটের ঘায়ে।

জাপানী অফিসার একবার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে রক্তাক্ত বিছানা ও মৃত রোগীর দেহটার দিকে চেয়ে দেখলে এবং তারপর সম্ভবত ভর্ৎসনার সুরে সৈন্যদের কি বললে।

তারপর বিমলের দিকে চেয়ে বললে—তুমি কোন্ দেশের লোক?

—ভারতীয়।

—রেডক্রসের ডাক্তার?

—না, আমি চীনা মেডিকেল ইউনিটের ডাক্তার।

—ও! চীনেদের সাহায্য করতে এসেছ ভারতবর্ষ থেকে?

—হ্যাঁ।

—আমার সৈন্যদের অপমান করতে তুমি সাহস কর?

—আমার সামনে আমার রোগী খুন করলো ওরা, তার প্রতিবাদমাত্র করেছি।

হঠাৎ জাপানী অফিসারটি ঠাস করে একটা চড় মারলে বিমলের গালে। পরক্ষণেই সেই ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট সামরিক আদেশের সুর গেল ওর কানে—রাগে অপমানে, চড়ের প্রবল ঘায়ে দিশাহারা ওর কানে। সব ক'জন সৈন্য মিলে তক্ষুনি ওকে ঘিরে ফেল্লে চক্ষের নিমেষে। দুজন ওকে পিছমোড়া করে বাঁধলে চামড়ার কোমরবন্ধ দিয়ে। তারপর ওকে নিয়ে হাসপাতালের বাইরে চললো রাইফেলের কুঁদোর ধাক্কা দিতে দিতে। চীনা নার্স দুজন ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে রইল।

বিমলকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হোল, সেখানটা একটা ছোট মাঠের মত। একদিকে একটা নিচু বাড়ি।

মাঠের এক পাশে একটা ছোট টেবিল ও চেয়ার পেতে জনৈক জাপানী সামরিক কর্মচারী বসে। তার চারিপাশে সশস্ত্র জাপানী সৈন্যের ভিড়। কিছুদূরে দেওয়াল থেকে পনেরো হাত দূরে একসারি রাইফেলধারী সৈন্য দাঁড়িয়ে। আরও অনেক জাপানী সৈন্য

wapsip.com

মাঠটার মধ্যে এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে নিজেদের কথাবার্তা বলছে।

এ জায়গাটাতে কি হচ্ছে বুঝতে পারলে না।

ওকে নিয়ে গিয়ে টেবিলের কিছুদূরে দাঁড় করালে সৈন্যরা, তখন ও চেয়ে দেখলে দুজন চীনাকে জাপানী সৈন্যেরা ঘিরে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। চেয়ারে উপবিষ্ট জাপানী অফিসারটি কি জিজ্ঞেস করছে সৈন্যদের। চীনা দুটি সৈন্য নয়, সাধারণ নাগরিক, বিমল ওদের দেখেই বুঝলে। একটু পরেই জাপানী অফিসারটি কি একটা আদেশ দিয়ে হাত নেড়ে চীন দুটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বললে।

জাপানী সৈন্যেরা তাদের টেনে নিয়ে গিয়ে মাঠের ওদিকে যে বাড়িটা, তার দেওয়ালের গায়ে নিয়ে দাঁড় করালে।

চীনা লোক দুটির মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে—তারা কলের পুতুলের মত জাপানীদের সঙ্গে চললো বটে, কিন্তু তাদের চোখের অবাক ভাব দেখে মনে হয় তারা বুঝতে পারে নি কেন তাদের দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়া করানো হচ্ছে।

বিমলও প্রথমটা বুঝতে পারে নি, সে বুঝলে—যখন দশজন জাপানী সৈন্যের সারি এক যোগে রাইফেল তুললে।

একটা তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, সামরিক আদেশ বাতাস চিরে উচ্চারিত হোল, সঙ্গে সঙ্গে দশটি রাইফেলের এক যোগে আওয়াজ। বিমল চোখ বুঁজলে।

যখন সে চোখ চাইলে, তখন প্রথমেই যে কথা তার মনে উঠলো, স্থান ও অবস্থা হিসেবে সেটা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার বলতে হবে। তার সর্বপ্রথম মনে হোল—জাপানী রাইফেলের ধোঁয়া তো খুব বেশি হয় না! কেন একথা তার মনে হোল এই নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে—জীবনের এই ভীষণ সঙ্কটময় মুহূর্তে, কে তা বলবে?

তারপরই বিমল দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখলে চীনা দুটি উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। দুজন জাপানী সৈন্য তাদের মৃতদেহের পা ধরে হিঁচড়ে টেনে একপাশে রেখে দিলে। তারা পাশাপাশি পড়ে রইল এমন ভাবে, দেখে বিমলের মনে হোল ওরা কোনো ঠাকুরের সামনে উপুড় হয়ে প্রণাম করছে।

মানুষকে মানুষ যে এমন ভাবে হত্যা করতে পারে, বিমল তা আজ প্রথম দেখেছে হাসপাতালে, আর দেখলে এখন।

এবার বিমলের পালা, বিমল ভাবলে।

কিন্তু চেয়ে দেখলে আর চারজন চীনাকে আবার কোথা থেকে নিয়ে এসে জাপানী সৈন্যেরা টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

এবারও পূর্বের মতো কথা-কাটাকাটি হোল জাপানী অফিসার ও সৈন্যদলের মধ্যে।

তারপর আবার পূর্বের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি! এই চীনা চারজনও উপুড় হয়ে পড়লো দেয়ালের সামনে আগের দুজনের মত।

চীনা ভাষা যদিও বা কিছু কিছু শিখেছে বিমল, জাপানীভাষার তো সে বিন্দুবিসর্গ জানে না। কেন যে এদের গুলি করে মারা হচ্ছে, কি অপরাধে এরা অপরাধী, কিছু বোঝা গেল না। আর এখানে জাপানীরাই কথাবার্তা বলছে, চীনাদের বিশেষ কিছু বলবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

বিমল ভাবছিল—এই দূর বিদেশে এখনি তার প্রাণ বেরুবে। মা বাবার সঙ্গে আর দেখা হোল না, হয় তো তাঁরা জানতেও পারবেন না যে তার কি হয়েছে। শুধু একখানা চিঠি যাবে

wapsip.com

তাঁদের কাছে, তাতে লেখা থাকবে, ছেলে তাঁদের 'মিসিং'—খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!··· কিন্তু এ্যালিসের কি হোল! এ্যালিসের সঙ্গেও আর দেখা হবে না। এ্যালিসকে বড় ভাল লেগেছিল। কোথায় যে তাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে! বেচারি এ্যালিস! বেচারি মিনি!

কিন্তু বিমলের পালা আসতে বড় দেরি হতে লাগলো।

দলে দলে চীনা নাগরিকদের টেবিলের সামনে দাঁড় করানো চলতে লাগলো। তারপর তাদের হত্যা করাও সমানভাবে চলছে।

মৃতদেহ ক্রমেই স্তূপাকার হয়ে উঠছে।

এ রকম নিষ্ঠুর হত্যা-দৃশ্য আর দেখা যায় না চোখে।

বিমলকে এইবার দুজন জাপানী সৈন্য নিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। বিমল অনুভব করলে তার ভয় হচ্ছে না মনে—কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে।

জ্বর আসবার আগে যেমন গা বমি-বমি করে, ওর ঠিক তেমনি হচ্ছে শরীরের মধ্যে। মাথাটা যেন হঠাৎ বড় হালকা হয়ে গিয়েছে, আর কেমন যেন বমির ভাব হচ্ছে।

জাপানী সামরিক অফিসারটি ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলে—তুমি রাস্তায় কি করছিলে?

বিমল ইংরিজিতে বললে রাস্তায় সে কিছু করেনি। হাসপাতাল থেকে তাকে ধরে এনেছে।

—কোন্ হাসপাতাল?

—চীনা রেডক্রস হাসপাতাল?

—তুমি সেখানে কি করছিলে?

—আমি ডাক্তার। ডিউটিতে ছিলাম, জাপানী সৈন্যেরা একজন চীনা রোগীকে অকারণে বেওনেটের খোঁচায়—

পেছন থেকে দুজন জাপানী সৈন্য ওকে রুক্ষ স্বরে কি বললে, বিমলের মনে হোল তাকে চুপ করে থাকতে বলছে।

জাপানী অফিসারটি বললে—থামলে কেন? বলে যাও—

বিমল হাসপাতালের হত্যাকাণ্ডের কথা সংক্ষেপে বলে গেল।

জাপানী অফিসার চারিপাশের জাপানী সৈন্যদের দিকে চেয়ে জাপানী ভাষায় কি প্রশ্ন করলে। বিমলের দিকে চেয়ে বললে—তুমি সেই সৈন্যকে চিনতে পারবে?

—না । অত ভাল করে দেখিনি তার চেহারা, তখন মাথার ঠিক ছিল না, তা ছাড়া জাপানী সৈন্যেরা সবাই আমার চোখে একই রকম দেখায়। দেখতে অভ্যস্ত নই বলে।

—তুমি সিঙ্গাপুরের লোক?

—আমি ভারতবাসী।

—চীনা হাসপাতালে চাকুরি করো?

—হ্যাঁ।

—সরাসরি এসেছ চীনে?

এ প্রশ্ন করবার কারণ বিমল একটু একটু বুঝতে পারলে। এখানে সে একটা মিথ্যে কথা বললে। এই একমাত্র ফাঁক, এই ফাঁক দিয়ে সে এবারের মত গলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তো করবে। তারপর যা হয় হবে। সে বললে—সরাসরি আসি নি। আন্তর্জাতিক কনসেশনে এসেছিলাম; ব্রিটিশ কনসুলেট আপিসে আমার নাম রেজেস্ট্রি করা আছে।

wapsip.com

এই সময় একজন জাপানী সৈন্য কি বললে অফিসারটিকে। তার হাতে তিনটে জরির ব্যান্ড, দেখে মনে.হয় সে একজন করপোরাল কিম্বা কম্প্যানি কম্যান্ডার।

জাপানী অফিসার বিমলের দিকে ভ্রূকুটি করে বললে—তুমি একজন গুপ্তচর।

—আমি একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি। আমি ডাক্তার। তোমার সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই জানে আমি হাসপাতালে ডিউটিতে ছিলাম, ওরা ধরে এনেছে।

—আঙুলের টিপসই দাও দুটো এখানে।

বিমল দুখানা কাগজে টিপসই দিলে। তারপর জাপানী অফিসার কি আদেশ করলে জাপানী ভাষায়, ওকে দুজন জাপানী সৈন্য ধরে নিয়ে গিয়ে বাইরে একটা কামানের গাড়ির উপর বসালে। চারিধারে বহু জাপানী সৈন্য গিজ গিজ করছে। সকলেই ব্যস্ত, উত্তেজিত। কোথায় যাবার জন্য সকলেই যেন ব্যগ্র উৎসুক।

বিমল দেখলে তাকে এরা ছেড়ে দিলে না। মুক্তি যে দিয়েছে তা নয়। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে? জাপানী ভাষার সে বিন্দুবিসর্গ বোঝে না, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারে না। মিনিট পনেরোর মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ করে কামানের গাড়ি টানতে লাগলো একখানা মোটর লরি। ওর দুদিকে সাঁজোয়া গাড়ি চলেছে সারি দিয়ে।

সাংহাই অতি প্রকাণ্ড শহর, এর আর যেন শেষ নেই, ঘণ্টা দুই চলবার পরে শহরের বাড়ি ঘর ক্রমে কমে আসতে লাগলো। ফাঁকা মাঠ আর ধানের ক্ষেত। চীনদেশের এ অংশের দৃশ্য ঠিক যেন বাংলাদেশ, তবে এখানে কাছাকাছি নিচু পাহাড় শ্রেণী চোখে পড়ে।

কিছুদূরে একটা অনুচ্চ পাহাড়ের ওপারে ঘন ধোঁয়া। রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ আসছে।

এক জায়গায় মাঠের মধ্যে পাইন বন। সেখানে কামানের গাড়ি দাঁড়ালো। বিমল দেখলে একটা উঁচু ঢালু মত জায়গা লম্বা সারি দিয়ে জাপানী সৈন্যরা উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেল ধরে ছুঁড়ছে, এক সঙ্গে পঞ্চাশ ষাটটা রাইফেলের আওয়াজ হচ্ছে।

ওপাশ থেকেও তার জবাব আসছে; এটা যে যুদ্ধক্ষেত্র এতক্ষণ পরে বিমল বুঝতে পারলে! ওদিকে চীনা নাইন্‌থ রুট আর্মি জাপানীদের বাধা দিচ্ছে—চীনা সৈন্যবাহিনী সাংহাই ছেড়ে হটে গিয়েছে বটে, কিন্তু জাপানীদের আর এগোতে দেবে না।

আর একটু পরে বিমল লক্ষ্য করে দেখলে, পাইন বনের একপাশে গাছের তলায় একরাশ মৃতদেহ জাপানী সৈন্যের। স্ট্রেচারে করে বিমলের চোখের সামনে আরও দুজন মরা কি জ্যান্ত সৈন্যকে নিয়ে এল, বিমল বুঝতে পারলে না। একটু পরে আহতদের আর্তনাদ কানে যেতেই চিকিৎসক বিমল চঞ্চল হয়ে উঠলো। পাশের একজন জাপানী সৈন্যকে বললে পিজিন ইংলিশে—আমাকে ওখানে নিয়ে চল, আমি ডাক্তার, ওদের দেখবো।

সব মানুষের দুঃখই সমান। দুঃখপীড়িত মানুষের জাত নেই—তারা চীনা নয়, জাপানীও নয়। একটু পরে জাপানী অফিসারের সম্মতিক্রমে বিমল হতাহত সৈন্যদের কাছে গেল দেখতে, যদি তার দ্বারা কোন সাহায্য হয়। যদি মড়ার গাদায় জড়ো করা সৈন্যদের মধ্যে দু-একজন সাংঘাতিক আহত লোক বার হয়—কারণ আর্তনাদ সেই গাদার মধ্যে থেকেই আসছিল।

আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিমলের কিন্তু মনে হচ্ছিল না যে এটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র।

বইয়ে পড়া বা কল্পনায় দেখা যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

একটা শান্ত পাইন বন, গোটা তিনেক কামানের গাড়ি, রাইফেল হাতে কতকগুলি সৈন্য উপুড় হয়ে আছে—ওপারে পাহাড়ের ওপর কিছু ধোঁয়া।—

wapsip.com

কেবল সম্মুখের হতাহত জাপানী সৈন্যগুলি পরিচয় দিচ্ছে যে বিমল কোনো শান্তিপূর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে নেই—যেখানে সে রয়েছে সেখানে মানুষের জীবন মরণের সঙ্গে সম্পর্ক বড় বেশি।

কিন্তু ওষুধপত্র কিছু নেই যা দিয়ে এই সব আহত সৈনিকদের চিকিৎসা চলে। এমন কি খানিকটা আইডিন পর্যন্ত বিমল অনেককে বলেও জোটাতে পারলে না। এদের হাসপাতাল শিবির অনেক দূরে—সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত নেই।

জাপানী সৈন্যেরা কিন্তু দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের ওপারে চীনা সৈন্যদের রাইফেল নিস্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। কারণ যে কি, কিছু বুঝলে না।

আবার কামানের গাড়িতে চড়ে সৈন্যবেষ্টিত হয়ে যাত্রা।

এবার জাপানীরা বিমলের সঙ্গে খানিকটা ভাল ব্যবহার করলে, কারণ আহত জাপানী সৈনিকদের ও যথেষ্ট সেবা করেছে। ও যে সাধারণ সৈনিক বা স্পাই নয়, একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার—এই বিশ্বাস জন্মেছে সকলেরই।

পাহাড়ের ওপারে অনেকটা সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র সৈন্যশিবির। ওর মধ্যে ঢুকেই বিমল বুঝতে পারলে, এটা চীনা আর্মির হাসপাতাল—প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল এখানে—এখন কিছু নেই, চীনা সৈন্য সব সঙ্গে করে নিয়ে পালিয়েছে, কেবল একটা বড় দস্তার টব পড়ে আছে—আর কিছু ব্যান্ডেজের তুলো। হাসপাতাল শিবির থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে এক গাছের তলায় এক চীনা সৈন্যকে পাওয়া গেল—হতভাগ্য গুরুতর আহত। রাইফেলের গুলি বোধহয় জাপানীদের, তার শরীরের দুই জায়গায় বিঁধেছে—রক্তে তার ইউনিফর্ম ভিজে উঠেছে। একে যে ওর বন্ধুরা কেন শত্রুর হাতে ফেলে পালিয়েছে কিছু বোঝা গেল না।

একজন জাপানী সৈন্য ওর পা ধরে খানিকটা হেঁচড়ে নিয়ে চললো। লোকটার বেশ জ্ঞান রয়েছে—সে যন্ত্রণায় অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠতেই পেছন থেকে একজন জাপানী অফিসার এগিয়ে গেল তাকে দেখতে।

ওদের মধ্যে উত্তেজিত স্বরে জাপানী ভাষায় কি বলাবলি হোল, বিমল বুঝলে না—হঠাৎ অফিসারটি রিভলবার বার করে আহত সৈনিকের মাথায় প্রায় নল ঠেকিয়ে গুলি করলে।

লোকটা যেন রিভলভার ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে পড়লো। ওর সকল যন্ত্রণার অবসান হয়েছে।

বিমল শিউরে উঠলো—চোখের সামনে এ রকম নিষ্ঠুর হত্যা দেখতে সে এখনও তেমন অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। মাইল তিন দূরে একটা চীনা গ্রাম—যুদ্ধক্ষেত্রের বাঁদিক ঘেঁষে। ডানদিকে একটা অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর দিকে জাপানী অফিসারটির ফিল্ড গ্লাস দিয়ে দেখছে সবাই, সেদিকে আঙুল দিয়ে কি দেখাচ্ছে—বিমল বুঝলে ওই পাহাড়টা বর্তমানে চীনা নাইন্থ রুট আর্মির দ্বিতীয় ঘাঁটি। প্রথম ঘাঁটি ছিল পূর্বোক্ত পাইন বনের সামনের পাহাড়—তা গিয়েছে।

একস্থানে একদল জাপানী সৈন্য গোল হয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তাদের পাশ দিয়ে বিমলদের দল কামানের গাড়ি নিয়ে চলে গেল। ওরা যেন খুব উত্তেজিত হয়ে কি বলাবলি করছে, বিমল বুঝতে পারলে না। একজন পিজিন ইংলিশ জানা জাপানী সৈন্যকে জিজ্ঞেস করলে....ওখানে কি হচ্ছে? সৈন্যটি বললে—শোনো নি তুমি? সাংহাই শহর এখন আমাদের

wapsip.com

হাতে। আজ সকালে আমাদের হাতে এসেছে।

—অত বড় সাংহাই শহর তোমাদের হাতে সবটা এসেছে?

—সব। ওরা এইমাত্র ফিল্ড্ টেলিফোনে খবর পেয়েছে।

—যুদ্ধ হোল কখন?

—কাল সারারাত প্রায় দুশো বম্বার প্লেন বোমা ফেলেছে—শুনছি বিস্তর লোক মরেছে সাংহাইতে—

—সকলেই সাধারণ নাগরিক বোধ হয়?

—বেশির ভাগ। হাজার দুই তো শুধু চা-পেইতেই মরেছে—আর শুনছি কনসেশনে বোমা ফেলে ছ'শো পলাতক চীনাকে মারা হয়েছে। ভয়ানক যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে—হবেই তো—আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই। সাংহাই কি, সারা এশিয়া আমরা দখল করবো—তোমাদের ভারতবর্ষ তো বটেই। দেখে নিও তুমি—নাও, এগিয়ে চল।

বিমল ভাবছিল সুরেশ্বর কি বেঁচে আছে। বোধ হয় না। চা-পেই পল্লীর অত্যন্ত কাছে চ্যাং সো লীন অ্যাভিনিউতে চীনা রেড ক্রস হাসপাতাল; জাপানী বম্বারগুলোর বিশেষ দৃষ্টি হাসপাতালের ওপর। কাল রাত্রেই সুরেশ্বরের ডিউটি থাকবার কথা। সম্ভবত হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দিয়েছে—রোগী, ডাক্তার, নার্স সুদ্ধ। ভাগ্যে এ্যালিস্ আর মিনি ওখানে ছিল না!

কিন্তু আন্তর্জাতিক কনসেশনে বোমা ফেলে আশ্রয়হীন চীনা নরনারীদের মেরেছে, এ কথাটা বিমলের ভাল বিশ্বাস হোল না। আন্তর্জাতিক কনসেশনে বোমা ফেলতে সাহস করে কখনো? ওটা নিতান্ত বাজে কথা বলছে।

ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক কনসেশনের সম্পর্কে বিমলের এ অলৌকিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব দূর হয়েছিল—সাংহাই অধিকার করার পূর্বে ও পরে জাপানী বম্বার প্লেনগুলো সে কনসেশনের পবিত্রতা মানে নি—এ সংবাদ বিমল আরও ভাল জায়গা থেকে এর পরে শুনেছিল।

পথের মধ্যে একটা চীনা গ্রাম। বড় বড় ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে। তখন সন্ধ্যা হবার বেশি দেরী নেই। পূর্বোক্ত পাহাড় ও পাইনবন থেকে অন্তত পাঁচমাইল তখন আসা হয়েছে। জাপানী সৈন্যের একটা দল গ্রামটা দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠলো—এবং সবাই তক্ষুনি হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে প্রায় বুক ঠেকিয়ে, চুপি চুপি অগ্রসর হতে লাগলো গ্রামখানার দিকে। বিমল শুধু ভাবছিল, ভগবান করেন—গ্রামটাতে লোক না থাকে—সব যেন পালিয়ে গিয়ে থাকে।

কিন্তু তা হোল না। এ গ্রামের লোক যুদ্ধের বিশেষ কোন খবর রাখতো না—সাংহাই থেকে অন্তত পনেরো ষোল মাইল দূরে এই গ্রামখানা। এরা বেশ নিশ্চিন্ত ছিল যে চীনা নাইন্থ-রুট আর্মি তাদের রক্ষা করছে। হঠাৎ যে নাইন্থ-রুট আর্মি ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছে—তা ওরা সম্ভবত জানতো না।

জাপানী সৈন্যরা গ্রামখানাকে আগে চুপি চুপি গোল করে ঘিরে ফেললে। গ্রামে অনেকগুলো সাদা সাদা খোলার ঘর, খড়ের ঘর। শস্যের গোলা, দোকান পত্রও আছে। বেশ করে ঘেরার পরে জাপানীরা হঠাৎ একযোগে ভীষণ পৈশাচিক চীৎকার করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত নরনারী ঘুম ভেঙে বাইরে এসে অনেকে দাঁড়ালো—অনেকে ব্যাপারটা কি না বুঝতে পেরে বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টিতে জানালা খুলে চেয়ে দেখতে লাগলো।

তারপর যে দৃশ্যের সূচনা হোল তা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অমানুষিক। বিমলের চোখের

wapsip.com

সামনে বর্বর জাপানী সৈন্যেরা নিরীহ গ্রামবাসীদের টেনে টেনে ঘর থেকে বার করতে লাগলো, এবং বিনা দোষে বেওনেটের কিংবা বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে তার মধ্যে সাত আটজনকে একদম মেরে ফেললে। ছুতো এই যে, তারা নাকি বাধা দিয়েছিল। বাকিগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে দাঁড় করিয়ে রাখলে—চারিধারে বেওনেট-চড়ানো রাইফেল্ হাতে জাপানী সৈন্যের দল।

দু-তিনখানা খড়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। দুটো ছোট ছোট বাছুরকে ভয় দেখিয়ে মজা করতে লাগলো, একটা পিচ গাছের ডালগুলো অকারণে ভেঙে গাছটাকে ন্যাড়া করে দিলে। তবুও বিমল সবটা দেখতে পাচ্ছিল না—একে অন্ধকার, গ্রামটাও লম্বায় বড়, ওদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে জানে না—তার সামনে যেগুলো ঘটছে সেগুলো সে কেবল জানে। তবে নারী ও শিশুকণ্ঠের চীৎকার শুনে মনে হচ্ছিল, ওদিকের জাপানী সৈন্যেরা ঠিক বুদ্ধদেবের বাণী আবৃত্তি করছে না। মিনিট কুড়ি পঁচিশ এমনি চললো—বেশিক্ষণ ধরে নয়। তখন অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এসেছে, কেবল জ্বলন্ত ঘরের চালের আলোয় সামনেটা আলোকিত।

হঠাৎ বিমলের যেন হুঁশ হোল—সে তার আশে পাশে চেয়ে দেখলে তার খুব কাছে কোনো জাপানী সৈন্য নেই—লুঠপাটের লোভে সবাই গ্রামের ঘর-দোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে জটলা করছে।

বিমল একবার পিছনের দিকে চাইলে—সেদিকে একখানা কামানের গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ির কাছে সৈন্য নেই। গাড়িখানা থেকে পঞ্চাশ গজ আন্দাজ দূরে একটা প্রাচীন সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভ। চীনদেশের অনেক পাড়াগাঁয়ে সহমৃতা বিধবার এমন পুরোনো আমলের স্মৃতিস্তম্ভ সে আরও দু একটা দেখেছে। ততদূর পর্যন্ত বেশ দেখা যাচ্ছে অগ্নিকাণ্ডের আলোয়, কিন্তু তার ওপারে অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না।

বিমল আস্তে আস্তে পিছনে হটতে হটতে দশ বারো পা গিয়ে হঠাৎ পেছনে ফিরে ছুট দিয়ে সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভটার আড়ালে একটা অন্ধকার স্থানে এসে দাঁড়ালো।

ওর বুক টিপ টিপ করছে। যদি জাপানীরা তাকে এখন ধরে, তবে এখুনি গুলি করে মারবে। কিন্তু ওদের হাতে বন্দী হয়ে এভাবে থাকার চেয়ে মৃত্যুপণ করেও মুক্তির চেষ্টা তাকে করতে হবে।

স্মৃতিস্তম্ভটার গায়ে একটা ডোবা। অন্ধকারের মধ্যেও মনে হোল ডোবাটায় বেশ জল আছে। বিমল তাড়াতাড়ি ডোবার জলে নামলো—তার কেমন মনে হোল জলে নেমে সে যদি গলা ডুবিয়ে থাকে, তবেই সব চেয়ে নিরাপদ—ডাঙায় ছুটে পালাবার চেষ্টা করলে বেশিদূর যেতে না যেতেই সে ধরা পড়বে।

এই ডোবায় নামবার জন্যেই যে এ যাত্রা বেঁচে গেল—সেটা সে খানিকটা পরেই বুঝতে পারলে।

অল্পক্ষণ—বোধ হয় দশ বারো মিনিটের পরেই ভীষণ চীৎকার ও বহু রাইফেলের সম্মিলিত আওয়াজ শোনা গেল। খুব একটা হৈ চৈ দুপ্ দাপ পালানোর শব্দ, আবার চেঁচামেচি—একটা ঘোর বিশৃঙ্খলার ভাব!

বিমল তখন ডোবার জলে গলা ডুবিয়ে বসে আছে। যদি ডাঙায় থাকতো তবে অন্ধকারে ছুটন্ত রাইফেলের গুলিতে হয়তো তার প্রাণ যেত।

wapsip.com

ব্যাপারটা কি? বিমল দেখলে সেই জাপানী কামানের গাড়িটা ঘিরে একটা খণ্ডযুদ্ধ ও হাতাহাতি আরম্ভ হয়েছে সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভটার ওপারে। হ্যান্ডগ্রিনেড ফাটাবার ভীষণ আওয়াজে হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা যেন কেঁপে উঠলো। একটা—দুটো—তিনটে। জাপানী কামানের গাড়ির কাছ থেকে জাপানী সৈন্যেরা হটে যাচ্ছে একটা বাগানের দিকে।

বিমল এবার ব্যাপারটা কিছু কিছু বুঝলে। চীনা সৈন্যের একটা দল জাপানীদের অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। জাপানীরা ফিল্ডগানগুলো একেবারে ছুঁড়তে পারলে না—দুটোর একটাও না। চীনারা বুদ্ধি করে আগেই সে দুটো কামানই ঘেরাও করে দখল করলে। চীনা সৈন্যের এই দলটা হ্যান্ডগ্রিনেড ছুঁড়ে জাপানীদের দলের জটলা ভেঙে দিলে।

কিছুক্ষণ পরে রাইফেলের ও হ্যান্ডগ্রিনেডের আওয়াজ থেমে গেল। জাপানীরা কামানের গাড়ি ও বন্দীদের ফেলে পালিয়েছে। বিমল বেশ দেখতে পেলে কাছাকাছি কোথাও জাপানী সৈন্য একটাও নেই। কাদামাখা পোশাকে সতর্কতার সঙ্গে সে ধীরে ধীরে ডোবার জল থেকে উঠলো ডাঙায়।

একজন সৈনিকের চড়া আওয়াজ তার কানে গেল—কে ওখানে?

বিমল আশ্চর্য হোল এ পুরুষের গলা নয়—মেয়েমানুষের মত সরু গলা। বিমল কথার উত্তর দেবার আগে দুজন রাইফেলধারী চীনা সৈনিক ওর দিকে এগিয়ে এল ইলেকট্রিক টর্চ হাতে। তারা ওকে দেখে যেমন অবাক হোল, বিমলও ওদের দেখে তেমনি অবাক হয়ে গেল।

এরা পুরুষ মানুষ নয়, দুজনেই মেয়ে; বয়েসও বেশি নয়। কুড়ি পঁচিশের মধ্যে। বেশ সুশ্রী দুজনেই—সৈন্যবিভাগের আঁট-সাঁট খাকী পোশাকে এদের দেহের লাবণ্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়নি।

তারা বিমলকে ধরে নিয়ে গেল গ্রামের সদর রাস্তার ওপরে।

অবাক কাণ্ড! সকলেই মেয়ে সৈনিক! এদের মধ্যে পুরুষ মানুষ নেই একজন। এই সুশ্রী তরুণীর দল এতক্ষণ হ্যান্ডগ্রিনেড ছুঁড়ছিল এবং এরাই জাপানী ফিল্ড গান দুটো ঘেরাও করে দখল করেছে।

বিমলের মনে পড়লো চীনা নাইন্থ-রুট আর্মির সঙ্গে একটি নারী বাহিনী আছে—সে সাংহাই চীনা রেডক্রস হাসপাতালে শুনেছিল বটে।

এরাই সেই চীনা মেয়ে-যোদ্ধার দল।

এদের কম্যান্ডান্ট কিন্তু মেয়ে নয়—পুরুষ। একটা পাইনকাঠের পুরোনো ভাঙা টেবিলের সামনে সম্ভবত একটা উপুড় করা কলসী বা ওই রকম কোন হাস্যকর জিনিস পেতে খুব লম্বা গোঁপ-ওয়ালা কম্যান্ডান্ট বসে ছিলেন। মেয়েরা বিমলকে ধরে নিয়ে গেল সেখানে।

বিমলের মনে হোল সমগ্র নারী বাহিনীর মধ্যে এই লোকই ইংরাজি জানে এবং বেশ ভাল আমেরিকান টানের ইংরাজি বলে।

বিমলের আপাদমস্তক ভাল করে দেখে প্রশ্ন করলে—তুমি জাপানীদের লোক?

—না। আমি চীনা হাসপাতালের ডাক্তার।

—কোথাকার হাসপাতাল?

—সাংহাইয়ের রেডক্রস হাসপাতাল। আমাকে ওরা বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল।

—তুমি কোন্ দেশের লোক?

—ভারতবর্ষের। চীনা মেডিকেল ইউনিটের আমি সভ্য।

কমান্ডান্ট বিস্ময়ের সুরে বললে—ও! তা ডোবার জলে কি করছিলে? বিমল লজ্জিত

wapsip.com

হোল। এতগুলি মেয়ের সামনে!

বললে—লুকিয়ে ছিলুম। ওদের অসতর্ক মুহূর্তে ওদের হাত থেকে পালিয়ে ডোবার জলে লুকিয়েছিলুম। তার পর হঠাৎ হ্যান্ডগ্রিনেডের আওয়াজ আর চিৎকার শুনলাম, তখনই ভাবলাম চীনা সৈন্য আক্রমণ করেছে ওদের।

কথাবার্তা চলছে এমন সময়ে গ্রামের পথে কি একটা গোলমাল উঠলো। কমান্ডান্টকে ঘিরে যারা ছিল, তারা চমকে উঠে সেদিকে ছুটতে লাগল। আবার কি জাপানী সৈন্যের দল আক্রমণ করেছে?

বিমল চেয়ে দেখল জনকয়েক সৈন্য যেন কাউকে ধরে আনছে—তাদের পেছনে পেছনে অনেক সৈন্য মজা দেখতে আসছে।

ব্যাপার কি? হয়তো কোন জাপানী সৈন্য ওদের হাতে ধরা পড়েছে, তাকে সকলে মিলে ধরে আনছে—নিশ্চয়ই।

কিন্তু দলটি কমান্ডান্টের কাছে এসে পৌঁছে যখন ওদের প্রথামত সামরিক অভিবাদন করে দুজন বন্দীকে এগিয়ে নিয়ে দাঁড় করাল কমান্ডান্টের সামনে—বিমল চমকে উঠে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। কারণ কিছুক্ষণ পরে তার মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরুলো—এ্যালিস! মিনি! সামনের শীর্ণকায়া মূর্তি দুটি এ্যালিস ও মিনি ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু ওদের হাত পা বাঁধা—মুখে কাপড় দিয়ে বাঁধা। এমন শক্ত করে বাঁধা যে ওদের কথা বলবার উপায় নেই।

ভয়ানক রাগ হোল বিমলের এক মুহূর্তে এই চীনা নারী বাহিনীর ওপর। মেয়ে হয়ে মেয়ের ওপর এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার! ওদের এমন করে বেঁধে আনার অর্থ কি? ওরা ছিলই বা কোথায়?

কমান্ডান্ট উত্তেজিত সুরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো। ইতিমধ্যে এ্যালিস ও মিনির হাত-পা মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হোল। ব্যাপারটা ক্রমশ যা জানা গেল তা হোল এই—

চীনা নারী সৈন্যেরা এদের গ্রামের একটা ঘরের মধ্যে অন্ধকার কোণে এই অবস্থাতেই পায়। বাইরে থেকে ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল—কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজে সন্দেহ করে ওরা দরজা ভেঙে দেখতে পায় এদের। ওরা বুঝতে পেরেছে যে এরা ইউরোপীয় বা আমেরিকান মহিলা। কিন্তু চীনের এই সুদূর পাড়াগাঁয়ে একা অন্ধকার ঘরের কোণে এদের কে এ অবস্থায় এনে ফেলেছে তা না বুঝতে পেরে সবাই মহা বিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো।

হঠাৎ বিমল বলে উঠলো—এ্যালিস! মিনি!

প্রথমে চমকে উঠে ওর দিকে চাইলে এ্যালিস। বিমলকে দেখে সে যেন প্রথমটা চিনতে পারলে না—তারপর প্রায় ছুটে ওর কাছে এসে বিস্মিত চকিত আনন্দভরা কণ্ঠে বললে— তুমি এখানে!

সঙ্গে সঙ্গে মিনিও ছুটে এল। মিনির চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে নানা কষ্টে, উদ্বেগে, এবং খুব সম্ভবত অনাহারেও বটে। সে বললে, তোমার বন্ধু কই?

ঘণ্টা কয়েক পরে।

একটা রিচ গাছের তলায় বসে মিনি, এ্যালিস ও বিমল কথা বলছিল। এখনও রাত আছে; তবে পূর্ব আকাশে শুকতারা উঠেছে—ভোর হওয়ার বেশি দেরি নেই।

wapsip.com

মিনি ও এ্যালিস তাদের গল্প বলে যাচ্ছিল। ওদের ভাল করে খেতে দেওয়া হয়েছে, কারণ ওদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল পেটভরে খাওয়া ওদের অদৃষ্টে অনেকদিন ধরে জোটেনি।

বিমল বললে—এখানে তোমরা কি করে এলে?

এ্যালিস বললে—এখনও ঠিক গুছিয়ে বলতে পারবো না, কিন্তু বড্ড খুশি হয়েছি তোমায় দেখে, বিমল। আমরা তো আশঙ্কা করছিলাম জাপানীরা আক্রমণ করেছে—এইবার ঘর জ্বালিয়ে আমাদের বন্দী অবস্থায় পুড়িয়ে মারবে—কে আর উদ্ধার করবে আমাদের? আর আমাদের অস্তিত্ব জানেই বা কে?

—কবে তোমরা এ গ্রামে এসেছ?

—আজ তিন দিন হোল খুব সম্ভব—কারণ দিনরাত্রির জ্ঞান আমাদের বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

—কে তোমাদের আনে?

—কয়েকজন চীনা দস্যু।

—সাংহাইয়ের চণ্ডুর আড্ডায় তোমাদের নিয়ে গিয়েছিল ধরে?

এ্যালিস বিস্ময়ের সুরে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে—তুমি কি করে জানলে?

বিমল হেসে বললে—আমি আর সুরেশ্বর সেই চণ্ডুর আড্ডাতে যাই তোমাদের খুঁজতে। কিন্তু বড় বিভ্রাট বেধে গেল সে রাত্রে। জাপানী বম্বারগুলো সেইরাত্রে ভীষণ বোমা বর্ষণ শুরু করলে। মিনি বললে, আমরা খুব জানি । আমরা তখন হাতমুখ বাঁধা অবস্থায় একটা গরুর গাড়ির মধ্যে শুয়ে। একটা বোমা তো আমাদের গাড়ির পাশে পড়লো।

এ্যালিস বললে—তারপর ওরা আমাদের নানা জায়গায় ঘোরালে। দশ হাজার ডলার মুক্তিপণ না দিলে আমাদের ছাড়বে না। দেশের বাপমায়ের কাছে চিঠি লিখবে বলে ঠিকানা চেয়েছিল—আমরা দিইনি। আজ ওরা আমাদের শাসিয়েছিল জাপানী সৈন্যেরা গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে—ঠিকানা যদি না দিই তবে ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে পালাবে—আমরা নিঃশব্দে পুড়ে মরবো। করেছিলও তাই। চীনা মেয়ে সৈন্যেরা না এলে জাপানীরা গ্রাম জ্বালিয়ে দিত। আমরাও পুড়ে মরতাম।

বিমল বললে—কি সর্বনাশ!

এ্যালিস বললে—সর্বনাশ আর কি, পুড়ে মরতাম এর আর সর্বনাশ কি? কতই তো মরছে! কিন্তু তুমি এখানে কি করে এলে বিমল?

—আমাকে হাসপাতাল থেকে জাপানীরা বন্দী করে এনেছিল। আমি নাকি স্পাই। এতদিন গুলি করেই মারতো যদি একথা ওদের না বলতুম যে ব্রিটিশ কনসুলেট আপিসে আমার নাম রেজেস্ট্রি করা আছে।

মিনি বললে—সুরেশ্বর কোথায় গেল একটা খোঁজ করতে হয়। আর আমেরিকান কনসুলেটে আমাদের বিষয়ে একটা খবর দিতে হয়—চলো কমান্ডান্টকে বলি।

জনকয়েক তরুণী চীনা মেয়ে-সৈন্য ওদের হাসিমুখে ঘিরে দাঁড়ালো। এদের হাস্যদীপ্ত সুন্দর চেহারা বিমলের বড় ভাল লাগলো, এমন একটা জিনিস নতুন দেখছে সে—বহুশতাব্দীর জড়তা দূর করে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নারী—রণক্ষেত্রের নিষ্ঠুরতা, কঠোরতার মধ্যে। দেশের দুর্দিনে দেশমাতৃকার সেবাযজ্ঞে তারা আজ মস্ত বড় হোতা—মিথ্যে জড়তা, মিথ্যে লজ্জা-সঙ্কোচ দূর করে ফেলেছে টেনে!

wapsip.com

একটি মেয়ে ইংরাজিতে বললে—তোমরা হ্যাংচাউতে রাজকুমারী তাং-এর দেউল দেখেছ?

এ্যালিস বললে—না, সে কি?

—পাঁচশো বছর আগে মিং রাজবংশের একজন রাজকুমারী ছিলেন তাং। তাঁর পুণ্যচরিত্র এখনও আমাদের দেশের লোকের মুখে মুখে আছে। এখান থেকে বেশি দূর নয়—দেখে যেও।

বিমল বললে—তুমি বেশ ইংরাজি বলতে পারো তো?

মেয়েটি এমন হাসলে যে তার তেরচা চোখ দুটো বুজে গিয়ে দুটো কালো রেখার মত দেখাতে লাগলো।

—ভাল ইংরিজি বলছি? তবুও এ ইয়াংকি ইংরিজি। মিশনারী স্কুলে পাঁচ বছর পড়েছিলুম এক সময়ে। ইংরিজি গান পর্যন্ত গাইতে পারি—শুনবে?

হঠাৎ বিউগল বেজে উঠলো। সবাই ব্যস্ত হয়ে কমাণ্ডান্টের তাঁবুর দিকে চললো। এখনি মার্চ শুরু করতে হবে। খবর পাওয়া গিয়েছে জাপানীদের বড় একটা দল এখানে আসছে।

বিমল বাঁ দিকে চেয়ে দেখলে।

একটা অনুচ্চ পাহাড়ের মত লম্বা ঢিবির আড়াল থেকে মাঝে মাঝে যে সাদা ধোঁয়া বার হচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে ফটফট শব্দ হচ্ছে। শব্দটা অনেকটা যেন বিমলদের দেশের লিচু বাগানে পাখি তাড়াবার জন্যে চেরা বাঁশের ফটাফট আওয়াজের মত।

রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ। আধুনিক যুদ্ধে ব্যবহৃত রাইফেলে শব্দ হয় খুব কম— বিমল জানতো।

সবাই বললে—মাথা নিচু করো—মাথা নিচু করো—

জাপানী সৈন্যরা আক্রমণ করে ওই ঢিবিটাতে আড়াল নিয়েছে—কিন্তু হয়তো এখুনি বেওনেট চার্জ করবে কিংবা হ্যান্ডগ্রিনেড নিয়ে ছুটে আসবে।

চক্ষের নিমেষে সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেলের মুখ ঢিবিটার দিকে ফেরালে। একটা মেয়ে হঠাৎ অস্পষ্ট চীৎকার করে উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ হয়ে গেল—তার হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে গিয়ে পড়লো আর একটি মেয়ের পিঠের ওপরে—সে কিছু দূরে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল বন্দুক বাগিয়ে। এ্যালিস ছুটে উঠে গিয়ে মেয়েটির মাথা নিজের কোলে তুলে নিলে—আশপাশের মেয়েরা বললে—মাথা নিচু—মাথা নিচু—শুয়ে পড়ো—

বিমল শঙ্কিত চোখে অল্পক্ষণের জন্যে এ্যালিসের দিকে চেয়ে দেখলে—তারপরে সেও উঠে গিয়ে এ্যালিসের পাশে বসলো। আহত মেয়ে-সৈনিকের হাতের নাড়ী দেখে বললে—এ শেষ হয়ে গিয়েছে। এঃ, এই দ্যাখো গলায় লেগেছে গুলি—তোমার কাপড় যে রক্তে ভেসে গেল।

এ্যালিসকে এক রকম জোর করে টেনে বিমল তাকে আবার উপুড় করে শোয়ালে। বিমল ভাবছিল, এখুনি যদি দুর্দান্ত জাপানী গ্রিনেডিয়ারেরা হ্যান্ডগ্রিনেড নিয়ে ছুটে আসে ঢিবিটা ডিঙিয়ে, তবে এই শায়িতা নারী-সৈনিকের দল একটাও টিকবে না। জাপানী হ্যান্ডগ্রিনেডের বিস্ফোরণের ফল অতি সাংঘাতিক, এদের কমাণ্ডান্ট কি ভরসায় এদের এখনো শুইয়ে রেখেছে? মরবে তো সবগুলোই মরবে। যা করে করুক, ওদের সৈন্য ওরা বাঁচাতে হয় বাঁচাক, নয় তো যা হয় করুক। কিন্তু মিনি ও এ্যালিসের জীবন আবার বিপন্ন হোল।

ফটাফট—ফটাফট—

wapsip.com

আবার একটা অস্ফুট শব্দ। তারপর বিমল চেয়ে দেখলে চীৎকার না করেও সারির মাঝামাঝি দুটি মেয়ে উপুড় অবস্থাতেই মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে। হাতের শিথিল মুঠিতে তখনও রাইফেল ধরাই রয়েছে। তার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ থেকে রক্ত বার হয়ে সামনের মাটি রাঙা হয়ে গিয়েছে। আর একটি মেয়েও দেখতে দেখতে মুখ গুঁজে পড়ে গেল। আঃ —কি ভীষণ হত্যাকাণ্ড! পুরুষদের এরকম অবস্থায় দেখলে সহ্য করা হয় তো যায়—কিন্তু এই ধরনের নারীবলির দৃশ্যটা বিমলের কাছে অতি করুণ ও অসহনীয় হয়ে উঠলো!

বিমল বললে—এ্যালিস। কমান্ডান্টটি কেমন লোক? এদের দাঁড়িয়ে খুন করাচ্ছে কেন? হঠে যাবার অর্ডার না দেওয়ার মানে কি? জাপানীরা বেওনেট কি হ্যান্ডগ্রিনেড চার্জ করলে একজনও বাঁচবে?

এ্যালিস বিমলের পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে— তার ওদিকে মিনি।

মিনি বললে—কমান্ডান্টের এ-রকম ব্যবহারের নিশ্চয়ই কোন মানে আছে।

মানে কি আছে তা জানবার আগেই আরও দুটি মেয়ে মুখ গুঁজড়ে পড়ে গেল—এদের এই নিঃশব্দ মৃত্যু বিমলের কাছে বড় মর্ম্মস্পর্শী বলে মনে হোল। হঠাৎ একটা লম্বা কাশীর পেয়ারার আকারে বস্তু শায়িতা মেয়েদের সারির অদূরে এসে পড়লো—বিমল ও এ্যালিস দুজনেই বলে উঠলো—গ্রিনেড!

কিন্তু হ্যান্ডগ্রিনেডটা ফাটলো না। বোধ হয় এবার জাপানীরা চার্জ করবে। এ্যালিস ও মিনির জন্যে বিমল শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

ঠিক সেই সময় কমান্ডান্ট ওদের হঠবার অর্ডার দিলে।

পেছনের সারি শুয়ে-শুয়েই পিছুদিকে হঠতে লাগলো। সামনের সারিগুলো ততক্ষণ রাইফেল বাগিয়ে তাদের রক্ষা করছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সামনের সারিও হঠতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা চার্জ করলে। দলে দলে ওরা টিবিটা পেরিয়ে 'বানজাই' বলে ভীষণ বাজখাঁই চীৎকার করতে করতে ছুটে এল—এদিকে নারী-বাহিনীর সব বন্দুকগুলো একসঙ্গে গর্জ্জন করে উঠলো। এখানে ওখানে জাপানী সৈন্য ধুপ-ধাপ করে মুখ থুবড়ে পড়তে লাগলো। তবুও ওদের দল এগিয়ে আসছে।

সব পেছনের সারি উঠে দাঁড়িয়ে একযোগে সাত আটটা হ্যান্ডগ্রিনেড ছুঁড়লো, চার পাঁচটা ফাটলো। আরও কতকগুলো জাপানী সৈন্য মাটিতে পড়ে গেল। তিন জন মাত্র জাপানী এদের দলের মধ্যে এসে পৌঁছেছিল। তাদের মধ্যে দুজন বেওনেটের ঘায়ে সাংঘাতিক আহত হোল—বাকি একজনের মাথায় গুলি লেগে সাবাড় হোল।

ততক্ষণ নারী-বাহিনী প্রায় একশো দেড়শো গজ দূরে চলে গিয়েছে। এতদূর থেকে হ্যান্ডগ্রিনেড কোনো কাজে আসবে না—কেবল কার্যকরী হতে পারে মিল্‌স্ বম্ব্ জাতীয় বোমা। সে কোনো দলের কাছেই নেই, বেশ বোঝা গেল।

কমান্ডান্ট বিমলকে ডেকে বললেন—এরকম কেন করেছি, আপনি বোধ হয় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। এর কিছু দূরে মিং-চাউ এর রেল স্টেশন। দুটো সৈন্যবাহী ট্রেন পর পর চলে যাবার কথা। জাপানীরা রেল স্টেশন আক্রমণ করতো। আমি ওদের বাধা দিয়ে এখানে আটকে রাখলাম। টাইম অনুসারে ট্রেন দুটো চলে গিয়েছে। এখন আর আমার সৈন্যদের মৃত্যুর সম্মুখীন করা অনাবশ্যক। জাপানীরাও তা বুঝেছে, ওরাও আর আসবে না। ওদের লক্ষ্যস্থল আমরা নই—সেই ট্রেন দুখানা।

—কিন্তু এরোপ্লেন যদি বোমা ফেলে?

wapsip.com

—আমার ঘাঁটি পার করে দিলাম নিরাপদে—তারপর অন্য এলাকার লোক গিয়ে বুঝুক সে কথা।

মিং-চাউয়ের রেল স্টেশন পৌঁছে সবাই খাওয়া-দাওয়া করবার হুকুম পেলে। বিমল ব্যস্ত হয়ে পড়লো মিনি ও এ্যালিসকে কিছু খাওয়াতে। খাবার কিছুই নেই। অন্তত সভ্য খাদ্য কিছু নেই। কমান্ডান্টকে বলে কিছু চাল যোগাড় করে একটা গাছতলায় এ্যালিস একটা পুরানো সস-প্যানে ভাত চাপিয়ে দিলে তিনজনের মত।

বেলা প্রায় বারোটা। রৌদ্র বেশ প্রখর, কিন্তু গরম নেই, বেশ শীত।

ভাত প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় দলে দলে ছোট্ট শীর্ণকায় ছেলেমেয়ে গাছতলায় নীরবে এসে দাঁড়ালো। তারা ক্ষুধার্তের ব্যগ্র দৃষ্টিতে সস-প্যানের দিকে চেয়ে রইল। জনৈক মেয়ে সৈনিক বললে—এরা আশপাশের গ্রামের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ছেলেমেয়ে; আমাদের দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ চলছে। ওরা খাবার লোভে এসেছে।

এ্যালিস বললে—পুওর লিট্‌ল ডিয়ারস্! ....ওদের কি খেতে দিই, বিমল?

বিমল মুশকিলে পড়ে গেল। নিজের খাওয়ার জন্যে নয়—মিনি এ্যালিস কত দিন পেট ভরে খায়নি বলেই ওদের খাওয়াতে ব্যগ্র ছিল। নিজে না হয় না খাবে, কিন্তু এ্যালিস যেমন মেয়ে নিজের মুখের ভাত সব এক্ষুনি তুলে দেবে এখন এদের।

সুখের বিষয় একটা সমাধান হোল। ওরা চীনা ছেলে-মেয়ে, চীনা খাবার খেতে আপত্তি নেই। অন্য অন্য মেয়ে-সৈনিকরা ওদের দেশীয় খাদ্য কিছু কিছু দিলে। তারা চলে গেল তাই খেয়ে। এ্যালিসের ইচ্ছে ওদের মধ্যে একটা ছোট্ট ছেলে নিয়ে যায়। বললে—বিমল, বলো না ওদের মধ্যে কাউকে আমার সঙ্গে যাবে। আমি খুব যত্ন করবো। বিমল হাসলে, তা কি কখনো হয়?

একটু পরে একখানা ট্রেন এল। তাতে সব খোলা ট্রাক, কয়লার গাড়ির মত। কমান্ডান্টের আদেশে সবাই তাতে উঠে পড়লো। ট্রেনের গার্ডের মুখে শোনা গেল জাপানীরা এখান থেকে বাইশ মাইল ডাউন লাইনে একখানা সৈন্যবাহী ট্রেন এরোপ্লেন থেকে বোমা মেরে উড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছে।

ট্রেন ছাড়লো। গার্ড বললে—ভয়ানক বিপজ্জনক অবস্থা। ওরা প্রত্যেক সৈন্যবাহী ট্রেনের ওপর কড়া লক্ষ্য রেখেছে। পৌঁছে দিতে পারবো কিনা নিরাপদে তার ঠিক নেই।

মাইল ত্রিশেক দুধারে ফাঁকা মাঠ, ধানের ক্ষেত, গমের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলল। বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে, রোদ নেই। মাঠে ঘন ছায়া পড়ে এসেছে। এমন সময় একটা পরিচিত আওয়াজ শুনে বিমলের বুকের মধ্যেটা কেমন করে উঠলো। মুখ উঁচু করে দেখতে গিয়ে দেখলে ট্রেনের সবাই মুখ তুলে চেয়ে রয়েছে। অনেকগুলি এরোপ্লেনের সম্মিলিত ঘর্-ঘর্ আওয়াজ। ট্রেন যেন গতি বাড়িয়ে দিয়ে জোরে চলতে লাগলো।

মিনি বললে—ওই দেখো বিমল এরোপ্লেনের সারি! বম্বার!—

চক্ষের নিমেষে এরোপ্লেনের সারি নিকটবর্তী হোল—কিন্তু ট্রেনখানাকে গ্রাহ্য না করেই যেন এরোপ্লেনগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে যাচ্ছিল—হঠাৎ একখানা বম্বার দল ছেড়ে বেশ নিচু হয়ে এলো। ট্রেনের সকলের মুখ শুকিয়েছিল আগেই—এখন যেন বুকের রক্ত পর্যন্ত জমে গেল। এই ফাঁকা মাঠে বোমা ফেললে ট্রেনের চিহ্ন খুঁজে মিলবে না। তার ওপরে ছাদ-খোলা ট্রাক গাড়ি বোঝাই সৈন্য, কারও মৃত দেহ এর পর সনাক্ত পর্যন্ত করা যাবে না। এ্যালিস ও মিনিকে বাঁচানো গেল না শেষে।

wapsip.com

এরোপ্লেনখানা নিচে নেমে ছোঁ-মারা চিলের মত একটা বোমা ফেলেই তখনি ওপরে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ! সমস্ত ট্রেনখানা কেঁপে নড়ে উঠলো যেন, কিন্তু ট্রেনের বেগ কমলো না। বিমল চেয়ে দেখলে রেললাইন থেকে দশ গজ দূরে একটা জায়গায় বিশাল গর্তের সৃষ্টি করে মাটি, ধুলো, ঘাস, বালি অন্তত পঁচিশ ত্রিশ হাত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে কালো ধোঁয়ার আবরণের মধ্যে বোমাটা সমাধি লাভ করেছে। বোমারু তাগ্ ঠিক করতে পারে নি।

আর মাইল পাঁচ ছয় পরে একটা রেলস্টেশন। গাড়িখানা সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার পূর্বেই দেখা গেল স্টেশন থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরুচ্ছে—লোকজন ছোটাছুটি করছে—একটা হট্টগোল, কলরব, ব্যস্ততার ভাব। ট্রেনখানা স্টেশনে গিয়ে দাঁড়াতেই বোঝা গেল জাপানী বিমান থেকে বোমা ফেলে স্টেশনটাকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। টিনের ছাদ দুমড়ে বেঁকে ছিটকে বহু দূরে গিয়ে পড়েছে, একপাশে আগুন লেগে গিয়েছে—গোটা প্ল্যাটফর্মে মানুষের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ, কারও হাত, কারও পা, কারও মুণ্ড।

নিকটে একখানা গ্রাম। গ্রামের চিহ্ন রাখেনি বোমারুর দল। ইনসেনডিয়ারি বোমা ফেলে সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ট্রেন থেকে সবাই নেমে সাহায্য করতে ছুটলো। গ্রামের লোক বেশি মরে নি—তবুও বিমল দেখলে গ্রামের পথে চার-পাঁচটা বীভৎস মৃতদেহ পড়ে আছে। এরোপ্লেনগুলোর চিহ্ন নেই আকাশে, তাদের কাজ শেষ করে তারা চলে গিয়েছে। গ্রামের নরনারী ভয়ে বিহ্বল হয়ে মাঠের মধ্যে ছুটে পালিয়েছিল, যদিও বিপদের সম্ভাবনা ছিল সেখানেই সর্বাপেক্ষা বেশি, একটি মেয়ে একা ভাঙা ঘরের সামনে ভাঙাচোরা হাঁড়িকুড়ি বেতের পেটরা কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করছে আর কাঁদছে। একজন মেয়ে-সৈন্য তার কাছে গিয়ে চীনা ভাষায় কি জিজ্ঞেস করলে। বিমলের দল গ্রামের অন্য অন্য লোকজনের সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

একটু পরেই সেখানে ভারি একটি অদ্ভুত দৃশ্য সবারই চোখে পড়ল।

গ্রামের পাশে একটা ছোট্ট মাঠ—তারই এক গাছতলায় জনৈক বৃদ্ধ গ্রামের লোকজনকে চারিপাশে নিয়ে কি বলছেন বক্তৃতার ধরনে। বিমল চিনলে—প্রোফেসর লি!

এ্যালিস সকলের আগে এগিয়ে গিয়ে বললে—ড্যাডি! চিনতে পারো?

সৌম্য মূর্তি শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ বক্তৃতা থামিয়ে একগাল হেসে ওর দিকে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন—তোমরা কোথা থেকে?

এ্যালিস হেসে বললে—এই ট্রেনে নামলাম। আর একটু হলে আমাদের কাউকে দেখতে পেতে না—আমাদের ট্রেনেও বোমা পড়েছিল।

বিমল বললে—গুডমর্নিং, প্রোফেসর লি। আপনার দলবল কোথায়? আপনি কি করছেন এখানে?

বৃদ্ধ বললে—দলবল এখান থেকে তিন মাইল দূরে আর একখানা বোমায় বিধ্বস্ত গ্রামে সাহায্য করছে। আমি এদের উপদেশ দিচ্ছি এরোপ্লেন বোমা ফেলতে এলে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয়। এরা কিছুই জানে না—দাঁড়িয়ে মরছে, নইলে দেখ গ্রামের অধিকাংশ লোক ফাঁকা মাঠে ছুটে পালায়?

—আপনাকে তো সর্বত্রই দেখি, প্রোফেসর লি। পরের সাহায্য করতে এমন আর ক'জন লোক চীনদেশে আছেন জানি না। আপনাকে দেখে আপনার দেশের ওপর ভক্তি আমার অনেক বেড়ে গেল।

wapsip.com

প্রোফেসর লি হেসে বললেন—আমার দেশ অতি হতভাগ্য, আমরা অতি প্রাচীন সভ্য জাতি কিন্তু জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছি। ভগবান নদীর এক কূল ভাঙেন আর এক কূল গড়েন। জাপান আজ উঠছে—আবার আমাদের দিন আসবে। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, যে ক'দিন বাঁচি, মূঢ়তা ও বর্বরতার দ্বারা অত্যাচারিত দেশের সেবা করে দিন কাটিয়ে যেতে চাই। কিন্তু আমার দ্বারা আর কতটুকু উপকারই বা হবে?

বিমল বললে—বড় ইচ্ছে হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথা অনুসারে আপনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। আপনি কি অনুমতি করবেন? বৃদ্ধ মহাচীন যেন তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন আপনার মূর্তিতে।

বিমলের দেখাদেখি মিনি, এ্যালিস এবং আরও কয়েকটি মেয়ে-সৈনিক বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে হাসিমুখে।

ট্রেন হুইসল্ দিলে। কমান্ডান্টের হুকুম শোনা গেল—ট্রেনে গিয়ে উঠে পড়।

এ্যালিস বললে— ড্যাডি, তোমার সঙ্গে কোথায় আবার দেখা হবে? আমরা দুটি মেয়ে এবং আমার এই ভারতবর্ষীয় বন্ধুটি তোমার সঙ্গে থেকে কাজ করতে চাই—অনুমতি দেবে ড্যাডি?

বৃদ্ধ বললেন—এখন তোমরা যাও খুকীরা—শীগগির আমার সঙ্গে দেখা হবে। এ কাজ তোমাদের নয়।

ট্রেন আবার চললো।

দুধারে শস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে ধোঁয়ায় কালো অগ্নিদগ্ধ গ্রাম। জাপানী বোমারু বিমানের নিষ্ঠুরতার চিহ্ন।

এ্যালিস বললে—বিমল, আমার কি মনে হচ্ছে জানো? প্রোফেসর লি-কে আবার আমাদের মধ্যে পেতে। এত ভাল লেগেছে ওঁকে! আমার নিজের বাবা নেই, ওকে দেখে সেই বাবার কথা মনে আসে।

বিমল দেখলে এ্যালিসের বড় বড় চোখদুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।

মিনি বললে—আমারও বড় ভক্তি হয় সত্যি! ভারি চমৎকার লোক।

বিমল বললে—অথচ কি ভাবে ওঁর সঙ্গে আলাপ তা জানো? আমি যখন প্রথম চীনদেশে আসি—আজ প্রায় একবছর আগের কথা—তখন হ্যাং-চাউ রেলস্টেশনে উনি ওঁর ছাত্রদল নিয়ে উঠলেন—বললেন, যুদ্ধের সময় ওখানকার মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে যাচ্ছেন। শুনে আমার হাসি পেয়েছিল।

এ্যালিস বললে—তখন কি জানতে উনি একজন মহাপুরুষ লোক! উনি যুদ্ধ-উপদ্রুত অঞ্চলের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে এসেছিলেন এটা ঠিকই—কিন্তু পরের দুঃখ দেখে সে সব ওঁর ভেসে গেল। People such as these are the salts of the Earth—নয় কি?

বিমল মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

একটি নদীর পুল বোমায় ভেঙে দিয়েছে। আর ট্রেন যাবার উপায় নেই। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারীরা দিনরাত খাটছে যদি পুলটা কোন রকমে মেরামত করে কাজ চালানো যায়।

কাছেই একটা তাঁবু। মাঠের মধ্যে কিছুদূরে জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে। এটা ফিল্ড হাসপাতাল।

ট্রেন থেকে মেয়ে-সৈন্যদের পথেই নামিয়ে দেওয়া হোল। ট্রেনখানা যেখান থেকে

wapsip.com

এসেছিল সেখানে ফিরে যাবে বলে পিছু হঠে চলে গেল। কোনো বড় স্টেশনে গিয়ে এঞ্জিন খানা সোজা করে জুড়ে নেবে। সম্পূর্ণ নতুন জায়গা। যেন অনেকটা পূর্ববঙ্গের বড় বড় জলা অঞ্চলের মত। ফসলের ক্ষেত নেই—সামনে একটা বিল কিংবা ঐ ধরনের জলাশয়—দীর্ঘ দীর্ঘ জলজ ঘাসের বন জলের ধারে। দূরে দূরে মেঘের মত নীল পাহাড়। জায়গাটার নাম সিং-চাং। বিমল নেমে চারিদিক দেখে অবাক হয়ে গেল।

ট্রেনে করে এতদূরে এসে এখানে আবার যুদ্ধক্ষেত্র কি করে এল।

বিমলের ধারণা ছিল জাপানীদের আসল ঘাঁটি কোন্‌কালে পার হয়ে আসা গিয়েছে।

কিন্তু কমান্ডান্ট তাকে বুঝিয়ে বললেন—এখান থেকে আরও প্রায় পঁচিশ মাইল দূর হ্যাং-কাউ শহর পর্যন্ত ওদের সৈন্য রেখা বিস্তৃত। সমুদ্রের উপকূলভাগে অনেক দূর অবধি ওরা নিজেদের লাইন ছড়িয়ে রেখেছে। মাটিতে একটা নক্সা এঁকে বুঝিয়েও দিলেন।

বিমল একটা অনুচ্চ ঢিবির ওপর উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলে।

কিছুদূরে একটা গ্রাম—পাশে কাদের অনেকগুলো ছোট বড় তাঁবু—সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে, বোধ হয় রান্নাবান্না চলেছে। পশ্চিম দিকে একটা বড় শস্যক্ষেত্র, তার ধারে লম্বা লম্বা কি গাছের সারি। মোটের ওপর সবটা নিয়ে বেশ শান্তিপূর্ণ পল্লীদৃশ্য।

এ কি ধরনের যুদ্ধক্ষেত্র?

কিন্তু বিমলদের সেখানে উপস্থিত হবার আধ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ ছ'জন আহত সৈন্যকে স্ট্রেচারে করে হাসপাতাল তাঁবুতে আনা হোল। সকলেই রাইফেলের গুলিতে আহত।

বিমল জিজ্ঞেস করে জানল যুদ্ধক্ষেত্র যে বেশিদূর তাও নয়—ওই গাছের সারির পাশেই, এখান থেকে আধমাইলের মধ্যে। একটা ক্ষুদ্র গ্রাম জাপানীরা দখল করে সেখানে ঘাঁটি করেছে—চীনা সৈন্য ওদের সেখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছে।

কমান্ডান্টের আদেশে মেয়ে-সৈনিকরা রান্নাবান্না করে খাবার আয়োজন করতে লাগলো—কারণ অনেকক্ষণ তারা বিশেষ কিছু খায়নি। বিমল বললে—খাইয়ে নিয়ে এদের কি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে? কমান্ডান্ট বললে—না, এরা পরিশ্রান্ত। ক্লান্ত সৈন্যদের দিয়ে যুদ্ধ হয় না—ওদের অন্তত দশঘণ্টা বিশ্রাম করতে দেবো।

—তারপর?

—তারপর যুদ্ধে পাঠাতে পারি—রিজার্ভ রাখতে পারি। এখান থেকে সাত মাইল দূরে হ্যানকাউ-ক্যান্টন রেলের ধারে একটা গ্রামে নাইন্‌থ-রুট আর্মির এক ঘাঁটি। সেখানে জেনারেল মাও-সি-তুং আছেন—তাঁর হুকুমমত কাজ হবে।

—হুকুম আসবে কি করে?

—ঘোড়ার পিঠে যায় আসে ডেসপ্যাচ দল। আমাদের ফিল্ড টেলিফোন নেই।

কমান্ডান্টের সঙ্গে কথা বলে ফিরে গিয়ে বিমল হাসপাতাল তাঁবুতে আহত সৈন্যদের চিকিৎসার কাজে মন দিল। তিনটি হতভাগ্য সৈনিক কোনোপ্রকার সাহায্য পাবার পূর্বেই মারা গেল। বাকি কয়েকজন করুণ আর্তনাদে হাসপাতাল মুখরিত হয়ে উঠলো। কি নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ব্যাপার এই যুদ্ধ! এ কথা বিমলের মনে না এসে পারলো না।

এ্যালিস এসে বললে—এদের জন্যে বৃথা চেষ্টা। এদের একজনও বাঁচবে না।

বিমল বললে—তাই মনে হয়। না আছে ওষুধ, না আছে যন্ত্রপাতি, কি দিয়ে চিকিৎসা করবো?

—বিমল, এদের জন্যে আমেরিকান রেডক্রসে লিখে কিছু জিনিস আনার চেষ্টা করবো?

wapsip.com

—লেখো না। নইলে সত্যি বলছি আমাদের খাটুনি বৃথা হবে।

—ঠিকই তো? এটা কি একটা হাসপাতাল? কি ছাই আছে এখানে?

—মিনি কোথায় গেল?

—সে রাঁধছে। খেতে হবে তো? রাঁধবার কোন বন্দোবস্ত নেই। দুটি চাল ছাড়া আর কিছুই দেয় নি।

—টিনবন্দী খাবার কিছু সাংহাই থেকে আনিয়ে নিই। ও খেয়ে তোমরা বাঁচবে না।

—একটা কথা শোনো। তুমি একবার সাংহাই যাও—মিনি সুরেশ্বর সম্বন্ধে বড় উদ্বিগ্ন হয়েছে আমায় বলছিল। ও আমায় কাল থেকে বলছে তোমায় বলতে।

—আমিও যে তা না ভেবেছি এমন নয়। কিন্তু সাংহাই পর্যন্ত কোনো ট্রেন এখান থেকে যাচ্ছে না তো? আচ্ছা, কমান্ডান্টকে বলে দেখি।

আবার চারজন আহত সৈনিককে স্ট্রেচারে করে আনা হোল। একজনের মাথার খুলির অর্ধেকটা উড়ে গিয়েছে বললেই হয়। বিমল বললে—এ তো গেল! একে এখানে কেন এনেছে?

কিন্তু অদ্ভুত জীবনীশক্তি চীনা সৈনিকটির। মাথার ব্যান্ডেজ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, দুবার ব্যান্ডেজ বদলাতে হোল, তবুও সৈনিকটি মারা গেল না—বিমল ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে।

একজন সৈনিক ডেস্‌প্যাচ রাইডার হাসপাতালে ঢুকে বললে—আমাদের তাঁবু ওঠাতে হবে এখান থেকে—শত্রু খুব নিকটে এসে পড়েছে। রেল লাইনের ওপর ওদের লক্ষ্য কিনা? রেল লাইনটি দখল করবে। আমাদের সৈন্য প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে কিন্তু আজ সারাদিনে জাপানীরা প্রায় একমাইল এগিয়েছে। দেখবে এসো।

তারপরে সৈনিকটি একটা ফিল্ড গ্লাস বার করে বিমলের হাতে দিয়ে বললে— পূর্বদিকে ওই যে গাঁ-খানা দেখা যাচ্ছে ওদিকে চেয়ে দেখ—বিমল একখানা গ্রাম বেশ স্পষ্ট দেখছিল, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু না। সৈনিকটি বললে—ওই গ্রামখানির পেছনেই শত্রুর লাইন। গ্রামখানা দখল করতে ওরা আজ ক'দিন চেষ্টা করছে—ওখানেই আমরা বাধা দিচ্ছিলাম। আজ গ্রামের অর্ধেকটা দখল করেছে। সুতরাং বোধহয় কাল কি পরশু রেললাইনে এসে পৌঁছবে।

—গ্রামে লোকজন আছে?

—পাগল! কবে পালিয়েছে। পশ্চিমদিকে একটা নদী আছে—তার ওপারে পলাতক গৃহহারাদের একটা বস্তি বসে গেছে। আট দশখানা গ্রামের লোক জড় হয়েছে ওখানে।

—খাবার দিচ্ছে কে?

—কে দেবে? অনাহারে অনেকে দিন কাটাচ্ছে। তাদের দুর্দশা দেখলে বুঝবে বর্তমান কালের যুদ্ধ কি নিষ্ঠুর ব্যাপার।

বিমল কথায় কথায় জানতে পারলে, ডেস্‌প্যাচ রাইডার সৈনিকটি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান—পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট—পূর্বে স্কুল মাস্টারি করতো, যুদ্ধ বাধবার পর সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে।

বিমল বললে—তুমি আমাকে ওই গ্রামে নিয়ে চলো না?

—এমনিই তো যেতে হবে। বোধহয় ওখানেই হাসপাতাল উঠে যাবে—কারণ শত্রুর লাইন থেকে, জায়গাটা দূরে।

wapsip.com

—এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলতে বারণ করেছে কে।

—কেউ না। সে তো সর্বত্রই ফেলছে। তবে একটা পাইনবনের তলায় এ বস্তি—জাপানী প্লেন হঠাৎ সন্ধান পাবে না। ভয়ে ওরা রান্না করে না।—পাছে ধোঁয়া দেখে বোমারু প্লেন সন্ধান পায়।

সৈনিকটি চলে গেলে বিমল এ্যালিসকে ডেকে কথাটা বলতে যাচ্ছে, এমন সময় একখানা ট্রেনের শব্দ শোনা গেল দূরে।

এ্যালিস তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে এসে বললে—ট্রেন আসছে, না এরোপ্লেন? বিমল বললে—ট্রেনই। বোধহয় আরও সৈন্য আসছে। চলো দেখি গিয়ে। অনেকে রেললাইনের ধারে জড়ো হোল। এখানে স্টেশন নেই। একজন লোক নিশান হাতে অপেক্ষা করছিল—নিশান দেখিয়ে ট্রেন দাঁড় করাবে। ট্রেন এসে পড়লো। সারি সারি খোলা মালগাড়িতে সৈন্য বোঝাই—অন্য সাধারণ যাত্রীও আছে। কতকগুলো ছাদ-আঁটা মাল-গাড়ি পেছনের দিকে—তাতে সৈন্যদের রসদ বোঝাই।

গাড়ি থেকে দলে দলে সৈন্য নামতে লাগলো। জাপানী সৈন্যদের হাত থেকে গ্রাম রক্ষা করবার জন্যে এরা আসছে ক্যান্টন থেকে। রসদ বোঝাই মাল-গাড়িগুলো থেকে রসদ নামানোর ব্যবস্থা করা হতে লাগলো—কারণ বেশিক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকলে এখুনি কোনদিক থেকে জাপানী বিমান আকাশপথে দেখা দেবে হয়তো। হঠাৎ এ্যালিস উত্তেজিত সুরে বললে—বিমল, বিমল—ও কে? প্রোফেসর লি না?

তারপরেই সে হাসিমুখে সামনের দিকে ভিড়ের মধ্যে ছুটে গেল—ড্যাডি— ড্যাডি—

সত্যিই তো—হাস্যমুখ বৃদ্ধ একটা বড় ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে ভিড় ঠেলে বাইরে আসতে চেষ্টা করছেন।

বিমল এগিয়ে গিয়ে বলে বললে—নমস্কার প্রোফেসর লি—ব্যাগটা আমার হাতে দিন। আপনি কোথা থেকে?

এ্যালিস ততক্ষণ গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ তার কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে বিমলের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললেন—তোমরা এখানে আছ? বেশ বেশ। আমি এসেছি পলাতক গ্রামবাসীদের যে বস্তি আছে নদীর ওপারে—সেখানে কয়েক পিপে আপেল বিলি করতে। আমেরিকান জুনিয়র রেডক্রস দুশো পিপে ভাল কালিফোর্নিয়ার আপেল পাঠিয়েছে দুঃস্থ বালক-বালিকাদের খাওয়ানোর জন্যে। আমার ঠিকানাতেই পাঠিয়েছিল। আর সব বিলি করে দিয়েছি অন্য অন্য স্থানে—দশ পিপে মজুত আছে এখনও। তা তোমরা আছ ভালই হয়েছে—তোমরা সাহায্য করো এখন।

এ্যালিস তো বেজায় খুশি। বললে—ড্যাডি, খুব ভাল কথা। তা বাদে আরও অনেক কাজ হবে যখন তুমি এসে পড়েছো। চলো, আপেলের পিপে সব নামিয়ে নিই।

এমন সময় মিনি ভিড়ের মধ্যে কোথা থেকে ছুটে এসে ব্যস্ত ভাবে বললে—শীগগির এসো বিমল, শীগগির এসো এ্যালিস—সুরেশ্বর নামছে ওই দেখ ট্রেন থেকে—

সুরেশ্বর সত্যিই নামছে বটে—তার সঙ্গে দুজন চীনা ডাক্তার, এদেরও বিমল চেনে—সাংহাই চীনা রেডক্রস হাসপাতালে এরা ছিল।

বিমল বললে—প্রোফেসর লি—একটু আমায় ক্ষমা করুন, পাঁচমিনিটের জন্যে আসছি।

সুরেশ্বর তো ওদের দেখে অবাক। বললে—তোমরা এখানে! মিনি আর এ্যালিসই বা এখানে কি করে এল! সাংহাইতে বেজায় গুজব এদের চীনা গুণ্ডারা গুম করেছে— আর

wapsip.com

বিমল তুমি জাপানীদের হাতে বন্দী। মিনি কেমন আছে?

বিমল বললে—সে সব কথা হবে এখন। চলো এখন সবাই মিলে তাঁবুতে গিয়ে বসা যাক। অনেক কথা আছে। প্রোফেসর লি-কে ডেকে আনি—উনিও আমাদের সঙ্গে আসুন। তোমরা এগিয়ে চলো ততক্ষণ। আমি ওঁর আপেলের পিপেগুলো নামাবার কি ব্যবস্থা হোল দেখে আসি।

কিছুক্ষণ পরে দুঃস্থ চীনা নরনারীদের তাঁবুতে সুরেশ্বর, বিমল, এ্যালিস ও মিনি আপেল বিলি কাজে প্রফেসর লি'র সাহায্য করছিল। এ জায়গা ঠিক তাঁবু নয়, একটা পাইন বন, তার মাঝে মাঝে পুরানো কেম্বিস, চট, মাদুর, ভাঙা টিন প্রভৃতি জোড়াতালি দিয়ে আশ্রয় বানিয়ে তারই মধ্যে হতভাগ্য গৃহহারার দল মাথা গুঁজে আছে। ওদের দুর্দশা দেখে বিমলের কঠিন মনেও দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হোল। ছোট ছোট উলঙ্গ, ক্ষুধার্ত, কাদামাটি মাখা শিশুদের ব্যগ্র প্রসারিত হাতে আপেল বিলি করবার সময় সময় এ্যালিসের চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখলে বিমল। নাঃ—বড় ছেলেমানুষ এই এ্যালিস! ...এ্যালিসের প্রতি একটা কেমন অকারণ স্নেহে ও মমতায় বিমলের মন গলে যায়। কি সুন্দর মেয়ে এ্যালিস আর কি ছেলেমানুষ!

হঠাৎ একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল। আপেল বিলি করতে করতে প্রফেসর লি এক সময় একটা আপেলের পিপের মধ্যে ঘাড় নিচু করে দেখে বললেন—চারটে আপেল আর বাকি আছে। আমি কালিফোর্নিয়ার আপেল কখনো খাইনি—একটি আমি খাবো।

বলেই সদানন্দ বৃদ্ধ বালকের মত আনন্দে একটা আপেল তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলেন। বিমল অবাক, সে যেন একটা স্বর্গীয় দৃশ্য দেখলে। শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তার মাথা লুটিয়ে পড়তে চাইল বৃদ্ধের পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ধরনের ভালবাসা এসে তার মনে উপস্থিত হোল, বৃদ্ধের প্রতি। এঁকে ছেড়ে আর সে থাকতে পারবে না—অসম্ভব! যেমন সে আর এ্যালিসকে ছেড়ে কখনো থাকতে পারবে না। চীনদেশে তার আসা সার্থক হয়েছে এই দুজনের সাক্ষাৎ পেয়ে। এই যুদ্ধের বর্বরতা, হত্যা, বোমাবর্ষণ, রক্তপাত, অনাহার, দারিদ্র্য, এই চারিদিকের বীভৎস নরবলির হৃদয়হীন অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রফেসর লি আর এ্যালিস (অবশ্য মিনিও আছে)—এদের আবির্ভাব দেবতার আবির্ভাবের মতই অপ্রত্যাশিত ও সুন্দর।

এ্যালিস ও মিনি ছুটে গেল ছেলেমানুষের মত।

—ড্যাডি, ড্যাডি, আমাদের একটা আপেল দেবে না?...

বৃদ্ধ হাসিমুখে বললেন—মেয়েদের না দিয়ে কি বুড়োবাবা খায়? দুটি রেখে দিয়েছি তোমাদের দুজনের জন্যে—আর একটি বাকি আছে, কে নেবে?

বিমল বললে—সুরেশ্বর নাও।

সুরেশ্বর বললে—বিমল, তুমি নাও, আমি আপেল খাই না।

এ্যালিস বললে—খাও, সুরেশ্বর, আমি আমার আধখানা বিমলকে দিচ্ছি।

মিনি বললে—তা নয়, বিমল খাও, আমি আধখানা সুরেশ্বরকে দেবো।

প্রোফেসর লি মীমাংসা করে দিলেন—একটা আপেল ভাগাভাগি করে খাবে বিমল ও সুরেশ্বর। মেয়েরা আস্ত আপেল খাবে। তাঁর কথার ওপর আর কেউ কথা বলতে সাহস করলে না।

সেই সৈনিক ডেস্‌প্যাচ-রাইডারটি এসে খবর দিলে, হাসপাতাল তাঁবু এখানেই উঠে আসছে—পাইনবনের মাঝখানে। সামনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কমন্ডান্ট খবর পাঠিয়েছেন।

wapsip.com

ডেস্‌প্যাচ রাইডার আরও এক করুণ সংবাদ দিলে—আজ সকালে জাপানীদের হ্যান্ডগ্রিনেড চার্জে নারীবাহিনীর সতেরোটি তরুণী একদম মারা পড়েছে। একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে তাদের দেহ—হাত, পা, মুণ্ড, আঙুল—ছড়িয়ে ছত্রাকার হয়ে গিয়েছে।

মিনি শিউরে উঠে বললে—ও হাউ সিম্পলি ড্রেড্‌ফুল!

কেন জানি না এই দুঃসংবাদে বিমলের মন এ্যালিসের প্রতি মমতায় ভরে উঠলো। এ্যালিসের মতই উদার, নিস্বার্থ সতেরোটি তরুণী—কত গৃহ অন্ধকার করে, কত বাপমায়ের হৃদয় শূন্য করে চলে গেল!—মানুষ মানুষের ওপর কেন এমন নিষ্ঠুর হয়?

হঠাৎ পলাতকদের মধ্যে একটা ভয়ার্ত শোরগোল উঠলো। সবাই ছুটছে, গাছের তলায় গুঁড়ি মেরে বসছে, ঘাসের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে—একটা হুড়োহুড়ি, এ ওকে ঠেলছে, দু একজন উর্ধ্বশ্বাসে খোলা মাঠের দিকে ছুটছে।

ডেস্‌প্যাচ রাইডার সৈনিক যুবকটি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললে—নিচু হয়ে বসে পড়ুন—সবাই শুয়ে পড়ুন,—জাপানী বম্বার!

আকাশে এরোপ্লেনের আওয়াজ বেশই স্পষ্ট হয়ে উঠলো··· বিমল চোখ তুলে দেখলে পাইনবনের মাথার ওপর আকাশে দুখানা কাওয়াসাকি বম্বার··· নিজের অজ্ঞাতসারে সে তখুনি এ্যালিসের হাত ধরে তাকে একটা গাছের তলায় নিয়ে দাঁড় করালে।

—প্রোফেসর লি—প্রোফেসর লি—এদিকে আসুন—

ভীষণ একটা আওয়াজ.··· বিদ্যুতের মত আলোর চমক···ধোঁয়া, মাটি··· পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠলো ভূমিকম্পের মত··· সবারই কানে তালা··· চোখে অন্ধকার··· জাপানী বম্বার বোমা ফেলছে।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আর্তনাদ কান্না··· গোঁঙানি··· নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত চীৎকার।

আবার একটা··· বিমলের মনে হোল পৃথিবীর প্রলয় সমাগত। পৃথিবী দুলছে, আকাশ দুলছে.··· কেউ বাঁচবে না, মিনি, এ্যালিস, সে, সুরেশ্বর, প্রোফেসর লি, সবাই এই প্রলয়ের অনলে ধ্বংস হবে।

তারপর ক'টা বোমা পড়লো এরোপ্লেন থেকে—তা আর গুনে নেওয়া সম্ভব হোল না বিমলের পক্ষে। বিস্ফোরণের আওয়াজ ও মনুষ্য-কণ্ঠের আর্তনাদের একটা একটানা শব্দপ্রবাহ তার মস্তিষ্কের মধ্যে বয়ে চলেছে—একটা থেকে আর একটাকে পৃথক করে নেওয়া শক্ত।

তারপর হঠাৎ যখন সব থেমে গেল, এরোপ্লেন চলে গিয়েছে—যখন বিমল আবার সহজ বুদ্ধি ফিরে পেল—তখন দেখলে এ্যালিসের একখানা হাত শক্ত করে তার নিজের মুঠোর মধ্যে ধরা—মিনি, সুরেশ্বর, প্রোফেসর লি সকলে মাটিতে শুয়ে—হয়তো সবাই মারা গিয়েছে—সে-ই একমাত্র রয়েছে বেঁচে।

প্রথমে মাটি থেকে ঝেড়ে উঠলো এ্যালিস। তারপর প্রোফেসর লি, তারপর সুরেশ্বর।—মিনি মূর্ছা গিয়েছে—অনেক কষ্টে তার চৈতন্য সম্পাদনা করা হোল। হঠাৎ এ্যালিস চমকে উঠে আঙুল দিয়ে কি দেখিয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো।

সেই তরুণ ডেস্‌প্যাচ-রাইডারের দেহ অস্বাভাবিক ভাবে শায়িত কিছুদূরে। রক্তে আশপাশের মাটি ভেসে গিয়েছে—একখানা হাত উড়ে গিয়েছে—বীভৎস দৃশ্য। সেদিকে চাওয়া যায় না।

কিন্তু দেখা গেল পলাতক গৃহহীন ব্যক্তিদের খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। কয়েকটি ছেলেমেয়ে এবং একটি বৃদ্ধ জখম হয়েছে মাত্র। পাইনবনের পাতার আড়ালে ছিল

wapsip.com

এরা—ওপর থেকে বোমার লক্ষ্য ঠিকমত হয়নি।

প্রোফেসর লি'র সঙ্গে এ্যালিস ও মিনি আহতদের সাহায্যে অগ্রসর হোল।

সন্ধ্যার পরে একখানা ট্রেন এসে দাঁড়াল। নাইন্থ-রুট আর্মির একটা ব্যাটালিয়ন ট্রেন থেকে নামলো—এরা এসেছে রেলপথ রক্ষা করতে এবং দুটো সাঁকো প্যাহারা দিতে।

বিমল সুরেশ্বরকে বললে—আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে বলতে গেলে একরকম বাস করছি, অথচ লড়াই যে কোন্‌দিকে হচ্ছে—কি ভাবে হচ্ছে—তা কিছুই জানিনে, চোখেও দেখতে পাচ্ছিনে।

রাত্রে কমান্ডান্টের সারকুলার বেরুলো—রেললাইনের প্রান্ত পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে—আজ শেষ রাত্রে জাপানীরা আক্রমণ করবে—সকলে তৈরি থাকো, যারা সৈন্য নয় যুদ্ধ করছে না—এমন শ্রেণীর লোক দূরে চলে যাও।

রাত প্রায় বারোটা। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

সুরেশ্বর বর্ষাতি কোট গায়ে বাইরে থেকে হাসপাতাল তাঁবুতে ঢুকে বললে—আমাদের আয়ু মনে হচ্ছে ফুরিয়ে এসেছে। সারকুলার দেখেছ?

বিমল বললে—গতিক সেই রকমই বটে। জাপানীরা হ্যান্ডগ্রিনেড চার্জ করলে কেউ বাঁচবে না।

—আমি ভাবছি মেয়েদের কথা—

—প্রোফেসর লি-কে কথাটা বলা ভাল। উনি কি বলেন দেখি।

—প্রোফেসর লি-কে ডাকতে গিয়ে একটা সুন্দর দৃশ্য বিমলের চোখে পড়লো। হাসপাতাল তাঁবুর পাশে একটা ছোট্ট চটে-ছাওয়া তাঁবুতে এ্যালিস ও মিনি কি রান্না করছে আগুনের ওপর—বৃদ্ধ লি ওদের কাছে উনুন ঘেঁষে বসে বুড়ো ঠাকুরদাদার মত গল্প করছেন।

এ্যালিস বললে—তোমার বন্ধু কোথায় বিমল—খেতে হবে না তোমাদের আজ? ড্যাডি আমাদের এখানে খাবেন। উঃ—কি সত্যি কথা। গোলমালে তার মনেই নেই যে সন্ধ্যা থেকে কারও পেটে কিছু যায় নি! বিমল সুরেশ্বরকে ডেকে নিয়ে এল। খাবার বিশেষ কিছু নেই। শুধু ভাত ও শুকনো সিঙ্গাপুরী কাঁচকলা, চর্বিতে ভাজা।

একজন ডেস্‌প্যাচ-রাইডার ব্যস্তভাবে তাঁবুর বাইরে এসে বিমলকে ডাক দিলে। তার হাতে একখানা ছোট্ট শিল-করা খাম।

—আপনি হাসপাতালের ডাক্তার?

—আপনার চিঠি। ট্রেন এখুনি একখানা আসছে। টেলিগ্রামে অর্ডার দিয়ে আনানো হচ্ছে। আপনি আপনার নার্স ও রোগী নিয়ে হ্যানকাউতে এই ট্রেনে যাবেন; আপনাকে একথা বলার আদেশ আছে আমার ওপর। গুড্ নাইট।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান। কেন হঠাৎ এ আদেশ জানেন?

—আমরা এই রেলের জন্যে আর লোক ক্ষয় করবো না। জেনারেল চু-টে'র আদেশ এসেছে হেড কোয়ার্টার্স থেকে। পরবর্তী যুদ্ধ হবে এর দশমাইল দূরে। আর এখুনি আপনারা তৈরি হোন। আজ শেষ রাত্রে জাপানীরা আড্ডা দখল করবে। তার আগে হয়তো গোলা ছুঁড়তে পারে।

প্রোফেসর লি কাছেই দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলেন। তিনি বললেন—আমি এই ট্রেনে গরিব গ্রামবাসীদের উঠিয়ে নিয়ে যাবো। নইলে জাপানী বোমা থেকে যাও বা বেঁচেছে, গোলা আর হ্যান্ডগ্রিনেড খেলে তাও যাবে। আপনি দয়া করে আমার এই অনুরোধ কমান্ডান্টকে জানিয়ে

wapsip.com

আমায় খবর দিয়ে যাবেন?

ডেস্‌প্যাচ-রাইডার অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হোল।

আরও দেড়ঘণ্টা পরে এল ট্রেন। প্রায় খালি। তবে পেছনের গাড়িগুলো সুঁটকি মাছ বোঝাই—বিষম দুর্গন্ধ। বিমল হাসপাতালের সব লোকজন নিয়ে ট্রেনে উঠলো—মিনি, এ্যালিস, দুটি চীনা নার্স, সাত আটটি রোগী। প্রোফেসর লি ইতিমধ্যে তাঁর দলবল নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—কিন্তু ট্রেনের সামরিক গার্ড কমান্ডান্টের বিনা আদেশে তাঁর দলবল গাড়িতে উঠাতে চাইলে না।

এ্যালিস বললে—বিমল, ওদের বলো তাহলে আমরাও যাবো না। ওঁকে ফেলে আমরা যাবো না। ট্রেনের সামরিক গার্ড বললে—আমার কোন হাত নেই। আপনারা না যান, পনেরো মিনিট পরে আমি গাড়ি ছেড়ে দেবো।

এ্যালিস ও মিনি নামলো। চীনা নার্স দুটিও এদের দেখাদেখি নাবলো। ট্রেনের গার্ড বললে—রোগীরা কাদের চার্জে যাবে? একজন ডাক্তার চাই। আমি রিপোর্ট করলে আপনাদের কোর্ট মার্শাল হবে। আপনারা হাসপাতালের কর্মচারী, সামরিক আদেশ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য।

বিমল বললে—সে এঁরা নন—এই মেয়ে দুটি। এঁরা আমেরিকান রেডক্রস সোসাইটির। চীনা পার্লামেন্টের হাত নেই এদের ওপর।

এদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হচ্ছে, এমন সময়ে ডেস্‌প্যাচ-রাইডারটিকে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে দেখা গেল এবং কিছুক্ষণ পরে প্রোফেসর লি তাঁর দলবল নিয়ে হুড়মুড় করে ট্রেনে উঠে পড়লেন। ট্রেনও ছেড়ে দিল।

দিন পনেরো পরে।

হ্যানকাউ শহরের উপকণ্ঠে পবিত্র ফা-চিন্‌ মন্দির। মিং রাজবংশের রাজকুমারী ফা-চিন্‌ তাঁর প্রণয়ীর স্মৃতির মান রাখবার জন্যে চিরকুমারী ছিলেন—এবং একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ মঠে দেহত্যাগ করেন একষট্টি বছর বয়সে। তাঁর দেহের পুণ্য ভস্মরাশির ওপরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চারিধারে অতি মনোরম উদ্যান ও ফোয়ারা।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে এ্যালিস ও বিমল মার্বেলের চৌবাচ্চায় মন্দিরের অতি বিখ্যত লালমাছ দেখছিল। অনেক দূর থেকে লোকে এই লালমাছ দেখতে আসে—আর আসে নব-বিবাহিত দম্পতি—তাদের বিবাহিত জীবনের কল্যাণ কামনায়।

একটা গাছের ছায়ায় বেঞ্চিতে এ্যালিস ক্লান্ত ভাবে বসলো।

বিমল বললে—মিনিরা কোথায়?

—মন্দিরের মধ্যে ঢুকেছে। এখানে বসো। কেমন সুন্দর লাল মাছ খেলা করছে দেখো। আমি কি ভাবছি বিমল জানো, এমন পবিত্র মন্দির, এমন সুন্দর শান্তি, এই প্রাচীন পাইন গাছের সারি—সব জাপানী বোমায় একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। যুদ্ধের এই পরিণাম, প্রাচীন দিনের শান্তি ও সৌন্দর্যকে চুরমার করে বর্বরতাকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

—এ্যালিস, আর কতদিন চীনে থাকবে?

—যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয়, যতদিন একজন আহত চীন সৈনিকও হাসপাতালে পড়ে থাকে! যততদিন ড্যাডি লি তাঁর সাহায্যকারিণী মেয়ের দরকার অনুভব করেন।

এ্যালিস বিমলের দিকে চেয়ে বললে—কিন্তু বিমল ততদিন তোমাকেও তো থাকতে

wapsip.com

হবে—তোমাকে যেতে দেবো না।

পাইনগাছের ওদিকে নিকটেই প্রোফেসর লি'র প্রাণখোলা হাসি ও কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল।

এ্যালিস বললে—ওরা এদিকেই আসছে।

এ্যালিসের ভুল হয়েছিল, মিনি আর সুরেশ্বর এল না—এলেন প্রোফেসর লি। এই বয়সেও তাঁর চোখের অমন অদ্ভুত দীপ্তি যদি না থাকতো, তবে তাঁকে জনৈক বৃদ্ধ চীনা রিকশাওয়ালা বলে ভুল করা অসম্ভব হয় না—এমনি সাদাসিধে তাঁর পরিচ্ছদ।

প্রোফেসর লি বললেন—হ্যানকাউ শহরে এসে আমার গরিব গ্রামবাসীরা আশ্রয় পেয়ে বেঁচেছে। কিন্তু গভর্নমেন্টের তৈরি মাটির নিচের ঘরে লুকিয়ে থাকলে আমার চলবে না এ্যালিস, আমি কালই এখান থেকে গ্রামে চলে যাবো।

এ্যালিস বললে, কেন?

—দক্ষিণ চীনে সর্বত্র ভীষণ দুর্ভিক্ষ। লোক না খেয়ে মরছে, তার সাথে বোমা আছে। মড়ক লেগেছে। আমার এখানে বসে থাকলে চলে?

—আমি আবেদন পাঠিয়েছি আমেরিকায় মার্কিন রেডক্রস সোসাইটির মধ্যস্থতায়। তারাই আপেল পাঠিয়েছিল এদের খাওয়াতে। যতদূর জানা গিয়েছে, ওরা কিছু অর্থ মঞ্জুর করেছে! টাকাটা শীগগির আসবে।

এ্যালিস বললে—ড্যাডি, আমার একটা প্রস্তাব শুনবেন? আমার মাসীমা নিঃসন্তান বিধবা, অনেক টাকার মালিক। আমায় তিনি উইল করে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন, টাকাটা আমি চাইলেই পাবো। সেই টাকা আপনাকে দিচ্ছি—হ্যানকাউ শহরে দুঃস্থ বালক-বালিকাদের জন্যে একটা 'হোম' খুলুন। আপনি লেখালেখি করলে গভর্নমেন্টও কিছু সাহায্য করবে। আমি আর মিনি ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করবো।

প্রোফেসর লি বললেন—তোমায় ধন্যবাদ, এ্যালিস। অতি দয়াবতী মেয়ে তুমি, কিন্তু তোমার টাকা নেবো না। তা ছাড়া, এমন কোনো বড় আশ্রয়স্থল আমরা গড়তে পারবো না, যাতে সকল দুঃস্থ বালক-বালিকাদের আমরা জায়গা দিতে পারি। সারা দক্ষিণ-চীন বিপন্ন, কত ছেলেমেয়েকে আমরা পুষতে পারি? মাঝে পড়ে তোমার টাকাগুলো যাবে।

বিমল একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে, এ্যালিসের ওপর প্রোফেসর লি'র স্নেহ নিজের সন্তানের ওপর পিতার স্নেহের মতই। উনি চান না এ্যালিসের টাকাগুলো খরচ করিয়ে দিতে। নইলে উনি 'হোম' গঠনের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখালেন, সেটা এমন কিছু জোরালো নয়। সব দুঃস্থ লোকদের আশ্রয় দিতে পারছিনে বলে তাদের মধ্যে কাউকেও আশ্রয় দেবো না?

এমন সময় সুরেশ্বর ও মিনি এসে বললে—এসো এ্যালিস, এসো বিমল, একটা জিনিস দেখে যাও।

ওরা বাগানের বেঞ্চি থেকে উঠে মন্দিরের উঁচু চত্বরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দেখলে ওদের আগে আগে দুটি চীনা তরুণ-তরুণী মন্দিরে উঠছে। তাদের হাতে ছোট ছোট ধ্বজা, মোমবাতি ও ফুল।

মিনি বললে—ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ছেলেটি বেশ ইংরাজি জানে। ওর ডাক পড়েছে যুদ্ধে, যুদ্ধে যাওয়ার আগে ওই মেয়েটিকে কাল বিয়ে করেছে; অনেকদিন থেকে মেয়েটি ওর বাগদত্তা। ফা-চিন্ মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে এসেছে—

বিমল ও এ্যালিস নিজেদের অজ্ঞাতসারে শিউরে উঠলো। বর্তমান যুগের ভীষণ

wapsip.com

মারণাস্ত্রের সামনে যুদ্ধ। আয়ু ফুরিয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। একটা বোমার অপেক্ষা মাত্র। তরুণীর বয়স অল্প—ষোল সতেরো।

চীন দেশে সম্ভ্রান্ত-সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নেই।

তরুণ-তরুণীর মুখ প্রফুল্ল ও হাস্যময়। কোন দিকে ওদের লক্ষ্য নেই। মন্দিরের অন্ধকার গর্ভগৃহে মোমবাতি জ্বলছে। ওরা খোদাই-করা কাঠের চৌকাঠ পার হয়ে রাজকুমারী ফা-চিন্এর কৃত্রিম সমাধির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলে, ফুল ছড়িয়ে দিলে, দুজনে পাশাপাশি বসে রইল খানিকক্ষণ চুপ করে। তারপর ওরা উঠলো—ঘর থেকে বাইরে এসে মন্দিরের চত্বরে দাঁড়ালো, দুজনে দুজনের হাত ধরে আছে—দুজনের হাসি-হাসি মুখ।

এ্যালিস বললে—মিনি, ওঁদের এখানে দাঁড়াতে বলো না? আমাদের অনুরোধ—

মিনি বললে—আপনারা একটু দয়া করে যদি দাঁড়ান—মন্দিরের চত্বরে—

যুবক ওদের দিকে হাসিমুখে চাইলে, তারপর মেয়েটিকে চীনাভাষায় কি বললে। তরুণীও অল্প হাসিমুখে ওদের দিকে একবার চেয়ে দেখে চোখ নিচু করলে।

যুবক হাসিমুখে বললে—ফটো নেবে বুঝি? আলো নেই মোটে—ফটো উঠবে?

এ্যালিস এই সময় মন্দিরের বাইরের ফুলের দোকান থেকে একরাশ ফুল কিনে নিয়ে এল। বৃদ্ধ লি'কেও সে ডেকে এনেছে বাগান থেকে। হাসিমুখে বললে—ড্যাডি, এই ফুল নিয়ে ওদের আশীর্বাদ করুন—তোমরাও সবাই ফুল নাও।

যুবকের সঙ্গে প্রোফেসর লি চীনা ভাষায় কি কথাবার্তা বললেন, তারপর সকলে অর্ধচক্রাকারে ঘিরে দাঁড়ালো নবদম্পতিকে।

প্রোফেসর লি চীনা ভাষায় গম্ভীর স্বরে কয়েকটি কথা উচ্চারণ করে ওদের ওপর ফুল ছড়িয়ে দিলেন—তারপর সকলে ফুল ছড়ালে ওদের ওপর। এ্যালিস ও মিনির কি হাসি ফুল ছড়াতে ছড়াতে!

তরুণ-তরুণী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমল একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলো—সন্ধ্যা নেমেছে। কোথাও আর রোদ নেই—এই পবিত্র, প্রাচীন ফা-চিন্ মন্দির, পাইন বন, লাল মাছের চৌবাচ্চা, শান্ত গভীর সন্ধ্যা—এই কলহাস্যমুখরা বিদেশিনী মেয়ে দুটি,—এই নবদম্পতি। দেখে মনেও হয় না এই পবিত্র স্থানের তিন মাইলের মধ্যে মানুষ মানুষকে অকারণে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে বিষবাষ্প দিয়ে, বোমা দিয়ে, কলের কামান দিয়ে। যুদ্ধ বর্বরের ব্যবসায়। অথচ এই হাসি, এই আনন্দ, তরুণ দম্পতির কত আশা, উৎসাহ!

এ্যালিস ঠিকই বলেছে। সব যাবে—কাল সকালেই হয়তো যাবে, জাপানী বোমায়। পবিত্র ফা-চিন্ মন্দির যাবে, পাইন গাছের সারি যাবে, লালমাছ যাবে, এই তরুণ দম্পতি যাবে, সে যাবে, মিনি, এ্যালিস, সুরেশ্বর, বৃদ্ধ লি—সব যাবে। যুদ্ধ বর্বরের ব্যবসায়।

ফুল ছড়ানো শেষ হয়েছে! মন্দিরের বাঁকানো ঢালু ছাদে পোষা পায়রার দল উড়ে এসে বসেছে। পাথরের সিঁড়ির ওপরের ধাপটা ফুলে ভর্তি। নবদম্পতি তখন হাসছে—এ একটা ভারি অপ্রত্যাশিত আমোদের ব্যাপার হয়েছে তাদের কাছে। ওদের হাসি ও আনন্দ যেন দানবীয় শক্তির ওপর,—মৃত্যুর ওপর,—মানুষের জয়লাভ। মহাচীনের নবজন্ম হয়েছে এই তরুণ-তরুণীতে। স্বর্গ থেকে ফা-চিন্-এর পবিত্র অমর আত্মা ওদের আশীর্বাদ করুন।

এ্যালিস এসে বিমলের হাত ধরলো।

—চল যাই বিমল। হাসপাতালে ডিউটি রয়েছে—তোমার আমার এক্ষুনি—

wapsip.com

wapsip.com

মিসমিদের কবচ

wapsip.com

wapsip.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্যামপুর গ্রামে সেদিন নন্দোৎসব।

শ্যামপুরের পাশের গ্রামে আমার মাতুলালয়। চৌধুরী-বাড়ির উৎসবে আমার মামার বাড়ির সকলের সঙ্গে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল—সুতরাং সেখানে গেলাম।

গ্রামের ভদ্রলোকেরা একটা শতরঞ্জি পেতে বৈঠকখানায় বসে আসর জমিয়েচেন। আমার বড় মামা বিদেশে থাকেন, সম্প্রতি ছুটি নিয়ে দেশে এসেচেন—সবাই মিলে তাঁকে অভ্যর্থনা করলে।

—এই যে আশুবাবু, সব ভালো তো? নমস্কার!

—নমস্কার। একরকম চলে যাচ্ছে—আপনাদের সব ভালো?

—ভালো আর কই? জ্বরজাড়ি সব। ম্যালেরিয়ার সময় এখন, বুঝতেই পারচেন।

—আপনার সঙ্গে এটি কে?

—আমার ভাগ্নে, সুশীল। আজই এসেচে—নিয়ে এলাম তাই।

—বেশ করেচেন, বেশ করেচেন, আনবেনই তো। কি করেন বাবাজি?

এখানে আমি মামাকে চোখ টিপবার সুবিধে না পেয়ে তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলি টিপে দিলাম।

মামা বললেন—আপিসে চাকরি করে—কলকাতায়।

—বেশ, বেশ। এসো বাবাজি, বসো এসে এদিকে।

মামার আঙুল টিপবার কারণটা বলি। আমি কলকাতার বিখ্যাত প্রাইভেট-ডিটেকটিভ নিবারণ সোমের অধীনে শিক্ষানবিশি করি। কথাটা প্রকাশ করবার ইচ্ছা ছিল না আমার।

নন্দোৎসব এবং আনুষঙ্গিক ভোজনপর্ব শেষ হলো। আমরা বিদায় নেবার যোগাড় করচি, এমন সময় গ্রামের জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার মামাকে ডেকে বললেন—কাল আপনাদের পুকুরে মাছ ধরতে যাবার ইচ্ছে আছে। সুবিধে হবে কি?

—বিলক্ষণ! খুব সুবিধে হবে! আসুন না গাঙ্গুলিমশায়, আমার ওখানেই তাহলে দুপুরে আহারাদি করবেন কিন্তু।

—না না, তা আবার কেন? আপনার পুকুরে মাছ ধরতে দিচ্চেন এই কত, আবার খেয়ে বিব্রত করতে যাবো কেন?

—তাহলে মাছ ধরাও হবে না বলে দিচ্চি। মাছ ধরতে যাবেন কেবল ওই এক শর্তে।

গাঙ্গুলিমশায় হেসে রাজী হয়ে গেলেন।

পরদিন সকালের দিকে হরিশ গাঙ্গুলিমশায় মামার বাড়িতে এলেন। পল্লীগ্রামের পাকা ঘুঘু মাছ-ধরায়, সঙ্গে ছ'গাছা ছোট-বড় ছিপ, দু'খানা হুইল লাগানো—বাকি সব বিনা হুইলের, টিনে ময়দার চার, কেঁচো, পিঁপড়ের ডিম, তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম, আরও কত কি।

মামাকে হেসে বললেন—এলাম বড়বাবু, আপনাকে বিরক্ত করতে। একটা লোক দিয়ে গোটাকতক কঞ্চি কাটিয়ে যদি দেন—কেঁচোর চার লাগাতে হবে।

মামা জিজ্ঞেস করলেন—এখন বসবেন, না, ওবেলা?

—না, এবেলা বসা হবে না। মাছ চারে লাগতে দু'ঘণ্টা দেরি হবে। ততক্ষণ খাওয়া দাওয়া সেরে নেওয়া যায়। একটু-সকাল-সকাল যদি আহারের ব্যবস্থা···

wapsip.com

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সব হয়ে গেছে। আমিও জানি, আপনি এসেই খেতে বসবার জন্যে তাগাদা দেবেন। মাছ যারা ধরে, তাদের কাছে খাওয়া-টাওয়া কিছুই নয় খুব জানি। আর ঘণ্টা খানেক পরেই জায়গা করে দেবো খাওয়ার।

যথাসময়ে হরিশ গাঙ্গুলি খেতে বসলেন এবং একা প্রায় তিনজনের উপযুক্ত খাদ্য উদরসাৎ করলেন।

আমি কলকাতার ছেলে, দেখে তো অবাক!

আমার মামা জিজ্ঞেস করলেন—গাঙ্গুলিমশায়, আর একটু পায়েস?

—তা একটুখানি না হয়··· ওসব তো খেতে পাইনে! একা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাই। বাড়িতে মেয়েমানুষ নেই, বৌমারা থাকেন বিদেশে আমার ছেলের কাছে। কে ওসব করে দেবে?

—গাঙ্গুলিমশায় কি একাই থাকেন?

—একাই থাকি বইকি। ছেলেরা কলকাতায় চাকরি করে, আমার শহরে থাকা পোষায় না। তাছাড়া কিছু নগদী লেন-দেনের কারবারও করি, প্রায় তিনহাজার টাকার ওপর। টাকায় দু'আনা মাসে সুদ। আপনার কাছে আর লুকিয়ে কি করবো? কাজেই বাড়ি না থাকলে চলে কই? লোকে প্রায়ই আসচে টাকা দিতে-নিতে।

গাঙ্গুলিমশায় এই কথাগুলো যেন বেশ একটু গর্বের সঙ্গে বললেন।

আমি পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে তত অভিজ্ঞ না হলেও আমার মনে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব দেখা দিলে। টাকা-কড়ির কথা এ-ভাবে লোকজনের কাছে বলে লাভ কি! বলা নিরাপদও নয়—শোভনতা ও রুচির কথা যদি বাদই দিই।

গাঙ্গুলিমশায়কে আমার বেশ লাগলো।

মাছ ধরতে-ধরতে আমার সঙ্গে তিনি অনেক গল্প করলেন।

···থাকেন তিনি খুব সামান্য ভাবে—কোনো আড়ম্বর নেই—খাওয়া-দাওয়া বিষয়েই কোনো ঝঞ্ঝাট নেই তাঁর। ···এই ধরনের অনেক কথাই হলো।

মাছ তিনি ধরলেন বড়-বড় দুটো। ছোট গোটা-চার-পাঁচ। আমার মামাকে অর্ধেকগুলি দিতে চাইলেন, মামা নিতে চাইলেন না। বললেন—কেন গাঙ্গুলিমশায়? পুকুরে মাছ ধরতে এসেছেন, তার খাজনা নাকি?

গাঙ্গুলিমশায় জিব কেটে বললেন—আরে রামো! তাই বলে কি বলচি? রাখুন অন্তত গোটা-দুই!

—না গাঙ্গুলিমশায়, মাপ করবেন, তা নিতে পারবো না। ও নেওয়ার নিয়ম নেই আমাদের।

অগত্যা গাঙ্গুলিমশায় চলে গেলেন। আমায় বলে গেলেন—তুমি বাবাজী একদিন আমার ওখানে যেও একটা ছুটিতে। তোমার সঙ্গে আলাপ করে বড় আনন্দ হলো আজ।

কে জানতো যে তাঁর বাড়িতে আমাকে অল্পদিনের মধ্যেই যেতে হবে; তবে সম্পূর্ণ অন্য কারণে—অন্য উদ্দেশ্যে।

গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে খোশগল্প করার জন্যে নয়!

wapsip.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গাঙ্গুলিমশায় চলে গেলে আমি মামাকে বললাম—আপনি মাছ নিলেন না কেন? উনি দুঃখিত হলেন নিশ্চয়।

মামা হেসে বললেন—তুমি জানো না, নিলেই দুঃখিত হতেন—উনি বড় কৃপণ।

—তা কথার ভাবে বুঝেচি।

—কি করে বুঝলে?

—অন্য কিছু নয় বৌ-ছেলেরা কলকাতায় থাকে, উনি থাকেন দেশের বাড়িতে। একটা চাকর কি রাঁধুনী রাখেন না, হাত পুড়িয়ে এ-বয়সে রেঁধে খেতে হয় তাও স্বীকার। অথচ হাতে দু'পয়সা বেশ আছে।

—আর কিছু লক্ষ্য করলে?

—বড় গল্প বলা স্বভাব! আমার ধারণা, একটু বাড়িয়েও বলেন।

—ঠিক ধরেচো। মাছ নিইনি তার আর-একটা কারণ, উনি মাছ দিয়ে গেলে সব জায়গায় সে গল্প করে বেড়াবেন, আর লোকে ভাববে আমরা কি চামার—পুকুরে মাছ ধরেছে বলে ওঁর কাছ থেকে মাছ নিইচি।

—না মামা, এটা আপনার ভুল। এ-কথা ভাববার কারণ কি লোকদের? তা কখনো কেউ ভাবে?

—তা যাই হোক, মোটের ওপর আমি ওটা পছন্দ করিনে।

—উনি একটা বড় ভুল করেন মামাবাবু। টাকার কথা অমন বলে বেড়ান কেন?

—ওটা ওঁর স্বভাব। সর্বত্র ওই করবেন। যেখানে বসবেন, সেখানেই টাকার গল্প। করেও আজ আসচেন বহুদিন। দেখাতে চান, হাতে দু'পয়সা আছে।

—আমার মনে হয় ও-স্বভাবটা ভালো নয়—বিশেষ করে এইসব পাড়াগাঁয়ে। একদিন আপনি একটু সাবধান করে দেবেন না?

—সে হবে না। তুমি ওঁকে জানো না। বড্ড একগুঁয়ে। কথা তো শুনবেনই না—আরও ভাববেন, নিশ্চয়ই আমার কোনো মতলব আছে।

আমি সেদিন কলকাতায় চলে এলাম বিকেলের ট্রেনে। আমার ওপর-ওয়ালা নিবারণবাবু লিখেছেন, খুব শীগগির আমায় একবার এলাহাবাদে যেতে হবে বিশেষ একটা জরুরি কাজে। অপিসে যেতেই খবর পেলাম, তিনি আর-একটা কাজে দু'দিনের জন্য পাটনা গিয়েচেন চলে—আমার এলাহাবাদ যাবার খরচের টাকা ও একখানা চিঠি রেখে গিয়েচেন তাঁর টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে।

আমার কাছে তাঁর ড্রয়ারের চাবি থাকে। ড্রয়ার খুলে চিঠিখানা পড়ে দেখলাম, বিশেষ কোনো গুরুতর কাজ নয়—এলাহাবাদ গভর্নমেন্ট থাম্ব-ইমপ্রেশন-বুরোতে যেতে হবে, কয়েকটি দাগী বদমাইশের বুড়ো-আঙুলের ছাপের একটা ফটো নিতে।

মিঃ সোম বুড়ো-আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

এলাহাবাদের কাজ শেষ করতে আমার লাগলো মাত্র একদিন, আট-দশদিন রয়ে গেলাম তবুও।

wapsip.com

সেদিন সকালবেলা হঠাৎ মিঃ সোমের এক টেলিগ্রাম পেলাম। একটা জরুরি কাজের জন্য আমায় সেইদিনই কলকাতায় ফিরতে লিখেচেন। আমি যেন এলাহাবাদে দেরি না করি।

ভোরে হাওড়ায় ট্রেন এসে দাঁড়াতেই দেখি, মিঃ সোম প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম, কারণ, এরকম কখনো উনি আসেন না।

আমায় বললেন—সুশীল, তুমি আজই মামার বাড়ি যাও। তোমার মামা কাল দু'খানা আর্জেন্ট-টেলিগ্রাম করেছেন তোমায় সেখানে যাবার জন্যে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম—মামার বাড়ি কারও অসুখ। সবাই ভালো আছে তো?

—সে-সব নয় বলেই মনে হলো। টেলিগ্রামের মধ্যে কারও অসুখের উল্লেখ নেই।

—কোনো লোক আসে নি সেখান থেকে?

—না। আমি তার করে দিয়েচি, তুমি এলাহাবাদে গিয়েচো। আজই তোমার ফিরবার তারিখ তাও জানিয়ে দিয়েচি।

আমি বাসায় না গিয়ে সোজা শেয়ালদ' স্টেশনে চলে এলাম মামার বাড়ি যাবার জন্যে।

মিঃ সোম আমার সঙ্গে এলেন শেয়ালদ' পর্যন্ত—বার-বার করে বলে দিলেন, কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটলে তাঁকে যেন খবর দিই—তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেন।

মামার বাড়ি পা দিতেই বড় মামা বললেন—এসেছিল সুশীল? যাক, বড্ড ভাবছিলাম?

—কি ব্যাপার মামাবাবু? সবাই ভালো তো?

—এখানকার কিছু ব্যাপার নয়। শ্যামপুরের হরিশ গাঙ্গুলিমশায় খুন হয়েছেন। সেখানে এখুনি যেতে হবে।

আমি ভীতও বিস্মিত হয়ে বললাম—গাঙ্গুলিমশায়! সেদিন যিনি মাছ ধরে গেলেন! খুন হয়েচেন?

—হ্যাঁ, চলো একেবার সেখানে। শীগগির স্নানাহার করে নাও। কারণ, সারাদিনই হয়তো কাটবে সেখানে।

বেলা দুটোর সময় শ্যামপুরে এসে পৌঁছুলাম। ছোট্ট গ্রাম। কখনো সেখানে কারও একটা ঘটি চুরি হয়নি—সেখানে খুন হয়ে গিয়েচে, সুতরাং গ্রামের লোকে দস্তুরমত ভয় পেয়ে গেছে। গ্রামের মাঝখানে বারোয়ারি-পূজা-মণ্ডপে জড়ো হয়ে সেই কথারই আলোচনা করছে সবাই।

আমার মামা এখানে এর পূর্বে অনেকবার এসেছিলেন এই ঘটনা উপলক্ষে, তা সকলের কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল। আমার কথা বিশেষ কেউ জিগ্যেস করলে না বা আমার সম্বন্ধে কেউ কোনো আগ্রহও দেখালে না। কেউ জানে না, আমি প্রাইভেট-ডিটেকটিভ মিঃ সোমের শিক্ষানবিশ ছাত্র—এ-সব অজ পাড়াগাঁয়ে ওঁর নামই কেউ শোনে নি—আমাকে সেখানে কে চিনবে?

মামা জিগ্যেস করলেন—লাশ নিয়ে গিয়েচে?

ওরা বললে—আজ সকালে নিয়ে গেল। পুলিস এসেছিল।

আমি ওদের বললাম—ব্যাপার কি ভাবে ঘটলো? আজ হলো শনিবার। কবে তিনি খুন হয়েচেন?

গ্রামের লোকে যেরকম বললে তাতে মনে হলো, সে-কথা কেউ জানে না। নানা লোক নানা কথা বলতে লাগলো। পুলিসের কাছেও এরা এইরকমই বলে ব্যাপারটাকে রীতিমত

wapsip.com

গোলমেলে করে তুলেচে।

আমি আড়ালে মামাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম—আপনি কি মনে করে এখানে এনচেন আমায়?

মামা বললেন—তুমি সব ব্যাপার শুনে নাও, চলো, অনেক কথা আছে। এই খুনের রহস্য তোমায় আবিষ্কার করতে হবে—তবে বুঝবো মিঃ সোমের কাছে তোমায় শিক্ষানবিশ করতে দিয়ে আমি ভুল করিনি। এখানে কেউ জানে না তুমি কি কাজ করো—সে তোমার একটা সুবিধে।

—সুবিধেও বটে, আবার অসুবিধেও বটে।

—কেন?

—বাইরের বাজে লোককে কেউ আগ্রহ করে কিছু বলবে না। গোলমাল একটু থামলে একজন ভালো লোককে বেছে নিয়ে সব ঘটনা খুঁটিয়ে জানতে হবে। গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে কোথায়?

—সে লাশের সঙ্গে মহকুমায় গিয়েছে। সেখানে লাশ কাটাকুটি করবে ডাক্তারে, তারপর দাহকার্য করে ফিরবে।

—লাশ দেখলে বড্ড সুবিধে হতো। সেটা আর হলো না।

—সেইজন্যেই তো বলছি, তুমি কেমন কাজ শিখেচো, এটা তোমার পরীক্ষা। এতে যদি পাশ করো তবে বুঝবো তুমি মিঃ সোমের উপযুক্ত ছাত্র। নয়তো তোমাকে আমি আর ওখানে রাখবো না—এ আমার এক-কথা জেনো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তারপর গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি গেলাম।

গিয়ে দেখি, যেখানটাতে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি—তার দু'দিকে ঘন-জঙ্গল। একদিকে দূরে একটা গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা, একদিকে একটি হচ্ছে বাড়ি।

আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের কথা জিগ্যেস করে জানলাম, সে এখনও মহকুমা থেকে ফেরে নি। তবে একটি প্রৌঢ়ার সঙ্গে দেখা হলো—শুনলাম তিনি গাঙ্গুলিমশায়ের আত্মীয়া।

তাঁকে জিগ্যেস করলাম—গাঙ্গুলিমশায়কে শেষ দেখেছিলেন কবে?

—বুধবার।

—কখন?

—বিকেল পাঁচটার সময়।

—কিভাবে দেখেছিলেন?

—সেদিন হাটবার ছিল—উনি হাটে যাবার আগে আমার কাছে পয়সা চেয়েছিলেন।

—কিসের পয়সা?

—সুদের পয়সা। আমি ওঁর কাছে দুটো টাকা ধার নিয়েছিলাম ও-মাসে।

—আপনার পর আর কেউ দেখেছিল?

গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ির ঠিক পশ্চিমগায়ে যে বাড়ি, সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে প্রৌঢ়া বললেন—ওই বাড়ির রায়-পিসি আমার পরও তাঁকে দেখেছিলেন?

wapsip.com

আমি বৃদ্ধা রায়-পিসির বাড়ি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই বৃদ্ধা আমায় আশীর্বাদ করে একখানা পিঁড়ি বার করে দিয়ে বললেন—বোসো বাবা।

আমি সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়ে বললাম—আপনি একা থাকেন নাকি এ বাড়িতে।

—হ্যাঁ বাবা। আমার তো কেউ নেই—মেয়ে-জামাই আছে, তারা দেখাশুনো করে।

—মেয়ে-জামাই এখানে থাকেন?

—এখানেও থাকে, আবার তাদের দেশ এই এখান থেকে চার ক্রোশ দূর সাধুহাটি গাঁয়ে, সেখানেও থাকে।—

—গাঙ্গুলিমশায়কে আপনি বুধবারে কখন দেখেন?

—রাত্তিরে যখন উনি হাট থেকে ফিরলেন—তখন আমি বাইরের রোয়াকে বসে জপ করছিলাম। তারপর আর চোখে না দেখলেও ওঁর গলার আওয়াজ শুনেচি রাত দশটা পর্যন্ত—উনি ওঁর রান্নাঘরে রাঁধছিলেন আলো জ্বেলে, আমি যখন শুতে যাই তখন পর্যন্ত।

—তখন রাত কত হবে?

—তা কি বাবা জানি? আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক—ঘড়ি তো নেই বাড়িতে। তবে তখন ফরিদপুরের গাড়ি চলে গিয়েচে। আমরা শব্দ শুনে বুঝি কখন কোন্ গাড়ি এল গেল।

—একা থাকতেন, আর রাত পর্যন্ত রান্না করছিলেন—এত কি রান্না?

—সেদিন মাংস এনেছিলেন হাট থেকে। মাংস সেদ্ধ হতে দেরি হচ্ছিল।

—আপনি কি করে জানলেন?

—পরে আমরা জেনেছিলাম। হাটে যারা ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে মাংস কিনেছিল—তারা বলেছিল। তাছাড়া যখন রান্নাঘর খোলা হলো—বাবাগো!

বলে বৃদ্ধা যেন সে দৃশ্যের বীভৎসতা মনের পটে আবার দেখতে পেয়ে শিউরে উঠে কথা বন্ধ করলেন। সঙ্গে যে প্রৌঢ়া আত্মীয়াটি ছিলেন গাঙ্গুলিমশায়ের, তিনিও বললেন—ও বাবা, সে রান্নাঘরের কথা মনে হলে এখনও গা ডোল দেয়!

আমি আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলাম—কেন? কেন?—কি ছিল রান্নাঘরে?

বৃদ্ধা বললেন—থালার চারদিকে ভাত ছড়ানো—মাংসের ছিবড়ে আর হাড়গোড় ছড়ানো।

বাটিতে তখনও মাংস আর ঝোল রয়েচে—ঘরের মেঝেতে ধস্তাধস্তির চিহ্ন—তিনি খেতে বসেছিলেন এবং তাঁর খাওয়া শেষ হবার আগেই যারা তাঁকে খুন করে তারা এসে পড়ে।

প্রৌঢ়াও বললেন—হ্যাঁ বাবা, এ সবাই দেখেচে। পুলিসও এসে রান্নাঘর দেখে গিয়েচে। সকলেরই মনে হলো, ব্রাহ্মণের খাওয়া শেষ হবার আগেই খুনেরা এসে তার ওপর পড়ে।

—আচ্ছা বেশ, এ গেল বুধবার রাতের ব্যাপার। সেদিনই হাট ছিল তো?

—হ্যাঁ বাবা, তার পরদিন সকালে উঠে আমরা দেখলাম, ওঁর ঘরের দরজা বাইরের দিকে তালা-চাবি দেওয়া। প্রথম সকলেই ভাবলে উনি কোথাও কাজে গিয়েচেন, ফিরে এসে রান্নাবান্না করবেন। কিন্তু যখন বিকেল হয়ে গেল, ফিরলেন না—তখন আমরা ভাবলাম, উনি ওঁর ছেলেদের কাছে কলকাতায় গেছেন।

—তারপর?

—বিষ্যুদবার গেল, শুক্রবার গেল, শুক্রবার বিকেলের দিকে বন্ধ-ঘরের মধ্যে থেকে কিসের দুর্গন্ধ বেরুতে লাগলো—তাও সবাই ভাবলে, ভাদ্রমাস, গাঙ্গুলিমশায় হয়তো তাল

wapsip.com

কুড়িয়ে ঘরের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন তাই পচে অমন গন্ধ বেরুচ্চে।

—শনিবার আপনারা কোন্ সময় টের পেলেন যে, তিনি খুন হয়েচেন?

—শনিবারে আমি গিয়ে গ্রামের ভদ্রলোকদের কাছে সব বললাম। অনেকেই জানতো না যে, গাঙ্গুলিমশায়কে এ ক'দিন গাঁয়ে দেখা যায়নি। তখন সকলেই এল। গন্ধ তখন খুব বেড়েচে! পচা তালের গন্ধ বলে মনে হচ্ছে না!

—কি করলেন আপনারা?

—তখন সকলে জানলা খোলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু সব জানলা ভেতর থেকে বন্ধ। দোর ভাঙাই সাব্যস্ত হলো। পরের ঘরের দোর ভেঙে ঢোকা ঠিক নয়—এরপর যদি তা নিয়ে কোনো কথা ওঠে। তখন চৌকিদার আর দফাদার ডেকে এনে তাদের সামনে দোর ভাঙা হলো।

—কি দেখা গেল?

—দেখা গেল, তিনি ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছেন! মাথায় ভারী জিনিস দিয়ে মারার দাগ। মেজে খুঁড়ে রাশীকৃত মাটি বার করা, ঘরের বাক্স-প্যাঁটরা সব ভাঙা, ডালা খোলা—সব তচনচ করেচে জিনিসপত্র। ...তারপর ওঁর ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হলো।

—এছাড়া আর কিছু আপনারা জানেন না?

—না বাবা, আর আমরা কিছু জানিনে।

গাঙ্গুলিমশায়ের প্রতিবেশিনী সেই বৃদ্ধাকে জিগ্যেস করলাম—রাত্রে কোনোরকম শব্দ শুনেছিলেন? গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি থেকে?

—কিছু না। অনেক রাত্তিরে আমি যখন শুতে যাই—তখনও ওঁর রান্নাঘরে আলো জ্বলতে দেখেচি। আমি ভাবলাম, গাঙ্গুলিমশায় আজ এখনও দেখি রান্না করচেন!

—কেন, এরকম ভাবলেন কেন?

—এত রাত পর্যন্ত তো উনি রান্নাঘরে থাকেন না; সকাল রাত্তিরেই খেয়ে শুয়ে পড়েন। বিশেষ করে সেদিন গিয়েছে ঘোর অন্ধকার রাত্তির—অমাবস্যা, তার ওপর টিপ-টিপ বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছিল সন্ধ্যে থেকেই।

—তখন তো আর আপনি জানতেন না যে, উনি হাট থেকে মাংস কিনে এনেচেন?

—না, এমন কিছুই জানিনে। ...হ্যাঁ বাবা,... যখন এত করে জিগ্যেস করচো, তখন একটা কথা আমার এখন মনে হচ্চে—

—কি, কি, বলুন?

—উনি ভাত খাওয়ার পরে রোজ রাত্তিরে কুকুর ডেকে এঁটো পাতা, কি পাতের ভাত তাদের দিতেন, রোজ-রোজ ওঁর গলার ডাক শোনা যেত। সেদিন আমি আর তা শুনি নি।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলেন হয়তো।

—না বাবা, বুড়ো-মানুষ—ঘুম সহজে আসে না। চুপ করে শুয়ে থাকি বিছানায়। সেদিন আর ওঁর কুকুরকে ডাক দেওয়ার আওয়াজ আমার কানেই যায়নি।

ভালো করে জেরা করার ফল অনেক সময় বড় চমৎকার হয়। মিঃ সোম প্রায়ই বলেন—লোককে বারবার করে প্রশ্ন জিগ্যেস করবে। যা হয়তো তার মনে নেই, বা, খুঁটিনাটির ওপর সে তত জোর দেয় নি—তোমার জেরায় তা তারও মনে পড়বে। সত্য বার হয়ে আসে অনেক সময় ভালো জেরার গুণে।

wapsip.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেদিনই আমার সঙ্গে গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে শ্রীগোপালের দেখা হলো। সে তার পিতার দাহকার্য শেষ করে ফিরে আসছে কাছাগলায়।

আমি তাকে আড়ালে ডেকে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলাম। শ্রীগোপালের চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌ করে জল পড়তে লাগলো। সে আমাকে সব-রকমের সাহায্য করবে প্রতিশ্রুতি দিলে।

আমি বললাম—কারও ওপর আপনার সন্দেহ হয়?

—কার কথা বলব বলুন। বাবার একটা দোষ ছিল, টাকার কথা জাহির করে বেড়াতেন সবার কাছে। কত জায়গায় এ-সব কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে কে এ-কাজ করলে কি করে বলি?

—আচ্ছা, কথা একটা জিগ্যেস করবো—কিছু মনে করবেন না। আপনার বাবার কত টাকা ছিল জানেন?

—বাবা কখনো আমাদের বলতেন না। তবে, আন্দাজ, দু'হাজারের বেশি নগদ টাকা ছিল না।

—সে টাকা কোথায় থাকতো?

—সেটা জানতাম। ঘরের মেজেতে বাবা পুঁতে রাখতেন—কতবার বলেছি, টাকা ব্যাঙ্কে রাখুন। সেকেলে লোক, ব্যাঙ্ক বুঝতেন না।

—গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুর পর বাড়ি এসে আপনি মেজে খুঁড়ে কিছু পেয়েছিলেন?

—মেজে তো খুঁড়ে রেখেছিল যারা খুন করেচে তারাই। আমি এক পয়সাও পাই নি—তবে একটা কথা বলি—দু'হাজার টাকার সব টাকাই তো মেঝেতে পোঁতা ছিল না—বাবা টাকা ধার দিতেন কিনা! কিছু টাকা লোকজনকে ধার দেওয়া ছিল।

—কত টাকা আন্দাজ?

—সেদিক থেকেও মজা শুনুন, বাবার খাতাপত্র সব ওই সঙ্গে চুরি হয়ে গিয়েচে। খাতা না দেখলে বলা যাবে না কত টাকা ধার দেওয়া ছিল।

—খাতাপত্র নিজেই লিখতেন?

—তার মধ্যে গোলমাল আছে। আগে নিজেই লিখতেন, ইদানীং চোখে দেখতে পেতেন না বলে এক-ওকে ধরে লিখিয়ে নিতেন।

—কাকে-কাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন জানেন?

—বেশির ভাগ লেখাতেন সদ্‌গোপ-বাড়ির ননী ঘোষকে দিয়ে। সে জমিদারী-সেরেস্তায় কাজ করে—তার হাতের লেখাও ভালো। বাবার কথা সে খুব শুনতো।

—ননী ঘোষের বয়েস কত?

—ত্রিশ-বত্রিশ হবে।

—ননী ঘোষ লোক কেমন? তার ওপর সন্দেহ হয়।

—মুশ্‌কিল হয়েচে, বাবা তো একজনকে দিয়ে লেখাতেন না! যখন যাকে পেতেন, তখন তাকেই ধরে লিখিয়ে নিতেন যে! স্কুলের ছেলে গণেশ বলে আছে, ওই মুখুজ্যে বাড়ি থেকে পড়ে—তাকেও দেখি একদিন ডেকে এনেচেন। শুধু ননী ঘোষের ওপর সন্দেহ করে

wapsip.com

কি করবো?

—আর কাকে দেখেচেন?

—আর মনে হচ্চে না।

—আপনি হিসাবের খাতা দেখে বলে দিতে পারেন, কোন্ হাতের লেখা কার?

—ননীর হাতের লেখা আমি চিনি। তার হাতের লেখা বলতে পারি—কিন্তু সে খাতাই বা কোথায়? খুনেরা সে খাতা তো নিয়ে গিয়েচে!

—কাকে বেশি টাকা ধার দেওয়া ছিল, জানেন?

—কাউকে বেশি টাকা দিতেন না বাবা। দশ, পাঁচ, কুড়ি—বড়জোর ত্রিশের বেশি টাকা একজনকেও তিনি দিতেন না।

শ্যামপুরের জমিদার-বাড়ি সেবেলা খাওয়া-দাওয়া করলাম।

একটা বড় চত্বর, তার চারিধারে নারিকেল গাছের সারি, জামরুল গাছ, বোম্বাই-আমের গাছ, আতা-গাছ। বেশ ছায়াভরা উপবন যেন। ডিটেকটিভগিরি করে হয়তো ভবিষ্যতে খাবো—তা বলে প্রকৃতির শোভা যখন মন হরণ করে—এমন মেঘমেদুর বর্ষা-দিনে গাছপালার শ্যামশোভা উপভোগ করতে ছাড়ি কেন?

বসলুম এসে চত্বরের একপাশে নির্জন গাছের তলায়।

বসে-বসে ভাবতে লাগলুম :

··· কি করা যায় এখন? মামা বড় কঠিন পরীক্ষা আমার সামনে এনে ফেলেচেন?

মিঃ সোমের উপযুক্ত ছাত্র কি-না আমি, এবার তা প্রমাণ করার দিন এসেচে।

কিন্তু বসে-বসে মিঃ সোমের কাছে যতগুলি প্রণালী শিখেচি খুনের কিনারা করবার—সবগুলি পাশ্চাত্ত্য-বৈজ্ঞানিক-প্রণালী—স্কট-ল্যান্ডইয়ার্ডের ডিটেকটিভের প্রণালী। এখানে তার কোনটিই খাটবে না। আঙুলের ছাপ নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করা হয় নি—সাত-আটদিন পরে এখন জিনিসপত্রের গায়ে খুনীর আঙুলের ছাপ অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে।

পায়ের দাগ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা।

খুন হবার পর এত লোক গাঙ্গুলিমশায়ের ঘরে ঢুকেচে—তাদের সকলের পায়ের দাগের সঙ্গে খুনীর পায়ের দাগ একাকার হয়ে তালগোল পাকিয়ে গিয়েচে। গ্রামের কৌতূহলী লোকেরা আমায় কি বিপদেই ফেলেচে! তারা জানে না, একজন শিক্ষানবিশ-ডিটেকটিভের কি সর্বনাশ তারা করেচে!

আর-একটা ব্যাপার, খুনটা টাটকা নয়, সাতদিন আগে খুন হয়ে লাশ পর্যন্ত দাহ শেষ—সব ফিনিশ—গোলমাল চুকে গিয়েচে।

চোখে দেখি নি পর্যন্ত সেটা—অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন-টিহ্নগুলো দেখলেও তো যা হয় একটা ধারণা করা যেত। এ একেবারে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া! ভীষণ সমস্যা!

মিঃ সোমকে কি একখানা চিঠি লিখে তাঁর পরামর্শ চেয়ে পাঠাবো? এমন অবস্থায় পড়লে তিনি নিজে কি করতেন জানাতে বলবো?

কিন্তু তাও তো উচিত নয়!

মামা যখন বলেচেন, এটা যদি আমার পরীক্ষা হয়, তবে পরীক্ষার হলে যেমন ছেলেরা কাউকে কিছু জিগ্যেস করে নেয় না—আমায় তাই করতে হবে।

যদি এর কিনারা করতে পারি, তবে মামা বলেচেন, আমাকে এ-লাইনে

wapsip.com

রাখবেন—নয়তো মিঃ সোমের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেবেন, নিয়ে হয়তো কোনো আর্টিস্টের কাছে রেখে ছবি আঁকতে শেখাবেন, বা, বড় দরজির কাছে রেখে শার্ট তৈরি, পাঞ্জাবী তৈরি শেখাবেন।

তবে শিক্ষানবিশের প্রথম পরীক্ষা-হিসেবে পরীক্ষা যে বেশ কঠিন, এতে কোন ভুল নেই।...

—বসে-বসে আরও অনেক কথা ভাবলুম :

...হিসেবের খাতা যে লিখতো, সে নিশ্চয়ই জানতো ঘরে কত টাকা মজুত, বাইরে কত টাকা ছড়ানো। তার পক্ষে জিনিসটা জানা যত সহজ, অপরের পক্ষে তত সহজ নয়।

এ-বিষয়েও একটা গোলমাল আছে। গাঙ্গুলিমশায় টাকার গর্ব মুখে করে বেড়াতেন যেখানে-সেখানে। কত লোক শুনেচে—কত লোক হয়তো জানতো।

একটা কথা আমার হঠাৎ মনে এল।

কিন্তু, কাকে কথাটা জিগ্যেস করি?

ননী ঘোষের বাড়ি গিয়ে ননী ঘোষের সঙ্গে দেখা করা একবার বিশেষ দরকার। তাকেই এ-কথা জিগ্যেস করতে হবে। সে নাও বলতে পারে অবিশ্যি—তবুও একবার জিগ্যেস করতে দোষ নেই।...

ননী ঘোষ বাড়িতেই ছিল। আমায় সে চেনে না, একটু তাচ্ছিল্য ও ব্যস্ততার সঙ্গে বললে—কি দরকার বাবু? বাড়ি কোথায় আপনার?

আমি বললাম—তোমার সঙ্গে দরকারী কথা আছে। ঠিক উত্তর দাও। মিথ্যে বললে বিপদে পড়ে যাবে।

ননীর মুখ শুকিয়ে গেল। দেখলাম সে ভয় পেয়েচে। বুঝেচে যে, আমি গাঙ্গুলিমশায়ের খুন-সম্পর্কে তদন্ত করতে এসেছি—নিশ্চয়ই পুলিসের সাদা পোশাক-পরা ডিটেকটিভ।

সে এবার বিনয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললে—বাবু, যা জিগ্যেস করেন, করুন।

—গাঙ্গুলিমশায়ের খাতা তুমি লিখতে?

ননী ইতস্তত করে বললে—তা ইয়ে—আমিও লিখিচি দু' একদিন—আর ওই গণেশ বলে একটা স্কুলের ছেলে আছে, তাকে দিয়েও—

আমি ধমক দিয়ে বললাম—স্কুলের ছেলের কথা হচ্ছে না—তুমি লিখতে কিনা?

ননী ভয়ে-ভয়ে বললে—আজ্ঞে, তা লেখতাম।

—কতদিন লিখচো? মিথ্যে কথা বললেই ধরা পড়ে যাবে। ঠিক বলবে।

—প্রায়ই লেখতাম। দু'বছর ধরে লিখচি।

—আর কে লিখতো?

—ওই যে স্কুলের ছেলে গণেশ—

—তার কথা ছেড়ে দাও, তার বয়েস কত?

—পনের-ষোলো হবে।

—আর কে লিখতো?

—আর, সরফরাজ তরফদার লিখতো, সে এখন—

—সরফরাজ তরফদারের বয়েস কত? কি করে?

—সে এখন মারা গিয়েছে।

—বাদ দাও সে-কথা। কতদিন মারা গিয়েচে?

wapsip.com

—দু'বছর হবে।

—এইবার একটা কথা জিগ্যেস করি—গাঙ্গুলিমশায়ের কত টাকা বাইরে ছিল জানো?

—প্রায় দু'হাজার টাকা।

—মিথ্যে বোলো না। খাতা পুলিসের হাতে পড়েচে—মিথ্যে বললে মারা যাবে।

—না বাবু, মিথ্যে বলিনি। দু'হাজার হবে।

—ঘরে মজুত কত ছিল?

—তা জানিনে!

—আবার বাজে কথা? ঠিক বলো।

—বাবু, আমার মেরেই ফেলুন আর যাই করুন—মজুত টাকা কত তা আমি কি করে বলবো? গাঙ্গুলিমশায় আমায় সে টাকা দেখায় নি তো? খাতায় মজুত-তবিল লেখা থাকতো না।

—একটা আন্দাজ তো আচে? আন্দাজ কি ছিল বলে তোমার মনে হয়?

—আন্দাজ আর সাত-আট-শো টাকা।

—কি করে আন্দাজ করলে?

—ওঁর মুখের কথা থেকে তাই আন্দাজ হতো।

—গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুর কতদিন আগে তুমি শেষ খাতা লিখেছিলে?

—প্রায় দু'মাস আগে। দু'মাসের মধ্যে আমি খাতা লিখিনি—আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলচি। তাছাড়া খাতা বেরুলে হাতের লেখা দেখেই তা আপনি বুঝবেন।

—কোনো মোটা টাকা কি তাঁর মরণের আগে কোনো খাতকে শোধ করেছিল বলে তুমি মনে কর?

—না বাবু! ঊর্ধসংখ্যা ত্রিশ টাকার বেশি তিনি কাউকে ধার দিতেন না, সেটা খুব ভালো করেই জানি। মোটা টাকা মানে, দুশো একশো টাকা কাউকে তিনি কখনো দেননি।

—এমন তো হতে পারে, পাঁচজন খাতকে ত্রিশ টাকা করে শোধ দিয়ে গেল একদিনে? দেড়শো টাকা হলো?

—অ হতে পারে বাবু, কিন্তু তা সম্ভব নয়। একদিনে পাঁচজন খাতকে টাকা শোধ দেবে না। আর-একটা কথা বাবু। চাষী-খাতক সব—ভাদ্রমাসে ধান হবার সময় নয়—এখন যে চাষী-প্রজারা টাকা শোধ দিয়ে যাবে, তা মনে হয় না। ওরা শোধ দেয় পৌষ মাসে—আবার ধার নেয় ধান-পাট বুনবার সময়ে চৈত্র-বৈশাখ মাসে। এ-সময় লেন-দেন বন্ধ থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কোনো কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না ননীর কাছে। তবুও আমার সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে গেল না। ননী হয় সম্পূর্ণ নির্দোষ, নয়তো সে অত্যন্ত ধূর্ত। মিঃ সোম একটা কথা সব-সময়ে বলেন, 'বাইরের চেহারা বা কথাবার্তা দ্বারা কখনো মানুষের আসল রূপ জানবার চেষ্টা কোরো না—করলেই ঠকতে হবে। ভীষণ চেহারার লোকের মধ্যে অনেক সময় সাধুপুরুষ বাস করে—আবার অত্যন্ত সুশ্রী ভদ্রবেশী লোকের মধ্যে সমাজের কণ্টকস্বরূপ দানব-প্রকৃতির বদমাইশ বাস করে। এ আমি যে কতবার দেখেচি।'

wapsip.com

ননীর বাড়ি থেকে ফিরে এসে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ির পেছনটা একবার ভালো করে দেখবার জন্যে গেলাম।

গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়িতে একখানা মাত্র খড়ের ঘর। তার সঙ্গে লাগাও ছোট্ট রান্নাঘর। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে যাওয়া যায়। এসব আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে দেখলাম।

তাকে বললাম—আপনার পিতার হত্যাকারীকে যদি খুঁজে বার করতে পারি, আপনি খুব খুশি হবেন?

সে প্রায় কেঁদে ফেলে বললে—খুশি কি, আপনাকে পাঁচশো টাকা দেবো।

—টাকা দিতে হবে না। আমায় সাহায্য করুন। আর-কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনে।

—নিশ্চয় করবো। বলুন কি করতে হবে?

—আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন আপাতত। তারপর বলবো যখন যা করতে হবে। আচ্ছা, চলুন তো বাড়ির পিছন দিকটা একবার দেখি?

—বড্ড জঙ্গল, যাবেন ওদিকে?

—জঙ্গল দেখলে তো আমাদের চলবে না—চলুন দেখি।

সত্যই ঘন আগাছার জঙ্গল আর বড়-বড় বনগাছের ভিড় বাড়ির পেছনেই। পাড়াগাঁয়ে যেমন হয়ে থাকে—বিশেষ করে এই শ্যামপুরে জঙ্গল একটু বেশি। বড়-বড় ভিটে লোকশূন্য ও জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বহুকাল থেকে। ম্যালেরিয়ার উৎপাতে দেশ উৎসন্ন গিয়েছিল বিশ-ত্রিশ বছর আগে। এখন পাড়ায়-পাড়ায় নলকূপ হয়েচে জেলাবোর্ডের অনুগ্রহে, ম্যালেরিয়াও অনেক কমেচে—কিন্তু লোক আর ফিরে আসেনি।

জঙ্গলের মধ্যে বর্ষার দিনে মশার কামড় খেয়ে হাত-পা ফুলে উঠলো। আমি প্রত্যেক স্থান তন্নতন্ন করে দেখলাম। সাত-আটদিনের পূর্বের ঘটনা, পায়ের চিহ্ন যদি কোথাও থাকতে পারে—তবে এখানেই তা থাকা সম্ভব।

কিন্তু জায়গাটা দেখে হতাশ হতে হলো।

জমিটা মুথো-ঘাসে ঢাকা—বর্ষায় সে ঘাস বেড়ে হাতখানেক লম্বা হয়েছে। তার ওপর পায়ের দাগ থাকা সম্ভবপর নয়।

আমার মনে হলো, খুনী রাত্রে এসেছিল ঠিক এই পথে। সামনের পথ লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে—কখনই সে-পথে আসতে সাহস করে নি।

অনেকক্ষণ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেও সন্দেহজনক কোনো জিনিস চোখে পড়লো না—কেবল এক জায়গায় একটা সেওড়াগাছের ডাল ভাঙা অবস্থায় দেখে আমি গাঙ্গুলি-মশায়ের ছেলেকে বললাম—এই ডালটা ভেঙে কে দাঁতন করেছিল, আপনি?

গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে আশ্চর্য হয়ে বললে—না, আমি এ-জঙ্গলে দাঁতন-কাঠি ভাঙতে আসবো কেন?

—তাই জিগ্যেস করচি।

—আপনি কি করে জানলেন, ডাল ভেঙে কেউ দাঁতন করেচে?

—ভালো করে চেয়ে দেখুন। একরকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুচড়ে ভেঙেচে ডালটা—তাছাড়া এতগুলো সেওড়াডালের মধ্যে একটিমাত্র ডাল ভাঙা। মানুষের হাতে ভাঙা বেশ বোঝা যাচ্চে। দাঁতনকাঠি সংগ্রহ ছাড়া অন্য কি উদ্দেশ্যে এভাবে একটা ডাল কেউ ভাঙতে পারে?

wapsip.com

—আপনার দেখবার চোখ তো অদ্ভুত! আমার তো মশাই চোখেই পড়তো না!

—আচ্ছা, দেখে বলুন তো, কত দিন আগে এ-ডালটা ভাঙা হয়েচে?

—অনেক দিন আগে।

—খুব বেশি দিন আগে না। মোচ্‌ড়ানো-অংশের গোড়াটা দেখে মনে হয়, ছ'সাতদিন আগে। এর চেয়েও নিখুঁতভাবে বলা যায়। ঐ অংশের সেলুলোজ অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করলে ধরা পড়বে। আমি এই গাছের ভাঙা-ডালটা কেটে নিয়ে যাবো, একটা দা আনুন তো দয়া করে?

গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের মুখ দেখে বুঝলাম সে বেশ একটু অবাক হয়েচে। ভাঙা-দাঁতনকাঠি নিয়ে আমার এত মাথাব্যথার কারণ কি বুঝতে পারচে না।

সে পিছন ফিরে দা আনতে যেতে উদ্যত হলো—কিন্তু দু'চার পা গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে ঘাসের মধ্যে থেকে কি একটা জিনিস হাতে তুলে নিয়ে বললে—এটা কি?

আমি তার হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে দেখলাম, সেটা একটা কাঠের ছোট্ট গোলাকৃতি পাত। ভালো করে আলোয় নিয়ে এসে পরীক্ষা করে দেখলাম, পাতের গায়ে একটা খোদাই কাজ। একটা ফুল, ফুলটার নিচে একটা শেয়ালের মত জানোয়ার।

শ্রীগোপাল বললে—এটা কি বলুন তো?

আমি বুঝতে পারলাম না, কি জিনিস এটা হতে পারে তাও আন্দাজ করতে পারলাম না। জিনিসটা হাতে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম। যাবার আগে সেওড়াগাছের ভাঙা ডালের গোড়াটা কেটে নিয়ে এলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন থানায় গিয়ে দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করে আমার পরিচয় দিলাম।

তিনি আমায় সমাদর করে বসালেন—আমায় বললেন, তাঁর দ্বারা যতদূর সাহায্য হওয়া সম্ভব তা তিনি করবেন।

আমি বললাম—আপনি এ-সম্বন্ধে কিছু তদন্ত করেচেন?

—তদন্ত করা শেষ করেচি। তবে, আসামী বার-করা ডিটেকটিভ ভিন্ন সম্ভব নয় এক্ষেত্রে।

—ননী ঘোষকে আমার সন্দেহ হয়।

—আমারও হয়, কিন্তু ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজ হবে না।

—ওকে চালান দিন না, ভয় খেয়ে যাক! খুনের রাত্রে ও অনুপস্থিত ছিল। কোথায় ছিল তার সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারে নি।

—আপনি ওকে চালান দিতে পরামর্শ দেন?

—দিলে ভালো হয়। এর মধ্যে আর-একটা উদ্দেশ্য আছে—বুঝেচেন নিশ্চয়ই।

দারোগাবাবু হেসে বললেন—এতদিন পুলিসের চাকরি করে তা আর বুঝিনি মশায়? ওকে চালান দিলে সত্যিকার হত্যাকারী কিছু অসতর্ক হয়ে পড়বে এবং যদি গা-ঢাকা দিয়ে থাকে, তবে বেরিয়ে আসবে—এই তো?

—ঠিক তাই—যদিও ননী ঘোষকে আমি বেশ সন্দেহ করি। লোকটা ধূর্ত-প্রকৃতির।

wapsip.com

—কাল আমি লোকজন নিয়ে গ্রামে গিয়ে ডেকে বলব—ননীকে কালই চালান দেবো।

—চালান দেওয়ার সময় গ্রামের সব লোকের সেখানে উপস্থিত থাকা দরকার।

দারোগাবাবু বললেন—দাঁড়ান, একটা কথা আছে। হিসেবের খাতার একখানা পাতা সেদিন কুড়িয়ে পেয়েছিলাম গাঙ্গুলিমশায়ের ঘরে। পাতাখানা একবার দেখুন।

একখানা হাতচিঠে-কাগজের পাতা নিয়ে এসে দারোগাবাবু আমার হাতে দিলেন।

আমি হাতে নিয়ে বললাম—এ তো ননীর হাতের লেখা নয়!

—না, এ গণেশের হাতের লেখাও নয়।

—সরফরাজ তরফদারও নয়। কারণ, সে মারা যাওয়ার পরে লেখা। তারিখ দেখুন।

—তবে, খুনের অনেকদিন আগে এ লেখা হয়েচে—চার মাসেরও বেশি আগে।

—ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়চে মশায়। আমি একটা জিনিস আপনাকে তবে দেখাই।

দারোগাবাবুর হাতে কাঠের পাতটা দিয়ে বললাম—এ-জিনিসটা দেখুন।

দারোগাবাবু সেটা হাতে নিয়ে বললেন—কি এটা?

—কি জিনিসটা তা ঠিক বলতে পারবো না। তবে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ির পেছনের জঙ্গলে এটা কুড়িয়ে পেয়েচি। আর-একটা জিনিস দেখুন।

ব'লে সেওড়াডালের গোড়াটা তাঁর হাতে দিতেই তিনি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—এ তো একটা শুকনো গাছের ডাল—এতে কি হবে?

—ওতেই একটা মস্ত সন্ধান দিয়েচে। জানেন? যে খুন করেচে, সে ভোর রাত পর্যন্ত গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি ছাড়ে নি। ভোরের দিকে রাত পোহাতে দেরি নেই দেখে সরে পড়েচে। যাবার সময় অভ্যাসের বশে সেওড়াডালের দাঁতন করেচে।

দারোগামশায় হো-হো করে হেসে উঠে বললেন—আপনারা যে দেখচি মশায়, স্বপ্নরাজ্যে বাস করেন! এত কল্পনা করে পুলিসের কাজ চলে? কোথায় একটা দাঁতনকাঠির ভাঙা গোড়া।!

—আমি জানি আমার গুরু মিঃ সোম একবার একটা ভাঙা দেশলাইয়ের কাঠিকে সূত্র ধরে আসামী পাকড়েছিলেন।

দারোগাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন—বেশ, আপনিও ধরুন না দাঁতনকাঠি থেকে, আমার আপত্তি কি?

—যদি আমি এটাকে এত প্রয়োজনীয় মনে না করতাম, তবে এটা এতদিন সঙ্গে নিয়ে বেড়াই? যে দুটো জিনিস পেয়েচি, তাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে—এও আমার বিশ্বাস।

—কি রকম?

—যে দাঁতনকাঠি ভেঙেচে—তার বা তাদের দলের লোকেরা এই কাঠের পাতখানাও!

—পাতখানা কি?

—সে-কথা পরে বলবো? আর-একটা সন্ধান দিয়েছে এই দাঁতনকাঠিটা।

—কি?

—সেটা এই: দোষীর বা দোষীর দলের কারও দাঁতন করবার অভ্যেস আছে। দাঁতন করবার যার প্রতিদিনের অভ্যেস নেই—সে এরকম দাঁতন নিপুণভাবে মোচড় দিয়ে ভাঙতে জানবে না। এবং সম্ভবত সে বাঙালী এবং পল্লীগ্রামবাসী। হিন্দুস্থানীরা দাঁতন করে, কিন্তু দেখবেন, তারা সেওড়াডালের দাঁতন করতে জানে না—তারা নিম, বা বাবলাগাছের দাঁতনকাঠি

wapsip.com

ব্যবহার করে সাধারণত। এ লোকটা বাঙালী এ-বিষয়ে ভুল নেই।

সেইদিনই আমি কলকাতায় মিঃ সোমের সঙ্গে দেখা করলাম। সেওড়াডালের গোড়াটা আমি তাঁকে দেখাই নি—কাঠের পাতটা তাঁর হাতে দিয়ে বললাম—এটা কি বলে আপনি মনে করেন?

তিনি জিনিসটা দেখে বললেন—এ তুমি কোথায় পেলে?

—সে-কথা আপনাকে এখন বলবো না, ক্ষমা করবেন।

—এটা আসামে মিস্‌মি-জাতির মধ্যে প্রচলিত রক্ষাকবচ। দেখবে? আমার কাছে আছে।

মিঃ সোমের বাড়িতে নানা দেশের অদ্ভুত জিনিসের একটা প্রাইভেট মিউজিয়াম-মত আছে। তিনি তাঁর সংগৃহীত দ্রব্যগুলির মধ্যে থেকে সেই রকম একটা কাঠের পাত এনে আমার হাতে দিলেন।

আমি বললাম—আপনারটা একটু বড়। কিন্তু চিহ্ন একই—ফুল আর শেয়াল।

—এটা ফুল নয়, নক্ষত্র—দেবতার প্রতীক, আর নিচে উপাসনাকারী মানুষের প্রতীক—পশু!

—কোন্ দেশের জিনিস বললেন?

—নাগা পর্বতের নানা স্থানে এ-কবচ প্রচলিত—বিশেষ করে ডিব্রু-সদিয়া অঞ্চলে।

আমি তাঁর হাত থেকে আমার পাতটা নিয়ে তারপর বললাম—এই সেওড়াডালটা ক'দিনের ভাঙা বলে মনে হয়?

তিনি বললেন—ভালো করে দেখে দেবো? আচ্ছা, বোসো।

সেটা নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে একটু পরে ফিরে এসে বললেন—আট ন'দিন আগে ভাঙা।

আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম নিজের বাসায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমার মনে একটা বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ়তর হয়ে উঠচে। গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করতে এবং খুনের পরে তাঁর ঘরের মধ্যে খুঁড়ে দেখতে খুনীর লেগেছিল সারারাত। যুক্তির দিক থেকে হয়তো এর অনেক দোষ বার করা যাবে—কিন্তু আমি অনেক সময় অনুমানের ওপর নির্ভর করে অগ্রসর হয়ে সত্যের সন্ধান পেয়েছি।

কিন্তু ননী ঘোষকে আমি এখনও রেহাই দিই নি। শ্যামপুরে ফিরেই আমি আবার তার সঙ্গে দেখা করলাম। আমায় দেখে ননীর মুখ শুকিয়ে গেল—তাও আমার চোখ এড়ালো না।

বললাম—শোনো ননী, আবার এলাম তোমায় জ্বালাতে—কতকগুলো কথা জিগ্যেস করবো।

—আজ্ঞে, বলুন!

—গাঙ্গুলিমশায় যেদিন খুন হন, সে-রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?

ননীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। বললে, আজ্ঞে···

—বলো কোথায় ছিলে। বাড়ি ছিলে না—

wapsip.com

—আজ্ঞে না। সামটায় শ্বশুরবাড়ি যেতে-যেতে সেদিন দেবনাথপুরের হাটতলায় রাত কাটাই।

—কেউ দেখেচে তোমায়?

—ননী বললে—আজ্ঞে, তা যদিও দেখে নি—

—কেন দেখে নি।

—রাত হয়ে গেল দেখে ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তখন কেউ সেখানে ছিল না।

—খেয়াঘাট পার হওনি দেবনাথপুরে?

—হ্যাঁ বাবু। অনেক লোক একসঙ্গে পার হয়েছিল। আমায় তো পাটনি চিনে রাখে নি!

—বাড়ি এসেছিলে কবে?

—শনিবার দুপুরবেলা।

—গাঙ্গুলিমশায় খুন হয়েচেন কার মুখে শুনলে?

—আজ্ঞে, গাঁয়ে ঢুকেই মাঠে কাপালিদের মুখে শুনি।

—কার মুখে শুনেছিলে তার নাম বলো।

—আজ্ঞে, ঠিক মনে হচ্ছে না, বোধ হয় হীরু কাপালি—

—তার কাছে গিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারবে?

ননী ইতস্তত করে বললে—আজ্ঞে, ঠিক তো মনে নেই; যদি হীরু না হয়?

ননীর কথায় আমার সন্দেহ আরও বেশি হলো। সে-রাত্রে ও ঘরে ছিল না, অথচ কোথায় ছিল তা পরিষ্কার প্রমাণও দিতে পারছে না। গোপনে সন্ধান নিয়ে আরও জানলাম, ননী সম্প্রতি কলকাতায় গিয়েছিল। আজ দু'দিন হলো এসেছে। ননীকে জিগ্যেস করে কোনো লাভ নেই, ও সত্যি কথা বলবে না। একটা কিছু কাণ্ড ও ঘটাচ্ছে নাকি তলে-তলে? কিছু বোঝা যাচ্চে না!

দু'দিন পরে শ্রীগোপাল এসে আমায় খবর দিলে, গ্রামের মহীন সেকরাকে সে ডেকে এনেচে—আমার সঙ্গে দেখা করবে, বিশেষ কাজ আছে।

মহীন সেকরার বয়স প্রায় পঞ্চাশের ওপর। নিতান্ত ভালোমানুষ গ্রাম্য-সেকরা, ঘোরপেঁচ জানে না বলেই মনে হলো।

শ্রীগোপালকে বললাম—একে কেন এনেচ?

—এ কি বলচে শুনুন।

—কি মহীন?

—বাবু, ননী ঘোষ আমার কাছে এগারো ভরি সোনার তাবিজ আর হার তৈরি করে নিয়েচে—আজ তিন-চারদিন আগে।

—দাম কত?

—সাতাশ টাকা করে ভরি, হিসেব করুন।

—টাকা নগদ দিয়েছিল?

—হ্যাঁ বাবু।

—সে টাকা তোমার কাছে আছে? নোট, না নগদ?

—নগদ। টাকা নেই বাবু, তাই নিয়ে মহাজনের ঘর থেকে সোনা কিনে এনে গহনা গড়ি!

—দু' একটা টাকাও নেই?

wapsip.com

—না বাবু।

—তোমার মহাজনের কাছে আছে?

—বাবু, রাণাঘাটের শীতল পোদ্দারের দোকানে কত সোনা কেনা-বেচা হচ্চে দিনে। আমার সে টাকা কি তারা বসিয়ে রেখেচে?

—শীতল পোদ্দার নাম? আমার সঙ্গে তুমি চলো রাণাঘাটে আজই।

বেলা তিনটের ট্রেনে মহীন সেকরাকে নিয়ে রাণাঘাটে শীতল পোদ্দারের দোকানে হাজির হলাম। সঙ্গে মহীনকে দেখে বুড়ো পোদ্দারমশায় ভাবলে, বড় খরিদ্দার একজন এনেচে মহীন। তাদের আদর-অর্ভ্যথনাকে উপেক্ষা করে আমি আসল কাজের কথা পাড়লাম, একটু কড়া—রুক্ষস্বরে।

বললাম—সেদিন এই মহীন আপনাদের ঘর থেকে সোনা কিনেছিল এগারো ভরি?

পোদ্দারের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো ভয়ে—ভাবলে, এ নিশ্চয়ই পুলিসের হাঙ্গামা! সে ভয়ে-ভয়ে বললে—হ্যাঁ বাবু, কিনেছিল।

—টাকা নগদ দেয়?

—তা দিয়েছিল।

—সে টাকা আছে?

—না বাবু, টাকা কখনো থাকে? আমাদের বড় কারবার, কোথাকার টাকা কোথায় গিয়েচে!

আমিও ওকে ভয় দেখানোর জন্যে কড়া সুরে বললাম—ঠিক কথা বলো। টাকা যদি থাকে আনিয়ে দাও—তোমার ভয় নেই! চুরির ব্যাপারে নয়, মহীনের কোনো দোষ নেই। তোমাদের কোনো পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হবে না—কেবল কোর্টে সাক্ষী দিতে হতে পারে। টাকা বার করো।

মহীনও বললে—পোদ্দারমশায়, আমাদের কোনো ভয় নেই, বাবু বলেচেন। টাকা যদি থাকে, দেখান বাবুকে।

পোদ্দার বললে—কিন্তু বাবু, একটা কথা। টাকা তো সব সমান, টাকার গায়ে কি নাম লেখা আছে?

—সে-কথায় তোমার দরকার নেই। নাম লেখা থাক্‌ না থাক্—টাকা তুমি বার করো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শীতল পোদ্দার টাকা বার করে নিয়ে এল একটা থলির মধ্যে থেকে। বললে—সেদিনকার তহবিল আলাদা করা ছিল। সোনা বিক্রির তহবিল আমাদের আলাদা থাকে, কারণ, এই নিয়ে মহাজনের সোনা কিনতে যেতে হয়। টাকা হাতে নিয়ে দেখবার আগেই শীতল একটা কথা বললে—যা আমার কাছে আশ্চর্য বলে মনে হলো। সে বললে—বাবু, এগুলো পুরোনো টাকা, পোঁতা-টোতা ছিল ব'লে মনে হয়, এ চুরির টাকা নয়।

আমি প্রায় চমকে উঠলাম ওর কথা শুনে! মহীন সেকরার মুখ দেখে বিবর্ণ হয়ে উঠেচে।

wapsip.com

আমি বললাম—তুমি কি করে জানলে এ পুরোনো টাকা?

—দেখুন আপনিও হাতে নিয়ে! পুরোনো কলঙ্ক-ধরা রুপো দেখলে আমাদের চোখে কি চিনতে বাকি থাকে বাবু। এই নিয়ে কারবার করচি যখন!

—কতদিনের পুরোনো টাকা এ?

—বিশ-পঁচিশ বছরের।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, বিশ বৎসরের পরের কোনো সালের অঙ্ক টাকার গায়ে লেখা নেই। বললাম—মাটিতে পোঁতা টাকা বলে ঠিক মনে হচ্চে?

—নিশ্চয়ই বাবু। পেতলের হাঁড়িতে পোঁতা ছিল। পেতলের কলঙ্ক লেগেচে টাকার গায়ে।

—আচ্ছা, তুমি এ-টাকা আলাদা করে রেখে দাও। আমি পুলিস নই, কিন্তু পুলিস শীগগির এসে এ-টাকা চাইবে মনে থাকে যেন।

শীতল পোদ্দার আমার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে অনুনয়ের সুরে বললে—দোহাই বাবু, দেখবেন, যেন আমি এর মধ্যে জড়িয়ে না পড়ি। কোনো দোষে দুষী নই বাবু, মহীন আমার পুরোনো খাতক আর খদ্দের, ও কোথা থেকে টাকা এনেচে তা কেমন করে জানবো বাবু, বলুন?

মহীনকে নিয়ে দোকানের বাইরে চলে এলাম। দেখি, ও ভয়ে কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠেচে। বললাম—কি মহীন তোমার ভয় কি? তুমি গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করো নি তো?

মহীন বললে—খুন? গাঙ্গুলিমশায়কে? কি যে বলেন বাবু?

দেখলাম ওর সর্বশরীর যেন থরথর করে কাঁপচে।

কেন, ওর এত ভয় হলো কিসের জন্যে?

আমরা ডিটেকটিভ, আসামী ধরতে বেরিয়ে কাউকে সাধু বলে ভাবা আমাদের স্বভাব নয়। মিঃ সোম আমার শিক্ষাগুরু—তাঁর একটি মূল্যবান উপদেশ হচ্ছে, যে-বাড়িতে খুন হয়েচে বা চুরি হয়েচে—সে বাড়ির প্রত্যেককেই ভাববে খুনী ও চোর। প্রত্যেককে সন্দেহের চোখে দেখবে, তবে খুনের কিনারা করতে পারবে—নতুবা পদে-পদে ঠকতে হবে।

ননী ঘোষ তো আছেই এর মধ্যে, এ-সন্দেহ আমার এখন বদ্ধমূল হলো। বিশেষ করে টাকা দেখবার পরে আদৌ সে-সন্দেহ না থাকবারই কথা।

কিন্তু এখন আবার একটা নতুন সন্দেহ এসে উপস্থিত হলো।

এই মহীন সেকরার সঙ্গে খুনের কি কোনো সম্পর্ক আছে?

কথাটা ট্রেনে বসে ভাবলাম। মহীনও কামরার একপাশে বসে আছে। সে আমার সঙ্গে একটা কথাও বলে নি—জানলা দিয়ে পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে ভীত চোখে বাইরের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মহীনের যোগাযোগে ননী ঘোষ খুন করে নি তো? দুজনে মিলে হয়তো এ-কাজ করেচে। কিংবা এমনও কি হতে পারে না যে, মহীনই খুন করেচে, ননী ঘোষ নির্দোষী?

তবে একটা কথা, ননী ঘোষের হাতেই খাতাপত্র—কত টাকা আসচে-যাচ্চে, ননীই তো জানতো, মহীন সেকরা সে খবর কি করে রাখবে!...

তখুনি একটা কথা মনে পড়লো। গাঙ্গুলিমশায় ছিলেন সরলপ্রাণ লোক, যেখানে-সেখানে নিজের টাকা-কড়ির গল্প করে বেড়াতেন, সবাই জানে।

মহীনকে বললাম—তোমার দোকানে অনেকে বেড়াতে যায়, না?

wapsip.com

মহীন যেন চমকে উঠে বললে—হ্যাঁ বাবু।

—গাঙ্গুলিমশায়ও যেতেন?

—তা যেতেন বইকি বাবু।

—গিয়ে গল্প-টল্প করতেন?

—তা করতেন বইকি বাবু!

—টাকাকড়ির কথা কখনো বলতেন তোমার দোকানে বসে?

—সেটা তো তাঁর স্বভাব ছিল—সে-কথাও বলতেন মাঝে মাঝে।

—ননী ঘোষের সঙ্গে তোমার খুব মাখামাখি ভাব ছিল?

—আমার দোকানে আসতো গহনা গড়াতে। আমার খদ্দের। এ থেকে যা আলাপ—তাছাড়া সে আমার গাঁয়ের লোক। খুব মাখামাখি ভাব আর এমন কি থাকবে? যেমন থাকে।

—তুমি আর ননী দুজনে মিলে গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করে টাকা ভাগাভাগি করে নিয়েচো—কেমন কি না?

এই প্রশ্ন করেই আমি ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলাম। ভয়ের রেখা ফুটে উঠলো ওর মুখে! ও আমার মুখের দিকে বড়-বড় চোখ করে বললে—কি যে বলেন বাবু! আমি বেহ্মহত্যার পাতক হবো টাকার জন্যে! দোহাই ধর্ম, আপনাকে সত্যিকথা বলছি বাবু!

কিছু বুঝতে পারা গেল না। কেউ-কেউ থাকে, নিপুণ ধরনের স্বাভাবিক অভিনেতা। তাদের কথাবার্তা, হাবভাবে বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়—এ আমি কতবার দেখেচি।

শ্যামপুরে ফিরে আমি গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে শ্রীগোপালের সঙ্গে দেখা করলাম। শ্রীগোপাল বললে—থানা থেকে দারোগাবাবু আর ইনস্পেক্টরবাবু এসেছিলেন। আপনাকে খুঁজছিলেন।

—তুমি গহনার কথা কিছু বললে নাকি তাঁদের?

—না। আমি কেন সে-কথা বলতে যাবো। আমাকে কোন কথা তো বলে দেন নি?

—বেশ করেচো।

—ওঁরা আপনার সেই কাঠের তক্তামত-জিনিসটা দেখতে চাইছিলেন।

—কেন?

—সে কথা কিছু বলেননি।

—তাঁরা ও দেখে কিছু করতে পারেন, আমি তাঁদের দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাঁরা পারবেন বলে আমার ধারণা নেই।

বিকেলের দিকে আমি নির্জনে বসে অনেকক্ষণ ভাবলাম।···আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিস্‌মিজাতির কাষ্ঠনির্মিত রক্ষাকবচের সঙ্গে এই খুনীর যোগ আছে। সেই রক্ষাকবচ প্রাপ্তি এমন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে, আমার কাছে সেটা রীতিমত সমস্যা হয়ে উঠচে ক্রমশ।

ননী ঘোষের সঙ্গেও এর সম্পর্ক এমন নিবিড় হয়ে উঠেচে, যেটা আর কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। শীতল পোদ্দারের দোকানের টাকার কথা যদি পুলিসকে বলি, তবে তারা এখুনি ননীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু সে-দিক থেকে মস্ত বাধা হচ্ছে, সে-টাকা যে ননী ঘোষ দিয়েছিল মহীনকে, তার প্রমাণ কি?

মহীনের কথার উপর নির্ভর করা ছাড়া এক্ষেত্রে অন্য কোনো প্রমাণ নেই!

শীতল পোদ্দারও তো ভুল করতে পারে!

wapsip.com

হয়তো এমনও হতে পারে, মহীন সেকরাই আসল খুনী। তার দোকানে বসে গাঙ্গুলিমশায় কখনো টাকার গল্প করে থাকবেন—তারপর সুবিধে পেয়ে মহীন গাঙ্গুলিমশায়কে খুন করেচে, পোঁতা-টাকা পোদ্দারের দোকানে চালিয়ে এখন ননীর ওপর দোষ চাপাচ্ছে···

ননী ঘোষের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় দেখা করলাম।

ওকে দেখেই কিন্তু আমার মনে কেমন সন্দেহ হলো, লোকটার মধ্যে কোথায় কি গলদ আছে, ও খুব সাচ্চা লোক নয়। আমাকে দেখে প্রতিবারই ও কেমন হয়ে যায়।

লোকটা ধূর্তও বটে। ওর চোখ-মুখের ভাবেও সেটা বোঝা যায় বেশ।

ওকে জিগ্যেস করলাম—তুমি মহীনের দোকান থেকে তাবিজ গড়িয়েছ সম্প্রতি?

ননী বিবর্ণমুখে আমার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ—তা—হ্যাঁ বাবু—

—অত টাকা হঠাৎ পেলে কোথায়?

—হঠাৎ কেন বাবু! আমরা তিনপুরুষে ঘি-মাখনের ব্যবসা করি। টাকা হাতে ছিল, তা ভাবলাম, নগদ টাকা পাড়াগাঁয়ে রাখা—

— টাকা নগদ দিয়েছিলে, না, নোটে?

— নগদ।

— সব টাকা তোমার ঘি-মাখন বিক্রির টাকা?

—হ্যাঁ বাবু।

ননীকে ছেড়ে দিয়ে গ্রামের মধ্যে বেড়াতে বেরুলাম। ননী অত্যন্ত ধূর্ত লোক, ওর কাছ থেকে কথা বার করা চলবে না দেখা যাচ্চে।

বেড়াতে-বেড়াতে গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ির কাছে গিয়ে পড়েছি, এমন সময় দেখি কে একজন ভদ্রলোক গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে শ্রীগোপালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইচেন।

আমাকে দেখে শ্রীগোপাল বললে—এই যে! আসুন, চা খাবেন।

— না, এখন খাবো না। ব্যস্ত আছি।

—আসুন, আলাপ করিয়ে দিই···ইনি সুশীল রায়, আর ইনি জানকীনাথ বড়ুয়া, আমাদের পাড়ার জামাই—আমার বাড়ির পাশের ওই বুড়ি-দিদিমার জামাই। উনিও একটু—একটু— মানে—ওঁকে সব বলেছিলাম।

আমি বুঝলাম, জানকী বড়ুয়া আর যাই হোক, সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। মনটা হঠাৎ যেন বিরূপ হয়ে উঠলো শ্রীগোপালের প্রতি। সে আমার ওপর এরই মধ্যে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, এবং কোথা থেকে আর-একজন গোয়েন্দা আমদানি করে তাকে সব ঘটনা খুলে বলছিল, আমাকে আসতে দেখে থেমে গিয়েচে।

আমি জানকীবাবুকে বললাম—আপনি কি বুঝচেন?

—কি সম্বন্ধে?

—খুন সম্বন্ধে।

— কিছুই না। তবে আমার মনে হয়—

— কি, বলুন?

—এখানকার লোকেই খুন করেচে।

—আপনি বলছেন— এই গাঁয়ের লোক?

— এই গাঁয়ের জানাশোনা লোক ভিন্ন এ-কাজ হয় নি। ননী ঘোষের সম্বন্ধে আপনার

wapsip.com

মনে কি হয়?

আমি বিস্মিতভাবে জানকীবাবুর মুখের দিকে চাইলাম! তাহলে শ্রীগোপাল দেখচি ননী ঘোষের কথাও এই ভদ্রলোকের কাছে বলেচে! ভারি রাগ হলো শ্রীগোপালের ব্যবহারে।

আমার ওপর তাহলে আদৌ আস্থা নেই ওর দেখচি।

একবার মনে হলো, জানকীবাবুর কথার কোনো উত্তর আমি দেবো না। অবশেষে ভদ্রতা-বোধেরই জয় হলো। বললাম—ননী ঘোষের কথা আপনাকে কে বললে?

— কেন, শ্রীগোপালের মুখে সব শুনেচি।

— আপনি তাকে সন্দেহ করেন?

—খুব করি! তার সঙ্গে এখুনি দেখা করা দরকার। তার হাতেই যখন টাকার হিসেব লেখা হতো···

—দেখুন না, ভালোই তো।

হঠাৎ আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে জানকীবাবু বলেন— আচ্ছা, আপনি ঘটনাস্থলে ভালো করে খুঁজেছিলেন?

—খুঁজেছিলাম বইকি।

— কিছু পেয়েছিলেন?

আমি জানকীবাবুর এ-প্রশ্নে দস্তুরমত বিস্মিত হলাম। যদি তিনি নিজেও একজন গোয়েন্দা হন, তবে তাঁর পক্ষে অন্য-একজন সমব্যবসায়ী লোককে এ-কথা জিগ্যেস করা শোভনতা ও সৌজন্যের বিরুদ্ধে, বিশেষত যখন আগে-থেকেই এ ব্যাপারের অনুসন্ধানে আমি নিযুক্ত আছি।

আমি নিস্পৃহভাবে উত্তর দিলাম— না, এমন বিশেষ কিছু না।

জানকীবাবু পুনরায় জিগ্যেস করলেন—তাহলে কিছুই পান নি?

— কিছুই না তেমন।

কাঠের পাতের কথাটা জানকীবাবুকে বলবার আমার ইচ্ছে হলো না। জানকীবাবুকে বলে কি হবে? তিনি কি বুঝতে পারবেন জিনিসটা আসলে কি? মিঃ সোমের সাহায্য ব্যতীত কি আমারই বোঝার কোনো সাধ্য ছিল? মিঃ সোমের মত পণ্ডিত ও বিচক্ষণ গোয়েন্দা খুব বেশি নেই এদেশে, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

জানকীবাবু চলে গেলে আমি শ্রীগোপালকে বললাম—তুমি একে কি বলেছিলে?

—কি বলবো!

—ননী ঘোষের কথা বলেচো?

—হ্যাঁ, তা বলেছি।

আমি ওকে তিরস্কারের সুরে বললাম—আমাকে তোমার বিশ্বাস না হতে পারে—তা বলে আমার আবিষ্কৃত ঘটনা-সূত্রগুলো তোমার অন্য ডিটেকটিভকে দেওয়ার কি অধিকার আছে?

শ্রীগোপাল চুপ করে রইলো। ওর নির্বুদ্ধিতায় ও অবিবেচকতায় আমি যারপরনাই বিরক্তি বোধ করলাম।

wapsip.com

নবম পরিচ্ছেদ

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি মহীন সেকরার সঙ্গে আবার দেখা করতে গেলাম। মহীন আমায় দেখে ভয়ে-ভয়ে একটা টুল পেতে দিল বসবার জন্যে।

আমি বললাম— মহীন, একটা সত্যি কথা বলবে?

—কি, বলুন!

—তোমার সঙ্গে ননীর ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল কিছুকাল আগে?

মহীন আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললে— ননী বলেচে বুঝি? সব মিথ্যে কথা ওর বাবু, সব মিথ্যে।

আমি কড়াসুড়ে বললাম—ঝগড়া হয়েছিল তাহলে? সত্যি বলো!

মহীন চুপ করে রইল অনেকক্ষণ, তারপর আস্তে-আস্তে বললে—হয়েছিল বাবু, কিন্তু আমার তাতে কোনো দোষ···

—আমি সে-কথা বলি নি—ঝগড়া হয়েছিল কিনা জিগ্যেস করচি।

— হ্যাঁ বাবু।

— কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল, বলো এবার!

—সোনার দর নিয়ে বাবু।

—আচ্ছা, তুমি শ্রীগোপালের কাছে ননী ঘোষের তাবিজ গড়ানোর কথা এইজন্যে বলেছিলে—কেমন, ঠিক কিনা?

—হ্যাঁ বাবু।

—তুমি তখন ভেবেছিল যে, ননী ঘোষই খুন করেচে?

— তা— না—

—ঠিক বলো।

—না বাবু।

—তাহলে তুমিও যে দোষী হবে আইনত; তাই ভাবচো বুঝি?

মহীন সেকরা ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো, বললে— বাবু, তা— তা—

—তোমাকে গ্রেপ্তারের জন্যে থানায় খবর দেবো!

মহীন আমার পা জড়িয়ে ধরে বললে—দোহাই বাবু, আমার সব কথা শুনুন আগে। আপনি দেশের লোক—আমার সর্বনাশ করবেন না বাবু—কাচ্চা-বাচ্চা মারা যাবে।

— কি, বলো!

—তখন আমিও লুটের টাকা বলে সন্দেহ করিনি। কি করে করবো!' বলুন বাবু, তা কি সম্ভব?

—তবে, কখন সন্দেহ করলে?

—বাবু, শ্রীগোপালই আমায় বললে, আপনি ননী ঘোষকে সন্দেহ করেন। তখন আমি ভাবলাম, গহনার কথাটা প্রমাণ না করলে আমি মারা যাবো এর পরে। তাই বলেছিলাম।

শ্রীগোপালের নির্বুদ্ধিতা দেখচি নানা দিক থেকে প্রকাশ পাচ্চে। যদি ওর বাবার খুনের আসামী ধরা না পড়ে, তবে সেটা ওর নির্বুদ্ধিতার জন্যেই ঘটবে।

wapsip.com

দশম পরিচ্ছেদ

কথাটা শ্রীগোপালকে বলবার জন্যে তার বাড়ির দিকে চললাম।

রাস্তাটা বাড়ির পেছনের দিকে—শীগগির হবে বলে 'শর্ট-কার্ট' করে গেলাম বনের মধ্যে দিয়ে। সেই বন—যেখানে আমি সেদিন মিস্‌মি-জাতির কবচ ও দাঁতনকাঠির গোড়া সংগ্রহ করে ছিলাম।

অন্ধকারেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা সাদা-মত কি কিছুদূরে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। জিনিসটা নড়চে-চড়চে আবার। অন্ধকারের জন্যে ভয় যেন বুকের রক্ত হিম করে দিলে।

এই বনের পরেই গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ি—গাঙ্গলিমশায়ের ভূত নাকি রে বাবা!

হঠাৎ একটা টর্চ জ্বলে উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে কে কড়া-গলায় হাঁকলে, কে ওখানে?

—আমিও তো তাই জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম—কে আপনি?

—ও।

আমার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো একটা মনুষ্যমূর্তি এবং টর্চের আলো-আঁধার কেটে গেলে দেখলাম, সে জানকীবাবু ডিটেকটিভ!

বিস্ময়ের সুরে বললাম—আপনি কি করছিলেন অন্ধকারে বনের মধ্যে?

জানকীবাবু অপ্রতিভ সুরে বললেন—আমি এই—এই—

—ও, বুঝেচি। কিছু মনে করবেন না। হঠাৎ এসে পড়েছিলাম এখানে।

—না না, কিছু না।

তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলি এগিয়ে। ভদ্রলোক শুধু অপ্রতিভ নয়, যেন হঠাৎ ভীত ও ত্রস্তও হয়ে পড়েচেন। কি মুশকিল! এসব পাড়াগাঁয়ে শহরের মত বাথরুমের বন্দোবস্ত না থাকাতে সত্যিই অনেকের বড়ই অসুবিধে হয়।

জানকী বড়ুয়া প্রাইভেট-ডিটেকটিভকে এই অন্ধকারে গাঙ্গুলিমশায়ের ভূত বলে মনে হয়েছিল ভেবে আমার খুব হাসি পেলো। ভদ্রলোককে কি বিপন্নই করে তুলেছিলাম!

সেদিন সন্ধ্যার পরে শ্রীগোপালের বাড়ি বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় জানকীবাবু আমার পাশে এসে বসলেন। তাঁকেও চা দেওয়া হলো। জানকীবাবু দেখলাম বেশ মজলিসি লোক, চা খেতে-খেতে তিনি নানা মজার-মজার গল্প বলতে লাগলেন। আমায় বললেন—আমি তো মশায় গাঁয়ের জামাই, আজ চোদ্দ বছর বিয়ে করেচি, কাকে না চিনি বলুন গ্রামে, সকলেই আমার আত্মীয়।

আমি বললাম—আপনি এখানে প্রায়ই যাতায়াত করেন? তাহলে তো হবেই আত্মীয়তা!

—আমার স্ত্রী মারা গিয়েচে আজ বছর তিনেক। তারপর আমি প্রায়ই আসি না। তবে শাশুড়িঠাকরুন বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন, আমার আসার জন্যে চিঠি লেখেন, না এসে পারিনে।

—ছেলেপুলে কি আপনার?

— একটি ছেলে হয়েছিল, মারা গিয়েচে। এখন আর কিছুই নেই।

—ও।

wapsip.com

হঠাৎ জানকীবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে আমায় জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা, গাঙ্গুলিমশায়ের খুন সম্বন্ধে পুলিস কোনো সূত্র পেয়েচে বলে আপনার মনে হয়?

— কেন বলুন তো?

— আমার বিশেষ কৌতূহল এ-সম্বন্ধে। গাঙ্গুলিমশায় আমার শ্বশুরের সমান ছিলেন। বড় স্নেহ করতেন আমায়। তাঁর খুনের ব্যাপারের একটা কিনারা না হওয়া পর্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই। আমার মনে কোনো অহঙ্কার নেই মশায়। আমি এ খুনের কিনারা করি, বা আপনি করুন, বা পুলিসই করুক, আমার পক্ষে সব সমান। যার দ্বারা হোক কাজ হলেই হলো । নাম আমি চাইনে।

—নাম কে চায় বলুন? আমিও নয়।

—তবে আসুন-না আমরা মিলে-মিশে কাজ করি? পুলিশকেও বলুন।

—পুলিশ তো খুব রাজী, তারা তো এতে খুব খুশি হবে।

— বেশ, তবে কাল থেকে—

—আমার কোনো আপত্তি নেই।

—আচ্ছা, প্রথম কথা—আপনি কোনো কিছু সূত্র পেয়েচেন কিনা আমায় বলুন। আমি যা পেয়েচি আপনাকে বলি।

—আমি এখানে এখন বলবো না। পরে আপনাকে জানাবো।

—ননী ঘোষের ব্যাপারটা আপনি কি মনে করেন?

—সেদিন তো আপনাকে বলেচি। ওকে আমার সন্দেহ হয়। আপনি ওকে সন্দেহ করেন?

—নিশ্চয় করি।

—আপনি ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পেয়েচেন?

—সেই গহনা ব্যাপারটাই তো ওর বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড় প্রমাণ।

— তা আমারও মনে হয়েচে, কিন্তু ওর মধ্যে গোলমালও যথেষ্ট।

—মহীন সেকরাকে নিয়ে তো? আমি মহীনকে সন্দেহ করিনে।

— কেন বলুন তো?

— মহীন তো খাতা লিখতো না গাঙ্গুলিমশায়ের। ভেবে দেখুন কথাটা।

—সে-সব আমিও ভেবেচি। তাতেও জিনিসটা পরিষ্কার হয় না।

—চলুন না, দুজনে একবার ননীর কাছে যাই।

—তার কাছে আমি গিয়েছিলাম। তাতে কোন ফল হবে না।

— হিসাবের খাতাখানা কোথায়?

—পুলিসের জিম্মায়।

— আপনি ভালো করে দেখেচেন খাতাখানা?

—দেখেচি বলেই তো ননীকে জড়াতে পারিনে ভালো করে।

—কেন?

—শুধু ননীর হাতের লেখা নয়, আরও অনেকের হাতের লেখা তাতে আছে।

—কার কার?

জানকীবাবু ব্যগ্রভাবে এ-প্রশ্নটা করে আমার মুখের দিকে যেন উৎকণ্ঠিত-আগ্রহে উত্তরের প্রতীক্ষায় চেয়ে রইলেন। আমি মৃত-মুসলমান ভদ্রলোকটির ও স্কুলের ছাত্রটির কথা

wapsip.com

তাঁকে বললাম। জানকীবাবু বললেন—ও, এই! সে তো আমি জানি—শ্রীগোপালের মুখে শুনেচি।

—যা শুনেচেন, তার বেশি আমারও কিছু বলবার নেই।

পরদিন সকালে ননী ঘোষ এসে আমার কাছে হাজির হলো। বললে—বাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

— কি?

—জানকীবাবু এ-গাঁয়ের জামাই বলে খাতির করি। কিন্তু উনি কাল রাতে আমায় যে-রকম গালমন্দ দিয়ে এসেচেন, তাতে আমি বড় দুঃখিত। বাবু, যদি দোষ করে থাকি, পুলিসে দিন—গালমন্দ কেন?

—তুমি বড় চালাক লোক ননী। আমি সব বুঝি। পুলিসে দেবার হলে, তোমাকে একদিনও হাজতের বাইরে রাখবো ভেবেচো।

— বাবুও কি আমাকে এখনও সন্দেহ করেন?

লোকটা সাংঘাতিক ধূর্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ-খুন যেই করুক, ননী তার মধ্যে নিশ্চয়ই জড়িত। অথচ ও ভেবেচে যে, আমার চোখে ধুলো দেবে!

বললাম—সে-কথা এখন নয়। এক মাসের মধ্যেই জানতে পারবে।

— বাবু, আপনি আমাকে যতই সন্দেহ করুন, ধর্ম যতদিন মাথার উপর আছে—

ধূর্ত লোকেরাই ধর্মের দোহাই পাড়ে বেশি! লোকটার উপর সন্দেহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

সারাদিন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

সন্ধ্যার পরে আহারাদি সেরে অনেকক্ষণ বই পড়লাম! তারপর আলো নিবিয়ে দিয়ে নিদ্রা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কেন জানি না—অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হলো না এবং বোধহয় সেইজন্যই সেই রাতে আমার প্রাণ বেঁচে গেল।

ব্যাপারটা কি হলো খুলে বলি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেও এক কৃষ্ণপক্ষের গভীর অন্ধকার রাত্রি। মাঝে-মাঝে বৃষ্টি পড়চে আবার থেমে যাচ্চে, অথচ গুমট কাটেনি। আমার ঘরটার উত্তরদিকে একটা মাত্র কাঠের গরাদে দেওয়া জানলা, জানলার সামনাসামনি দরজা। পশ্চিমদিকের দেওয়ালে জানলা নেই—একটা ঘুলঘুলি আছে মাত্র।

রাত প্রায় একটা কি তার বেশি। আমার ঘুম আসে নি, তবে সামান্য একটু তন্দ্রার ভাব এসেচে।

হঠাৎ বাইরে ঘুলঘুলির ঠিক নিচেই যেন কার পায়ের শব্দ শোনা গেল! গরু কি ছাগলের পায়ের শব্দ হওয়া বিচিত্র নয়— বিশেষ গ্রাহ্য করলাম না।

তারপর শব্দটা সেদিক থেকে আমার শিয়রের জানলার কাছে এসে থামলো। তখনও আমি ভাবচি, ওটা গরুর পায়ের শব্দ। এমন সময় আমার বিস্মিত-দৃষ্টির সামনে দিয়ে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে কার একটা সুদীর্ঘ হাত একেবারে আমার বুকের কাছে—ঠিক বুকের ওপর

wapsip.com

এসে পৌঁছলো—হাতে ধারালো একখানা সোজা-ছোরা, অন্ধকারেও যেন ঝকঝক করচে!

ততক্ষণে আমার বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত কেটে গিয়েচে।

আমি তাড়াতাড়ি পাশমোড়া দিয়ে ছোরা-সমেত হাতখানা ধরতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য একটা বাঁশের লাঠিকে চেপে ধরলাম।

পরক্ষণেই কে এক জোর ঝটকায় লাঠিখানা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে। সঙ্গে-সঙ্গে ছোরার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের আঘাতে আমার হাতের কব্জি ও বুকের খানিকটা চিরে রক্তারক্তি হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে টর্চ জ্বেলে দেখি, বিছানা রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েচে। তখুনি নেকড়া ছিঁড়ে হাতে জলপটি বেঁধে লণ্ঠন জ্বাললাম।

লাঠির অগ্রভাগে তীক্ষ্ণাস্ত্র ছোরা বাঁধা ছিল—আমার বুক লক্ষ্য করে ঠিক কুড়ুলের কাপের ধরনে লাঠি উঁচিয়ে কোপ মারলেই ছোরা পিঠের ওদিক দিকে ফুঁড়ে বেরুতো। তারপর বাঁধন আল্‌গা করে ছোরাখানা আমার বিছানার পাশে কিংবা আমার ওপর ফেলে রাখলেই আমি যে আত্মহত্যা করেচি, এ-কথা বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অন্য লোককে ভুল করে বোঝানো চলতো।

আমি নিরস্ত্র ছিলাম না—মিঃ সোমের ছাত্র আমি। আমার বালিশের তলায় ছ'নলা অটোমেটিক ওয়েবলি লুকোনো। সেটা হাতে করে তখুনি বাইরে এসে টর্চ ধরে ঘরের সর্বত্র খুঁজলাম—জানালার কাছে জুতো-সুদ্ধ টাটকা পায়ের দাগ!

ভালো করে টর্চ ফেলে দেখলাম।

কি জুতো? ...রবার-সোল, না, চামড়া? ...অন্ধকারে ভালো বোঝা গেল না।

এখুনি এই জুতোর সোলের একটা ছাঁচ নেওয়া দরকার। কিন্তু তার কোনো উপকরণ দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ আমার কাছে নেই।

আমার মনে কেমন ভয় করতে লাগলো, আকাশের দিকে চাইলাম। কৃষ্ণপক্ষের ঘোর মেঘান্ধকার রজনী।

এমনি রাত্রে ঠিক গত কৃষ্ণপক্ষেই গাঙ্গুলিমশায় খুন হয়েছিলেন।

আমি শ্রীগোপালের বাড়ি গিয়ে ডাকলাম—শ্রীগোপাল, শ্রীগোপাল, ওঠো— ওঠো!

শ্রীগোপাল জড়িত-কণ্ঠে উত্তর দিলে—কে?

— বাইরে এসো— আলো নিয়ে এসো—সব বলচি।

শ্রীগোপাল একটা কেরোসিনের টেমি জ্বালিয়ে চোখ মুছতে-মুছতে বিস্মিতমুখে বার হয়ে এসে বললে—কে? ও, আপনি? এত রাত্রে কি মনে করে?

—চলো বসি—সব বলচি। এক গ্লাস জল খাওয়াও তো দেখি!

—চা খাবেন? স্টোভ আছে। চা-খোর আমি, সব মজুত রাখি—করে দিই।

চা খেয়ে আমি আর বসতে পারচি না। ঘুমে যেন চোখ ঢুলে আসচে! শ্রীগোপাল বললে—বাকি রাতটুকু আমার এখানেই শুয়ে কাটিয়ে দেবেন-এখন।

ব্যাপার সব শুনে শ্রীগোপাল বললে—এর মধ্যে ননী আচে বলে মনে হয়। এ তারই কাজ।

—না।

—না? বলেন কি?

—না, এ ননীর কাজ নয়।

wapsip.com

— কি করে জানলেন?

—এখানকার লোক ছোরার ব্যবহার জানে না—বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে ছোরার ব্যবহার নেই।

—তবে?

— এ-কাজ যে করেচে সে বাংলার বাইরে থাকে। তুমি কাউকে রাতের কথা বোলো না কিন্তু!

—আপনাকে খুন করতে আসার উদ্দেশ্য?

— আমি দোষী খুঁজে বার করবার কাজে পুলিসকে সাহায্য করচি—এছাড়া আর অন্য কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

ভোর হলো। আমি উঠে আমার ঘরে চলে গেলাম।

জানলার বাইরে সেই পায়ের দাগ তেমনি রয়েচে। রবার-সোলের জুতো বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে। ক'নম্বরের জুতো তাও জানা গেল।

বিকেলে আমি ভাবলাম, একবার মামার বাড়ি যাবো। এ-গ্রামে ডাক্তার নেই ভালো—মামার বাড়ি গিয়ে আমার ক্ষতস্থানটা দেখিয়ে ওষুধ দিয়ে নিয়ে আসবো। ঘরের মধ্যে জামা গায়ে দিতে গিয়ে মনে হলো—আমার ঘরের মধ্যে কে যেন ঢুকেছিল।

কিছুই থাকে না ঘরে। একটা ছোট চামড়ার সুটকেস—তাতে খানকতক কাপড়-জামা। কে ঘরের মধ্যে ঢুকে সুটকেসটা মেজেতে ফেলে তার মধ্যে হাতড়ে কি খুঁজেচে—কাপড়-জামা, বা, একটা মনিব্যাগে গোটা-দুই টাকা ছিল যেগুলো ছোঁয়নি। বালিশের তলা—এমন কি, তোশকটার তলা পর্যন্ত খুঁজেচে।

আমি প্রথমটা ভাবলাম, এ কোনো ছিঁচকে-চোরের কাজ। কিন্তু চোর টাকা নেয় নি—তবে কি, রিভলভারটা চুরি করতে এসেছিল? সেটা আমার পকেটেই আছে অবিশ্যি—সে উদ্দেশ্য থাকা বিচিত্র নয়।

জানকীবাবুকে ডেকে সব কথা বললাম। জানকীবাবু শুনে বললেন—চলুন, জায়গাটা একবার দেখে আসি।

ঘরে ঢুকে আমরা সব দিক ভালো করে খুঁজে দেখলাম। সব ঠিক আছে। জানকীবাবু আমার চেয়েও ভালো করে খুঁজলেন, তিনিও কিছু বুঝতে পেরেচেন বলে মনে হলো না।

বললাম—দেখলেন তো?

— টাকাকাড়ি কিছু যায় নি?

—কিছু না।

—আর কোনো জিনিস আপনার ঘরে ছিল?

— কি জিনিস?

— অন্য কোনো দরকারি—ইয়ে— মানে—মূল্যবান?

— এখানে মূল্যবান জিনিস কি থাকবে?

—তাই তো!

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়লো। মিস্‌মিদের সেই কবচ আর দাঁতনকাঠির টুকরোটা আমি এই ঘরে কাল পর্যন্ত রেখেছিলাম, কিন্তু কাল কি মনে করে শ্রীগোপালের বাড়ি যাবার সময় সে জিনিস দুটি আমি পকেটে করে নিয়ে গিয়েছিলাম—এখনও পর্যন্ত সে দুটি

wapsip.com

আমার পকেটেই আছে। কিন্তু কথাটা জানকীবাবুকে বলি-বলি করেও বলা হলো না।

জানকীবাবু যাবার সময় বললেন—ননীর ওপর আপনার সন্দেহ হয়?

—হয় খানিকটা।

—একবার ওকে ডাকিয়ে দেখি।

—এখন নয়। আমি মামার বাড়ি যাই, তারপর ওকে ডেকে জিগ্যেস করবেন।

কিছুক্ষণ পরে আমি জানকীবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মামার বাড়ি চলে এলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমার মামার বাড়ির পাশে সুরেশ ডাক্তারের বাড়ি। সে আমার সমবয়সী—গ্রামে প্র্যাকটিস করে। মোটামুটি যা রোজগার করে, তাতে তার চলে যায়। ওর কাছে ক্ষতস্থান ধুইয়ে ব্যান্ডেজ করিয়ে আবার শ্রীগোপালদের গ্রামেই ফিরলাম। জানকীবাবুর সঙ্গে পথে দেখা। তিনি বোধহয় বেড়াতে বেরিয়েচেন। আমায় বললেন—আজই ফিরলেন?

তাঁর কথার উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ আমার মনে পড়লো, মিস্‌মিদের কবচখানা আমার পকেটেই আছে এখনও—সামনে রাত আসচে আবার, ও-জিনিসটা সঙ্গে এনে ভালো করিনি, মামার বাড়ি রেখে আসাই উচিত ছিল বোধহয়।

জানকীবাবুর পরামর্শটা একবার নিলে কেমন হয়, জিনিসটা দেখিয়ে?

কিন্তু ভাবলাম, এ-জিনিসটা ওঁর হাতে দিতে গেলে এখন বহু কৈফিয়ৎ দিতে হবে ওই সঙ্গে। হয়তো তিনি জিনিসটার গুরুত্ব বুঝবেন না—দরকার কি দেখানোর?

জানকীবাবুর শ্বশুরবাড়ি শ্রীগোপালের বাড়ির পাশেই।

ওর বৃদ্ধা শাশুড়ি, দেখি, বাইরের রোয়াকে বসে মালা জপ করচেন। আমি তাঁকে আরও জিগ্যেস করবার জন্যে সেখানে গিয়ে বসলাম।

বুড়ী বললে—এসো দাদা, বসো।

—ভালো আছেন, দিদিমা?

—আমাদের আবার ভালোমন্দ—তোমরা ভালো থাকলেই আমাদের ভালো।

—আপনি বুঝি একাই থাকেন?

—আর কে থাকবে বলো—আছেই-বা কে? এক মেয়ে ছিল, মারা গিয়েচে।

—তবে তো আপনার বড় কষ্ট, দিদিমা!

—কি করবো দাদা, অদেষ্টে দুঃখ থাকলে কেউ কি ঠ্যাকাতে পারে?

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। বুড়ীর সামনের গোয়ালের ছিটেবেড়ায় একটা অদ্ভুত জিনিস রয়েচে— জিনিসটা হচ্ছে, খুব বড় একটা পাতার টোকা। পাতাগুলো শুকনো তামাক-পাতার মত ঈষৎ লাল্‌চে। পাতার বোনা ওরকম টোকা, বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে কখনো দেখি নি।

জিগ্যেস করলাম—দিদিমা, ও জিনিসটা কি? এখানে তৈরি হয়?

বৃদ্ধা বললেন— ওটা এ-দেশের নয় দাদা।

—কোথায় পেয়েছিলেন ওটা?

—আমার জামাই এনে দিয়েছিল।

wapsip.com

—আপনার জামাই? জানকীবাবু বুঝি?

— হ্যাঁ দাদা। ও আসামে চা-বাগানে থাকতো কিনা, ওই আর বছর এনেছিল।

হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগলো··· আসাম! ···চা বাগান! এই ক্ষুদ্র গ্রামের সঙ্গে সুদূর আসামের যোগ কিভাবে স্থাপিত হতে পারে—এ আমার নিকট একটা মস্ত-বড় সমস্যা। একটা ক্ষীণ সূত্র মিলেচে।

আমি বললাম—জানকীবাবু বুঝি আসামে থাকতেন?

— হ্যাঁ দাদা, অনেকদিন ছিল। এখন আর থাকে না। আমার সে মেয়ে মারা গিয়েচে কিনা! তবুও জামাই মাঝে-মাঝে আসে। গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে বড় ভাব ছিল। এলেই ওখানে বসে গল্প, চা খাওয়া—

—ও!

—বুড়ো খুন হয়েছে শুনে জামাইয়ের কি দুঃখু!

— গাঙ্গুলিমশায়ের মৃত্যুর ক'দিন পরে এলেন উনি?

— তিন-চার দিন পরে দাদা!

—আপনার মেয়ে মারা গিয়েচেন কতদিন হলো দিদিমা?

—তা, বছর-তিনেক হলো—এই শ্রাবণে।

—মেয়ে মারা যাওয়ার পর উনি যেমন আসছিলেন, তেমনই আসতেন, না, মধ্যে কিছুদিন আসা বন্ধ ছিল?

—বছর-দুই আর আসে নি। মন তো খারাপ হয়, বুঝতেই পারো দাদা! তারপর এল একবার শীতকালে। এখানে রইলো মাসখানেক। বেশ মন লেগে গেল। সেই থেকে প্রায়ই আসে।

আমি বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সেদিন আর কোথাও বেরুলাম না। পরদিন সকালে উঠে স্থির করলাম একবার থানার দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করা দরকার। বিশেষ আবশ্যক।

পথেই জানকীবাবুর সঙ্গে দেখা। আমায় জিগ্যেস করলেন—এই যে! বেড়াচ্ছেন বুঝি?

আমি বললাম—চলুন, ঘুরে আসা যাক একটু। আপত্তি আছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন না যাই।

—আচ্ছা জানকীবাবু, আপনি মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করেন?

—হ্যাঁ, খানিকটা করিও বটে, খানিকটা নাও বটে। কেন বলুন তো?

—আমার নিজের ওতে একেবারেই বিশ্বাস নেই। তাই বলচি। আপনি তো অনেক দেশ ঘুরেচেন, আপনার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে বেশি।

হঠাৎ জানকীবাবু আমার চোখের সামনে এমন একটা কাণ্ড করলেন, যাতে আমি স্তম্ভিত ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণের জন্যে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কাণ্ডটা এমন কিছুই নয়, খুবই সাধারণ।

জানকীবাবু পথের পাশে ঝোপের জঙ্গলের দিকে চেয়ে বললেন—দাঁড়ান, একটা দাঁতন

wapsip.com

ভেঙে নি। সকালবেলাটা···

তারপর তিনি আমার সামনে পথের ধারে একটা সেওড়াডাল ঘুরিয়ে ভেঙে নিলেন দাঁতনকাঠির জন্যে।

আমার ভাবান্তর অতি অল্পক্ষণের জন্যে।

পরক্ষণেই আমি সামলে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘুরে এসে আমি ভাঙা-সেওড়াডালটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখি, সঙ্গে সেদিনককার সেই দাঁতনকাঠির শুকনো গোড়াটা এনেছিলাম।

যে বিশেষ ভঙ্গিতে আগের গাছটা ভাঙা হয়েচে, এটাও অবিকল তেমনি ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ভাঙা!

কোনো তফাৎ নেই।

আমার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছিল। আসাম, দাঁতনকাঠি—দুটো অতি সাধারণ, অথচ অত্যন্ত অদ্ভুত সূত্র।

জানকীবাবুর এখানে গত এক বছর ধরে ঘনঘন আসা-যাওয়া, পত্নীবিয়োগসত্ত্বেও শ্বশুরবাড়ি আসার তাগিদ, গাঙ্গুলীমশায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব!

মিঃ সোম একবার আমায় বলেছিলেন, অপরাধী বলে যাকে সন্দেহ করবে, তখন তার পদমর্যাদা বা বাইরের ভদ্রতা—এমন কি, সম্বন্ধ, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদিকে আদৌ আমল দেবে না।

জানকীবাবুর সম্বন্ধে আমার গুরুতর সন্দেহ জাগলো মনে।

একটা সূত্র এবার অনুসন্ধান করা দরকার। অত্যন্ত দরকারী একটা সূত্র।

সকালে উঠে গিয়ে দারোগার সঙ্গে দেখা করলাম থানায়।

দারোগাবাবু আমায় দেখে বললেন—কি? কোনো সন্ধান করা গেল?

—করে ফেলেচি প্রায়। এখন—যে খাতার পাতাখানা আপনার কাছে আছে, সেই খানা একবার দরকার।

—ব্যাপার কি, শুনি?

— এখন কিছু বলচিনে! হাতের লেখা মেলানোর ব্যাপার আছে একটা।

— কি রকম!

—গাঙ্গুলিমশায়ের খাতা লিখতো যে-ক'জন—তাদের সবার হাতের লেখা জানি, কেবল একটা হাতের লেখার ছিল অভাব—তাই না?

— সে তো আমিই আপনাকে বলি।

—এখন সেই লোক কে হতে পারে, তার একটা আন্দাজ করে ফেলেচি। তার হাতের লেখার সঙ্গে এখন সেই পাতার লেখাটা মিলিয়ে দেখতে হবে।

—লোকটার বর্তমান হাতের লেখা পাওয়ার সুবিধে হবে?

—যোগাড় করতে চেষ্টা করছি। যদি মেলে, আমি সন্দেহক্রমে তাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবো।

— আমায় বলবেন, আমি গিয়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসবো। ওয়ারেন্ট বের করিয়ে নিতে যা দেরি।

— বাকিটুকু কিন্তু আপনাদের হাতে।

—সে ভাববেন না, যদি আপনার সংগৃহীত প্রমাণের জোর থাকে, তবে বাকি সব আমি

wapsip.com

করে নেবো। এই কাজ করচি আজ সতেরো বছর।

আমি গ্রামে ফিরে একদিনও চুপ করে বসে রইলাম না। এ-সব ব্যাপারে দেরি করতে নেই, করলেই ঠকতে হয়। জানকীবাবুর শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করলাম। শুনলাম, জানকীবাবু মাছ ধরতে গিয়েচেন কোথাকার পুকুরে— আর মাত্র দু'দিন তিনি এখানে আছেন—এই দু'দিনের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত করে ফেলতে হবে।

আমি বললাম—দিদিমা, জানকীবাবু আপনাকে কিছু-কিছু টাকা পাঠান শুনেচি?

—না দাদা, ও-কথা কার কাছে শুনেচো? জামাই তেমন লোকই নয়।

— পাঠান না?

—আরও উল্টে নেয় ছাড়া দেয় না। মেয়ে থাকতে তবুও যা দিতো, এখন একেবারে উপুড়-হাতটি করে না কোনোদিন।

—যাক, চিঠিপত্র দিয়ে খোঁজখবর নেন তো—তাহলেই হলো।

—তাও কখনো-কখনো। বছরে একবার বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে একখানা লেখে।

— খাম, না পোস্টকার্ড?

— হ্যাঁ, খাম না রেজিস্টারি চিঠি। তুমিও যেমন দাদা! মেয়ে বেঁচে না থাকলেই জামাই পর হয়ে যায়। তার উপর কি কোনো দাবী থাকে দাদা? দু'লাইন লিখে সেরে দেয়।

— কই, দেখি? আছে নাকি চিঠি?

—ওই চালের বাতায় গোঁজা আছে, দ্যাখো না।

খুঁজে-খুঁজে নাম দেখে একখানা পুরনো পোস্টকার্ড চালের বাতা থেকে বের করে বৃদ্ধাকে পড়ে শোনালুম। বৃদ্ধা বললেন— ওই চিঠি দাদা।

আরও দু'একটা কথা বলে চিঠিখানা নিয়ে চলে এলাম সঙ্গে করে। জানকীবাবু যদি এ-কথা এখন শুনতেও পান যে, তাঁর লেখা চিঠি সঙ্গে করে নিয়ে এসেচি, তাতেও আমার কোনো ক্ষতির কারণ নেই।

থানায় দারোগার সামনে বসে হাতের লেখা দুটো মেলানো হলো।

অদ্ভুত ধরনের মিল। দু'একটা অক্ষর লেখার বিশেষ ভঙ্গিটা উভয় হাতের লেখাতেই একইরকম।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দারোগাবাবু বললেন—তবুও একজন হাতের লেখা-বিশেষজ্ঞের মত নেওয়া দরকার নয় কি?

—সে তো কোর্টে প্রমাণের সময়। এখন ওসব দরকার নেই। আপনি সন্দেহক্রমে চালান দিন।

— আমায় অন্য কারণগুলো সব বলুন।

— একে-একে সব বলবো—তার আগে একবার কলকাতায় যাওয়া দরকার।

মিঃ সোমের সঙ্গে দেখা করলাম কলকাতায়। সব বললাম তাঁকে খুলে।

তিনি বললেন—একটা কথা বলি। তোমাদের সাক্ষীসাবুদ প্রমাণ-সূত্রাদির চেয়েও একটা বড় জিনিস আচে। এটা সূত্র ধরে অপরাধী বের করতে বড্ড সাহায্য করে। অন্তত আমায় তো অনেকবার যথেষ্ট সাহায্য করেচে। সেটা হলো— অঙ্কশাস্ত্র। অঙ্ক, Chance-এর আঁক কষে বোঝা যায় যে, একজন লোক যে আসামে থাকে বলবে, অথচ দাঁতন করবে, অথচ তার

wapsip.com

হাতের লেখার সঙ্গে যাকে সন্দেহ করা হচ্চে তার হাতের লেখার হুবহু মিল থাকবে, এ-ধরনের ব্যাপার হয়তো তিন হাজারের মধ্যে একটা ঘটে। এক্ষেত্রে যে সে-রকম ঘটেচে, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই—সুতরাং ধরে নিতে হবে ও সেই লোকই।

সেদিন কলকাতা থেকে চলে এলাম। আসবার সময় একবার থানার দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করি। তিনি বললেন, আপনি লোক পাঠালেই আমি সব ব্যবস্থা করবো।

—ওয়ারেন্ট বার হয়েচে?

—এখনও হস্তগত হয়নি, আজ-কাল পেয়ে যাবো।

গ্রামে ফিরে দু'তিন দিন চুপচাপ বসে রইলাম শ্রীগোপালের বাড়িতে। খবর নিয়ে জানলাম, জানকীবাবু দু'একদিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবেন। থানার দারোগার কাছে চিঠি দিয়ে আসতে বলে দিলাম।

পকেটে মিস্‌মিদের কবচখানা রেখে আমি জানকীবাবুর সন্ধানে ফিরতে থাকি এবং একটু পরে পেয়েও যাই। জানকীবাবুকে কৌশল করে নির্জনে গাঁয়ের মাঠের দিকে নিয়ে গেলাম।

আজ একবার শেষ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। হয় এসপার, নয় ওসপার!

জানকীবাবু বললেন—আপনার কাজ কতদূর এগুলো?

— এক পাও না। আপনি কি বলেন?

— আমি তো ভাবচি, ননীর সম্বন্ধে থানায় গিয়ে বলবো।

—সন্দেহের কারণ পেয়েচেন?

— না পেলে কি আর বলচি?

— আচ্ছা জানকীবাবু, আপনি বুঝি আসামে ছিলেন?

— কে বললে?

— আমি শুনলাম যেন সেদিন কার মুখে।

—না, আমি কখনো আসামে ছিলাম না। যিনি বলেচেন, তিনি জানেন না।

আমার মনে ভীষণ সন্দেহ হলো। জানকীবাবু এ-কথা বলতে চান কেন? তবে কি তিনি মিস্‌মিদের কবচ হারানো এবং বিশেষ করে সেখানা যদি আমার হাতে পড়ে বা পুলিসের কোনো সুযোগ্য ডিটেকটিভের হাতে পড়ে তবে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত?

আমি তখন আমার কর্তব্য স্থির করে ফেলেচি। বললাম—মানে, অন্য কেউ বলে নি, আপনার দেওয়া একটা পাতার টোকা সেদিন আপনার শ্বশুরবাড়িতে দেখে ভাবলাম এ-টোকা আসাম সদিয়া অঞ্চল ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না— মিস্‌মিদের দেশে অমন টোকার ব্যবহার আছে।

—আপনার ভুল ধারণা।

আমি তাঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে পকেট থেকে মিস্‌মিদের কাঠের কবচখানা বের করে তাঁর সামনে ধরে বললাম—দেখুন দিকি এ জিনিসটা কি? ···চেনেন? যে-রাত্রে গাঙ্গুলিমশায় খুন হন, সে-রাত্রে তাঁর বাড়ির পেছনে এটা কুড়িয়ে পাই। আসামে মিস্‌মিজাতের মধ্যে এই ধরনের কাঠের কবচ পাওয়া যায় কিনা— তাই।

আমার খবরের সঙ্গে সঙ্গে জানকীবাবুর মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল— কিন্তু অত্যন্ত অল্পকালের জন্যে। পরমুহূর্তেই ভীষণ ক্রোধে তাঁর নাক ফুলে উঠলো, চোখ বড়-বড় হলো। হঠাৎ আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লেন বাঘের মত এবং সঙ্গে-সঙ্গে কবচ-সুদ্ধ হাতখানা চেপে ধরে জিনিসটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। তাতে

wapsip.com

ব্যর্থ হয়ে তিনি দু'হাতেই আমার গলা চেপে ধরলেন পাগলের মত।

আমি এর জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম।

বরং জানকীবাবুই আমার যুযুৎসুর আড়াই-পেঁচির ছুটের জন্যে তৈরি ছিলেন না।

তিনি হাতের মাপের অন্তত তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন।

আমি হেসে বললাম—এ লাইনে যখন নেমেচেন; তখন অন্তত দু'একটা প্যাঁচ জেনে রাখা আপনার নিতান্ত দরকার ছিল জানকীবাবু। কবচ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবেন না। কবচ আপনাকে ছেড়ে দিয়েচে। এখন এটা আমার হাতে। এখন ভাগ্যদেবী আমায় দয়া করবেন।

—কি বলচেন আপনি?

— এ-কথার জবাব দেবেন অন্য জায়গায়। দাঁড়ান একটু এখানে।

থানার দারোগাবাবু কাছেই ছিলেন, আমার ইঙ্গিতে তিনি এসে হাসিমুখে বললেন—দয়া করে একটু এগিয়ে আসুন জানকীবাবু! খুনের অপরাধে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম ...এই, লাগাও!

কনস্টেবলরা এগিয়ে গিয়ে জানকীবাবুর হাতে হাতকড়ি লাগালো।

জানকীবাবু কি বলতে চাইলেন। দারোগাবাবু বললেন—আপনি এখন যা-কিছু বলবেন, আপনার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা হবে, বুঝেসুঝে কথা বলবেন।

জানকীবাবুর বিরুদ্ধে পুলিস আরও অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করে। গাঙ্গুলিমশায় খুন হওয়ার পাঁচদিনের মধ্যে তিনি জেলার লোন-আফিসব্যাঙ্কে সাড়ে ন'শো টাকা জমা রেখেচেন, পুলিসের থানা-তল্লাসীতে তার কাগজ বার হয়ে পড়লো।

তারপর বিচারে জানকীবাবুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

একটা বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিল জানবার। জানকীবাবুর সঙ্গে আমি জেলের মধ্যে দেখা করলাম। তখন তাঁর প্রতি দণ্ডাদেশ হয়ে গিয়েচে।

আমাকে দেখে জানকীবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেমন আছেন জানকীবাবু?

— ধন্যবাদ! কোনো কথা জিগ্যেস করতে হবে না আপনাকে।

একটু বেশি রাগ করেচেন বলে মনে হচ্চে। কিন্তু আমায় কর্তব্য পালন করতে হয়েচে, তা বুঝতেই পারচেন।

—থাক ওতেই হবে।

—দেখুন জানকীবাবু, মনের অগোচর পাপ নেই। আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন, আপনি কতদূর হীন কাজ করেচেন। একজন অসহায়, সরল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—যিনি আপনাকে গাঁয়ের জামাই জেনে আপনার প্রতি আত্মীয়ের মত—এমন কি, আপনার শ্বশুরের মত ব্যবহার করতেন, আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে তাঁর টাকাকড়ির হিসেব আপনাকে দিয়ে লেখাতেন—তাঁকে আপনি খুন করেচেন। পরকালে এর জবাবদিহি দিতে হবে যখন, তখন কি করবেন ভাবলেন না একবার?

wapsip.com

—মশায়, আপনাকে পাদ্রি-সায়েবের মত লেকচার দিতে হবে না। আপনি যদি এখনই এখান থেকে না যান—আমি ওয়ার্ডারকে ডেকে আপনাকে তাড়িয়ে দেবো—বিরক্ত করবেন না।

লোকটা সত্যিই অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির। নররক্তে হাত কলুষিত করেচে, অথচ এখন মনে অনুতাপের অঙ্কুর পর্যন্ত জাগে নি ওর।

আমি বললাম—আপনি সংসারে একা, ছেলেপুলে নেই, স্ত্রী নেই। তাঁরা স্বর্গে গিয়েচেন, কিন্তু আপনার এই কাজ স্বর্গ থেকে কি তাঁরা দেখবেন না আপনি ভেবেচেন? তাঁদের কাছে মুখ দেখাবেন কি করে?

জানকীবাবু চুপ করে রইলেন এবার। আমি ভাবলুম, ওষুধ ধরেচে। আগের-কথাটা আরও সুস্পষ্টভাবে বললাম। জানি না আজ জানকীবাবুর হৃদয়ের নিভৃত কোণে তাঁর পরলোকগত স্ত্রী-পুত্রের জন্য এতটুকু স্নেহপ্রীতি জাগ্রত আছে কিনা! কিন্তু আমার যতদূর সাধ্য তাঁর মনের সে দিকটাতে আঘাত দেবার চেষ্টা করলাম—বহুদিনের মরচেপড়া হৃদয়ের দোর যদি এতটুকু খোলে!

বললাম— ভেবে দেখুন জানকীবাবু, আপনার কাছে কত পবিত্র স্মৃতির আধার হওয়া উচিত যে গ্রাম, সেই গ্রামে বসে আপনি নরহত্যা করেচেন—এ যে কত পাপের কাজ তা যদি আজও বোঝেন, তবুও অনুতাপের আগুনে হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অনুতাপে মানুষকে নিষ্পাপ করে, মহাপুরুষেরা বলেচেন। আপনি বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, মহাপুরুষদের বাণী তা বলে মিথ্যা হয়ে যাবে না।

জানকীবাবু আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—-মশায়, আপনি কি কাজ করেন? এই কি আপনার পেশা?

—খারাপ পেশা নয় তা স্বীকার করবেন বোধহয়!

—খারাপ আর কি!

—দোষীকে প্রায়শ্চিত্ত করবার সুবিধে করে দিই, যাতে তার পরকালে ভালো হয়।

— আচ্ছা, এ আপনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন?

— নিশ্চয়ই করি।

—তবে শুনুন বলি, বসুন।

— বেশ কথা, বলুন।

—আমার দ্বারাই এ-কাজ হয়েচে।

— অর্থাৎ গাঙ্গুলিমশায়কে আপনি···

— ও-কথা আর বলবেন না।

— বেশ। কেন করলেন?

— সে অনেক কথা। আমার উপায় ছিল না।

— কেন?

—আমি ব্যবসা করতুম শুনেচেন তো? ব্যবসা ফেল পড়ে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিলাম, চারিদিকে দেনা। লোভ সামলাতে পারলাম না।

—আপনার সান্ত্বনা আপনার কাছে। কিন্তু এটা লাগসই কৈফিয়ৎ হলো না।

—আমি তা জানি। দুর্বল মন আমাদের—কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে বড় ইচ্ছে হয়।

wapsip.com

— স্বচ্ছন্দে বলুন।

— আপনি ওই কবচখানা পেয়েছিলেন যেদিন, সেদিন আপনি বুঝতে পেরেছিলেন ওখানা কি?

— না।

— কবে পারলেন?

— আমার শিক্ষাগুরু মিঃ সোমের কাছে কবচের বিষয় সব জেনেছিলাম। আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করবো?

— বলুন!

—আপনি কেন আবার এ-গ্রামে এসেছিলেন, খুনের পরে?

—আপনি নিশ্চয়ই তা বুঝেচেন।

—আন্দাজ করেছি। কবচখানা হারিয়ে গিয়েছিল খুনের রাত্রেই—সেখানা খুঁজতে এসেছিলেন।

— ঠিক তাই।

— সেদিন গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়ির পেছনের জঙ্গলে অন্ধকারে ওটা খুঁজছিলেন কেন, দিনমানে না খুঁজে?

—দিনেই খুঁজতে শুরু করেছিলাম, রাত হয়ে পড়লো।

—ওখানেই যে হারিয়েছিলেন, তা জানলেন কি করে?

—ওটা সম্পূর্ণ আন্দাজি-ব্যাপার! কোনো জায়গায় যখন খুঁজে পেলাম না তখন মনে পড়লো, ওই জঙ্গলে দাঁতন ভেঙেছিলাম, তখন পকেট থেকে পড়ে যেতে পারে। তাই—

আমি ওঁর মুখে একটা ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হতে দেখলাম। বললাম—সব কথা খুলে বলুন। আমি এখনও আপনার সব কথা শুনিনি! তবে আপনার মুখ দেখে তা বুঝতে পারচি।

জানকীবাবু ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলেন, যেন তাঁর গোপনীয় কথা শুনবার জন্যে জেলে সেই ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে কেউ লুকিয়ে ওৎ পেতে বসে রয়েচে। তাঁর এ ভাব-পরিবর্তনে আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ভয়ে দুঃখে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?

আমায় বললেন—ওখানা এখন কোথায়?

— একজিবিট হিসেবে কোর্টেই জমা আছে।

—তারপর কে নিয়ে নেবে?

—আপনার সম্পত্তি, আপনার ওয়ারিশান কোর্টে দরখাস্ত করলে—

জানকীবাবু ভয়ে যেন কোনো অদৃশ্য শত্রুকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে দেবার ভঙ্গিতে হাত নাড়তে-নাড়তে বললেন—না না, আমি ও চাইনে, আমার ওয়ারিশান কেউ নেই, ও আমি চাইনে—ওই সর্বনেশে কবচই আমাকে আজ এ-অবস্থায় এনেচে। আপনি জানেন না ও কি!

এই পর্যন্ত বলে তিনি চুপ করে গেলেন। যেন অনেকখানি বেশি বলে ফেলেচেন— যা বলবার ইচ্ছে ছিল তার চেয়েও বেশি। আর তিনি কিছু বলতে চান না বা ইচ্ছে করেন না।

আমি বললাম—আপনি যদি না নিতে চান, আমি কাছে রাখতে পারি।

আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে জানকীবাবু বললেন—আপনি সাহস করেন?

— এর মধ্যে সাহস করবার কি আছে? আমায় দেবেন।

—আপনি আমায় পুলিসে ধরিয়ে দিয়েচেন, আপনি আমার শত্রু—তবুও এখন ভেবে

wapsip.com

দেখচি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে দিয়েচেন আপনি! আপনার ওপর আমার রাগ নেই। আমি আপনাকে বন্ধুর মত পরামর্শ দিচ্চি—ও-কবচ আপনি কাছে রাখতে যাবেন না।

— কেন?

—সে-অনেক কথা। সংক্ষেপে বললাম—ও-জিনিসটা দূরে রেখে চলবেন।

আমি যেজন্যে আজ জানকীবাবুর কাছে এসেছিলাম, সে উদ্দেশ্য সফল হতে চলেচে। আমি এসেছিলাম আজ ওঁর মুখে কবচের ইতিহাস কিছু শুনবো বলে। আমার ওভাবে কথা পাড়বার মূলে এই একটা উদ্দেশ্য ছিল। অনুনয়ের সুরে কোনো কথা বলে জানকীবাবুর কাছে কাজ আদায় করা যাবে না এ আমি আগেই বুঝেছিলাম. সুতরাং আমি তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম—আমার কোনো কুসংস্কার নেই জানবেন।

জানকীবাবু খোঁচা খেয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বললেন—কুসংস্কার কাকে বলেন আপনি?

—আপনার মত ওইসব মন্ত্র-তন্ত্র-কবচে বিশ্বাস—ওর নাম যদি কুসংস্কার না হয়, তবে কুসংস্কার আর কাকে বলবো?

জানকীবাবু ক্রোধের সুরে বললেন—আপনি হয়তো ভলো ডিটেকটিভ হতে পারেন, কিন্তু দুনিয়ার সব জিনিসই তা বলে আপনি জানবেন?

আমি পূর্বের মত তাচ্ছিল্যের সুরেই বললাম—আমার শিক্ষাগুরু একজন আছেন, তাঁর বাড়িতে ওরকম একখানা কবচ আছে।

—কে তিনি?

— মিঃ সোম, বিখ্যাত প্রাইভেট-ডিটেকটিভ।

— যিনিই হোন, আমার তা জানবার দরকার নেই। একটা কথা আপনাকে বলি। যদি আপনি তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, তবে অবিলম্বে তাঁকে বলবেন সেখানা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে। কতদিন থেকে তাঁর সঙ্গে সেখানা আছে, জানেন।

—তা জানিনে, তবে খুব অল্পদিনও নয়। দু'তিন বছর হবে।

—আর আমার সঙ্গে এ-কবচ আছে সাত বছর। কিন্তু থাকগে।

ব'লেই জানকীবাবু চুপ করলেন। আর যেন তিনি মুখই খুলবেন না, এমন ভাব দেখালেন।

আমি বললাম—বলুন, কি বলতে চাইছিলেন?

—অন্য কিছু নয়, ও-কবচখানা আপনি আপনার গুরুকে টান মেরে ভাসিয়ে দিতে বলবেন— আর, এখানাও আপনি কাছে রাখবেন না।

— আমি তো বলেচি আমার কোনো কুসংস্কার নেই!

— অভিজ্ঞতা দ্বারা যা জেনেচি, তাকে কুসংস্কার বলে মানতে রাজী নই। বেশি তর্ক আপনার সঙ্গে করবো না। আপনি থাকুন কি উচ্ছন্নে যান, তাতে আমার কি?

—এই যে খানিক আগে বলছিলেন, আমার ওপর আপনার কোনো রাগ নেই?

— ছিল না, কিন্তু আপনার নির্বুদ্ধিতা আর দেমাক দেখে রাগ হয়ে পড়েছে।

—দেমাক দেখলেন কোথায়? আপনি তো কোনো কারণ দেখান নি। শুধুই বলে যাচ্ছেন—কবচ ফেলে দাও। আজকাল কোনো দেশে এসব মন্ত্রে-তন্ত্রে বিশ্বাস করে ভেবেচেন? একখানা কাঠের পাত মানুষের অনিষ্ট করতে পারে ব'লে, আপনিও বিশ্বাস করেন?

wapsip.com

—আমিও আগে ঠিক এই কথাই ভাবতাম, কিন্তু এখন আমি বুঝেছি। কিন্তু বুঝেছি এমন সময় যে, যখন আর কোনো চারা নেই।

— জিনিসটা কি, খুলে বলুন না দয়া করে!

— শুনবেন তবে? ওই কবচই আমার এই সর্বনাশের কারণ।

আমি বুঝেছিলাম এ-সম্বন্ধে জানকীবাবু কি একটা কথা আমার কাছে চেপে যাচ্ছেন। আগে একবার বলতে গিয়েও বলেন নি, হঠাৎ গুম খেয়ে চুপ করে গিয়ে অন্য কথা পেড়েছিলেন। এবার হয়তো তার পুনরাবৃত্তি করবেন।

সুতরাং, আমি যেন তাঁর আসল কথার অর্থ বুঝতে পারি নি এমনভাব দেখিয়ে বললাম—তা বটে। একদিক থেকে দেখতে হলে, ওই কবচখানাই তো আপনার বর্তমান অবস্থার জন্যে দায়ী!

জানকীবাবু আমার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—আপনি কি বুঝেছেন, বলুন তো? কিভাবে দায়ী।

— মানে, ওখানা না হারিয়ে গেলে তো আপনি আজ ধরা পড়তেন না—যদি ওখানা পকেট থেকে না পড়ে যেত?

—কিছুই বোঝেন নি।

—এ-ছাড়া আর কি বুঝবার আছে?

— আজ যে আমি একজন খুনী, তাও জানবেন ওই সর্বনেশে কবচের জন্যে। কবচ যদি আমার কাছে না থাকতো তবে আজ আমি একজন মার্চেন্ট—হতে পারে ব্যবসাতে লোকসান দিয়েছিলাম—কিন্তু ব্যবসা করতে গেলে লাভ-লোকসান কার না হয়? আমার বুকে সাহস ছিল, লোকসান আমি লাভে দাঁড় করাতে পারতাম। কিন্তু ওই কবচ তা আমায় করতে দেয়নি। ওই কবচ আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করেচে!

জানকীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম, গল্প বলবার আসন্ন নেশায় তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেচেন। চুপ করে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

জানকীবাবু বললেন—আজ প্রায় পঁচিশ বছর আমি সদিয়া-অঞ্চলে ব্যবসা করচি। পরশুরামপুর-তীর্থের নাম শুনেছেন?

— খুব।

—ঘন জঙ্গলের পাশে ওই তীর্থটা পড়ে। ওখান থেকে আরও সত্তর মাইল দূরে ভীষণ দুর্গম বনের মধ্যে আমি জঙ্গল ইজারা নিয়ে পাটের ব্যবসা শুরু করি। ওখানে দফ্‌লা, মিরি, মিস্‌মি এইসব নামের পার্বত্য-জাতির বাস। একদিন একটা বনের মধ্যে কুলিদের নিয়ে ঢুকেছি। জায়গাটার একদিকে ঝরনা, একদিকে উঁচু পাহাড়, তার গায়ে ঘন বাঁশবন। ওদিকে প্রায় সব পাহাড়েই বাঁশবন অত্যন্ত বেশি। কখনো গিয়েছেন ওদিকে?

আমি বললাম—না, তবে খাসিয়া পাহাড়ে এমন বাঁশবন দেখেচি, শিলং যাওয়ার পথে।

জানকীবাবুর গল্পটা আমি আমার নিজের ধরনেই বলি।

সেই পাহাড়ী-বাঁশবনে বন কাটাবার জন্যে ঢুকে তাঁরা দেখলেন, এক জায়গায় একটা বড় শালগাছের নিচে আমাদের দেশের বৃষ-কাষ্ঠের মত লম্বা ধরনের কাঠের খোদাই এক বিকট-মূর্তি দেবতার বিগ্রহ!

কুলিরা বললে— বাবু, এ মিস্‌মিদের অপদেবতার মূর্তি, ওদিকে যাবেন না।

জানকীবাবুর সঙ্গে ক্যামেরা ছিল, তাঁর শখ হলো মূর্তিটার ফটো নেবেন। কুলিরা বারণ

wapsip.com

করলে, জানকীবাবু তাদের কথায় কর্ণপাত না করে ক্যামেরা তেপায়ার উপর দাঁড় করিয়েছেন, এমন সময় একজন বৃদ্ধ মিস্‌মি এসে তাদের ভাষায় কি বললে। জানকীবাবুর একজন কুলি সে ভাষা জানতো। সে বললে—বাবু, ফটো নিও না, ও বারণ করচে।

অন্য-অন্য কুলিরাও বললে— বাবু, এরা জবর জাত— সরকারকে পর্যন্ত মানে না। ওদের দেবতাকে অপমান করলে গাঁ-সুদ্ধ তীর-ধনুক নিয়ে এসে হাজির হয়ে আমাদের সবগুলোকে গাছের সঙ্গে গেঁথে ফেলবে। ওরা দুনিয়ার কাউকে ভয় করে না, কারও তোয়াক্কা রাখে না—ওদের দেবতার ফটো খিঁচবার দরকার নেই।

জানকীবাবু ক্যামেরা বন্ধ করলেন— এতগুলো লোকের কথা ঠেলতে পারলেন না। তারপর নিজের কাজকর্ম সেরে তিনি যখন জঙ্গল থেকে ফিরবেন, তখন আর-একবার সেই দেবমূর্তি দেখবার বড় আগ্রহ হলো।

সন্ধ্যার তখন বেশি দেরি নেই, পাহাড়ী-বাঁশবনের নিবিড় ছায়া-গহন পথে বন্য-জন্তুদের অতর্কিত আক্রমণের ভয়, বেণুবনশীর্ষে ক্ষীণ সূর্যালোক ও পার্বত্য-উপত্যকার নিস্তব্ধতা সকলের মনে একটা রহস্যের ভাব এনে দিয়েচে, কুলিদের বারণ সত্ত্বেও তিনি সেখানে গেলেন।

সবাই ভীত ও বিস্মিত হয়ে উঠলো যখন সেখানে গিয়ে দেখলে, কোন্ সময় সেখানে একটি শিশু বলি দেওয়া হয়েচে! শিশুটির ধড় ও মুণ্ড পৃথক-পৃথক পড়ে আছে, কাঠে-খোদাই বৃষকাষ্ঠ-জাতীয় দেবতার পাদমূলে! অনেকটা জায়গা নিয়ে কাঁচা আধশুকনো রক্ত।

সেখানে সেদিন আর তাঁরা বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না।…

জানকীবাবু বললেন—আমার কি কুগ্রহ মশায়, আর যদি সেখানে না যাই তবে সবেচেয়ে ভালো হয়, কিন্তু তা না করে আমি আবার পরের দিন সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। কুলিদের মধ্যে একজন লোক আমায় যথেষ্ট নিষেধ করেছিল, সে বলেছিল, 'বাবু, তুমি কলকাতার লোক, এসব দেশের গতিক কিছু জানো না। জংলী-দেবতা হলেও ওদের একটা শক্তি আছে—তা তোমাকে ওদের পথে নিয়ে যাবে, তোমার অনিষ্ঠ করবার চেষ্টা করবে—ওখানে অত যাতায়াত কোরো না বাবু।' কিন্তু কারো কথা শুনলাম না, গেলাম শেষ পর্যন্ত। লুকিয়েই গেলাম, পাছে কুলিরা টের পায়।

কেন যে জানকীবাবু সেখানে গেলেন, তিনি তা আজও ভালো জানেন না।

কিংবা হয়তো রক্ত-পিপাসু বর্বর দেবতার শক্তিই তাঁকে সেখানে যাবার প্ররোচনা দিয়েছিল…কে জানে!

জানকীবাবু বললেন—ক্যামেরা নিয়ে যদি যেতাম, তাহলে তো বুঝতাম ফটো নিতে যাচ্ছি—তাই বলছিলাম, কেন যে সেখানে গেলাম, তা নিজেই ভালো জানিনে!

আমি বললাম—সে-মূর্তির ফটো নিয়েছিলেন?

— না, কোনো দিনই না। কিন্তু তার চেয়ে খারাপ কাজ করেছিলাম, এখন তা বুঝতে পারচি।

জানকীবাবু যখন সেখানে গেলেন, তখন ঠিক থমথম করচে দুপুরবেলা, পাহাড়ী-পাখিদের ডাক থেমে গিয়েচে, বনতল নীরব, বাঁশের ঝাঁড়ে ঝাঁড়ে শুকনো বাঁশের খোলা পাতা পড়বার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নাই।

দেবমূর্তির একেবারে কাছে যাবার অত্যন্ত লোভ হলো—কারণ, কুলিরা সঙ্গে থাকায় এতক্ষণ তা তিনি করতে পারেন নি।

wapsip.com

গিয়ে দেখলেন, শিশুর শবের চিহ্নও সেখানে নেই। রাত্রে বন্যজন্তুতে খেয়েই ফেলুক, বা, জংলীরাই নিজেরা খাবার জন্যে সরিয়ে নিয়ে যাক। অনেকক্ষণ তিনি মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন—কেমন এক ধরনের মোহ, একটা সুতীব্র আকর্ষণ! সত্যিকার নরবলি দেওয়া হয় যে দেবতার কাছে, এমন দেবতা কখনো দেখেন নি বলেই বোধ হয় আকর্ষণটা বেশি প্রবল হলো, কিংবা অন্য কিছু তা বলতে পারেন না তিনি।

সেইসময় ওই কাঠের কবচখানা দেবমূর্তির গলায় ঝুলতে দেখে জানকীবাবু কিছু না ভেবে—চারিদিকে কেউ কোথাও নেই দেখে—সেখানা চট করে মূর্তিটার গলা থেকে খুলে নিলে।...

আমি বিস্মিতসুরে বললাম—খুলে নিলেন! কি ভেবে নিলেন হঠাৎ?

—ভাবলাম একটা নিদর্শন নিয়ে যাবো এদেশের জঙ্গলের দেবতার, আমাদের দেশের পাঁচজনের কাছে দেখাবো! নরবলি খায় যে দেবতা, তার সম্বন্ধে যখন বৈঠকখানা জাঁকিয়ে বসে গল্প করবো তখন সঙ্গে সঙ্গে এখানা বার করে দেখাবো। লোককে আশ্চর্য করে দেবো, বোধহয় এইরকমই একটা উদ্দেশ্য তখন থেকে থাকবে। কিন্তু যখন নিলাম গলা থেকে খুলে, তখনই মশায় আমার সর্বশরীর যেন কেঁপে উঠলো! যেন মনে হলো একটা কি অমঙ্গল ঘনিয়ে আসচে আমার জীবনে। ও-ধরনের দুর্বলতাকে কখনোই আমল দিই নি—সেটা খুলে নিয়ে পকেটজাত করে ফেললাম একবারে। মিস্‌মিদের অনেকে এ রকম কবচ গলায় ধারণ করে, সেটাও দেখেচি কিন্তু তারপরে। শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবার সময় বিশেষ করে এ-কবচ তারা পরবেই।

— তারপর?

— তারপর আর কিছুই না। সাতবছর কবচ আছে আমার কাছে। জংলী-জাতের জংলী-দেবতার কবচ, ও ধীরে-ধীরে আমায় নামিয়েচে এই সাতবছরে। এক-একটা জিনিসের এক-একটা শক্তি আছে। আমায় জাল করিয়েচে, পাওনাদারের টাকা মেরে দেবার ফন্দি দিয়েচে—শেষকালে মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়ে দিলে পর্যন্ত। একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যবসাদার ছিলুম মশায়—আজ কোথায় এসে নেমেছি দেখুন! এ-প্রবৃত্তি জাগাবার মূলে ওই কবচখানা! আমি দেখেচি, যখনই ওখানা আমার কাছে থাকতো, তখনই নানারকম দুষ্টবুদ্ধি জাগতো মনে—কাকে মারি, কাকে ফাঁকি দিই। লোভ জিনিসটা দুর্দমনীয় হয়ে উঠতো। গাঙ্গুলিমশায়ের খুনের দিনের রাত্রে আমি দশটার গাড়িতে অন্ধকারে ইস্টিশানে নামি। কেউ আমায় দেখে নি। আমার পকেটে ঐ কবচ— কিন্তু যাক সে-কথা, আর এখন বলবো না।

— বলুন না।

— না। আমার ঘাড় থেকে এখন ভূত নেমে গিয়েচে, আর সে-ছবি মনে করতে পারব না। এখন করলে ভয় হয়। নিজের কাজ করেই কবচ সরে পড়লো সে-রাত্রেই। আমার সর্বনাশ করে ওর প্রতিহিংসা পূর্ণ হলো বোধহয়—কে বলবে বলুন! স্টীমারে আমায় একজন বারণ করেছিল কিন্তু। আসাম থেকে ফিরবার পথে ব্রহ্মপুত্রের ওপর স্টীমারে একজন বৃদ্ধ আসামী ভদ্রলোককে ওখানা দেখাই। তিনি আমায় বললেন, 'এ কোথায় পেলেন আপনি? এ মিরি আর মিস্‌মিদের কবচ, পশু এখানে মানুষের স্থান নিয়েচে, ওরা যখন অপরের গ্রাম আক্রমণ করতে যেত— অপরকে খুন-জখম করতে যেত—তখন দেবতার মন্ত্রপূত এই কবচ পরতো গলায়। এ-আপনি কাছে রাখবেন না, আপনাকে এ অমঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে।' তখনও যদি তার কথা শুনি তাহলে কি আজ এমন হয়? তাই আপনাকে আমি বলচি, আমি

wapsip.com

তো গেলামই—ও-কবচ আপনি আপনার কাছে কখনো রাখবেন না।

জানকীবাবু চুপ করলেন। যে উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিলাম তা পূর্ণ হয়েচে। জানকীবাবুর মুখে কবচের ইতিহাসটা শুনবার জন্যেই আসা।

বললাম—আমি যা করেচি, কর্তব্যের খাতিরে করেচি। আমার বিরুদ্ধে রাগ পুষে রাখবেন না মনে। আমায় ক্ষমা করবেন। নমস্কার!

বিদায় নিয়ে চলে এলাম ওর কাছ থেকে

* * * *

যতদূর জানি—এখন তিনি আন্দামানে।

wapsip.com

হীরামানিক জ্বলে

wapsip.com

wapsip.com

ছোট্ট গ্রাম সুন্দরপুর।

একটি নদীও আছে গ্রামের উত্তর প্রান্তে। মহকুমা থেকে বারো তের মাইল, রেল স্টেশন থেকেও সাত আট মাইল।

গ্রামের মুস্তফি বংশ এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন, এখন তাঁদের অবস্থা আগের মত না থাকলেও আশপাশের অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে তাঁরাই এখনও পর্যন্ত বড়লোক বলে গণ্য, যদিও ভাঙা পুজোর দালানে আগের মত জাঁকজমকে এখন আর পুজো হয় না—প্রকাণ্ড বাড়ির যে মহলগুলোর ছাদ খসে পড়েছে গত বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে, সেগুলো মেরামত করবার পয়সা জোটে না, বাড়ির মেয়েদের বিবাহ দিতে হয় কেরানি পাত্রদের সঙ্গে—অর্থের এতই অভাব।

সুশীল এই বংশের ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ করে বাড়ি বসে আছে—বড় বংশের ছেলে, তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কখনো চাকুরি করেন নি, সুতরাং বাড়ি বসেই বাপের অন্ন ধ্বংস করুক, এই ছিল বাড়ির সকলেরই প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়।

সুশীল তাই করে আসছে অবিশ্যি।

সুন্দরপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস খুব বেশি নেই—আগে অনেক ভদ্র গৃহস্থের বাস ছিল, তাদের সবাই এখন বিদেশে চাকুরি করে—বড় বড় বাড়ি জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে।

মুস্তফিদের প্রকাণ্ড ভদ্রাসনের দক্ষিণে ও পূর্বে তাঁদের দৌহিত্র রায় বংশ বাস করে। পূর্বে যখন মুস্তফিদের সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল তখন বিদেশ থেকে কুলগৌরব-সম্পন্ন রায়দের আনিয়ে কন্যাদান করে জমি দিয়ে এখানেই বাস করিয়েছিলেন এঁরা।

কালের বিপর্যয়ে সেই রায় বংশের ছেলেরা এখন সুশিক্ষিত ও প্রায় সকলেই বিদেশে ভাল চাকুরি করে। নগদ টাকার মুখ দেখতে পায়—বাড়ি কেউ বড় একটা আসে না—যখন আসে তখন খুব বড়-মানুষি চাল দেখিয়ে যায়। পদে পদে মাতুল বংশের ওপর টেক্কা দিয়ে চলাই যেন তাদের দু-একমাস-স্থায়ী পল্লীবাসের সর্বপ্রধান লক্ষ্য।

আশ্বিন মাস। পুজোর বেশি দিন দেরি নেই।

অঘোর রায়ের বড় ছেলে অবনী সস্ত্রীক বাড়ি এসেছে। শোনা যাচ্ছে, দুর্গোৎসব না করলেও অবনী এবার ধুমধামে নাকি কালী পুজো করবে। অবনী সরকারী দপ্তরে ভাল চাকুরি করে। অবনীর বাবা অঘোর রায় ছেলের কাছেই বিদেশে থাকেন। তিনি এ-সময় বাড়ি আসেন নি, তাঁর মেজ ছেলে অখিলের সঙ্গে পুরী গিয়েছেন। অখিল যেন কোথাকার সাবডেপুটি—পনেরো দিন ছুটি নিয়ে স্ত্রীপুত্র ও বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে বেড়াতে বার হয়েছে।

সুশীল অবনীদের বৈঠকখানায় বসে এদের চালবাজির কথা শুনছিল অনেকক্ষণ থেকে।

অবনী বললে—মামা, তোমাদের বড় শতরঞ্জি আছে?

—একখানা দালানজোড়া শতরঞ্জি তো ছিল জানি—কিন্তু সেটা ছিঁড়ে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়।

—ছেঁড়া শতরঞ্জি আমার চলবে না। তাহলে কলকাতায় লোক পাঠিয়ে ভাল একখানি বড় শতরঞ্জি কিনে আনি, বন্ধুবান্ধব পাঁচজনে আসবে, তাদের সামনে বার করার উপযুক্ত হওয়া চাই তো!—বড় আলো আছে?

—বাতির ঝাড় ছিল, এক-এক থাকে কাঁচ খুলে গিয়েছে—তাতে চলে তো নিও।

wapsip.com

—তোমাদের তাতেই কাজ চলে?

—কেন চলবে না? দেখায় খুব ভাল। তা ছাড়া দুর্গোৎসবের কাজ দিনমানেই বেশি—রাত্রে আরতি হয়ে গেলেই আলোর কাজ তো মিটে গেল।

—আমার ডে-লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি। কালীপুজোর রাতে আলোর ব্যবস্থা একটু ভালরকম থাকা দরকার। ইলেকট্রিক আলোয় বারো মাস বাস করা অভ্যেস, সত্যি পাড়াগাঁয়ে এসে এমন অসুবিধে হয়!

বৃদ্ধ সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলী তাঁর ছোট ছেলের একটা চাকুরির জন্যে অবনীর কাছে ক-দিন ধরে হাঁটাহাঁটি করে একটু—অবিশ্যি খুব সামান্যই একটু—ভরসা পেয়েছিলেন, তিনি অমনি বলে উঠলেন—তা অসুবিধে হবে না? বলি তোমরা বাবাজী কি রকম জায়গায় থাকো, কি ধরনে থাকো—তা আমার জানা আছে তো! গঙ্গাচানের যোগে কলকাতা গেলেই তোমাদের ওখানে গিয়ে উঠি, আর সে কী যত্ন! ওঃ, ইলেক্‌টিরি আলো না হলে কি বাবাজী তোমাদের চলে।

সুশীল কলকাতায় দু-একবার মাত্র গিয়েছে,—আধুনিক সভ্যতার যুগের নতুন জিনিসই তার অপরিচিত—শিক্ষিত ও শহুরে বাবু অবনীর সঙ্গে ভয়ে ভয়ে তাকে কথা বলতে হয়।

তবুও সে বললে—ডে-লাইটের চেয়ে কিন্তু ঝাড়-লণ্ঠন দেখায় ভাল—

অবনী হেসে গড়িয়ে পড়ে আর-কি!

—ওহে যে যুগে জমিদারপুত্রেরা নিষ্কর্মা বসে থাকত আর হাতিতে চড়ে জরদ্‌গবের মত ঘুরে বেড়াতো—ওসব চাল ছিল সেকালের। মডার্ন যুগে ও সব অচল, বুঝলে মামা? এ হল প্রগতির যুগ—হাতির বদলে এসেছে ইলেকট্রিক লাইট—সেকালকে আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে?

বনেদি পুরোনো আমলের চালচলনে আবাল্য অভ্যস্ত সুশীল। বয়সে যুবক হলেও প্রাচীনের ভক্ত।

সে বললে—কেন, হাতি চড়াটা কী খারাপ দেখলে?

—রামোঃ! জবড়জং ব্যাপার! হাতির মত মোটা জানোয়ারের ওপর বসে-থাকা পেটমোটা নাদুস-নুদুস—

সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলী বললেন—গোবর-গণেশ—

—জমিদারের ছেলেরই শোভা পায়, কিন্তু কাজে যারা ব্যস্ত, সময় যাদের হাতে কম, দিনে যাদের ত্রিশ মাইল চক্কর দিয়ে বেড়াতে হয় নিজের কাজে বা আপিসের কাজে—তাদের পক্ষে দরকার মোটর বাইক বা মোটর কার। স্মার্ট যারা—তাদের উপযুক্ত যানই হচ্ছে—

সুশীল প্রতিবাদ করে বললে—স্মার্ট কারা জানি নে; মোগল বাদশাদের সময় আকবর আওরঙ্গজেবের মত বীর হাতিতে চড়ে যুদ্ধ করত—তারা স্মার্ট হল না—হল তোমাদের কলকাতার আদ্দির-পাঞ্জাবী-পরা চশমা-চোখে ছোকরা বাবুর দল, যারা বাপের পয়সায় গড়ের মাঠে হাওয়া খায়—কিংবা শখে পড়ে দু-দশ কদম মোটর ড্রাইভ করে, তারা? অত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, তারা হাতিতে চড়ে যুদ্ধ করত, পুরুরাজ হাতির পিঠে চড়ে আলেকজান্ডারের গ্রীক বাহিনীর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল—তারা স্মার্ট ছিল না, স্মার্ট হল সিনেমার ছোকরা অ্যাক্টরের দল?

সুশীল সেখান থেকে উঠে চলে এল। অবনীর ধরন-ধারণ তার ভাল লাগে নি—দূর সম্পর্কের মামাভাগ্নে, কোন-কালের দৌহিত্র বংশের লোক, এই পর্যন্ত। এখন তাদের সঙ্গে

wapsip.com

প্রত্যক্ষ কী যোগ আছে?—কিছুই না। জমিদারের ছেলেদের ওপর অবনীর এ কটাক্ষ, সুশীলের মনে হল তাকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে।

তা করতে পারে—এরা এখন সব হঠাৎ-বড়লোকের দল, পুরনো বংশের ওপর এদের রাগ থাকা অসম্ভব নয়।

সুশীল জমিদারপুত্রও বটে, নিষ্কর্মাও বটে। বসে খেতে খেতে দিনকতক পরে পেটমোটা হয়েও উঠবে—এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ। অবনী তাকে লক্ষ্য করেই বলেছে নিশ্চয়ই।

বাড়ি এসে সুশীল জ্যাঠামশায়কে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা জ্যাঠামণি, আমাদের বংশে কখনো কেউ চাকরি করেছে?

জ্যাঠামশায় তারাকান্ত মুস্তফির বয়স সত্তরের কাছাকাছি। তিনি পুজোর দালানের সঙ্গের ছোট কুঠরিতে সারাদিন বৈষয়িক কাগজপত্র দেখেন এবং মাঝে মাঝে গীতা পাঠ করেন। ঘরটার কুলুঙ্গিতে ও দেওয়ালের গায়ের তাকে গত পঞ্চাশ বছরের পুরনো পাঁজি সাজানো। তারাকান্ত বললেন—কেন বাবা সুশীল? এ বংশে কারও কোন ভাবনা ছিল যে চাকুরি করবে?

—ছেলেরা কী করত জ্যাঠামণি?

—পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে খেয়ে আমাদের পুরুষানুক্রমে চলে আসছে—তবে আজকাল বড় খারাপ সময় পড়েছে, জমিজমাও অনেক বেরিয়ে গেল—তাই যা-হয় একটু কষ্ট যাচ্ছে। কী আবার করবে কে? ওতে আমাদের মান যায়।

সুশীল কথাটা ভেবে দেখলে অবসর সময়ে। অবনীর কথাগুলো হিংসেতে ভরা ছিল এখন দেখা যাচ্ছে। অবনীদের বাইরে বেরিয়ে চাকুরি না করলে চলে না—আর তাদের চিরকাল চলে আসছে বাড়ি বসে—এতে অবনীর হিংসের কথা বৈকি।

মামার বাড়ি খেয়ে চিরকাল ওরা মানুষ। আজ হঠাৎ বড়লোক হয়ে চাল দেওয়া কথাবার্তায় সেই মাতুল বংশকেই ছোট করতে চায়।

সুশীল এর প্রমাণ অন্য একদিক থেকে খুব শিগগিরই পেলে। মুস্তফিদের সাবেকি পুজোর মণ্ডপে দুর্গোৎসব টিমটিম করে সমাধা হল—লোকের পাতে ছেঁচড়া, কলাইয়ের ডাল, ক্ষেতের রাঙা নাগরা চালের ভাত, পুকুরের মাছ, জোলো দুধোলো দই ও চিনির ডেলা ঘোঙা মোণ্ডা খাইয়ে—কিন্তু অবনীদের বাড়ি যে কালীপুজো হল—সে একটা দেখবার জিনিস!

কালীপুজোর রাত্রে গাঁ-সুদ্ধ পোলাও মাংস, কলকাতা থেকে আনা দই রাবড়ি সন্দেশ খেলে। টিন-টিন দামী সিগারেট নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বিলি হল, পরদিন দুপুরে যাত্রা ও ভাসানের রাত্রে প্রীতি সম্মেলনে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। অবনীর এক বন্ধু আবার ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড দেখিয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতাও করলে। গ্রামের লোক সবাই ধন্য-ধন্য করতে লাগল। এ গাঁয়ে এমনটি আর কখনো হয় নি—কেউ দেখেনি! সকলের মুখে অবনীর সুখ্যাতি।

কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি ছিল না, যদি তারা সেইসঙ্গে অমনি মুস্তফি জমিদারদের ছোট করে না দিত।

—নাঃ, মুস্তফিরা কখনো এদের সঙ্গে দাঁড়ায়? বলে—কিসে আর কিসে!

—যা বলেছ ভায়া! নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না—

—শুধু লম্বা লম্বা কথা আছে—আর কিছু নেই রে ভাই।

এ-ধরনের একটা কথা একদিন সুশীলের নিজের কানেই গেল। নিজেদের পুকুরের ঘাটে বসে সুশীল ছিপে মাছ ধরছে, গাঁয়ের ওর পরিচিত দুটি ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে পথ

wapsip.com

দিয়ে যাচ্ছেন। একজন বললেন—মুস্তফিদের ওপর এবার খুব একহাত নিয়েছে অবনী! অপর জন বললে—তার মানে মুস্তফিদের আর কিছু নেই। সব ছেলেগুলো বাড়ি বসে বসে খাবে, আজকালকার দিনে কি আর সেকেলে বনেদি চাল চলে? লেখাপড়া তো একটা ছেলেও ভাল করে শিখলে না—

—লেখাপড়া শিখেও তো ঐ সুশীলটা বাপের হোটেলে দিব্যি বসে খাচ্ছে—ওদের কখনো কিছু হবে না বলে দিলাম। যত সব আলসে আর কুঁড়ে।

কথাটা সুশীলের মনে লাগল। এদিক থেকে সে কোনদিন নিজেকে বিচার করে দেখেনি। চিরকাল তো এইরকম হয়ে আসছে তাদের বংশে, এতদিন কেউ কিছু বলে নি, আজকাল বলে কেন তবে?

পাশের গ্রামে সুশীলের এক বন্ধু থাকত, সুশীল তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে। ছেলেটির নাম প্রমথ, তার বাবা এক সময়ে মুস্তফিদের স্টেটের নায়েব ছিলেন, কিন্তু তারপর চাকুরি ছেড়ে মাল-চালানি ব্যবসা করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন।

প্রমথ বেশ বুদ্ধিমান ও বলিষ্ঠ যুবক। সে নিজের চেষ্টায় গ্রামে একটা নৈশ স্কুল করেছে, একটা দরিদ্র-ভাণ্ডার খুলেছে—তার পেছনে গ্রামের তরুণদের যে দলটি গড়ে উঠেছে—গ্রামের মঙ্গলের জন্যে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই। সম্প্রতি প্রমথ বাবার আড়তে বেরুতে আরম্ভ করেছে।

সুশীল বললে—প্রমথ, আমাকে তোমাদের আড়তে কাজ শেখাবে?

প্রমথ আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে চেয়ে বললে—কেন বল তো? হঠাৎ এ কথা কেন তোমার মুখে?

—বসে বসে চিরকাল বাপের ভাত খাব?

—তোমাদের বংশে কেউ কখনো অন্য কাজ করেনি, তাই বলছি। হঠাৎ এ মতিবুদ্ধি ঘটল কেন তোমার?

—সেসব বলব পরে। আপাতত একটা হিল্লে করে দাও তো।

—ওর মধ্যে কঠিন আর কি? যেদিন ইচ্ছে এসো, বাবার কাছে নিয়ে যাব।

মাসখানেক ধরে সুশীল ওদের আড়তে বেরুতে লাগল, কিন্তু ক্রমশ সে দেখলে, ভুষি মাল চালানির কাজের সঙ্গে তার অন্তরের যোগাযোগ নেই। তার বাবা ছেলেকে আড়তে যোগ দিতে বাধা দেন নি, বরং বলেছিলেন ব্যবসার কাজে যদি কিছু টাকা দরকার হয়, তাও তিনি দেবেন।

একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আড়তের কাজ কিরকম হচ্ছে?

সুশীল বললে—ও ভাল লাগে না, তার চেয়ে বরং ডাক্তারি পড়ি।

—তোমার ইচ্ছে। তাহলে কলকাতায় গিয়ে দেখে শুনে এস।

কলকাতায় এসে সুশীল দেখলে, ডাক্তারি স্কুলে ভর্তি হবার সময় এখন নয়। ওদের বছর আরম্ভ হয় জুলাই মাসে—তার এখনও তিন চার মাস দেরি। সুশীলের এক মামা খিদিরপুরে বাসা করে থাকতেন, তাঁর বাসাতেই সুশীল এসে উঠেছিল—তাঁরই পরামর্শে সে দু-একটা আপিসে কাজের চেষ্টা করতে লাগল।

দিন-পনেরো অনেক আপিসে ঘোরাফেরা করেও সে কোথাও কোন কাজের সুবিধে করতে পারলে না—এদিকে টাকা এল ফুরিয়ে। মামার বাসায় খাবার খরচ লাগত না অবিশ্যি, কিন্তু হাত খরচের জন্যে রোজ একটি টাকা দরকার। বাবার কাছে সে চাইবে না—নগদ টাকার

wapsip.com

সেখানে বড় টানাটানি, সে জানে। একটা কিছু না করে এবার বাড়ি ফিরবার ইচ্ছে নেই তার। অথচ করাই বা যায় কী? সন্ধ্যার দিকে গড়ের মাঠে বসে রোজ ভাবে।

সুশীল সেদিন গড়ের মাঠের একটা নির্জন জায়গায় বসে ছিল চুপ করে। বড্ড গরম পড়ে গিয়েছে—খিদিরপুরে তার মামার বাসাটিও ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের চিৎকার ও উপদ্রবে সদা সরগরম—সেখানে গিয়ে একটা ঘরে তিন-চারটি আট দশ বছরের মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে হবে। সুশীলের ভাল লাগে না আদৌ। তাদের অবস্থা এখন খারাপ হতে পারে, কিন্তু দেশের বাড়িতে জায়গার কোন অভাব নেই।

ওপরে নিচে বড় ঘর আছে—লম্বা লম্বা দালান, বারান্দা—পুকুরের ধারের দিকে বাইরের মহলে এত বড় একটা রোয়াক আছে যে, সেখানে অনায়াসে একটা যাত্রার আসর হতে পারে।

এমন সব জ্যোৎস্না রাতে কতদিন সে পুকুরের ধারে ওই রোয়াকটায় একা বসে কাটিয়েছে। পুকুরের ওপারে নারিকেল গাছের সারি, তার পেছনে রাধাগোবিন্দের মন্দিরের চুড়োটা, সামনের দিকে ওর ঠাকুরদাদার আমলের পুরনো বৈঠকখানা। এ বৈঠকখানায় এখন আর কেউ বসে না—কাঠ ও বিচুলি, শুকনো তেঁতুল, ভুষি ঘুঁটে ইত্যাদি রাখা হয় বর্ষাকালে।

মাঝে-মাঝে সাপ বেরোয় এখানে।

সেবার ভাদ্রমাসে তালনবমীর ব্রতের ব্রাহ্মণ ভোজন হচ্ছে পুজোর দালানে, হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শোনা গেল পুকুর-পাড়ের পুরনো বৈঠকখানার দিক থেকে।

সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, হরি চাকর বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকেছিল বিচালি পাড়বার জন্যে—সেই সময় কি সাপে তাকে কামড়েছে।

হৈ-হৈ হল। লোকজন এসে সারা বৈঠকখানার মালামাল বার করে সাপের খোঁজ করতে লাগল। কিছু গেল না দেখা। হরি চাকর বললে সে সাপ দেখেনি, বিচুলির মধ্যে থেকে তাকে কামড়েছে।

ওঝার জন্যে রানীনগরে খবর গেল। রানীনগরের সাপের ওঝা তিনটে জেলার মধ্যে বিখ্যাত—তারা এসে ঝাড়ফুঁক করে হরিকে সে-যাত্রা বাঁচালে। লোকজনে খুঁজে সাপও বের করলে—প্রকাণ্ড খয়ে-গোখরো। হরি যে বেঁচে গেল, তার পুনর্জন্ম বলতে হবে।

—বাবু, ম্যাচিস আছে—ম্যাচিস?

সুশীল চমকে মাথা তুলে দেখলে, একটি কালোমত লোক। অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত অবাঙালী লোক বলেই সুশীলের ধারণা হল—কারণ তারাই সাধারণত দেশলাইকে 'ম্যাচিস' বলে থাকে।

সুশীল ধূমপান করে না, সুতরাং সে দেশলাইও রাখে না। সে কথা লোকটাকে বলতে সে চলেই যাচ্ছিল—কিন্তু খানিকটা গিয়ে আবার অন্ধকারের মধ্যে যেন কি ভেবে ফিরে এল।

সুশীলের একটু ভয় হল। লোকটিকে এবার সে ভাল করে দেখে নিয়েছে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে। বেশ সবল, শক্ত-হাত-পা-ওয়ালা চেহারা—গুণ্ডা হওয়া বিচিত্র নয়। সুশীলের পকেটে বিশেষ কিছু নেই—টাকা-তিনেক মাত্র। সুশীল একটু সতর্ক হয়ে সরে বসল। লোকটা ওর কাছে এসে বিনীত সুরে বললে—বাবুজি, দু-আনা পয়সা হবে?

সুশীল বিনা বাক্যব্যয়ে একটা দুয়ানি পকেট থেকে বের করে লোকটার হাতে দিলে। তাই নিয়ে যদি খুশি হয়, হোক না। এখন ও চলে গেলে যে হয়!

চলে যাওয়ার কোন লক্ষণ কিন্তু লোকটার মধ্যে দেখা গেল না। সে সুশীলের কাছেই

wapsip.com

এসে সকৃতজ্ঞ সুরে বললে—বহুৎ মেহেরবানি আপনার বাবু! আমার আজ খাওয়ার কিছু ছিল না—এই পয়সা লিয়ে হুটেলে গিয়ে রোটি খাবো। বাবুজির ঘর কুথায়?

ভাল বিপদ দেখা যাচ্ছে! পয়সা পেয়ে তবুও নড়ে না যে! নিশ্চয় আরও কিছু পাবার মতলব আছে ওর মনে মনে। সুশীল চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলে, কাছাকাছি কেউ নেই। পকেটে টাকা তিনটে ছাড়া সোনার বোতামও আছে জামায়, হঠাৎ এখন মনে পড়লো।

ও উত্তর দিলে—কলকাতাতেই বাড়ি, বালিগঞ্জে। আমার কাকা পুলিসে কাজ করেন কিনা, এদিকে রোজ বেড়াতে আসেন মোটর নিয়ে। এতক্ষণে এলেন বলে, রেড রোডে মোটর রেখে এখানেই আসবেন। আমি এখানে থাকি রোজ, উনি জানেন।

—বেশ বাবু, আপনাকে দেখেই বড় ঘরানা বলে মনে হয়।

সুশীলের মনে কৌতূহল হওয়াতে সে বললে—তুমি কোথায় থাক?

—মেটেবুরুজে বাবুজি।

—কিছু করো নাকি?

—জাহাজে কাজ করতাম, এখন কাজ নেই। ঘুরি ফিরি কাজের খোঁজে। রোটির যোগাড় করতে হবে তো?

লোকটার সম্বন্ধে সুশীলের কৌতূহল আরও বেড়ে উঠল। তা ছাড়া লোকটার কথাবার্তার ধরনে মনে হয় লোকটা খুব খারাপ ধরনের নয় হয়ত। সুশীল বললে— জাহাজে কতদিন খালাসিগিরি করছ?

—দশ বছরের কুছু ওপর হবে।

—কোন্ কোন্ দেশে গিয়েছ?

—সব দেশে। যে দেশে বলবেন সে দেশে। জাপান লাইন, বিলেত লাইন, জাভা সুমাত্রার লাইন—এস. এস. পেনগুইন, এস. এস. গোলকুণ্ডা—এস. এস. নলডেরা, পিয়েনোর বড় জাহাজ নলডেরা, নাম শুনেছেন?

'পিয়েনো' কি জিনিস, পল্লীগ্রামের সুশীল তা বুঝতে পারলে না। না, ওসব নাম সে শোনেনি।

—তা বাবুজি, আপনার কাছে ছিপাবো না। সরাব পিয়ে পিয়ে কাজটা খারাবি হয়ে পড়ল, জাহাজ থেকে ডিসচার্জ করে দিলে। এখন এই কোষ্টো যাচ্ছে, মুখ ফুটে কাউকে বলতে ভি পারিনি। কী করবো, নসিব বাবুজি!

—জাহাজের কাজ আবার পাবে না?

—পাবো বাবুজি, ডিসচার্জ সাটিক-ফিটিক্ ভাল আছে। সরাব টরাবের কথা ওতে কুছু নেই। কাপ্তানটা ভাল লোক, তাকে কেঁদে গোড়-পাকড়ে বললাম—সাহেব আমার রোটি মেরো না। ওকথা লিখ না!

লোকটি আর-একটু কাছে এসে ঘেঁষে বসল। বললে—আমার নসিব খারাপ বাবু—নয় তো আমায় আজ চাকরি করে খেতে হবে কেন? আজ তো আমি রাজা!

সুশীল মৃদু কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞাসা করলে—কি রকম?

লোকটি এদিক ওদিক চেয়ে সুর নামিয়ে বললে—আজ আর বলব না। এইখানে কাল আপনি আসতে পারবেন?

—কেন পারব না?

—তাই আসবেন কাল। আচ্ছা বাবু, আপনি পুরানো লিখা পড়তে পারেন?

wapsip.com

সুশীল একটু আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কী লেখা?

—সে কাল বাৎলাবো। আপনি কাল এখানে আসবেন, তবে, বেলা থাকতে আসবেন—সুরয ডুববার আগে।

মামার বাসায় এসে কৌতূহলে সুশীলের রাতে চোখে ঘুমই এল না। এক-একবার তার মনে হল, জাহাজী মাল্লা কত দূর কত দেশ ঘুরেছে, কোন এক আশ্চর্য ব্যাপারের কথা কি তাকে বলবে? কোন্ নতুন দেশের কথা? পুরনো লেখা কিসের?···

ওর ছোট মামাতো ভাই সনৎ ওর পাশেই শোয়। গরমে তারও চোখে ঘুম নেই। খানিকটা উশখুশ করার পরে সে উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। বললে—দাদা চা খাবে? চা করব?

—এত রাত্তিরে চা কী রে?

—কী করি বল। ঘুম আসছে না চোখে—খাও একটু চা।

সনৎ ছেলেটিকে সুশীল খুব পছন্দ করে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, লেখা-পড়াতেও ভাল, ফুটবল খেলায় এরই মধ্যে বেশ নাম করেছে, কলেজ টীমের বড়-বড় ম্যাচে খেলবার সময় ওকে ভিন্ন চলে না।

সনৎ-এর আর একটা গুণ, ভয় বলে কোন জিনিস নেই তার শরীরে। মনে হয় দুনিয়ার কোন কিছুকে সে গ্রাহ্য করে না। দু-বার এই স্বভাবের দোষে তাকে বিপদে পড়তে হয়েছিল, একবার খেলার মাঠে এক সার্জেন্টের সঙ্গে মারামারি করে, নিজে তাতে মার খেয়েছিলও খুব—মার দিয়েছিলও। সেবার ওর বাবা টাকাকড়ি খরচ করে ওকে জেলের দরজা থেকে ফিরিয়ে আনেন। আর একবার মাহেশের রথতলায় একটি মেয়েকে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে গুণ্ডার ছুরিতে প্রায় প্রাণ দিয়েছিল আর-কি। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক যুবকদল ওকে গুণ্ডাদের মাঝখান থেকে টেনে উদ্ধার করে আনে।

সুশীল বললে—সনৎ, কতদূর লেখাপড়া করবি ভাবছিস?

—দেখি দাদা। বি. এস-সি. পর্যন্ত পড়ে একটা কারখানায় ঢুকে কাজ শিখব। কলকব্জার দিকে আমার ঝোঁক, সে তো তুমি জানোই—

—আমি যদি কোন ব্যবসায় নামি, আমার সঙ্গে থাকবি তুই?

—নিশ্চয়ই থাকব। তুমি যেখানে থাকবে, যা করবে—আমি তাতে থাকি এ আমার বড় ইচ্ছে কিন্তু। কী ব্যবসা করবে ভাবছ দাদা?

—আচ্ছা, কাউকে এখন এসব কিছু বলিস নে। তোকে আমি জানাবো ঠিক সময়ে। তোকে নইলে আমার চলবে না। চল আজ শুয়ে পড়ি—রাত দুটো বাজে—

পরদিন সুশীল গড়ের মাঠে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে একা বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল—তবুও লোকটির দেখা নেই।

অন্ধকার নামল। আসবে না সে লোক? হয়ত নয়। কি একটা বলবে ভেবেছিল কাল, রাতারাতি তার মন ঘুরে গেছে।

রাত আটটার সময় সুশীল উঠতে যাবে, এমন সময়ে পেছনে পায়ের শব্দ শুনে সে চেয়ে দেখলে।

পরক্ষণেই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

লোকটা ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে।

—সেলাম, বাবুজি! মাপ করবেন, বড় দেরি হয়ে গেল। এই দেখুন—

wapsip.com

লোকটার পায়ের ওপর দিয়ে ভারি একটা জিনিস চলে গিয়েছে যেন। সাদা কাপড়ের ব্যান্ডেজ বাঁধা—কিন্তু ব্যান্ডেজ রক্তে ভিজে উঠেছে।

সুশীল বললে—এঃ, কী হয়েছে পায়ে?

—এই জন্যেই দেরি হয়ে গেল বাবুজি। বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আর একটা ভারী হাতেঠেলা গাড়ি পায়ের ওপর এসে পড়ল। দু-জন লোক ঠেলছিল, তাদের সঙ্গে মারামারি হয়ে গেল আমার সঙ্গের লোকদের।

—বসো বসো। তোমার পায়ে দেখছি সাঙ্ঘাতিক লেগেছে! না এলেই পারতে!

—না এলে আপনি তো হারিয়ে যেতেন। আপনাকে আর পেতাম কোথায়? রিকশা করে এসেছি বাবুজি, দাঁড়াতে পারছি নে!

লোকটা ঘাসের ওপর বসে পড়ল। বললে—আজ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বাবুজি, আজ কোন কাজ হবে না।

লোকটা কথা বলবে, সুশীল শুনবে। এতে দিনের আলোর কী দরকার, সুশীল বুঝতে পারলে না। বললে—কী কথা বলবে বলেছিলে—বলে যাও না?

লোকটা ধীরে ধীরে চাপা গলায় অনেক কথা বললে—মোটামুটি তার বক্তব্য এই :—

তার বাড়ি আগে ছিল পশ্চিমে। কিন্তু অনেকদিন থেকে সে বাঙলা দেশে আছে এবং বাঙালী খালাসীদের সঙ্গে কাজ করে বাঙলা শিখেছে। লোকটা মুসলমান, ওর নাম জামাতুল্লা। একবার কয়েকজন তেলেগু লস্করের সঙ্গে সে একটা জাহাজে কাজ করে—ডাচ ঈস্ট ইন্ডিজের বিভিন্ন দ্বীপে নারকোল-কুচি বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেত মাদ্রাজ থেকে। সেই সময় একবার তাদের জাহাজ ডুবো-পাহাড়ে ধাক্কা লেগে অচল হয়ে পড়ে। সৌরাবায়া থেকে তাদের কোম্পানির অন্য জাহাজ এসে তাদের জাহাজের মাল তুলে নিয়ে যাবার আগে সাতদিন ওরা সেইখানে পড়েছিল। একদিন সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে জাহাজসুদ্ধ লোকের কলেরা হল।

এইখানে সুশীল জিজ্ঞেস করলে—সবারই কলেরা হল?

—কেউ বাদ ছিল না বাবু। খাবার পাওয়া যেত না, পাহাড়ের একটা গর্তে কাঁকড়া পেয়ে সেদিন ওরা তাই ধরেছিল। ছোট-ছোট—লাল কাঁকড়া।

—তারপর?

—দু-জন বাদে বাকি সব সেই রাত্রে মারা গেল। বাবুজী, সে রাতের কথা ভাবলে এখনও ভয় হয়। সতেরো জন দিশি লস্কর আর দু-জন ওলন্দাজ সাহেব—একজন মেট আর একজন ইঞ্জিনীয়ার—সেই রাত্রে সাবাড়। রইলাম বাকি কাপ্তান আর আমি।

তারপর জাহাজের কাপ্তান ওকে বললে—মড়াগুলো টান দিয়ে ফেলে দাও জলে—

ও বললে—আমি মুর্দাফরাশ নই সাহেব, ও আমি ছোঁব না—

সাহেব ওকে গুলি করে মারতে এল। ও গিয়ে লুকোলো ডেকের ঢাকনি খুলে হোল্ডের মধ্যে। সেই রাত্রে কাপ্তান সাহেব খুব মদ খেয়ে চিৎকার করে গান গাইছে—ও সেই সময় জাহাজের বোট খুলে নিয়ে নামাতে গেল।

ডেভিট থেকে বোট নামাবার শব্দে সাহেবের মদের নেশা ভাঙল না তাই নিস্তার—ডেকের ওপরে তখন দুটো মড়া পড়ে রয়েছে—মরণের বীজ জাহাজের সর্বত্র ছড়ানো, ভয়ে ও কিছু খায়নি সকাল থেকে, পাছে কলেরা হয়। সুতরাং অনাহারে ও ভয়ে খানিকটা দুর্বলও হয়ে পড়েছে।

wapsip.com

দূরে ডাঙা দেখা যাচ্ছিল, দুপুরের দিকে ও লক্ষ্য করেছিল। সারা রাত নৌকো বাইবার পর ভোরে এসে বোট ডাঙায় লাগল। ও নেমে দেখে ডাঙায় ভীষণ জঙ্গল— ওদেশের সব দ্বীপেই এ ধরনের জঙ্গল ও জানত। লোকজনের কোন চিহ্ন নেই কোনদিকে।

বোট ডাঙায় বেঁধে ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দু-দিন হাঁটলে, শুধু গাছের কচি পাতা আর এক ধরনের অম্ল-মধুর ফল খেয়ে। মানুষের বসতির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় এসে হঠাৎ একেবারে ও অবাক হয়ে গেল।

ওর সামনে প্রকাণ্ড বড় সিংহদরজা—কিন্তু বড় বড় লতাপাতা উঠে একেবারে ঢেকে ফেলে দিয়েছে। সিংহদরজার পর একটা বড় পাঁচিলের খানিকটা—আরও খানিক গিয়ে একটা বড় মন্দির, তার চুড়ো ভেঙে পড়েছে—মন্দিরের গায়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি বলে তার মনে হল। সে ভারতের লোক, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি সে চেনে। এ ক্ষেত্রে হয়ত সে ঠিক চিনতে পারে নি—তবে তার ওইরকম বলেই মনে হয়েছিল।

অবাক হয়ে সে আরও ঘুরে ঘুরে দেখলে। জায়গাটা একটা বহুকালের পুরোনো শহরের ভগ্নস্তূপ মনে হল। কত মন্দির, কত ঘর, কত পাথরের সিংহদরজা, গভীর বনের মধ্যে বড় বড় কাছির মত লতার নাগপাশ বন্ধনে জড়িয়ে কত যুগ ধরে পড়ে আছে। ভীষণ বিষধর সাপের আড্ডা সর্বত্র। একটা বড় ভাঙা মন্দিরে সে পাথরের প্রকাণ্ড বড় মূর্তি দেখেছিল—প্রায় আট দশ হাত উঁচু।

সন্ধ্যা আসবার আর বেশি দেরি নেই দেখে তার বড় ভয় হয়ে গেল। এ সব প্রাচীন কালের নগর শহর—জিন পরীর আড্ডা, তেলেগু লস্করেরা যাকে ওদের ভাষায় বলে 'বিহ্মমুনি'।

বিহ্মমুনি বড় ভয়ানক জিন, হিন্দুদের পুরোহিত মারা যাওয়ার পর বিহ্মমুনি হয়। এই গহন অরণ্যের মধ্যে লোকহীন পরিত্যক্ত বহু প্রাচীন নগরীর অলিতে গলিতে ঝোপে ঝোপে ধূম্রবর্ণ, বিকটাকার, কত যুগের বুভুক্ষু বিহ্মমুনির দল সন্ধ্যার অন্ধকার পড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিকারের সন্ধানে জাগ্রত হয়ে উঠে হাঁক পাড়ে—ম্যয় ভুখা হুঁ! তাদের হাতের নাগালে পড়লে কি আর রক্ষে আছে? অতএব এখান থেকে পালানোই একমাত্র বাঁচবার পথ।

সুশীল এক মনে শুনছিল,—পালিয়ে গেলে কোথায়?

—সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আবার দু-দিন তিন দিন ধরে হেঁটে সমুদ্রের ধারে পৌঁছুলাম। জাহাজে উঠব এসে এই তখন খেয়াল।

—আবার সেই মড়া-ভর্তি জাহাজে কেন?

—বুঝলেন না বাবুজি? যদি জাহাজে উঠি, তবে তো দেশে পৌঁছুবার ঠিকানা মেলে। নয়তো সেই জংলি মুলুকে যাবো কোথায়? চারিধারে সমুদ্র, যদি জাহাজ না পাই তবে সেই জংলি মুলুকে না খেয়ে মরতে হবে—নয়তো জংলি লোকেরা খুন করে ফেলবে। বাবুজি, তখন এমন ডর, যে রাতে ঘুমুতে পারি নে। একদিন প্রকাণ্ড এক বনমানুষের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম—নসিবের জোর খুব। অমন ধরনের জানোয়ার যে দুনিয়ায় আছে তা জানতাম না। গাছের ওপর একদল বনমানুষ ছিল— ধাড়িটা আমায় দেখতে পেলে না বাবুজি, দেখলে আর বাঁচতাম না।

সুশীল মনে মনে একবার চিন্তা করে দেখলে। লোকটা মিথ্যা কথা বলছে না সত্যি বলছে, ওর এই বনমানুষের কথা তার একটা মস্ত বড় পরীক্ষা। সুশীল জন্তুজানোয়ার সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়াশুনো করেছিল, বাড়িতে আগে নানা রকম পাখি, বেঁজি, খরগোশ, শজারু, ও

wapsip.com

বাঁদর পুষত। গাঁয়ের লোকে ঠাট্টা করে বলত, 'মুস্তফিদের চিড়িয়াখানা'। এ সম্বন্ধে ইংরাজি বইও নিজের পয়সায় কিনেছিল।

ও বললে—কত বড় বনমানুষ?

—খুব বড় বাবুজি। ইন্দোরের পালোয়ান রামনকীব সিং-এর চেয়েও একটা বাচ্চার গায়ে জোর বেশি। নিজের আঁখ্‌সে দেখলাম।

—কী করে দেখলে?

—ডাল ফাঁড়লে হাত আর পা দিয়ে ধরে! আমার মাথার ওপর গাছপালার ডালগুলো তো বনমানুষে বিলকুল ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।

—তবে তো তুমি সুমাত্রা দ্বীপে কিংবা বোর্নিওতে গিয়েছিলে কিংবা ওর কাছাকাছি কোন ছোট দ্বীপে। তুমি যে বনমানুষ বলছ—ও হচ্ছে ওরাং ওটাং—ও ছাড়া আর কোন বনমানুষ ও দেশে থাকবে না—

লোকটা হঠাৎ অত্যন্ত বিস্ময়ে সুশীলের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল—দাঁড়ান—দাঁড়ান, বাবুজি, কী জায়গার নাম করলেন আপনি?

—সুমাত্রা আর বোর্নিও—

—ওঃ, বাবুজি, আপনি বহুৎ পড়ালিখা আদমি! এই নাম কতকাল শুনিনি জানেন? আজ দশ বারো বছর। শেষের নামটা—কী বললেন বাবুজি? বোর্নিও? ঠিক। সুলু সী'র নাম জাহাজী চার্টে দেখবেন। সুলু সী'র কাছাকাছি, এপার ওপার। কেন জানেন বাবুজি? এই নাম শুনলে আমার বহুত কথা মনে পড়ে যায়! তাজ্জব কথা! আজ দেখচেন আমায় এই গড়ের মাঠে বসে দু-একটা পয়সা ভিক্ষে করছি—কিন্তু আমি আজ—আচ্ছা, সে কথা এখন থাক।

—তারপর কী করলে বল না! জঙ্গল থেকে এসে উঠলে আবার জাহাজে?

—হ্যাঁ, উঠলাম। সেই কাপ্তান তখন মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে নিজের কেবিনে চাবি দিয়ে ঘুমুচ্ছে—আমি আগে তো ভাবলাম মরে গিয়েছে। মড়াগুলো কতক কাপ্তান ফেলে দিয়েছে—কতক তখনও রয়েচে। ভীষণ বদ গন্ধ—আর সেই গরম! আমি জাহাজের কিছু খেতে পারিনে কলেরার ভয়ে। ডাঙায় গিয়ে মাছ ধরতাম—আর কচ্ছপ।

—কাপ্তেন বেঁচে ছিল?

—বেঁচে ছিল, কিন্তু বেচারির মগজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল একেবারে। তখনকার দিনে বেতার ছিল না, আমাদের জাহাজে যে অমন হয়ে গেল, সে খবর কোথাও দেওয়া যায় নি। ওসব দিকের সমুদ্রে জাহাজ বেশি চলাচল করে না—জাহাজের লাইন নয়। এগারো দিন পরে সৌরাবায়া থেকে জাহাজ যাচ্ছিল পাসারাপং,—তারা আমাদের আগুন দেখে এসে জাহাজে তুলে নিয়ে বাঁচায়।

—কিসের আগুন?

—ডুবো পাহাড়ের খানিকটা ভাঁটার সময় বেরিয়ে থাকত। পাটের থলে জ্বালিয়ে সেখানে রোজ আগুন করতাম—অন্য জাহাজের যদি চোখে পড়ে। তাতেই তো বেঁচে গেলাম।

এ পর্যন্ত শুনে সুশীল বুঝতে পারলে না লোকটার ভাগ্য কিসে ফিরেছিল। তবে লোকটা যে মিথ্যা কথা বলছে না, ওর কথার ধরন থেকে সুশীলের তা মনে হল। কিন্তু এইবার লোকটা যে কাহিনী বললে, তা শেষ পর্যন্ত শুনে সুশীল বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল—অল্পক্ষণের জন্য সারা গড়ের মাঠ, এমন কি বিরাট কলকাতা শহরটাই যেন তার সমস্ত

wapsip.com

আলোর মালা নিয়ে তার চেখের সামনে থেকে গেল বেমালুম মুছে—বহু দূরের কোন বিপদসঙ্কুল নীল সমুদ্রে সে একা পাড়ি জমিয়েছে বহুকালের লুকোনো হীরে-মানিক-মুক্তোর সন্ধানে—পৃথিবীর কত পর্বতে, কন্দরে, মরুতে, অরণ্যে অজানা স্বর্ণরাশি মানুষের চোখের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—বেরিয়ে পড়তে হবে সেই লুকোনো রত্নভাণ্ডারের সন্ধানে—পুরুষ যদি হও! নয় তো আপিসের দোরে দোরে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের মত ঘুরে ঘুরে সেলাম বাজিয়ে চাকুরির সন্ধান করে বেড়ানোই যার একমাত্র লক্ষ্য, তার ভাগ্যে নৈব চ, নৈব চ!

এই খালাসীটা হয়ত লেখাপড়া শেখে নি, হয়ত মার্জিত নয়—কিন্তু এ সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে এসেছে, দুনিয়ার বড় বড় নগর বন্দর, বড় বড় দ্বীপ দেখতে কিছু বাকি রাখে নি—এ একটা পুরুষ মানুষ বটে—কত বিপদে পড়েছে, কত বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছে!

বিপদের নামে ত্রিশ হাত পেছিয়ে থাকে যারা, গা বাঁচিয়ে চলবার ঝোঁক যাদের সারা জীবন ধরে, তাদের দ্বারা না ঘুচবে অপরের দুঃখ, না ঘুচবে তাদের নিজেদের দুঃখ। লক্ষ্মী যান না কাপুরুষের কাছে, অলসের কাছে—তাদের তিনি কৃপা করেন যারা বিপদকে, বিলাসকে, আরামপ্রিয়তাকে তুচ্ছ বোধ করে।

জাহাজ সৌরাবায়া এসে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের দু-জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সত্যিই ক্লান্তিতে, অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায়, অখাদ্য ভক্ষণে ওদের শরীর ভেঙে পড়েছিল। দিন পনেরো হাসপাতালে শুয়ে থাকবার পরে ক্রমশ ওর শরীর ভাল হয়ে গেল—কাপ্তেনের মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণও ক্রমে দূর হল।

ওদের জন্যে কিছু টাকা চাঁদা উঠেছিল, ও হাসপাতাল থেকে যেদিন বাইরে পা দিলে, সেদিন এক দয়াবতী মেমসাহেব ওকে টাকাটা দিয়ে গেলেন। দুঃস্থ নাবিকদের থাকবার জন্যে গভর্নমেন্টের একটা বাড়ি আছে—সেখানে ওকে বিনি খরচায় থাকবার অনুমতি দেওয়া হল।

এই বাড়িতে সে প্রায় দু-মাস ছিল, তারপর অন্য জাহাজে চাকরি নিয়ে ওখান থেকে চলে আসে। তারপর পাঁচ-সাত বছর কেটে গেল। ও যেমন জাহাজে কাজ করে তেমনি করে যাচ্ছে। প্রাচ্য-দেশের বড় বড় বন্দরের মদের দোকান ও জুয়ার আড্ডার সঙ্গে তখন সে সুপরিচিত।

একবার তাদের জাহাজ ম্যানিলাতে থেমেছে। ও অন্যান্য লস্করদের সঙ্গে গিয়ে এক পরিচিত জুয়ার আড্ডায় উঠেছে—এমন সময়ে আড্ডাধারী এসে ওকে বললে—একবার এসো তো! তোমাদের দেশের একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ও অবাক হয়ে বললে—আমাদের দেশের?

আড্ডাধারী চীনাম্যান হেসে বললে—হ্যাঁ, ইন্ডিয়ার। এতকাল দোকান করছি বন্দরে, ইন্ডিয়ার মানুষ চিনিনে?

ও আড্ডাধারীর পিছু পিছু গিয়ে দেখলে জুয়ার আড্ডার পেছনে একটা পায়রার খোপের মত ছোট্ট ভীষণ নোংরা ঘরে একজন লোক শুয়ে। লোকটার বয়স কত ঠিক বোঝবার জো নেই—চল্লিশও হতে পারে, আবার ষাটও হতে পারে। বিছানার সঙ্গে যেন সে মিশে গিয়েছে বহুদিন ধরে অসুখে ভুগে।

ওকে দেখে লোকটা ক্ষীণ কণ্ঠে তেলেগু ভাষায় বললে—দেশের লোককে দেখতে পাইনে। যখন হংকং হাসপাতালে ছিলাম, অনেক দেশের লোক দেখতাম সেখানে। বসো এখানে। আহা, ভারতের লোক তুমি! মুসলমান? তা কী? এতদূর বিদেশে তুমি শুধু ভারতের

wapsip.com

লোক, যে দেশের মাটিতে আমার জন্ম, সেই একই দেশের মাটিতে তোমারও জন্ম। এখানে তুমি আমার ভাই।

ও রোগীর বিছানার পাশে বসল। সেই অপরিচিত মুমূর্ষু স্বদেশবাসীকে দেখে ওর মনে একটা গভীর অনুকম্পা ও মমতা জেগে উঠল—যেন সত্যিই কতকালের আপনার জন।

রোগী বললে—আমার নাম নটরাজন, ত্রিবেন্দ্রাম শহর থেকে এগারো মাইল দূরে কাটিউপ্পা বলে ছোট্ট একটি গ্রামে আমার বাড়ি। কোচিন থেকে যে স্টীমলঞ্চ ছাড়ে ত্রিবেন্দ্রাম যাবার জন্যে, সে স্টীমার আমার গ্রামের ঘাট ছুঁয়ে যায়। বেউয়া কাপ্পিয়াম নদীর ধারে, চারিধারে ঘন আর ছোট ছোট পাহাড়—কেটিউপ্পা গ্রাম তুমি দেখ নি, বুঝতে পারবে না সে কী চমৎকার জায়গা! আমি অনেক দেশ বেড়িয়েছি পৃথিবীর, ভবঘুরে হয়ে চিরদিন কাটিয়ে দিলাম জীবনটা—কিন্তু আমি তোমায় বলছি শোন, ভারতবর্ষের মধ্যে তো বটেই, এমনকি পৃথিবীর মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর একটি অদ্ভুত সুন্দর দেশ। কিন্তু আমার দেশের বর্ণনা শোনাবার জন্যে আজ তোমায় আমি ডাকি নি। আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, কাল যে সূর্যদেব উঠবে আকাশে, তা আমি চোখে বোধহয় দেখতে পাব না—তুমি আমার দেশবাসী ভাই, একটা উপকার করবে আমার?

—কী বলুন? আপনি আমার চাচার বয়সী, যা হুকুম করবেন বলুন। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করব।

রোগীর পাণ্ডুর মুখ অল্পক্ষণের জন্যে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—নিবু-নিবু প্রদীপের শিখার মত। ওর দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—কথা দিলে? কিন্তু ভীষণ লোভ দমন করতে হবে ভাই!

—আল্লার নামে বলছি, যা করতে বলবেন, তাই করব।

—আমার মাথার বালিশের তলায় একটা চামড়ার ব্যাগ আছে, সেটা বার করে নাও। আমার মৃত্যুর পরে ব্যাগটা আমার গ্রামে আমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবে।

ও রোগীর মাথাটা সন্তর্পণে একধারে সরিয়ে আস্তে আস্তে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ বার করলে। ব্যাগের মধ্যে কতগুলো কাগজপত্র ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হল না ওর।

বৃদ্ধ নটরাজন বললে—তোমার কাছে আমি কোন কথা লুকোব না। ব্যাগটার মধ্যে একখানা ম্যাপ আছে—জীবনে অনেক সাহসের কাজ করেছি, অনেক বনে জঙ্গলে ঘুরেছি—অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছি। এই ম্যাপখানা এবং ব্যাগের মধ্যে যা যা আছে—তা আমি সৎপথে থেকে হস্তগত করি নি। সংক্ষেপে কথাটা বলে নিই, কারণ বেশি বলবার আমার সময় বা শক্তি নেই। আজ বিশ বাইশ বছর আগে এই ব্যাগ আমার হস্তগত হয়। যে ম্যাপখানা এই ব্যাগের মধ্যে আছে—তার সাহায্যে যে-কোন লোক দুনিয়ায় মহা ধনী লোক হয়ে যেতে পারে। সুলু সী'র একটা খাড়ির ধারে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন আমলের এক নগরের ভগ্নস্তূপ আছে। সেই নগর প্রাচীন যুগের এক হিন্দু রাজ্যের রাজধানী ছিল। তার এক জায়গায় প্রচুর ধনরত্ন লুকোনো আছে। যার কাছ থেকে এ ম্যাপ আমি পাই, সে আমারই বন্ধু, দু-জনে মিলে সুলু সমুদ্রে বোম্বেটেগিরি করেছি দশ বছর ধরে। সে জাতিতে মালয়, ম্যাপ তার তৈরি—সে নিজে ওই শহরের সন্ধান খুঁজে বার করেছিল। সেখানে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে, সামান্য কিছু পাথর ছাড়া সে বেশি কোন জিনিস আনতে পারে নি সেখান থেকে। তার নিজের লেখা জাহাজের লগ বুকের (Log Book) কয়েকখানা পাতা আমি মালয় ভাষা থেকে নিজের সুবিধার জন্যে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে নিই সৌরাবায়াতে এক

wapsip.com

গরিব মালয় স্কুল মাস্টারকে ধরে। সেই অনুবাদের কাগজখানাও এই ব্যাগের মধ্যে আছে। তারপর ম্যাপখানা হস্তগত করে আমি নিজে অনেক খোঁজাখুঁজি করি—কিন্তু সুলু সমুদ্র ও ওদিকের বহুশত বসতিহীন ও বসতিযুক্ত ছোট ও বড় দ্বীপ—তাদের প্রত্যেকটিতে ভীষণ জঙ্গল। ম্যাপও যা আছে, তা খুব নিখুঁত নয়—মোটের ওপর সে দ্বীপ আমি বার করতে পারিনি। দেশের গ্রামে আমার ছেলে আছে, তাকে নিয়ে গিয়ে ম্যাপটা আর ব্যাগ দিও। এর মধ্যে আর একটা জিনিস আছে—আমার বোম্বেটে বন্ধু সেই প্রাচীন শহরে একটা জিনিস পায়। জিনিসটা একটা সীলমোহর বলেই মনে হয়। একখানা গোটা পদ্মরাগ মণির ওপর সীলমোহরটা খোদাই করা। সেটা এর মধ্যে আছে। সেই মোহরের ওপর যে অদ্ভুত চিহ্নটি আঁকা আছে—আমার বিশ্বাস ছিল, সেটা একটা বড় হদিস ওই প্রাচীন নগরীর রত্নভাণ্ডারের। তাই ওখানা আমি কবচের মত গলায় ঝুলিয়ে বেড়িয়েছি এতদিন। কিন্তু আজ বুঝেছি আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। উনিশ বছর আগে গ্রাম থেকে যখন চলে আসি, তখন আমার ছেলে ছিল দু-বছরের—আর আমার স্ত্রী পুত্রকে দেখিনি এই উনিশ বছরের মধ্যে। বেঁচে থাকলে আজ সে একুশ বাইশ বছরের যুবক। তার হাতে এগুলো সব দিয়ে বলে দিও, বাপের ছেলে যদি হয়, সে যেন খুঁজে বার করে সেই নগরী, তার বাপ যা পারেনি। আর আমার কিছু বলবার নেই! ব্যাগটা নাও হাতে তুলে।

রোগী এই পর্যন্ত বলে ক্লান্তিতে চোখ বুজলো। চীনা আড্ডাধারীর ইঙ্গিতে ও রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সুশীল বললে—তারপর?

—বাবুজি, যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, নটরাজন বাঁচল কি মারা গেল সেদিকে কোন খেয়াল করিনি। আমার মাথা তখন ঘুরছে। ব্যাগ খুলে দেখলাম কতকগুলো পুরোনো কাগজপত্র ও ম্যাপখানা ছাড়া আর কিছুই নেই। পদ্মরাগ মণিটা নেড়ে-চেড়ে দেখে কিছু বুঝলাম না—ওসব জিনিসের আমরা কী বুঝি বলুন! কিন্তু তখন আমার আর একটা বড় কথা মনে হয়েছে। নটরাজন যখন ওর গল্প করছিল, আমার মনে পড়ল সাত বছর আগের সেই ঘটনা। জাহাজে সেই কলেরা হওয়া, আমার জাহাজ থেকে পালানো এবং বন জঙ্গলের মধ্যে সেই বিষ্ণুমুনির দেশের মধ্যে গিয়ে পড়া, বুঝলেন না বাবুজি?

—খুব বুঝেচি, বলে যাও।

—আমার মনে হল, আমি সেখানে গিয়ে পড়েছিলাম ঘুরতে ঘুরতে। সে পুরোনো শহর আমি দেখেছি। নটরাজন যা বের করতে পারে নি, আমি সেখানে একটা গোটা দিন কাটিয়েচি। এই জায়গা সুলু সী-র ধারে, তাও আমি জানি। যদিও ঠিক বলতে পারব না হয়ত—কিন্তু দূর থেকে দেখলে বোধ হয় চিনব।

—ত্রিবাঙ্কুরের সেই গাঁয়ে গেলে না?

লোকটা বললে, প্রথমে ওর লোভ হয়েছিল খুব। পদ্মরাগ মণিটার দাম যাচাই করে দেখা গেল প্রায় দেড় হাজার টাকা দাম সেটার। তা ছাড়া আরও লোভ হল, নটরাজনের ছেলেকে ম্যাপ দেবার কী দরকার? এই ম্যাপের সাহায্যে সে-ই তো জায়গাটা খুঁজে বার করতে পারে। বিশেষ করে একবার যখন সেখানে সে গিয়েছিল। কিন্তু তিন চার দিন ভাবার পরে ওর মনে হল মরবার আগে বিশ্বাস করে নটরাজন ওর হাতে জিনিসগুলো সঁপে দিয়েছে তার ছেলেকে দেবার জন্যে। এখন যদি না দেয়, তবে নটরাজনের ভূত ওর পেছনে লেগে থাকবে, হয়ত বা মেরেও ফেলতে পারে। অতএব খানিকটা ইচ্ছা এবং খানিকটা অনিচ্ছাতে সেখানে যেতে সে

wapsip.com

বাধ্যই হল। বড় মজার ব্যাপার ঘটল কিন্তু সেখানে।

সুশীল বললে—কি রকম?

—বাবুজি, অনেক কষ্ট করে বেউয়া কাপ্পিয়াম নদীর ধারে সেই কেটিউপ্পা গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছুলাম। দেখলাম নটরাজন মিথ্যে বলে নি, নদীটা একেবারে ওদের গ্রামের নিচে দিয়েই গিয়েছে বটে। নিজের পকেট থেকে যাওয়ার খরচ করলাম। গাঁয়ে গিয়ে যাকেই জিজ্ঞেস করি, কেউ নটরাজনের ছেলের খোঁজ দিতে পারে না। নটরাজনের কথাই অনেকের মনে নেই। দু-একজন বুড়ো লোক বললে, নটরাজনকে তারা চিনত বটে—তবে অনেকদিন আগে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তার স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে তারা জানে না।

—তারপর?

—মানে খানিকটা আনন্দ যে না হল তা নয়। ছেলেকে যদি সন্ধান না করতে পারি তবে আমার দোষ কী! তবুও একে ওকে জিজ্ঞেস করি। শেষকালে গাঁয়ের কাছারিতে কি ভেবে গিয়ে খোঁজ করলাম। তারা শুনে বললে, অনেকদিন আগে নজরাজনের জায়গা-জমি নীলাম করতে হয়েছিল খাজনা না দেওয়ার জন্যে। নীলামের নোটিশ তারা পাঠিয়েছিল ত্রিবেন্দাম শহরে।

—পেলে খুঁজে?

—ঠিকানা তো খুঁজে বার করলাম। ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ি, নারকেল গাছের বাগান সামনে। শহরের মধ্যে বাড়িটা নয়, শহর থেকে মাইল খানেক দূরে। অনেক ডাকাডাকির পর এক বুড়ি এসে দোর খুলে দিলে। মাথার চুল সব সাদা হয়েছে, অথচ মুখ দেখে খুব বয়স হয়েছে বলে মনে হয় না। বললে—কাকে চাও? আমি বললাম—নটরাজনের ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বুড়ী আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে—ও নাম কোথায় শুনলে? ও নাম তো কেউ জানে না! আমি তখন সব কথা বুড়ীকে বললাম। শুনে বুড়ি কেঁদে ফেললে। বললে—আমার ছেলে আজ নিরুদ্দেশ, তার বাপের মত সেও বেরিয়েছে—আজ তিন বছর হয়ে গেল। কোন খবর পাই নি।

—তুমি কী করলে?

—এই কথা শুনে আমার বড় কষ্ট হল, বাবুজি। আমি সেখানে বুড়ির বাড়ি সাত আটদিন রইলাম। তাকে মা বলে ডাকি। বুড়িও আমার বড় যত্ন করতে লাগল। বুড়ি বড় গরিব—ভাড়াটে ঘরে থাকে। তার ছেলে স্কুলে পড়ত। সে রাঁধুনিগিরি করে ছেলের পড়ার খরচ ও নিজেদের খরচ চালাতো। এখনও সে নারকেল তেলের গুদামের শেঠজীদের বাড়ি রাঁধে। কোনরকমে একটা পেট চলে যায়। বুড়িকে পদ্মরাগ মণিটা আমি দেখাইনি—

—এত কষ্ট করে গিয়ে ওটার বেলা ফাঁকি দিলে?

—ওই যে নটরাজন বলেছিল, পদ্মরাগ মণির গায়ে একটা আঁক-জোক আছে—যা হদিস দেবে হীরেজহরতের—ওই হল ওখানা না দেওয়ার গোড়ার কথা। ভাবলাম কী জানেন? ভাবলাম এই, নটরাজনের ছেলে না-পাত্তা—বুড়ির কাজ নয় ম্যাপ দেখে সুলু সী যাওয়া আর সেই দ্বীপের মধ্যে লুকানো শহর খুঁজে বার করা। যদি ওকে দিই ওগুলো এখানে পড়ে নষ্ট হবে। তার চেয়ে যদি আমি নিই, হয়ত চেষ্টা করলে একদিন না একদিন আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছুতেও পারি। যদি হীরে জহরত পাই, বুড়িকে আমি ভালভাবে খোরপোশ দিয়ে রাখব। কিন্তু যদি পদ্মরাগ মণিখানা দিয়ে দিই—তবে হদিসটা হাতছাড়া হয়ে গেল। বুড়ি এখুনি অপরকে মণি বিক্রি করবে। যে কিনবে, সে মণির গায়ে আঁকা সীলমোহরের কোন

wapsip.com

মানেই বুঝবে না। লোহার সিন্দুকে আটকা থাকবে জিনিসটা। তাতে কারও কোনো উপকার নেই। কী বলেন আপনি?

—তোমার যুক্তি মন্দ না। যদিও আমার মনে হয় জিনিসটা দেওয়াই তোমার উচিত ছিল। যাদের জিনিস, তারা সেটা নিয়ে যা খুশি করুক না কেন। তোমার ওপর শুধু পৌঁছে দেওয়ার ভার। সেটা তুমি রাখলে নিজের কাছে?

—হাঁ বাবুজি। এই দেখুন আমার কাছেই আছে। আসুন ওই আলোর কাছে।

সুশীল আলোর নিচে গিয়ে বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে ওর প্রসারিত করতলের ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ল। মস্ত একখানা পাথর, একটু চেপ্টা গড়নের, উজ্জ্বল সবুজ রঙের—তার ওপর খোদাই-কাজ করা।

সুশীল ওর হাত থেকে সীলমোহরটা নিয়ে দেখলে উল্টেপাল্টে। খোদাই-কাজ করা এত বড় পাথর সে কখনও দেখে নি। বড় সাইজের একটা কলার লেবেঞ্চুসের মত। সীলমোহরের মধ্যে চেয়ে সে অবাক হয়ে গেল—বড় একটা ওঁকারের 'ওঁ'র লেজ জড়িয়ে জড়িয়ে পাকিয়েছে একটা বটগাছ কিংবা অন্য কোন গাছকে। তারপর সে আরও ভাল করে চেয়ে দেখলে—আসলে ওটা ওঁকার নয়, যদিও সেইরকম দেখাচ্ছে বটে। কোন নাগদেবতার মূর্তি হওয়াও বিচিত্র নয়। ত্রিভুজাকৃতি কি একটা আঁকা রয়েছে ছবির বাঁ-দিকে। কোন নাম বা সন-তারিখ নেই।

লোকটা বললে—কিছু বুঝলেন বাবু?

—নাঃ, তবে হিন্দুর সঙ্গে এ জিনিসের সম্পর্ক আছে বলে মনে হল। দেড় হাজার টাকার জিনিসটা তুমি যে বড় বিক্রি করে ফেল নি এতদিন?

—ওই যে নটরাজন বলেছিল এই খোদাই-করা আঁকজোকের মধ্যে আসল মালের হদিস পাওয়া যাবে—সেই লোভেই একে হাতছাড়া করে ফেলি নি।

—নটরাজনের স্ত্রী কোথায়?

—তাকে কেটিউপ্পা গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। মাসে মাসে টাকা পাঠাই। শহরে খরচ বেশি, গাঁয়ে খরচ কম। ঘর ভাড়া লাগে না। সেই সেদিনও পাঁচ টাকা ডাকে পাঠিয়েছি। এখন চাকরি নেই—নিজের পেটই চলে না।

—কাগজপত্র আর ম্যাপগুলো?

—ওই নটরাজনের স্ত্রী—তাকে আমি মা বলি—সেখানে তার কাছেই আছে। সঙ্গে নিয়ে বেড়াইনে, বড্ড দামী ও দরকারী জিনিস—আমার কাছে থাকলে হারিয়ে যেতে পারে। সে বুড়ি তার বেতের পেঁটরায় তুলে রেখে দিয়েছে, যখন দরকার হবে, নিয়ে আসব গিয়ে।

—এসব আজ কত বছরের কথা হল?

—বেশি দিনের নয়। আজ দু-বছর আগে আমি নটরাজনের গাঁয়ে গিয়ে বুড়ির সঙ্গে প্রথম দেখা করি।

—তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোন। এই মানিকখানা বিক্রি করে ফেলে টাকাটা নটরাজনের স্ত্রীকে দাওগে। তার জীবনটা একটু ভালভাবে কাটবে। দেড় হাজার টাকা হাতে পেলে সে খুব খুশি হবে। তাদেরই জিনিস ধর্মত দেখতে গেলে, তোমার নিজের কাছে রাখা মানে চুরি করা।

—কিন্তু বাবু, তাহলে হদিস চলে গেল যে।

—যাবে না। প্যারিস প্লাস্টারের ছাঁচে ওটা তুলে নিলেই চলে। ওই ছবিটার সঙ্গে তোমার

wapsip.com

সম্পর্ক। মানিকখানা যার জিনিস, তাকে দাও ফিরিয়ে। তুমি যখন মা বলে ডাকো, তখন তার আশীর্বাদ তোমার বড় দরকার। মানিকখানা যদি বুড়ি বিক্রি করে, যে কিনবে সে ওর খোদাই ছবির কোন মানে করতে পারবে না, তার কোন কাজেই লাগবে না।

—বেশ বাবুজি, আপনিই কাজটা করিয়ে দিন না?

—কাল এটা সঙ্গে করে নিয়ে আমার সঙ্গে এখানে দেখা কোরো। আমার একটা জানাশুনো লোক আছে, সে এইসব কাজ করে—তাকে দিয়ে করিয়ে দেব।

রাত হয়ে গিয়েছিল। সুশীল মাঠ থেকে ফিরতে ফিরতে কত কথাই ভাবলে। তার মাথার মধ্যে যেন কেমন করছে। এ যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর মত অদ্ভুত! এমনভাবে গড়ের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে একজন মুসলমান লস্করের সঙ্গে দেখা হবে—সে তাকে এমন একটি আজগুবি গল্প বলে যাবে—এ কখনো সে ভেবেছিল? গল্পটা আগাগোড়া গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতেও পারত সে, যদি ওই চুনির সীলমোহরখানা সে না দেখত নিজের চোখে।

লোকটার গল্প যে সত্যি, তা ঐ পাথরখানা থেকে বোঝা যাচ্ছে। সন তারিখ ও জায়গা মিলিয়ে এমনভাবে সে গল্প বলে গেল—যা অবিশ্বাস করা শক্ত। সুশীল ওকে শেষের দিকে যে প্রশ্নটা করেছিল, অর্থাৎ কতদিন আগে বুড়ির সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল, সেটা শুধু সময় সম্বন্ধে তাকে জেরা করা মাত্র।

সুশীল বাড়ি গিয়ে সনৎকে বললে—এই কলকাতা শহরেই অনেক মজা ঘটে যায় দেখছি।

সনৎ বললে—কী দাদা?

—সে একটা অদ্ভুত গল্প। যদি বলবার দরকার বুঝি তবে বলব—

পরদিন গড়ের মাঠে আবার সে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে রইল। একটু পরে জামাতুল্লা খালাসী এসে ওর পাশে নিঃশব্দে বসে পড়ল। বললে—আমার কথা ভাবলেন বাবুজী?

—চল আমার সঙ্গে। একটা ছাঁচ তোমাকে করিয়ে দিই। এনেছ ওটা?

—হাঁ বাবুজী। দেখুন, আমি ভিক্ষে করে খাচ্ছি আজ দু-মাস, তবুও এত বড় দামী পাথরটা বিক্রি করি নি শুধু বড় একটা লাভের আশায়। কিন্তু যত দিন যাচ্চে, তত আমার মনে হচ্চে নসিব আমার খারাপ, নইলে সেই জায়গায় গিয়েও তো কিছু করতে—

—জামাতুল্লা, তুমি লেখাপড়া-জানা লোক না হলেও খুব বুদ্ধি আছে। একা তুমি কিছু করতে পারবে না তা বেশ বোঝ। এ কাজে টাকা চাই, লোক চাই, জাহাজ চাই। অনেক টাকার খেলা সে সব। তোমার অত টাকা নেই। মিছে কেন নটরাজনের স্ত্রীর পাওনা জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত করবে?

দু-একদিনের মধ্যে প্যারিস প্লাস্টারের ছাঁচটা হয়ে গেল। সুশীল প্রাচীন ধনী বংশের সন্তান, ওর যে ছাঁচ গড়িয়ে দিলে, সে ভাবলে ওদের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি এটা। ফেরত দেওয়ার সময় সে বললে—এটা আমার এক বন্ধুকে একবার দেখতে দেবে?

—কেন বল তো?

—আমার সে বন্ধু মিউজিয়মে কাজ করে। পণ্ডিত লোক। যদি গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এটা কিনে নেওয়া হয় তাই বলছি।

—তাকে তোমার স্টুডিওতে কাল নিয়ে এসো।

wapsip.com

পরদিন জামাতুল্লাকে নিয়ে সুশীল বন্ধুর স্টুডিওতে গিয়ে দেখলে একটি সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক সেখানে বসে আছেন।

বন্ধুটি বলে উঠল—এই যে এসো সুশীল, ইনি এসে অনেকক্ষণ বসে আছেন— আলাপ করিয়ে দিই—ডাঃ রজনীকান্ত বসু, এম. এ., পি. এইচ. ডি—মিউজিয়মে সম্প্রতি চাকুরিতে ঢুকেছেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাঃ বসু পদ্মরাগের সীলমোহরের ওপর ঝুঁকে পড়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠে বললেন—এ জিনিসটা আপনি পেলেন কোথায়?

সুশীলের আর্টিস্ট বন্ধু বললে—ওটা ওদের বংশের জিনিস। ওরা পল্লীগ্রামের প্রাচীন ধনী বংশ।

ডাঃ বসু সন্দিগ্ধ মুখে বললেন—কিন্তু এ তো তা নয়! এ যে বহু পুরোনো জিনিস! এ আপনারা পেয়েছিলেন কোথায় তার ইতিহাস কিছু জানেন? যদি বলতে বাধা না থাকে—

সুশীল বললে—না ডাঃ বসু, আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না। আপনি কী আন্দাজ করছেন।

ডাঃ বসু বললে—দেখুন, সীলমোহরের ওপর এ চিহ্ন আমি নিজে কখনো দেখি নি—তবে এই ধরনের পাথরের ওপর সীলমোহর ওঁকারভাটে পাওয়া গিয়েছে। ফরাসী ইন্দোচীনের জঙ্গলের মধ্যে বহু পুরোনো নগরের ধ্বংসস্তূপে। এর সময় নির্দিষ্ট হয়েছে মোটামুটি খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী। আমাদের মিউজিয়ামেও আছে—কাল যাবেন, দেখাবো। কিন্তু আপনার এটা আরও পুরানো, আমি একে নির্ভয়ে নবম শতাব্দীতে ফেলে দিতে পারি—কিংবা তারও আগে।

সুশীল বললে—আপনার তাই মনে হয়?

—নিশ্চয়ই। নইলে বলতাম না। আর সেইজন্যেই আপনাকে জিগ্যেস করছি আপনাদের পূর্বপুরুষে এটা পেলেন কি করে? এ হল সমুদ্রপারের জিনিস। বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের আমগাছের ছায়ায় শান্ত ও নিরীহ জিনিস নিয়ে কারবার—কিন্তু এ সীলমোহরের পেছনে রয়েছে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার দুর্দান্ত সাহস, দুর্জয় বিক্রম, যুদ্ধ, রক্তপাত—ভারতবাসী যেদিন সমুদ্রের ওপারে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেইসব দিনের ইতিহাস এ সীলমোহরের সঙ্গে জড়ানো। তাই বলছি, এটা আপনারা পেলেন কী করে?

ওখান থেকে বার হয়ে আসবার সময়ে সুশীলের মনে টাকার স্বপ্ন ছিল না।

ছিল যে সুদূরের, দুঃসাহসিক অভিযানের স্বপ্ন—জামাতুল্লা খালাসীর অত বড় পদ্মরাগ মণিখানার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না।

সে এমন এক দিনের স্বপ্ন—যা প্রত্যেক ভারতবাসীর আত্মসম্মানকে জাগ্রত করে, তরুণদের প্রাণে নতুন আশা, উৎসাহ ও আনন্দের সংবাদ আনে বয়ে—

তবু তা সুশীলের মনে যে ছবি জাগালে তা আদৌ স্পষ্ট নয়—সবই আবছায়া, সবই ধোঁয়া-ধোঁয়া। সুশীল ইতিহাসের ছাত্র নয়। ডাঃ বসুর শেষ কথা-কটির সঙ্গে যেন এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক শক্তি মেশানো ছিল—তার চোখের সামনে প্রাচীন কালের সুদীর্ঘ অলিন্দ বেয়ে তলোয়ার হাতে বর্মে চর্মে সুসজ্জিত বীরের দল সারি সারি চলেছে, মৃত্যুকে তারা ভয় করে না—অজানা সমুদ্রপথে তাদের বিজয় অভিযান নব উপনিবেশের ইতিহাস সৃষ্টি করে

wapsip.com

ভাবীকালের অসহায় ও অকর্মণ্য সন্তানদের শিরায় শিরায় নতুন রক্তের আলোড়ন এনে দেয়।

কোথায় সে পড়ে আছে পাড়াগাঁয়ে, পুরোনো জমিদার-ঘরের বিলাসপুষ্ট আয়েসী ছেলেটি সেজে—তাদেরই পূর্বপুরুষ একদিন যে অসি হাতে সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিল—তাদেরই স্বজাতি, স্বদেশবাসী—আর সে থাকবে দিব্যি আরামে তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে, তেলে জলে, দাদখানি চালের ভাত আর মাছের ঝোলে কোনরকমে পৈতৃক বাঙালী প্রাণটুকু বজায় রেখে চলবে টায় টায়!

চিরকাল হয়ত এমনি কেটে যাবে তার।

প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করে, পুরোনো চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক টেনে আর পালপার্বণে গ্রাম্য লোকজনের পাতে দই মোণ্ডা দিয়ে হাততালি অর্জন করবার প্রাণপণ চেষ্টায় মশগুল হয়ে।

তার পর আছে মামলা মোকর্দমার তদারক করতে কোর্টে ছুটোছুটি—ডিক্রি, নালিশ, কিস্তিবন্দী, সইমোহরের নকল, সমন জারি—উঃ! ভাবলে তার গা কেমন করে। প্রাচীন ধনী বংশের লাল খেরো-বাঁধানো রোকড় ও খতিয়ানের চাপে সে নিজের যৌবন ও জীবনকে একদম পিষে মেরে ফেলে শেষের দিকে যখন মহকুমার হাসপাতালে একটি মাত্র রোগী থাকবার স্থানের টাকা জেলাবোর্ডের হাতে দেবে স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতি-রক্ষা কল্পে—তখন হয়ত সে পাবে রায়সাহেব বা রায়বাহাদুর খেতাব।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভাববে, এই তো জীবনের পরম সার্থকতা সে পেয়ে গেছে।

না দেখবে দুনিয়া—না দেখবে জীবন, ঠুলিপরা বলদের মত ঘানিগাছের চারিধারে ঘুরেই জীবন কাটাবে।

রাত্রে সে সনৎকে ডেকে বললে—সনৎ, তোর সাহস আছে?

—কেন দাদা?

—আমি যদি বিদেশে বেরুই, আমার সঙ্গে যাবি?

—এখুনি—যদি নিয়ে যাও!

—অনেক দূরে হলেও?

—যেখানে বল।

—বাড়ির জন্যে মন কেমন করবে না?

—আমি পুরুষ মানুষ না দাদা? ও কথাই ওঠে না!

—আমি এমনি জিগ্যেস করছি—

পরদিন সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে পড়ল পুরোনো দিনের বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস। যে সব কথা সে জানত না, কোনদিন শোনে নি—ডাঃ বসুর কথায় তার ইচ্ছে গেল সেগুলো জানবার ও পড়বার।

বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের কাহিনী, চম্পা রাজ্যের কথা—সুদূর সমুদ্রপারের ভারতীয় উপনিবেশ চম্পা। ভারতবাসী অসির তীক্ষ্ণাগ্রভাগ দিয়ে যে দেশের মাটি পাথরের গায়ে নাগরাজ বাসুকী, শিব-পার্বতী ও বিষ্ণুমূর্তি অমর করে রেখেছে।

জামাতুল্লা খালাসীকে সে একশোবার ধন্যবাদ জানালো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে পড়তে পড়তে।

সে তো এক পাড়াগাঁয়ে অলস জীবন যাপন করছিল—

কোনদিন এসব কথা সে জানতেও পারত না—এত বড় ছবি তার মনে কোনদিন

wapsip.com

জাগতও না—যদি দৈবক্রমে জামাতুল্লা খালাসী সেদিন তার পাশে এসে বসে দেশলাই না চাইত।

তুচ্ছ এক পয়সার দেশলাই।

পড়ার টেবিলে বসে বসেই সুশীলের হাসি পেল কথাটা ভেবে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে বার হয়েই জামাতুল্লা খালাসীর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

মাঠের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে আছে। সুশীলকে দেখে সে বললে—আসুন বাবু, কাল রাতে এক কাণ্ড হয়ে গেছে!—আপনার সঙ্গে দেখা করব বলে—

সুশীল বাধা দিয়ে বললে—কী—কী?

জামাতুল্লা বললে—সে এক আজগুবি কাণ্ড বাবু—

—কী রকম ব্যাপার?

—আপনার সেই বন্ধুর বাড়ি থেকে পাথরখানা নিয়ে কাল ফিরছি বাবু, মেটেবুরুজের কাছে ছোটমোল্লাখালি বলে যে বস্তি ওই বস্তির কাছে আমার এক দোস্ত থাকে। ভাবলাম, চা খেয়ে যাই। সেখানে একেবারে মানুষ নেই—ফাঁকা মাঠ, সিকিমাইল দূরে ছোটমোল্লাখালি বস্তি। হঠাৎ বাবু আমার মনে হল আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, কে যেন আমার গলা দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে—আমি তো চেঁচিয়ে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম—কিন্তু পড়ে গেলাম চিৎপাত হয়ে মাঠের মধ্যে—পেছনে সে সময় পায়ের শব্দ শুনলাম যেন—

সুশীল ব্যস্ত হয়ে বললে—পাথরখানা আছে তো?

—শুনুন বাবু, তারপর। আমি এমন কাণ্ড কখনো দেখিনি। চিৎপাত হয়ে পড়ে আর জ্ঞান নেই। যখন জ্ঞান হল তখন দেখি আমার চারিপাশে দু-তিন জন লোক দাঁড়িয়ে, তারা কেউ পানি এনে আমার চোখে মুখে দিচ্ছে, কেউ গামছা নেড়ে বাতাস করছে। আমার দোস্তর নাম বলতে তারা আমায় ছোট মোল্লাখালি নিয়ে গেল তার বাড়িতে। সেখানে গিয়ে যখন আমার হুঁশ বেশ ভাল ফিরে এল, আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখি পাথরখানা নেই।

—বল কী? নেই! গেল সেখানা!

—শুনুন বাবু আজগুবি কাণ্ড! পাথর নেই দেখে তো আমি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। দোস্তর বাড়ি তো শোরগোল পড়ে গেল। কত লোক দেখতে এল—আমার দোস্ত কতবার মুখে চোখে পানি দিয়ে ডাক্তার ডেকে আমায় চাঙ্গা করলে। আমি সেই রাত্রেই বাড়ি চলে গেলাম—

—তারপর?

—বাবু আপনি বলুন একটা কথা। আমি কাল আপনার দোস্তর কাছে দেখাতে গিয়েছিলাম কী নিয়ে? যে ছাঁচ তৈরি হয়েছিল তাই নিয়ে—না আসল পাথরখানা নিয়ে? আপনার ওই যে দোস্ত খুব এলেমদার লোক, তার কাছে?

—ও, ডাঃ বসুর কাছে তুমি তো আসল পাথরখানা নিয়ে গেছলে।

—ছাঁচখানা নিয়ে যাই নি ঠিক তো? কিন্তু বাবু বাড়ি ফিরে দেখি আসল পাথরখানা পকেটে রয়েছে, ছাঁচখানা নেই।

সুশীল হো-হো করে হেসে বললে—এ কোন আজগুবি কাণ্ড হল না জামাতুল্লা। তুমি দু-খানাই নিয়ে গেছলে। যে তোমার গলা টিপেছিল সে ছাঁচখানাকে ভুল করে নিয়ে গেছে—আসলখানা তোমার পকেটেই রয়ে গিয়েছিল। কোন্ পকেটে কোন্টা রেখেছিলে মনে আছে?

wapsip.com

—বাবু আমি ছাঁচটা নিয়েই যাই নি—

—আমি বলছি শোন। তুমি ভুলে দুটোই নিয়ে গেছলে। কিন্তু এ থেকে আমাদের সাবধান হতে হবে। কেউ আমাদের পাথরের খবর পেয়েছে—কলকাতা গুণ্ডা বদমাইশের জায়গা—আমরা ক-দিন ধরে এখানে পাথরের কথা বলেছি, তত সাবধান হইনি। এখানেও শুনতে পারে, সেদিন ডাঃ বসুর ওখানে দুটো আরদালি দাঁড়িয়ে ছিল—আমার সন্দেহ হয় তাদের মধ্যে কেউ শুনতে পারে। যাক, ভালই হয়েছে যে আসলখানা চুরি যায় নি! আজ তোমার সঙ্গে নেই তো সেখানা?

—না বাবু। আমি কি আর তেমনি উজবুক?

—লোক লেগেছে আমাদের পেছনে। খুব সাবধানে চলাফেরা করবে।

জামাতুল্লা হেসে বললে—বাবু, লোক লেগে আমায় হঠাৎ কিছু করতে পারবে না। সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি—কত বদমাইশ লোকের সঙ্গে কতবার কারবার করেছি। এই হাতদুটো যে দেখছেন—এ দুটো ঠিক থাকলে এর সামনে কেউ এগুতে পারবে না জানবেন খোদার দোওয়ায়।

সুশীল একবার চারদিকে চেয়ে দেখলে—কোনদিকে কোন লোক নেই। সঙ্গীকে চুপিচুপি বললে—এসব কথা এখন নয়। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?

—কোথায় বাবুজি?

—আমার বাসায়। সেখানে ঘরের মধ্যে বসে সব কথা হবে এখন।

জামাতুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে সুশীল তাদের বাসায় এল। আসার পথে কোন কিছু অঘটন ঘটে নি দেখে সুশীলের মন থেকে ভয় ও বিপদাশঙ্কা অনেকখানিই চলে গেল। জামাতুল্লাকে কিছু খেতে দিয়ে ও তার জন্যে বাইরের ঘরের কোণে বিছানা করে দিলে।

জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, বিছানা কেন?

—রাত্রে এখানে তোমায় রাখব। যেতে দেব না মেটেবুরুজে। সাবধানের মার নেই। খিদিরপুরের মাঠ থেকে মেটেবুরুজ পর্যন্ত জায়গা বড্ড নির্জন—গুণ্ডা বদমাইশদের আড্ডা। রাত্রে সে পথে গেলে বিপদ আছে। তোমার যত সাহসই থাকুক—রাত্রে যাওয়া হবে না।

সুশীলের এ সতর্কতার জন্যে জামাতুল্লাকে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকতে হয়েছিল।

রাত্রে আহারাদির পরে সুশীল জামাতুল্লাকে বললে—আমার মতলব তোমাকে বলব বলেই তোমায় ডেকেছি। আমার মনে হয়েছে আমরা যে করেই হোক—চল সেই বনের মধ্যে প্রাচীন নগরের সন্ধানে বেরুই। টাকাকড়ির সন্ধান আমি করছি নে—পাই ভালো, তা আমি একা নেব না—নটরাজনের স্ত্রীর শেষ দিনগুলো যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটে তার ব্যবস্থা করব তা দিয়ে। তারপরে তুমি আছ, আমি আছি। ভগবানের আশীর্বাদে আমার ঘরে খাবার ভাবনা নেই।

জামাতুল্লা খালাসী ঘাড় নেড়ে বললে—সে আমি আগেই জানি বাবু—আপনি রইস্ আদমি—মানুষ দেখেই চিনতে পারি। নইলে আপনাকে এত বিশ্বাস করতাম না। বড় ঘরানা আপনারা, আপনাদের নজর হবে বড়।

—তাছাড়া কী জানো জামাতুল্লা? এই বয়স হচ্ছে বিদেশ বেড়ানোর সময়। চিরকাল বাড়ি বসে থাকব যদি, তবে দুনিয়া দেখব কবে?··· তোমার সাহস আছে আমায় সেখানে নিয়ে যাবার তো?

wapsip.com

—এ বাবুজি সাহসের কথা নয়। জাহাজ চালানো বিদ্যের কথা—কৌশলের কথা। সিঙ্গাপুরে আমার এক দোস্ত আছে তাকে খুঁজে বার করতে হবে। সে সুলু স্বী তে জাহাজ চালিয়েছে অনেক দিন—আপনার কাছে ছিপাবো না, বোম্বেটের কাজ করত সে। এখন বড্ড কড়া শাসন, ওলন্দাজ সরকার আর আমাদের ইংরাজ সরকারের। মানোয়ারী জাহাজ সর্বদা ঘুরছে। বোম্বেটে জাহাজ ধরতে পারলেই ধরে নিয়ে আসবে—আর গুলি করবে। সেজন্যে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে দোকান করে বসে আছে সিঙ্গাপুরে। তাকে সঙ্গে নিতে হবে।

—তাহলে কী রকম ব্যবস্থা করবে যাবার?

—আপনি টাকা কত নিতে পারবেন বলুন।

—শ-পাঁচেক। তার বেশি এক পয়সা নয়।

—তাও নেবেন না। আপনি আমার দোস্ত—দুশো নিয়ে চলুন। আমি পাথর বিক্রি করে ফেলি—সেই টাকায় চালাবো।

—সে টাকা তোমায় আমি নিতে দেব না জামাতুল্লা। নটরাজনের স্ত্রীকে বঞ্চিত করে সে পাথর নিয়ে আমাদের ফল ভাল হবে না। নটরাজন স্বর্গ থেকে দেখবে আর অভিশাপ দেবে।

—এইজন্যেই তো বলি, রইস্ আদমির বুদ্ধি আর আমাদের বুদ্ধি! আপনি যা বলবেন বাবুজি।

অনেক রাত হয়েছিল। জামাতুল্লার বিশ্রামের বন্দোবস্ত করে দিয়ে সুশীল নিজে শোবার জন্যে চলে গেল বটে—কিন্তু তার সারা রাত ঘুম এল না চোখে। এবার কী ক্ষণে সে বাড়ি থেকে বার হয়েছিল! সাগর-পারের যাত্রী হয়ে যদি সেই অজানা দ্বীপে অরণ্যের মধ্যে প্রাচীন যুগের হিন্দু-কীর্তি শুধু চোখের দেখা দেখে আসতে পারে—তবেই সে জীবন সার্থক বিবেচনা করবে। চম্পারাজ্যের মত সেখানেও আর এক হিন্দু উপনিবেশ ছিল নিশ্চয়ই—মহাকালের চক্রনেমির আবর্তনে অরণ্য গ্রাস করেছে সে নগরী—তবুও ভারতের সন্তান সে, প্রাচীন যুগের সেই পুণ্যভূমির পবিত্র ধূলি স্পর্শ করে সে ধন্য হতে চায়।

অর্থের জন্যে সে যাচ্ছে না।

পরদিন সকালে উঠে সুশীল জামাতুল্লাকে চা ও খাবার খেতে দিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে বসেছে—এমন সময় কাগজওয়ালা খবরের কাগজ দিয়ে গেল; সুশীল কাগজ খুলে সংবাদগুলোর ওপর সাধারণভাবে চোখ বুলোতে গিয়ে হঠাৎ উত্তেজিত সুরে বলে উঠল—জামাতুল্লা, আরে, তোমাদের মেটেবুরুজে খুন!...

জামাতুল্লা চা খেতে খেতে চমকে উঠে বললে—কোথায় বাবু, কোথায়?

—দু নম্বর মফিজুল সর্দারের লেন, একটা কুঠুরিতে নূর মহম্মদ নামে একটা লোককে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে—

সুশীল কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখলে জামাতুল্লা তালপাতার মত কাঁপছে—অতি কষ্টে সে সুশীলকে জিজ্ঞেস করলে—কী নাম লোকটির বাবুজী?

—নূর মহম্মদ—

জামাতুল্লা চা ফেলে উঠে এসে সুশীলের হাত ধরে বললে—আপনি আমার সবচেয়ে বড় দোস্ত—কাল এখানে রেখে আপনি আমার জান বাঁচিয়েছেন! নূর মহম্মদ আমার ঘরেই থাকে। এক বিছানাতে দুজনে শুই—কাল আমি থাকলে আমাকেই মারত, আমি ভেবে ভুল করে ও বেচারিকে খুন করে গিয়েছে—

সুশীল বলে—তুমি এখুনি বাড়ি যাও—সেই জিনিসটা—

wapsip.com

—না বাবু, সে আমি অন্য জায়গায় রেখেছি—সেখান থেকে কেউ সেটা বের করতে পারবে না।

সুশীল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে—তবুও একবার যাও—

—সেটা নিয়ে বাবুজি আপনাদের বাড়িতে রেখে দিন আপনি—মেহেরবানি করে যদি রেখে দেন!

—নিশ্চয়ই রাখব। তুমি একা যেও না—চল আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। আমার ভাই সনৎকে সঙ্গে নেব।

পাথরখানা এনেই সুশীল কয়েকদিনর মধ্যে তার আর-একখানা ছাঁচ করিয়ে নিয়ে সেখানা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এল। ওসব জিনিস সঙ্গে রাখলেই যত গোলমাল।

কিন্তু ব্যাঙ্কে রাখবার কয়েকদিন পরেও ঘটে গেল এক বিপদ।

সুশীল তখন হাজার দুই টাকার ব্যবস্থা একরকম করে ফেলেছে। তার কাকাই টাকাটা তাকে দেবেন—তবে সে বলেছে ব্যবসার জন্যেই ওটা দরকার—বিদেশে যাওয়ার কথা শুনলে কেউ উৎসাহ দিত না। ওর সঙ্গে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে রাজী, সনৎ একথা জানিয়েছে।

সুশীল বৌবাজার দিয়ে গিয়ে জামাতুল্লাকে ট্রামে দিয়ে এল। ট্রাম পরবর্তী থামবার জায়গায় যাবার পূর্বেই ট্রামে এক শোরগোল উঠল।

জামাতুল্লা ট্রামের বেঞ্চিতে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের একজন লোক নেমে গেল—নেমে যাবার সময় একবার যেন তার হাতখানা জামাতুল্লার পিঠের দিকে ঠেকল…অন্তত জামাতুল্লার তাই মনে হল। পরক্ষণেই জামাতুল্লা রক্তাক্ত দেহে চিৎপাত ট্রামের মেঝেতে!

লোকজন হৈ-হৈ—পুলিশ! পুলিশ! সবাই মিলে ওকে ধরাধরি করে নামিয়ে ফেললে।

শেষে দেখা গেল ওর বিশেষ কিছু লাগে নি এবারও। একখানা ধারালো ছুরি দিয়ে বোধহয় আততায়ী কোমরের থলে কাটতে চেষ্টা করেছিল। ছুরিখানা দৈবাৎ তলপেটের পাশের দিকে লেগে খানিকটা অগভীর রেখা সৃষ্টি করে লম্বালম্বিভাবে কেটে গিয়েছে।

এই ঘটনার ঠিক সাতদিন পরে সুশীল, সনৎ ও জামাতুল্লা তিনজনে একখানা রেঙ্গুনগামী জাহাজে চড়ে বসল—আপাতত সিঙ্গাপুর এবং সেখান থেকে ব্যাটেভিয়া যাবে এই হল উদ্দেশ্য ওদের।

মাস দুই পরের কথা। সকালবেলা।

সুশীল সিঙ্গাপুরের ভারতীয় পাড়ায় একটি ছোট শিখ হোটেলের একটা ঘরে বসে সনৎকে বলছিল—আমরা এখানে এসে ভাল করলাম কি মন্দ করলাম এখনও বুঝি নি সনৎ। জামাতুল্লার বোম্বেটে বন্ধু তো দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির লোক—ও হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। ওকে কি খুব বিশ্বাস করা উচিত হল?

—বিশ্বাস না করেই বা উপায় কী দাদা? ও ছাড়া সুলু সমুদ্রে জাহাজ চালাবে কে? তবে আমার মনে হয় যখন আমাদের কাছে এমন কোন মূল্যবান জিনিস নেই—তখন সে অনর্থক মানুষ খুনের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে যাবে কেন?

এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। জামাতুল্লা তার বোম্বেটে বন্ধু মিঃ ইয়ার

wapsip.com

হোসেনকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ইয়ার হোসেন ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে একটা চুল-ছাঁটা দোকান করে ভাড়াটে চীনে নাপিত দিয়ে চুল ছাঁটায়—রোজগার মন্দ হয় না। বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর বয়স হবে, রোগা চেহারা—চোখের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ভালমানুষ ও নিরীহ ধরনের বলে মনে হয়—পরনে সাহেবী পোশাক। লোকটা ভারতীয় নয়, মালয়ও নয়—কোন্ দেশের লোক তা কখনো বলে নি। তবে তার কথাবার্তা থেকে মনে হয় ভারতের ওপর টানটা তার বেশি। কথাবার্তা বলে ইংরাজিতে, নয়ত মালয় ভাষায়। তার ভাঙা ইংরাজি জামাতুল্লা বেশ বোঝে।

এ ধরনের লোকের সঙ্গে কখনো সুশীল বা সনৎ-এর পরিচয় ঘটে নি ইতিপূর্বে। বাইরে মোটামুটি ভদ্রলোক, এমন কি বেশ নিরীহ প্রকৃতির প্রৌঢ় ভদ্রলোক—কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইয়ার হোসেন দুর্দান্ত দস্যু। মুহূর্তের মনোমালিন্যের ফলে যারা বন্ধুর বুকে অতর্কিতে তীক্ষ্ণধার কিরীচ বসিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না—এ সেই জাতীয় লোক।

ইয়ার হোসেন ঘরে ঢুকে বললে—বসে আছেন? আমায় আর দুশো টাকা দিতে হবে—দরকার রয়েছে।

সুশীল জামাতুল্লার মুখের দিকে চাইলে অতি অল্পক্ষণের জন্যে। জামাতুল্লা চোখের ইঙ্গিতে তাকে বলে দিলে ইয়ার হোসেনকে যেন সে প্রত্যাখান না করে।

—কত টাকা বললেন মিঃ হোসেন?

—দুশো কি আড়াইশো—

—বেশ, নেবেন। সেদিন নিয়েছেন একশো—

ইয়ার হোসেন যেন খানিকটা উদ্ধত সুরে বললে—নিয়েছি তো কী হবে? তোড়জোড় করতেই সব টাকা যাচ্ছে—

—জাহাজের কী হল? চার্টার করবেন?

—জাহাজ চার্টার করবার টাকা কোথায়? কিন্তু আচ্ছা, একটা কথা বলি। আপনারা সে বিম্ভমুনির দেশে যেতে চাইছেন কেন? টাকা-কড়ি হীরে-জহরত সেখানে সত্যি আছে?

—কী করে বলি সাহেব! তবে, তোমার কাছে লুকুব না। খুব বড় রত্নভাণ্ডার সেখানে লুকোন আছে এই আমাদের বিশ্বাস। ওই মণির ওপর আঁকজোঁক আছে—ওটাই তার হদিস—অন্তত নটরাজন তাই বলেছিল।

—আমি চেষ্টা করে দেখব—কিন্তু আমার ভাগ ঠিক তিন ভাগের এক ভাগ চাই। ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলেই বিপদ ঘটবে। এই হাতে অনেক মানুষ খুন করেছি, সে কথা কে না জানে? মানুষ মারাও যা, আমার কাছে পাখি মারাও তা।

সুশীলের গা যেন শিউরে উঠল। কাজের খাতিরে এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের সঙ্গে আজ তাকে মিশতে হচ্ছে—ভাগ্য কী জানি কোন্ পথ তাকে নির্দেশ করছে! মুখে বললে—না সাহেব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—ফাঁকে তুমি পড়বে না।

ইয়ার হোসেন বললে—একটা গল্প বলি শোন তবে। একবার আমার জাহাজে ছ-সাতজন মাল্লা মদ খেয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। তাদের দলে একজন সর্দার ছিল, সে এসে আমায় জানালে, এই-এই শর্তে আমি রাজী না হলে তারা আমার হাত পা বাঁধবে—মেরে ফেলতেও পারে। আমি ওদের সান্ত্বনা দিয়ে শর্তে সই করে দিলাম। তারপর ইঞ্জিন রুমের বড় কর্মচারীকে ডেকে বললাম—জাহাজে কয়লা দিয়েই স্টীম বন্ধ করে ফার্নেসের মুখ খুলে রাখবে।

ইঞ্জিনিয়ার বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—কেন কাপ্তেন সাহেব—এ

wapsip.com

তো বড় বিপজ্জনক ব্যাপার—সেই ভীষণ উত্তাপে ফার্নেসের মুখ খুলে রাখব?

সে বেচারি আমার মতলব কিছু বুঝলে না। আমি সেই বিদ্রোহী সর্দারকে আর তার চারজন অনুচরকে বললাম ফার্নেসে কয়লা দিতে। এদিকে ইঞ্জিন-রুমে টেলিগ্রাফে ইঞ্জিনিয়ারকে পুরোদমে স্টীম দিতে বলেই ওরা ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে পুলি ঘুরিয়ে জাহাজ প্রায় পঁচিশ ডিগ্রি কোণ করে স্টারবোর্ডের দিকে কাত করে ফেললাম। টাল সামলাতে না পেরে ওরা হঠাৎ গিয়ে পড়ল খোলা ফার্নেসের মুখে। লোক ঠিক করা ছিল, তক্ষুনি তারা ওদের ফার্নেসের আগুনে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়ে ফার্নেসের দরজা ঘটাং করে বন্ধ করে দিলে।

সনৎ ও সুশীল রুদ্ধনিশ্বাসে বললে—তারপর?

—তার পর? তারপর দু-দিন পরে কতকগুলো আধপোড়া হাড় পোড়া কয়লার ছাইয়ের সঙ্গে ফার্নেস-সাফ-করা কুলি সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে। মিউটিনির শেষ হয়ে গেল।

—কেউ টের পেলে না?

—সবগুলো বদমাইশ যখন ও পথে গেল—তখন বাকিগুলো আপনা আপনিই চুপ করে গেল। ভালমানুষির দিন চলে গিয়েছে জানবেন। নিষ্ঠুর হতে হবে, নির্মম হতে হবে—তবে মানুষের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে পারবেন।

সুশীল বুঝল না এমন নিরীহ ভালমানুষটির আড়ালে কী করে এমন গূঢ় ও নির্মম চরিত্র লুকোনো থাকতে পারে।

—আর একটা কথা—অস্ত্রশস্ত্র কেমন আছে আপনাদের?

—কিছু না, একটি করে অটোম্যাটিক আছে দু-জনের—তার কার্টিজ নেই।

—রাইফেল নেই?

—ভারত থেকে রাইফেল কেনা? মিঃ হোসেন, এবার আপনি হাসালেন।

ইয়ার হোসেন দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা বড় রিভলভার নিয়ে এসে সুশীলের হাতে দিয়ে বললে—পছন্দ হয়?

—ওঃ, এ তো চমৎকার জিনিস।

—এই কিনব তিনটি তিনজনের, আর একটা পুরোনো মেশিনগান—

—মেশিনগান কী হবে!

—অনেক দরকার আছে।

সুশীল ও সনৎ দু-জনেই দেখলে সে অনেক রকম জানে শোনে। জাহাজ চালানোর যন্ত্রাদি কিনবার সময়—তার যে কিছু কিছু বিজ্ঞানের জ্ঞানও আছে—এ পরিচয়ও পাওয়া গেল। চাল-চলনে, ধরন-ধারণে—সে সর্বদাই মনে করিয়ে দেয় যে সে সাধারণ নয়।

সুশীল জামাতুল্লাকে বললে—তুমি বলেছিলে দুশো টাকা হলেই হবে—তো এখন দেখছি পাঁচশো টাকাই মিঃ হোসেন নিয়ে নিলে নানা ছুতো করে; হাতে কিন্তু এক পয়সাও রইল না—

—কোন ভয় নেই বাবুজি, আমি যখন আছি। ও তেমন লোক নয়।

—লোক নয় কী রকম? ভয়ানক লোক, আমরা বুঝেছি। ও দরকার মনে করলে তোমার মত পুরোনো বন্ধুর গলা কাটতে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

—বাবুজি দেখছি ভয় পেয়ে গিয়েছেন।

—তা একটু পেতে হয়েছে। টাকাটা ও মেরে দেবে না তো? তুমি হুঁশিয়ার হয়ে থাকবে

wapsip.com

ওর পেছনে।

—বাবুজি আমি হাজার পেছনে থেকেও কিছু করতে পারব না—ও যদি ইচ্ছে করে তবে সিঙ্গাপুর থেকে আজই পালিয়ে যেতে পারে—কেউ পাত্তাই পাবে না। ইয়ার হোসেন ছাঁচটার কথা জিগ্যেস করছিল—

—তুমি কী বললে?

—বললাম, বাবুর কাছে আছে।

—মতলব কী?

—না বাবু খারাপ কিছু নয়—ও একবার দেখতে চায়।

—ওঃ, ভাগ্যিস আসল পদ্মরাগখানা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এসেছিলাম কলকাতায়! নইলে সেই পাথর নিয়ে কলকাতাতেই খুন হয়ে গেল মেটেবুরুজে! এখানে আনলে সে পাথর আমরা হাতে রাখতে পারতাম না!

জামাতুল্লা গলার স্বর নিচু করে বললে—বাবুজি, এখানেও লোক পেছন নিয়েছে।

সুশীল ও সনৎ একযোগে সবিস্ময়ে বলে উঠল—কী রকম!

—এখন বলব না, আপনারা ভয় পেয়ে যাবেন। সিঙ্গাপুর ভয়ানক জায়গা—এখানে দিনদুপুরে মানুষের বুকে ছুরি বসায়—পরে শুনবেন।

সিঙ্গাপুরে যেদিকে বড় ডক তৈরি হয়েছে, ওর কাছে অনেক দূর পর্যন্ত সামরিক ঘাঁটি। সাধারণ লোককে সে সব রাস্তা দিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। জামাতুল্লাকে পথ-প্রদর্শকরূপে নিয়ে দু-জনে সেই দিকে বেড়াতে বেরুল। সমুদ্রের নীল দিগন্ত-প্রসারী রূপ এখান থেকে যেমন দেখায়, এমন আর কোথাও থেকে নয়। দুপুরের কাছাকাছি সময়টা প্রখর রৌদ্রকিরণে সমুদ্র-জল ইস্পাতের ছুরির মত ঝকঝক করছে। দু-খানা মানোয়ারী জাহাজ বন্দর থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

একজন চীনেম্যান এসে ওদের পিজিন ইংলিশে বললে—টী, স্যর, টী?

—নো টী।

—নো টী স্যর? মাই হাউস হিয়ার স্যর, ভেরি গুড হোম-মেড টী স্যর!

সনৎ বললে—চল দাদা, চল জামাতুল্লা, একটু চা খেয়ে আসি।

সবাই মিলে রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা চীনা বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে একটা অ্যাসবেস্টস-এর ঢেউ-খেলানো পাত দিয়ে ছাওয়া ছোট্ট বাড়িতে এল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাঁশের টেবিল পাতা আছে বারান্দায়। তিনজনে সেখানে বসে দূরে সমুদ্রের দৃশ্য দেখছে—এমন সময় চীনেম্যানটি চা নিয়ে এল। ওরা চা খাচ্ছে, সে লোকটা আবার কিছু কেক নিয়ে এসে ওদের সামনে রাখলে। ওদের বললে—তোমরা কোথায় যাবে?

সুশীল বললে—বেড়াতে এসেছি।

—কোথা থেকে?

—কলকাতা থেকে।

—ভেরি গুড। চমৎকার জায়গা সিঙ্গাপুর।—এখান থেকে আর কোথাও যাবে নাকি?

—না, আর কোথাও যাব না।

—ভাল কিউরিও কিনবে?

—কী জিনিস?

—এসো না ঘরের মধ্যে।

wapsip.com

ওরা তিনজনে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বুদ্ধের মূর্তি, মালা, ড্রাগনের মূর্তি, পোর্সিলেনের পেটমোটা চীনে ম্যান্ডারিনের মূর্তি ইত্যাদি সাধারণ শৌখিন জিনিস আলমারিতে সাজানো—ওরা হাতে করে দেখছে, এমন সময়ে সনৎ একটা জিনিস হাতে নিয়ে অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠল :

—দাদা দ্যাখো!

সুশীল ও জামাতুল্লা দু-জনেই চেয়ে দেখলে, একখানা জেড্ পাথরে তৈরি ছুরির গায়ে কি আঁক-জোঁক কাটা। ভাল করে দু-জনেই দেখলে অবিকল সেই আঁক-জোঁক, নটরাজনের পদ্মরাগ মণির গায়ে যে আঁক-জোঁক ছিল।

ওরা সবাই অবাক হয়ে গেল।

সুশীল বললে—এ ছুরিখানার দাম কত?

—দু-ডলার, মিস্টার।

—এ ছুরি তুমি কোথায় পেলে?

—দেখি ছুরিখানা? ও, এ আমি একজন মালয়ের কাছে কিনেছিলাম।

—এখানেই?

—হ্যাঁ, একজন মাল্লা ছিল সে।

—কোথা থেকে সে ছুরিখানা পেয়েছিল তা কিছু বলে নি?

—না মিস্টার। তবে ছুরিখানা সে ভয়ে পড়ে বিক্রি করে। সে বলেছিল দু-দুবার সে প্রাণে মরতে মরতে বেঁচে যায়, এ ছুরিখানার জন্যে। তার পেছনে লোক লেগেছিল। লুকিয়ে আমার কাছে বিক্রি করে। কেউ জানে না যে এখানা আমার কাছে আছে।

—আমরা এখানা নেব।

—ওখানা বিক্রি হবে না।

—আমরা তিন ডলার দেব।

—নিয়ে বিপদে পড়বে তোমরা। ও নিও না।

—তোমার দোকানের জিনিস বিক্রি করতে আপত্তি কী?

—আমি আমার খরিদ্দারকে বিপদে ফেলতে চাইনে। শোন মিস্টার, আমি জানি ও ছুরি তুমি কেন নিতে চাইছ। ওই আঁক-জোঁকগুলোর জন্যে—ঠিক কি না? প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে অনেকে জানে ওই আঁকগুলো কোথাকার এক গুপ্ত নগর আর তার ধন-ভাণ্ডারের হদিস। সকলে জানে না বটে, তবে পুরোনো লোক কেউ কেউ জানে। অনেক পুরোনো জেড্ পাথরের আংটিতে ওই আঁক-জোঁক আমি দেখেছি। ও নিয়ে একটা গুপ্ত সম্প্রদায় আছে। সম্প্রদায়ের বাইরে আর কারও কাছে এই আঁক-জোঁকওয়ালা আংটি কি ছুরি কি কিরীচ দেখলে তারা তার পেছনে লেগে গুপ্তহত্যা পর্যন্ত করে ফেলে—তবে তাদের আসল উদ্দেশ্য থাকে, জিনিসটাকে হস্তগত করা।

—কেন?

—পাছে অন্য কেউ ওই আঁক-জোঁকের হদিস পেয়ে সেই প্রাচীন নগর আর তার গুপ্ত ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করে ফেলে। ওরা নিজেরা যখন বের করতে পারলে না—তখন আর কাউকে ওরা খোঁজ করতেও দেবে না। ও চিহ্নের জিনিস কাছে রাখা মানে প্রাণ হাতে করে বেড়ানো। কিন্তু আমার মনে হয় কী জান, মিস্টার? ওরকম নগর কোথাও নেই। ও একটা মিথ্যা প্রবাদের মত এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কেউ দেখেছে এ পর্যন্ত বলতে পার? কেউ

wapsip.com

বলতে পারে সে দেখেছে? কেউ সন্ধান দিতে পারে? ও একটা ভুয়ো গল্প।

চা খেয়ে বাইরে এসে তিনজনে সমুদ্রের দিকে চলল।

চীনেম্যানটি পিছন থেকে ডেকে বলল—ওদিকে যেও না মিস্টার, সামরিক সীমানা—যাওয়া নিষেধ। সমুদ্রের ধারে এদিকে বসবার জায়গা নেই।

একটু নির্জন স্থানে গিয়ে সুশীল বললে—জামাতুল্লা, শুনলে সব কথা? এখনো কি তোমার মনে হয় সে নগর আছে কোথাও? আমরা আলেয়ার পেছনে ছুটছি নে? নটরাজনের গল্প ভুয়ো নয়?

জামাতুল্লা বললে—তবে পদ্মরাগ মণি এল কোথা থেকে?

—আমি তোমায় বলছি নটরাজনের কাহিনী আগাগোড়া বানানো গল্প। পদ্মরাগ মণিখানা সে কোনপ্রকার অসৎ উপায়ে হস্তগত করে—যার ওপরে প্রাচীন ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী ঐ চিহ্নটি-আঁকা ছিল। এ ছাড়া ওর কোন মানে নেই।

জামাতুল্লার মুখচোখের ভাব হঠাৎ যেন বদলে গেল—কত বৎসর পূর্বের এক স্বপ্নভরা দিন, এক আতঙ্কভরা কৃষ্ণ-রজনীর স্মৃতি তার মুখের রেখায়, চোখের দৃষ্টিতে। সে বললে—কিন্তু বাবুজি, নটরাজন হয়ত দেখেনি, আমি তা দেখেছি। ভীষণ বনের মধ্যে অন্ধকার রাত কাটিয়েছি। আমি কারও কথা শুনিনে।

—খুব সাবধান জামাতুল্লা, আমাদের প্রাণের দাম এক কানা-কড়িও না—যদি একথা কোন রকমে প্রকাশ হয় যে আমরা ওই আঁকজোক-পড়া পাথরের ছাঁচ যা সেই নগর খুঁজতে বেরিয়েছি।

—ঠিক বাবুজি। সেকথা আমারও মনে হয়েছে। এই সিঙ্গাপুর ভয়ানক জায়গা—এখানে পথে-পথে রাত্রের অন্ধকারে খুন হয়। ভারি সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। ইয়ার হোসেনকে সাবধান করে দিতে হবে। মুশকিল হয়েছে লোকটা মাতাল, মদ খেয়ে কোন কথা প্রকাশ করে না ফেলে। চল, যাওয়া যাক।

তিনজনে সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে বাসার দিকে রওনা হল।

পরদিন ইয়ার হোসেন এসে ওদের বাসায় খুব সকালেই উপস্থিত হল। সনৎ তখন উঠেছিল। চায়ের জন্যে স্টোভ ধরিয়েছে—ইয়ার হোসেনকে দেখে বললে—আসুন মিঃ হোসেন, ঠিক সময়েই এসেছেন—চা তৈরি।

ইয়ার হোসেন রুক্ষ প্রকৃতির লোক। বলে উঠল—চা খাবার জন্যে ঠিক আসি নি। আরো দুশো টাকা চাই।

হঠাৎ সনৎ-এর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আরও দুশো! তাহলে তো আমাদের হাতে রইল না কিছু!

—তা আমি কী জানি? এ কাজে এসেছেন যখন তখন পয়সার জন্যে হঠলে চলবে না। নয়তো বলুন ছেড়ে দিই।

—না না, দাঁড়ান আমি দাদা ও জামাতুল্লাকে ডাকি।

সুশীল শুনে বললে—তাই তো, ব্যাপার কী? চল, দেখি ব্যাপার কী।

ইয়ার হোসেন বাইরে বসে আছে। সুশীল গিয়ে বললে—গুড মর্নিং মিঃ হোসেন। কী মনে করে এত সকালে?

—সব ঠিক। আজ রাত্রে রওনা হতে হবে। সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছে।

সনৎ ও সুশীল একসঙ্গে বলে উঠল—কী রকম?

wapsip.com

ইয়ার হোসেন গম্ভীর মুখে বললে—সব ঠিক। তার আগে সেই ছাঁচখানা একবার দেখি—এখুনি। আর দুশো টাকা—এখুনি।

সুশীলের ইঙ্গিতে সনৎ বাক্স খুলে প্যারিস-প্লাস্টারের ছাঁচ ওর হাতে দিলে। ইয়ার হোসেন ছাঁচখানা উল্টে পাল্টে দেখে শুনে বললে—নাও। এ-সব বুজরুকি—অন্য কিছুই না। কিছুই হবে না হয়ত।—টাকা?

সুশীল বললে—টাকা রয়েছে জামাতুল্লার কাছে। সে আসুক।

—কোথায় সে?

—তা তো জানিনে। সকালে বেড়াতে বেরিয়েছে।

—আচ্ছা, আমি বসি।

—এখন কী ঠিক করলেন বলুন মিঃ হোসেন।

—এখান থেকে ডাচ্ স্টীমার 'বেন্দা' ছাড়ছে আজ রাত দশটায়। আমাদের নামতে হবে সাঙ্গাপান বন্দরে—সুলু সমুদ্রের ধারে। সাঙ্গাপান মশলার বড় আড়ত—সেখান থেকে চীনে জাঙ্ক্ ভাড়া করে যাব।

—এসব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ডাচ্ স্টীমারে উঠতে দেবে? মেশিনগান কিনেছেন নাকি?

—সব ঠিক আছে। আপনি শুধু দেখুন ইয়ার হোসেন কী করতে পারে।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। জামাতুল্লা আর ফেরে না। সুশীল ও সনৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। কাল বিকেলের সেই চীনাম্যানের কথা বার বার মনে পড়ছিল ওদের। কথাটা ইয়ার হোসেনকে বলা ঠিক হবে না হয়ত—ভেবেই ওরা বললে না। কিন্তু জামাতুল্লা সব জেনে শুনে একা বেরুল কোথায়?

বেলা প্রায় দশটা। এমন সময় জামাতুল্লা ঘর্মাক্ত কলেবরে এসে হাজির হল। ওর মুখের চেহারা দেখে তিনজনেই একসঙ্গে বললে—কী হল তোমার?

জামাতুল্লা ক্ষীণ হাসি হেসে বললে—কিছুই না।

—কিন্তু তোমার চেহারা দেখে—

—এই রোদে—

সুশীল বললে—জামাতুল্লা, মিঃ হোসেন আরও দুশো টাকা চান।

—ও! তা দিন বাবু। এই নিন চাবি।

—উনি বলছেন আজ রাত্রে আমাদের রওনা হতে হবে।

জামাতুল্লা সে কথায় কোন উত্তর না দিয়ে বললে—টাকাটা দিয়ে দিন ওঁকে আগে।

টাকা নিয়ে ইয়ার হোসেন বিদায় নেবার পর-মুহূর্তেই জামাতুল্লা নিম্নসুরে বললে—বড় বেঁচে গিয়েছি! ডকের পাশে যে গলি আছে ওখানে দু-জন মালয় গুণ্ডা আমাকে আক্রমণ করেছিল। দুজন দুদিক থেকে কিরীচ হাতে। ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিত আর-একটু হলে। আমি প্রাণপণে ছুটে বেঁচেছি। তোমরা অত ছুটতে পারতে না, মারা পড়তে ওদের হাতে। কালকের সেই চীনেম্যানের কথাই ঠিক। আমরা খুব বিপন্ন এখানে। বাড়ি থেকে কোথাও বেরিও না। ইয়ার হোসেনকে কিছু বোলো না।

সনৎ ও সুশীল রুদ্ধনিশ্বাসে ওর কথা শুনছিল। কথা শেষ হলে সনৎ তাকে চা ও টোস্ট খেতে দিয়ে বললে—কিছু বলি নি আমরা। ও আজই যেতে বলছে—শুনেছ তো?

—যাতে হয় আজই আমাদের পালাতে হবে। এখন প্রাণ নিয়ে জাহাজে উঠতে পারলে বাঁচি!

wapsip.com

—বল কী জামাতুল্লা? এত ভয় নেই। চীনেম্যানটার বাজে গল্পটা দেখছি তোমার মনে বড় দাগ কেটে দিয়েছে।

—বাবুজি, মেটেবুরুজের মাঠে খুনের কথাটা ভেবে দেখুন। সে পাথরখানার জন্যে নয়—আঁকজোঁকের জন্যে। এখন আমার তাই মনে হচ্ছে। অসাবধান হবেন না আজ দিনমানটা। জাহাজে উঠলে কতকটা বিপদ কাটে বটে।

সেদিন বিকেলে ইয়ার হোসেনের লোক আবার এল। একটা সীল-মোহর-করা চিঠি সুশীলের হাতে দিয়ে বললে—এর উত্তর এখুনি চাই। সুশীল চিঠিখানা পড়ে দেখলে, আজ কিভাবে কোথা থেকে রওনা হতে হবে, সেই ব্যবস্থা চিঠিতে লেখা। ইয়ার হোসেন অন্য পথ দিয়ে যাবে। ওদের যেন চেনে না, এভাবে। জাহাজে না উঠে এদের তিনজনের সঙ্গে সে কথাবার্তা বলবে না।

সুশীল চিঠির উত্তর দিয়ে দিলে। জামাতুল্লা বললে—আমাদের জিনিসপত্র যদি কিনতে হয়, এই সময় কিনে নিয়ে আসি—চলুন।

ওরা বেরিয়ে এল বাসা থেকে। ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের বড় বাজারে জিনিসপত্র কিনবে এই ওদের ইচ্ছে। জামাতুল্লা বললে—বাবু, কিছু ভাল জিনিস খেয়ে নেওয়া যাক। জানেন, কোন অজানা রাস্তায় অনেক দূর যেতে হলে, ভাল খেয়ে নিতে হয়। অনেকদিন হয়ত ভাল খাবার অদৃষ্টে জুটবে না।

একটা শিখ রেস্টুরেন্টে ওরা গিয়ে বসল। মাংস, কাটলেট, চা, টোস্ট ইত্যাদি আনিয়ে খাওয়া শুরু করেছে, এমন সময় একজন ইউরোপীয়-পোশাক-পরা মালয় এসে ওদের টেবিলে বসে বিনীতভাবে বললে—সে কি তাদের সঙ্গে বসে খেতে পারে?

সুশীল বললে—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

সে আর কোন কথা না বলে খাবার আনিয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে খেতে লাগল। তারপর আবার ওদের দিকে চেয়ে বললে—আপনারা ভারতীয়?

সুশীল ভদ্রভাবে উত্তর দিলে—হ্যাঁ।

—এখানে এসেছেন বেড়াতে, না?

—হ্যাঁ।

—কেমন লাগছে সিঙ্গাপুর?

—বেশ জায়গা।

—এখান থেকে দেশে ফিরছেন বোধহয়?

—তাই ইচ্ছে আছে।

—আপনারা তিনজনে বুঝি এসেছেন?

—না, আমরা এখানে এক হোটেলে থাকি—আলাপ হয়ে গিয়েছে।

—বেশ, বেশ।

—আপনারা কোন্ হোটেলে উঠেছেন জানতে পারি কি? আমাদের একজন ভারতীয় বন্ধুর একটা ভাল হোটেল আছে, সেখানে খাবার-পত্র সস্তা। ঘরদোরও ভাল। যদি আপনাদের দরকার হয়—

সনৎ হঠাৎ বলে উঠল—না, ধন্যবাদ। আমরা আজই চলে যাচ্ছি।

সুশীল টেবিলের তলা দিয়ে সনৎকে এক রামচিমটি কাটলে। মালয় লোকটার চোখে-মুখে একটা কৌতূহলের ভাব জাগল। সেটা গোপন করে সে বললে—ও! আজই যাবেন?

wapsip.com

কিন্তু ভারতের জাহাজ তো আজ ছাড়বে না?

সুশীল বললে—না, আমরা রেলে উঠে যাচ্ছি কুয়ালালামপুর।

—ও, কুয়ালালামপুর? দেখে আসুন, বেশ শহর।

আরও কিছুক্ষণ পরে লোকটা বিল চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সুশীল রাগের সঙ্গে সনৎ-এর দিকে চেয়ে বললে—ছি, ছি, এত নির্বোধ তুমি? ও-কথা কেন বলতে গেলে?

সনৎ অপ্রতিভ মুখে বললে—আমি ভাবলাম ওতেই আপদ বিদেয় হয়ে যাবে। অত জিজ্ঞেস করার ওর দরকার কি? আমরা যদি বা যাই, তোর তাতে কিরে বাপু?

—তা নয়। কে কী মতলব নিয়ে কথা বলে, দরকার কী ওদের সঙ্গে সব কথা বলার?

জামাতুল্লা বললে—ঠিক কথা বলেছেন বাবুজি।

সন্ধ্যার কিছু আগে ওরা রেস্টুরেন্ট থেকে বার হয়ে রাস্তায় নেমে দু-একটা জিনিস কেনবার জন্যে বাজারের দিকে চলেছে—এমন সময় জামাতুল্লা নিচু গলায় চুপিচুপি বললে—ওই দেখুন সেই লোকটা!

সুশীল ও সনৎ চেয়ে দেখলে, সেই মালয় লোকটা একটা দোকানে কি একটা জিনিস কিনছে। ওদের দিকে পিছন ফিরে।

সুশীল বললে—চল আমরা এখান থেকে চলে যাই—মোড়ের দোকানে জিনিস কিনি গে।

জিনিস কিনতে একটু রাত হয়ে গেল। ওরা বড় রাস্তা বেয়ে অনেকটা এসে ওদের হোটেল যে গলিটার মধ্যে সে গলিটাতে ঢুকতে যাবে, এমন সময় কি একটা ভারী জিনিস সুশীলের ঠিক বাঁ হাতের দেয়ালে জোরে এসে লেগে ঠিকরে পড়ল সামনে রাস্তার ওপরে।

ওরা চমকে উঠল। জামাতুল্লা পথের ওপর থেকে জিনিসটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে—সর্বনাশ!

ওরা দুজনে নিচু হয়ে জিনিসটা দেখতে গেল—কিন্তু জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, ছুটে আসুন, এখানে আর দাঁড়াবেন না বলছি!

দুজনে জামাতুল্লার পিছনে পিছনে দ্রুতপদে চলতে চলতে বললে—কী, কী হয়েছে? কী জিনিস ওটা?

মিনিট পাঁচ ছয় ছুটবার পর নির্জন গলিটার শেষ প্রান্তে ওদের হোটেলটা দেখা গেল। জামাতুল্লা হাই ছেড়ে বললে—যাক খুব বেঁচে যাওয়া গিয়েছে! এখানা মালয় দেশের ছুঁড়ে মারা ছুরি! ওরা দশ বিশ গজ তফাত থেকে এই ছুরি ছুঁড়ে লোকের গলা দুখানা করে কেটে দিতে পারে। আমাদের তাগ্ করেই ছুরিখানা ছুঁড়েছিল—কিন্তু অন্ধকারে ঠিক লাগেনি। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে, যে ছুঁড়েছে তার আর-একখানা ছুরি ছুঁড়তেই বা কতক্ষণ?

সনৎ সেই ভারী ছোরাখানা হাতে করে বললে—ওঃ, এ গলায় লাগলে পাঁঠা কাটার মত মুণ্ডু কেটে ছিট্‌কে পড়ত! কানের পাশ দিয়ে তীর গিয়েছে!

সুশীল বললে—এ সেই গুপ্ত সম্প্রদায়ের লোকের কাজ। আমাদের পেছনে লোক লেগেছে।

জামাতুল্লা বললে—লোক লেগেছে, তবে আমাদের বাসাটা এখনও বার করতে পারে নি। আমি বলি নি যে এখানে আমরা বিপন্ন। আমার না বলবার কারণ আছে।

রাতে ডাচ্ স্টীমার 'বেন্দা' ছাড়ল। ইয়ার হোসেন বড় বড় কেরোসিন কাঠের প্যাকবাক্স

wapsip.com

ওঠালে গোটাকতক জাহাজে—তাদের বাইরে বিলিতি বিয়ার মদের বিজ্ঞাপন মারা। ওঠাবার সময় অবিশ্যি কোন হাঙ্গামা হল না—কিন্তু সুশীল ও সনৎ-এর ভয় তাতে একেবারে দূর হয় নি। সিঙ্গাপুরের বন্দর ও প্রকাণ্ড নৌ-ঘাঁটি ধীরে ধীরে দিকচক্রবালে মিলিয়ে গেল—অকূল জলরাশি আলোকোৎক্ষেপী ঢেউয়ে রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

চারদিনের দিন সকালে জাহাজ এসে সাঙ্গাপান পৌঁছল। এখানে এসে ওরা নেমে একটা চীনা হোটেলে আশ্রয় নিলে।

সাঙ্গাপান মশলার খুব বড় আড়ত, কতগুলো নদী এসে সমুদ্রে পড়ছে, নদীর সেই মোহানাতেই বন্দর অবস্থিত—যেমন আমাদের দেশের চট্টগ্রাম।

ইয়ার হোসেন বাংলা জানে না, উর্দু বা হিন্দুস্থানীও ভুলে গিয়েছে—ও জামাতুল্লার সঙ্গে কথা বলে পিজিন ইংলিশে ও মালয় ভাষায়। বললে—জামাতুল্লা, এবার তুমি তোমার সেই দ্বীপে নিয়ে যেতে পারবে তো?

—পারব বলে মনে হচ্ছে। তবে এখনও ঠিক জানি নে—

সুশীল বললে—শুনুন মিঃ হোসেন। যখন আমার সঙ্গে জামাতুল্লার দেখা হয় গ্রামে, ও বলেছিল ডাচ ঈস্ট ইণ্ডিজের একটা দ্বীপে ওর জাহাজ নারকেলের ছোবড়া ও কুচি বোঝাই করতে গিয়ে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যায়। কেমন, তাই তো জামাতুল্লা? রাস্তার কথাটা একবার ভাল করে ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

—ঠিক বাবুজি—

—তারপর বলে যাও—

—তারপর আমরা সাতদিন সেইখানে থাকি।

ইয়ার হোসেন বললে—সেখানে থাকি মানে কী বুঝিয়ে বল। দ্বীপে, না সমুদ্রে?

—না সাহেব, দ্বীপে তো নয়—আমরা যাচ্ছিলাম এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে। মাঝ-দরিয়ায় এ কাণ্ড ঘটে। তারপর সৌরাবায়া থেকে জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করে।

—কতদিন পরে উদ্ধার করে?

—আট দশ দিন কি ওই রকম।

সুশীল বললে—আগে বলেছিলে সাতদিন।

—বাবু, ঠিক মনে নেই। অনেক দিনের কথা। সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে। সেই সময় সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে সব কলেরা হয়ে মারা গেল—বাকি ছিলাম কাপ্তান আর আমি। দ্বীপ ছিল নিকটেই—যেখানে ডুবো পাহাড়ে আমাদের জাহাজে ধাক্কা খেয়েছিল, সেখান থেকে ডাঙা নজরে পড়ে। জাহাজের রশির দু রশি কী তিন রশি তফাতে। দ্বীপ দেখলে আমি চিনতে পারব—তার ধারে একটা পাহাড়, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝরনা পড়েছে সমুদ্রে। বড় বড় পাথর পড়ে আছে, পাথরগুলো সাদা রঙের।

সুশীল হেসে বললে—তোমার সেই বিন্ধমুনির দ্বীপ?

জামাতুল্লা গম্ভীর মুখে বললে—হাসবেন না বাবুজি। এসব কাজে নেমে এ দেশের সব দেবতাকে মানতে হবে। না মানলে বিপদ হতে কতক্ষণ? আমি খুব ভাল করেই তা জানি।

ইয়ার হোসেন বললে—বুঝলাম, ও সব এখন রাখো। সাঙ্গাপান থেকে কোন্ দিকে যেতে হবে, কত দূরে? একটা আন্দাজ দাও—একটা নটিক্যাল চার্ট করে নেওয়া যাক।

—আমরা সাঙ্গাপান থেকেই রওয়ানা হয়ে যাই পূর্ব-দক্ষিণ কোণে—আন্দাজ দুশো মাইল—সেখান থেকে পূর্বে উত্তর-পূর্ব কোণে যাই আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল। এইখানে সেই

wapsip.com

ডুবো পাহাড়ের জায়গাটা—যতদূর আমার মনে হচ্ছে—

ইয়ার হোসেন অসহিষ্ণুভাবে বললে—যতদূর মনে হলে তো হবে না! আমাদের সেদিকে যেতে হবে যে। সুলু সমুদ্রের সর্বত্র তো ঘুরে বেড়াতে পারা যাবে না। আচ্ছা তুমি সে দ্বীপ কতদূর থেকে চিনতে পারবে? নেমে, না জাহাজে বসে?

—জাহাজে বসে চিনতে পারব ওই সাদা পাথরের পাহাড় আর ঝরনা দেখে।

—কত সাদা পাথরের পাহাড় থাকে—

—না সাহেব, তা নয়। সে পাথরের পাহাড়ের গড়ন অন্য রকম। দেখলেই চিনব।

ইয়ার হোসেন আর সুশীল দুজনে মিলে মোটামুটি ম্যাপ এঁকে নিয়ে সেদিন রাত্রে আর একবার মিলিয়ে নিলে জামাতুল্লার বর্ণনার সঙ্গে। চীনা জাঙ্ক্ ভাড়া করা হল। দু-মাসের মত চাল, আটা, চা, চিনি বোঝাই করে নেওয়া হল জাঙ্কে—আর রইল বিয়ারের কাঠের বাক্সভর্তি অস্ত্রশস্ত্র ও মেশিন গান।

ইয়ার হোসেন প্রস্তাব করলে—এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়। আজ রাত্রেই যাওয়া যাক—শত্রু লাগতে পারে—

জামাতুল্লা বললে—সে কথা ঠিক। কিন্তু রাত্রে হারবার-মাস্টার জাহাজ কি নৌকো ছাড়তে দেবে না, পোর্ট পুলিশে ধরবে। এসব জায়গায় এই নিয়ম। বোম্বেটে ডাকাতের আড্ডা কিনা সুলু সী! কড়া নিয়ম সব।

—তবে?

—কাল সকালে চলুন সাহেব—

ইয়ার হোসেন দ্বিধার সঙ্গে এ প্রস্তাবে মত দিলে। সুশীলকে ডেকে বললে—রাতের অন্ধকারে যাওয়া ভাল ছিল। দিনের আলোয় সকলের মনে কৌতূহল জাগিয়ে যাওয়া ভাল না। যাই হোক, উপায় কী?

সকাল আটটার পরে সাঙ্গাপান থেকে ওদের নৌকো ছাড়ল। মাত্র দেড় টনের চীনা জাঙ্ক্—সমুদ্রে মোচার খোলার মত। কিন্তু জামাতুল্লা বললে—জাঙ্ক্ হঠাৎ ডোবে না, এসব তুফানসঙ্কুল সমুদ্রে পাড়ি দিতে চীনা জাঙ্ক্-এর মত জিনিস নেই।

জাহাজ ছেড়ে অনেক দূর এল, ক্রমে চারিধারে শুধু সমুদ্রের নীল জলরাশি।

জামাতুল্লা নাবিক ও কর্ণধার—কিন্তু যে বৃদ্ধ চীনাম্যান জাঙ্কের সারেং সেও দেখা গেল বেশ জাহাজ চালাতে জানে। দুদিন জাহাজ চলবার পরে জামাতুল্লার সঙ্গে চীনা সারেং-এর ঝগড়া বেধে গেল।

ইয়ার হোসেন বললে—চেঁচামেচি কেন? কী হয়েছে?

চীনা সারেং বললে—জামাতুল্লা সাহেব জাহাজ চালাতে জানে না—কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—

জামাতুল্লা বললে—বিশ্বাস করবেন না ওর কথা! ও লোকটা একেবারে বাজে।

ইয়ার হোসেন ও সুশীল পরামর্শ করে জামাতুল্লার ওপরই কিন্তু জাহাজ চালানোর ভার দিলে। একদিন সন্ধ্যার সময় দূরে ডাঙা ও আলোর সারি দেখা গেল।

চীনা সারেং ছুটে গিয়ে বললে—ওহে, বড় যে জাহাজ চালাচ্ছ—ও ডাঙা আর আলো কোথাকার? এদিকে এত বড় ডাঙা কিসের?

জামাতুল্লাও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। চার্ট অনুসারে ওখানে আলো আর ডাঙা দেখবার কথা নয়। চীনা সারেং ইয়ার হোসেনকে আর সুশীলকে ডেকে বললে—ওকে বলতে বলুন

wapsip.com

স্যর, ও আলো আর ডাঙা কিসের?

জামাতুল্লাকে মাথা চুলকোতে দেখে চীনা সারেং বিজয়গর্বে বললে—আমি বলে দিচ্ছি স্যর—সাণ্ডা প্রণালীর মুখে পিয়েরপং বন্দরের আলো—তার মানে বুঝেছেন? আমরা আমাদের যাবার রাস্তা থেকে একশো মাইল পূর্ব-দক্ষিণে হঠে এসেছি—এইরকম করে জাহাজ চালালে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছতে আমাদের আর বেশি দেরি থাকবে না স্যর!

চীনা সারেং সেদিন থেকে হল কাপ্তেন।

সুশীল বললে—রাগ কোরো না জামাতুল্লা। তুমি অনেকদিন এ কাজ করো নি, ভুলে গিয়েছ হে।

জামাতুল্লা বললে—তা নয় বাবুজি। আমি ভুলিনি জাহাজ চালানো। আমার চার্ট ঠিক ছিল, আমার মনে হয় কি গোলমাল হয়েছে বা চার্টে ভুল করে রেখেছে।

আরও তিনদিন পরে বিকেলের দিকে চীনা কাপ্তেন বললে—পারা নামছে স্যর, দড়িদড়া সামলে আর জিনিস সামলে আপনারা খোলের মধ্যে নেমে যান—ঝড় উঠবে।

তিন ঘণ্টার মধ্যে ভীষণ ঝড় এল পূর্ব-দক্ষিণ কোণ থেকে। দড়িদড়া ছিঁড়ে পাল উড়িয়ে নিয়ে যায়—জামাতুল্লা চিৎকার করে বললে—সব খোলের মধ্যে যান—ভয়ঙ্কর ঢেউ উঠেছে—

জাঙ্কের ডেকের ওপর বড় বড় ঢেউ সবেগে আছড়ে পড়ে ক্ষুদ্র দেড় টনের জাঙ্ক্‌খানা যে কোন মুহূর্তে ভেঙে চুরে সমুদ্রের তলায় ডুবিয়ে দেবে মনে হল সবারই—কিন্তু দু-তিন বার জাঙ্কখানা ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল—নাকানি-চুবুনি খেয়েও আবার সমুদ্রের ওপর ঠেলে ওঠে। সাবাস মোচার খোলা!

হঠাৎ চীনা কাপ্তেন চিৎকার করে উঠল—সামনে পাহাড়—সামলাও—

জামাতুল্লা হালে ছিল, ডাইনে সজোরে হাল মারতেই কান ঘেঁষে কতকগুলো বজবজে সমুদ্রের ফেনা ঘুরতে ঘুরতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে চলে গেল, ফেনাগুলোর মাঝে কালো রঙের কি একটা টানা রেখা যেন ফেনারাশিকে দুভাগে চিরে দিয়েছে। ডুবো পাহাড়!

ঝড়ের শব্দে কে কী বলে শোনা যায় না—তবুও সুশীল শুনলে, চীনা কাপ্তেন চিৎকার করছে—খুব বাঁচা গিয়েছে! আর একটু হলেই সব শেষ হত আমাদের!

ইয়ার হোসেন ও সুশীল বাইরে একচমক দেখতে পেলে—জলের মধ্যে মরণের ফাঁদ পাতাই বটে! সাক্ষাৎ মরণের ফাঁদ!

জামাতুল্লা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হাল ধরে আছে। একটু আলগা হলেই এই ভীষণ জায়গায় জাঙ্ক্ বানচাল হয়ে ধাক্কা মারবে গিয়ে বাঁ দিকের ডুবো পাহাড়ে। খানিকটা পরে জামাতুল্লার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ভয়ে—একি! দু-দিকেই যে ডুবো পাহাড়!—ডাইনে আর বাঁয়ে।

চীনা কাপ্তেনকে হেঁকে বললে—কোথা দিয়ে জাহাজ চালাচ্ছ গাধার বাচ্চা! পাহাড়ের চুড়ো দিয়ে যে! মারবে এবার—

ঝড়ের তুফানের মধ্যে চীনা কাপ্তেনের কথাগুলো অট্টহাস্যের মত শোনা গেল। কী যে সে বললে, জামাতুল্লা বুঝতে পারল না।—কিন্তু যারই ভুল হোক, জাহাজ বাঁচাতে হবে।

সে সামনে পিছনে চেয়ে দেখলে—পাহাড়ের কালো রেখা অতিকায় শুশুকের শিরদাঁড়ার মত জলের ওপর স্পষ্ট জেগে; মাস্তুলের দিকে চেয়ে দেখলে চীনা সারেং সব পাল গুটিয়ে ফেলেছে—কেবল মাঝের বড় মাস্তুলে ষোল ফুট চওড়া বড় পালখানা ঝড়ের মুখে ছিঁড়ে ফালি-ফালি হয়ে অসংখ্য সাদা নিশানের মত উড়ছে। সে দেখলে নিশানগুলোর জন্যে

wapsip.com

জাহাজখানা এদিক ওদিকে হেলেছে ঘুরছে। চক্ষের নিমেষে সে কোমর থেকে ছুরি বার করে পালের মোটা সনের কাছি কাটতে লাগল। একবার করে খানিকটা কাটে, আবার ছুটে গিয়ে হাল টিপে ধরে।

অমানুষিক সাহস ও দৃঢ়তা এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাঁচ ছ-মিনিটের মধ্যে সে অত বড় মোটা রশিটা কেটে ফেললে। ফেলতেই দড়িদড়া ঢিলে পড়ে পাল সড়াং করে অনেকখানি নেমে এল।

চীনা কাপ্তেন চিৎকার করে বললে—কে রশি কাটলে?

—আমি।

—খুব ভাল কাজ করেছ! এবার সামলাও ঠ্যালা! যদি জানো না কোন কিছু, তবে সবতাতেই সর্দারি করতে আসো কেন?

চীনা কাপ্তেন মিথ্যে বলে নি। জামাতুল্লা সভয়ে দেখলে পালে ঢিলে পড়াতে জাঙ্ক্ এবার জগদ্দল পাথরের মত ভারী হয়ে পড়েছে যেন। পিছন থেকে বাতাস ঠেলা মেরেও তাকে নড়াতে পারছে না—সুতরাং দু-দিকের মরণ ফাঁদকে অতিক্রম করে বাহির সমুদ্রে পড়তে এর অনেক সময় লেগে যাবে—ইতিমধ্যে বাতাস দিক পরিবর্তন করলেই—বিষম বিপদ।

ইয়ার হোসেন পাকা লোক। সে বুঝেছিল কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। মাথা বার করে বললে—কী হল আবার? জাঙ্ক্ নড়ে না যে!

চীনা সারেং বললে—নড়বে কী স্যর—নড়বার পথ কি আর রেখেছে জামাতুল্লা? এবার বাঁচাতে পারলাম না বোধ হয়!

কিন্তু সুখের বিষয় আধঘণ্টার মধ্যে ভয় কেটে গেল। বাতাস পিছন হতেই বয়ে চলল একটানা—এবং আধঘণ্টার মধ্যে জাঙ্ক্কে ডুবো পাহাড়ের ফাঁদ পার করে বাহির সমুদ্রে তাড়িয়ে দিলে।

জামাতুল্লা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

চীনা কাপ্তেন টিটকিরি দিয়ে বললে—বাঁচলে সবাই আজ নিতান্ত বরাতের জোরে! তোমার হাতের গুণে নয়, মনে রেখো।

সমুদ্র শান্ত, জ্যোৎস্না উঠেছে—সুশীলদের দল খোলের ঢাকনি খুলে ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ জ্যোৎস্নার মধ্যে দূরে কি একটা বিরাট কালো জিনিস দেখা গেল—জল থেকে উঁচু হয়ে আছে মাথা তুলে।

ইয়ার হোসেন বললে—কী ওটা?

সুশীলও জিনিসটা প্রথমে দেখতে পেলে না—তারপর দেখে বিস্মিত হল—অস্পষ্ট কুয়াশামাখা জ্যোৎস্নালোকে কিছু ভাল দেখা যায় না—তবুও একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত আকাশের গায়ে কী ওটা জল থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে?

সনৎও সেদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল।

একমাত্র জামাতুল্লা দু-চোখ বিস্ফারিত করে জিনিসটার দিকে চেয়ে ছিল।

ইয়ার হোসেন কথার উত্তর না পেয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, জামাতুল্লা তাকে হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে ডেকের সম্মুখভাগে এগিয়ে এসে কালো জিনিসটা ভাল করে দেখতে লাগল।

চীনা সারেং টিট্কিরি দেওয়ার সুরে বললে—দেখছ কী, ওটা ডুবো পাহাড়—বুড়ো

wapsip.com

বয়সে চোখে ভাল দেখতে পাইনে—তবুও বলছি—

সুশীল বললে—জলের উপর জেগে রয়েছে যে! ডুবো পাহাড় কী করে হল?

চীনা সারেং বললে—ও পাহাড়ের চুড়োটা মাত্র জেগে আছে জলের ওপর, স্যর। প্রকাণ্ড ডুবো পাহাড় ওটা—

জামাতুল্লা এইবার সুশীলকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললে—সারেং ঠিক বলেছে। এতক্ষণ পরে আমি চিনেছি, এই সেই পাহাড় বাবুজি—এই পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েই—

সুশীল অবিশ্বাসের সুরে বললে—চিনলে কী করে?

—আমি এতক্ষণ তাই চেয়ে দেখছিলাম—এবার আমার কোন সন্দেহ নেই—ওই ডুবো পাহাড়ের এক জায়গায় দক্ষিণ কোণে একটা শুয়োরের মুখের মত ছুঁচলো গড়ন দেখছেন কি? আসুন আমি দেখাচ্ছি—এতকাল আমার মনে ছিল না, কিন্তু এবার দেখেই মনে পড়েছে।

—ইয়ার হোসেনকে বলি?

—কিন্তু ওই হলদেমুখো চীনাটাকে কিছু বলবেন না, বাবুজী। ওটাকে আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না—আপনি বলুন হোসেন সায়েবকে—

—যদি ও-ই সেই ডুবো পাহাড়টা হয়, তবে তো ওখান থেকে জমি দেখা যাবে, আর সেই সাদা পাথরের পাহাড়টা—

—সে হল তিন রশি চার রশি তফাতে বাবুজি—চাঁদনি রাতে সাদা পাথরের পাহাড় অত দূর থেকে ভাল দেখা যাবে না। সকাল হোক—

চীনা সারেং চিৎকার করে উঠল—হাল সামলাবে না গল্প করে সময় কাটাবে— ডুবো পাহাড় সামনে, সে খেয়াল আছে?

জামাতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে—আঃ, হলদেমুখো ভূতটা বড্ড জ্বালালে দেখছি— দাঁড়ান বাবুজি—আপনি হোসেন সাহেবকে বলুন, আমি দেখি ওদিকে কি বলে—

সুশীল হাসতে হাসতে বললে—তুমি যাই বলো, ও কিন্তু খুব পাকা জাহাজী—এসব অঞ্চল দেখছি ওর নখদর্পণে—ওস্তাদ জাহাজী—এ বিষয়ে ভুল নেই—

কিছু পরে চীনা সারেং তার নাবিকগিরির সুদক্ষতার এমন একটি প্রমাণ দিলে যাতে জামাতুল্লাকে পর্যন্ত তারিফ করতে হল। জামাতুল্লার হাল পরিচালনায় জাঙ্ক্ যখন ডুবো পাহাড়ের একদিক দিয়ে যাবার চেষ্টা করছে তখন চীনা সারেং হুকুম দিলে—সামনে এগোও—পাশ কাটাবার চেষ্টা করছ কেন?

—সামনে এগিয়ে ধাক্কা খাবে নাকি?

—এই বিদ্যে নিয়ে মাঝিগিরি করতে এসেছে সুলু সীতে? নিজের দেশে নদী খালে ডোঙা চালাও গে যাও গিয়ে! ওই পাহাড়ের দু-পাশের ভীষণ চাপা স্রোতের মুখে পড়ে জাঙ্ক্ পাহাড়ের গায়ে সজোরে ধাক্কা মারবে—সে খেয়াল আছে? তোমার হালের সাধ্যি হবে না সে স্রোতের বেগ সামলানো—দেখছ না জল কী রকম ঘুরছে?

জামাতুল্লা তখনও ইতস্তত করছে দেখে চীনা সারেং হেঁকে বললে—জামাতুল্লা এবার সবাইকে মারবে স্যর—ওকে বুঝিয়ে বলুন, একবার ওর হাত থেকে ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন—এবার বোধ হয় আর রক্ষে হয় না—

সুশীল আর ইয়ার হোসেন জামাতুল্লাকে বললে—ও যা বলছে তাই কর না জামাতুল্লা—

wapsip.com

—ও কী বলছে তা আপনারা খেয়াল করছেন না? ও বলছে ওই ডুবো পাহাড়ের দিকে সোজাসুজি হাল চালাতে—মরব তো তা-হলে—

চীনা সারেং জামাতুল্লার কথা শুনতে পেয়ে বললে—চালিয়ে দেখই না কী করি। মরণের অত ভয় করলে মাল্লাগিরি করা চলে না সাহেব—

জামাতুল্লা চোখ পাকিয়ে বললে—হুঁশিয়ার! আমি আর যাই হই—মরণের ভয় করি তা তুমি বলতে পারবে না, হলদেমুখো বাঁদর—

সুশীল ধমক দিয়ে বললে—ও কী হচ্ছে জামাতুল্লা? এ সময়ে ঝগড়া বিবাদ করে লাভ কী? সারেং যা বলছে তাই কর—

জামাতুল্লা হাতের চাকা ঘোরাতেই জাঙ্ক্ পাহাড়ের একেবারে বিশ গজের মধ্যে এসে পড়ল—ঠিক একেবারে সামনা-সামনি—সবাই দুরু-দুরু বক্ষে চেয়ে আছে, সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর ঘাঁটি, এ থেকে কী করে চীনা জাঙ্ক্ বাঁচবে কেউ বুঝছে না—দেখতে দেখতে বিশ গজের ব্যবধান ঘুচে গেল—দশ গজ—

আর বুঝি জাঙ্ক্ রক্ষা হয় না—মতলব কী চীনাটার?··· সবাই বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে আছে—বুকের ভিতর ঢেঁকির পাড় পড়ছে সবারই—হঠাৎ সারেং ক্ষিপ্রহস্তে প্রকাণ্ড একটা জাহাজী কাছি সুকৌশলে সামনের দিকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—ডাইনে হাল মার—

সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল যা ইয়ার হোসেন ও জামাতুল্লা তাদের জাহাজী মাল্লা-জীবনের অভিজ্ঞতায় কখনো দেখে নি। জাহাজ ডানদিকে ঘুরে পাহাড়ের গুঁড়িটা পেরিয়ে যেতেই সারেং-এর কাছি গিয়ে পাহাড়ের সরু অংশটা জড়িয়ে ধরল এবং পেছন দিক দিয়ে ঘড়-ঘড় করে নোঙর পড়ার শব্দে সবাই বুঝল বড় সী-অ্যাঙ্কর অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যে ফেলার বড় নোঙর তার সুদৃঢ় আঁকশির মুখ দিয়ে সমুদ্রের তলায় পাথর ও মাটি আঁকড়ে ধরলেই জাহাজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

বোঁ করে অতবড় জাঙ্ক্খানা ডিঙি নৌকোর মত ঘুরে গেল আর পরক্ষণেই স্থির, অচল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল পাহাড় থেকে তিন-চার গজের মধ্যে। জাঙ্ক্ আর পাহাড়ের মধ্যে কেবল একফালি সরু সাগর-জল, একটা বড় হাঙর তার মধ্যে কষ্টে সাঁতার দিতে পারে।

ইয়ার হোসেন বলে উঠল—সাবাস সারেং!

সুশীল ও সনৎ নিশ্বাস ফেলে বললে—খুব বাঁচিয়েছে বটে—

জামাতুল্লা চুপ করে রইল।

চীনা সারেং হলদে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে—বিদেশী লোক এখানে জাহাজ চালাতে পারে না, স্যার! জামাতুল্লা মাল্লাগিরি যা জানে, তা খাটে চাটগাঁয়ের বন্দরে—এ সব সে জায়গা নয়—এখানে জাহাজ চালাতে হলে পেটে বিদ্যে চাই অনেকখানি—

ইয়ার হোসেন বললে—এখন কী করা যাবে বলো। জাহাজ তো আটকে গেল।

সারেং ওদের অভয় দিয়ে বললে—জাঙ্ক্ আটকায় নি। জোয়ার এলেই সকালে জাঙ্ক্ ছাড়া নিরাপদ।

সকলে দুরু-দুরু বক্ষে সকালের প্রতীক্ষায় রইল। সুশীল আর জামাতুল্লা ভাল করে ঘুমুতেই পারলে না। খুব ভোরে উঠে জামাতুল্লাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে সুশীল বললে—এস, চেয়ে দেখ—চল বাইরে—

wapsip.com

জামাতুল্লা বাইরে এসে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললে—ওই সেই সাদা পাহাড় আর সেই দ্বীপ! আমি কাল রাত্রেই বুঝেছিলাম বাবুজি, কাউকে বলিনি—

—কেন?

—কী জানি বাবুজি, চীনা সারেংটাকে আর এই হোসেন সাহেবকে আমার তেমন যেন বিশ্বাস হয় না, খোদার দিব্যি বলছি ওদের সামনে মুখ খোলে না আমার। হোসেন সাহেব আস্ত গুণ্ডালোক, বাধ্য হয়ে ওর সাহায্য নিতে হয়েছে, কিন্তু সিঙ্গাপুরে ওর নাম শুনে সবাই ভয় পায়।

—সে কথা আর এখন ভেবে লাভ কী বলো। ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে যখন। ইয়ার হোসেনকে বলি কথাটা।

ইয়ার হোসেন সব শুনে জামাতুল্লাকে ডেকে বললে—কোন সন্দেহ নেই তোমার? এই দ্বীপ ঠিক?

—ঠিক।

—আমরা নেমে কিন্তু জাঙ্ক্ ছেড়ে দেব—ঠিক করে দ্যাখ এখনও।

সুশীল ও জামাতুল্লা আশ্চর্য হয়ে বললে—জাঙ্ক্ ছেড়ে দেবেন কেন?

—আমি ওদের অন্য এক গল্প বলেছি। আমি বলেছি জঙ্গলে মাঠের ইজারা নিয়েছি ডাচ গভর্নমেন্টের কাছে—এখানে আমরা এখন থাকব কিছুদিন। ওদের বলতে চাই নে—চীনেরা লোক বড় ভাল না—

দুপুরের পর জালি বোটে জিনিসপত্র ও দুটি ছোট ছোট তাঁবু সমেত ওদের সকলকে অদূরবর্তী দ্বীপের শিলাবৃত তীরভূমিতে নামিয়ে জাঙ্কের সারেং তার ভাড়া চুকিয়ে নিয়ে চলে গেল।

সুশীল ইয়ার হোসেনকে বললে—ডাচ ঈস্ট ইন্ডিজের দ্বীপ তো এটা? ডাচ গভর্মেন্টের কোন অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু—

—সে সব বড় হাঙ্গামা। ডাচ গভর্মেন্টের কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে জান যাবে তাহলে; কেন যাচ্ছি আমরা—ও দ্বীপে কতদিন আমরা থাকব! হয়ত আমাদের সঙ্গে পুলিশ পাহারা থাকত—সব মাটি হত।

জামাতুল্লা দ্বীপের মাটিতে নেমে কেমন যেন স্বপ্নমুগ্ধের মত চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। এতকাল পরে সে যে এখানে আসবে তা মেটেবুরুজের মাল্লাপাড়ার হোটেলে সান্‌কিতে ভাত খেতে বসে কখনও কি ভেবেছিল? সে ভেবেছিল তার দুঃসাহসের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে! সেই বিন্মমুনির দ্বীপ আবার!

সুশীল ভাবছিল, কী অদ্ভুত যোগাযোগ! বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের জমিদারের ছেলে সে চিরকাল বসেই খাবে পায়ের ওপর পা দিয়ে, নির্বিঘ্নে জমিজমার খাজনা শোধ, দুপুরে লম্বা ঘুম দেবে, বিকেলে দুপুরে মাছ ধরবে, সন্ধ্যায় বৈঠকখানায় পৈতৃক তাকিয়া হেলান দিয়ে তাস দাবা খেলবে, রাত্রে পিঠে-পায়েস খেয়ে আবার ঘুম দেবে—এই সনাতন জীবনযাত্রা-প্রণালীর কোন ব্যতিক্রম হয়নি তার পিতৃপিতামহের বেলায়—তার বেলাতেও সে ধারা অক্ষুণ্ণই থাকত, দৈবক্রমে সেদিন গড়ের মাঠে জামাতুল্লা খালাসী তার কাছে 'ম্যাচিস' চাইতে না আসত। কত সামান্য ঘটনা থেকে যে জীবনের কত বৃহৎ ও গুরুতর পরিবর্তন শুরু হয়!

সুশীল ও সনৎ দ্বীপের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের ঘন বনানী এ পর্যন্ত তারা কোথাও দেখে নি—রীতিমত ট্রপিক্যাল অরণ্য যাকে বলে, তা এতদিন সুশীল ছবিতেই

wapsip.com

দেখে এসেছে এবং ইংরেজি ভ্রমণের বইয়ে তার বর্ণনাই পড়ে এসেছে— এতকাল পরে তা সে দেখল। জলের ধার থেকেই অপরিচিত গাছপালার নিবিড় বন আরম্ভ হয়েছে—বনস্পতি-মাতার বড় বড় গাছের গায়ে অর্কিডের ফুলগুলি সুগন্ধে প্রভাতের বাতাস মাতিয়েছে—মোটা মোটা লতা দুলছে এ গাছ থেকে ও গাছে। কত রঙের প্রজাপতি উড়ছে—সামনে সুনীল সমুদ্র প্রস্তরাকীর্ণ তীরভূমিতে এসে সজোরে ধাক্কা মারছে, একেবারে খোলা জলরাশি থৈ-থৈ করছে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত, একটা ব্রেকওয়াটার পর্যন্ত নেই কোথাও—যদি কেউ জলে পড়ে, তবে হাঙরের আহার্য হবে এ জানা কথা—এসব সমুদ্রে হাঙরের উপদ্রব অত্যন্ত বেশি সুশীল আগেই শুনেছে। বনের মধ্যে অনেক জায়গায় এখনও অন্ধকার কাটে নি—কারণ প্রভাতের রৌদ্র তার মধ্যে এখনও অনেক জায়গাতেই ঢোকে নি—দেখে বোধ হয়, দুপুরেও ঢোকে কি না সন্দেহ।

ইয়ার হোসেন দেখে শুনে বললে—এ যে ভীষণ জঙ্গল দেখছি—। জামাতুল্লা বললে—আগে যেমন দেখেছিলাম তার চেয়েও যেন জঙ্গল বেশি হয়েছে।

সুশীল জানতে চাইলে এ দ্বীপে লোক আছে কি না। ইয়ার হোসেন বললে— ম্যাপে তো কিছু দেয় না—এ দ্বীপের কিছুই দেখিনে ম্যাপে—কী জামাতুল্লা, তুমি কী দেখেছিলে?

—কোথাও কিছু নেই।

—বেশ ভালো জানো?

—আমার যাওয়ার পথে অন্তত তো কিছু দেখি নি—

—এখান থেকে তোমার সে নগর কতদূর হবে আন্দাজ?

—তিন চার দিনের পথ।

—এত কেন হবে? এ দ্বীপের প্রস্থ তো খুব বেশি হবার কথা নয়!

সুশীল বললে—কত বলে আন্দাজ করছেন, মিঃ হোসেন?

—ত্রিশ মাইলের মধ্যে। তবে একটা কথা, এই জঙ্গল ঠেলে যাওয়ায় পথ এগোবে না বেশি। অনেক জায়গায় পথ কেটে নিয়ে তবে এগুতে হবে। তিন দিন লাগা বিচিত্র নয়।

সেদিন তাঁবু খাটিয়ে দুপুরে বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে দ্বীপের মধ্যে ঢোকবার জন্যে ইয়ার হোসেন সবাইকে তৈরি হতে বললে। মালয় কুলি ওরা এনেছিল সাতজন, জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে—এরা সবাই ইয়ার হোসেনের হাতের লোক এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বী। ওদের গতিক বড় সুবিধের বলে মনে হয়নি সুশীলের ও সনৎ-এর গোড়া থেকেই। দেখে মনে হয় সিঙ্গাপুরে এরা চুরি ডাকাতি ও রাহাজানি করে চালিয়ে এসেছে এতদিন। যেমন দুশমনের মত চেহারা, তেমনি ধূর্ত দৃষ্টি এদের চোখে। ইয়ার হোসেনের কথায় এরা ওঠে বসে। জামাতুল্লা এদের বিশ্বাস করত না। কিন্তু উপায় কী, ইয়ার হোসেনকে যখন দলে নিতে হয়েছে, তখন এদের রাখতে হবে।

দুদিন সমুদ্রের ধারে তাঁবু ফেলে থাকবার পরে সকলে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সুশীল সনৎ এমন জঙ্গল কখনও দেখে নি। গাছপালা যে এত সবুজ, এত নিবিড়, এত অফুরন্ত হতে পারে—বাংলা দেশের ছেলে হয়েও এরা এ জিনিসটা এই প্রথম দেখলে। ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে মাঝে-মাঝে এক-একটা ছোট নদী বা খাড়ি—তার দুপাশে যেন গাছপালা ও বনঝোপের সবুজ পর্বত—কত ধরনের অর্কিড, কত ধরনের লতা, কত অদ্ভুত ও বিচিত্র ফুল।

একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বন কাটতে কাটতে মোটে মাইল-তিনেক এগিয়ে যেতে সক্ষম হল।

wapsip.com

সন্ধ্যার দিকে ইয়ার হোসেন বললে—এখানে আজ তাঁবু ফেলা যাক।

কিন্তু তাঁবু ফেলবে কোথায়? সুশীল চারিদিকে চেয়ে দেখলে ভয়ানক ঘন জঙ্গলের মধ্যে বড়-বড় দোলানো লতার তলায় ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর রাত্রে বাস করতে হবে। আজ সারাদিনের অভিজ্ঞতায় এরা দেখেছে এখানকার জঙ্গলে তিনরকম জীব যেখানে সেখানে বাস করে—যে তিনটিই মানুষের শত্রু। প্রথম, বড়-বড় রক্ত-শোষক জোঁক; দ্বিতীয়, বিষধর সর্প; তৃতীয়, মৌমাছি। এই তিনটি শত্রুর কোনটাই কম নয়—যে-কোনটার আক্রমণ মানুষের জীবন বিপন্ন হবার পক্ষে যথেষ্ট।

কোন রকমে তাঁবু খাটানো হল।

ঘুমের মধ্যে কখন ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল—ট্রপিক্যাল অরণ্যের এ অঞ্চলে বৃষ্টি লেগেই আছে, এমন দিন নেই যে বৃষ্টি হয় না। ঘুমের মধ্যে সুশীল দেখলে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে কখন বৃষ্টির জলের ধারা গড়িয়ে এসে ওদের বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে। বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই।

হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে কোথায় এক গুরুগম্ভীর নিনাদ শোনা গেল—সমস্ত অরণ্য যেন কেঁপে উঠল।

সনৎ চমকে উঠে বললে—কে ডাকে দাদা?

অন্য তাঁবু থেকে ইয়ার হোসেন বলে উঠল—ও কিসের ডাক?

কেউ কিছু জানে না। না জামাতুল্লা না ইয়ার হোসেন—কেবল ইয়ার হোসেনের জনৈক অনুচর বললে—ওটা বুনো হাতির ডাক স্যর।

আর একজন অনুচর প্রতিবাদ করে বললে—ওটা গণ্ডারের ডাক।

কিছুমাত্র মীমাংসা হল না এবং আবার সেই ডাক, সঙ্গে-সঙ্গে অন্য এক জানোয়ারের ভীষণ গর্জন। সেটা শুনে অবশ্য সকলেই বুঝতে পারলে—বাঘের গর্জন।

এরই ফাঁকে আবার বন-মোরগও ডেকে উঠল। সময়ে এক-পাল বন্য কুকুরের ডাকও।

সনৎ বললে—ও দাদা, এ যে ঘুমুতে দেয় না দেখছি—

সুশীল উত্তর দিলে—কানে আঙুল দিয়ে থাক—

ইয়ার হোসেন বললে—রাইফেল নিয়ে বসে থাকতে হবে—কেউ ঘুমিও না—

এটা নিতান্ত প্রথম দিন বলে এদের ভয় ছিল বেশি, দু-একদিনের মধ্যে জন্তু জানোয়ারের আওয়াজ গা-সওয়া হয়ে গেল। নিবিড় ট্রপিক্যাল জঙ্গলের মধ্যে প্রতি রাত্রেই নানা বন্য জানোয়ারের বিচিত্র আওয়াজ—আওয়াজ যা করে, তাঁবুর আশে-পাশেই করে—কিন্তু তাঁবুর লোককে আক্রমণ করে না।

সুশীল দু-দিন ঘুমোতে পারে নি—কিন্তু তিন রাত্রির পরে সে বেশ স্বচ্ছন্দে ঘুমোতে পারলে।

জঙ্গলের কূল-কিনারা নেই—ওরা পাঁচদিন ধরে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরেও কোন কিছুই দেখতে পেলে না সেখানে—ওই বন আর বন।

সূর্যের আলো না দেখে সুশীল তো হাঁপিয়ে উঠল। এ জঙ্গলে সূর্যের আলো আদৌ পড়ে না।

আগে দেশে থাকতে সে দু-একখানা ভ্রমণের বইতে পড়েছিল যে মেক্সিকোতে, মালয়ে, আফ্রিকায় এমন ধরনের বন আছে, যেখানে কখনো সূর্যালোক প্রবেশ করে না। কথাটা আলঙ্কারিকের অত্যুক্তি হিসেবেই সে ধরে নিয়েছিল, আজ সে সত্যই প্রত্যক্ষ করলে এমন

wapsip.com

বন, যা চির-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পড়ন্ত বেলায় কেবল সু-উচ্চ বনস্পতিরাজির শীর্ষদেশ অস্তমান সূর্যের রাঙা আলোয় রঞ্জিত হয় মাত্র। ক্বচিৎ নিবিড় লতাঝোপের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো চাঁদের আলো সামান্য-মাত্র পড়ে, নতুবা সকল সময়েই গোধূলি দিনমানে। চিরগোধূলির জগৎ এটা যেন।

একদিন সনৎ পড়ে গেল বিপদে।

তাঁবু থেকে বন্দুক হাতে শিকার করতে বার হয়ে সে একটা গাছের ডালে এক ভীষণ অজগর সাপ দেখে সেটাকে গুলি করলে। সাপটা দুলতে দুলতে গাছের ডাল থেকে পাক ছাড়িয়ে ঝুপ করে একবোঝা মোটা দড়াদড়ির মত নিচে পড়ে গেল।

সনৎ সেটার কাছে গিয়ে দেখলে অজগরের মাথাটা গুলির ঘায়ে একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার ল্যাজটা হঠাৎ এসে সনৎ-এর পা দু-খানা জড়িয়ে ধরে শক্ত কাঠ হয়ে গেল। সরীসৃপের হিমশীতল স্পর্শ সনতের স্নায়ুগুলোকে যেন অবশ করে দিলে, নিজের পা দুখানাকে সে আর মোটেই নাড়তে পারলে না—হাতদুটোকে যখন কষ্টে নাড়ালে তখন লোহার শেকলের মত নাগপাশের শক্ত বাঁধনে তার পদদ্বয় গতিশক্তিহীন।

অজগর তো মরে কাঠ হয়ে গেল, কিন্তু সনৎ চেষ্টা করেও কিছুতেই নাগপাশ থেকে পা ছাড়াতে পারলে না। পা যেন ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে, এমন কি সনৎ-এর মনে হল আর কিছুক্ষণ এ অবস্থায় থাকলে সে চিরদিনের মত চলৎশক্তি হারাবে। এদিকে বিপদের ওপর বিপদ, বেলা ক্রমশ পড়ে আসছে—এরই মধ্যে গোধূলি গিয়ে যেন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে বনে। কিছুক্ষণ পরে দিক ঠিক করে তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হয়ে পড়বে। আরও কিছুক্ষণ কাটল, শেয়ালের দল বনের মধ্যে ডেকে উঠল—একটু পরেই বন্য হস্তীর বৃংহিত অরণ্যভূমি কাঁপিয়ে তুলবে, হায়েনার অট্টহাসিতে বুকের রক্ত শুকিয়ে দেবে।

সনৎ সবই বুঝছে—কিন্তু কোন উপায় নেই। বন্দুকটার আওয়াজ করলে তাঁবুর লোকদের তার সন্ধান দেওয়া চলত বটে—কিন্তু বন্দুকে গুলি নেই। শেষ দুটো টোটা অজগরের দিকে সে ছুঁড়েছে।

তিমিরময়ী রাত্রি নামল।

অসহায় অবস্থায় চুপ করে কাত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া তার কোন উপায় নেই। প্রথমটা তার মনে খুব ভয় হল—কিন্তু মরীয়ার সাহসে সাহসী হয়ে শেষ পর্যন্ত সে চুপ করে শুয়েই রইল। মৃত অজগরটাকে অন্ধকারে আর দেখা যায় না—কিন্তু তার হিম-শীতল আলিঙ্গন প্রতিমুহূর্তে সনৎকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল যে প্রাণের বদলে সে প্রাণই নিতে চায়।

সারারাত্রি এভাবে কাটলে বোধ হয় সনৎ সে যাত্রা ফিরত না—কিন্তু অনেক রাত্রে হঠাৎ সনৎ-এর তন্দ্রা গেল ছুটে। অনেক লোক আলো নিয়ে এসে ডাকাডাকি করছে। ইয়ার হোসেনের গলা শোনা গেল—হালু-উ-উ—মিঃ রায়—

সনৎ-এর সর্বশরীর ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গিয়েছিল—সে গলা দিয়ে স্বর উচ্চারণ করতে পারলে না। কিন্তু ইয়ার হোসেনের টর্চের আলো এসে পড়ল ওর ওপরে। সবাই এসে ওকে ঘিরে দাঁড়াল। পাশের মৃত অজগর দেখে ওরা আগে ভেবেছিল সর্পের বেষ্টনে সনৎও প্রাণ হারিয়েছে—তারপর ওকে হাত নাড়তে দেখে বুঝলে ও মরে নি।

তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করতে সনৎ চাঙা হয়ে উঠল।

ইয়ার হোসেন সেদিন ওদের ডেকে পরামর্শ করতে বসল।

জামাতুল্লাকে বললে—কই, তোমার সে মন্দিরের বা শহরের ধ্বংসাবশেষ তো দেখি নে

wapsip.com

কোনদিকে।

জামাতুল্লা বললে—আমি তো আর মেপে রাখি নি মশাই ক-পা গেলে শহর পাওয়া যাবে—সবাই মিলে খুঁজে দেখতে হবে।

সুশীল একটা নক্সা দেখিয়ে বললে—এ ক-দিনে যতটা এসেছি, জঙ্গলের একটা খসড়া ম্যাপ তৈরি করে রেখেছি। এই দেখে আমরা যে-যে পথে এসেছি দেখতে হবে, সে পথে আর যাব না।

আবার ওদের দল বেরিয়ে পড়ল। দু-দিন পরে সমুদ্র-কল্লোল শুনে বনঝোপের আড়াল থেকে বার হয়ে ওরা দেখলে—সামনেই বিরাট সমুদ্র।

সনৎ চিৎকার করে বলে উঠল—আলাট্টা! আলাট্টা!

সুশীল বললে—তোমার এ চিৎকার সাজে না সনৎ। তুমি জেনোফনের বর্ণিত গ্রীক সৈন্য নও, সমুদ্রের ধারে তোমার বাড়ি নয়—

ইয়ার হোসেন বললে—ব্যাপার কী? আমি তোমাদের কথা বুঝতে পারছিনে—

সনৎ বললে—জেনোফন বলে একজন প্রাচীন যুগের গ্রীক লেখক—নিজেও তিনি একজন সৈনিক—পারস্য দেশের অভিযান শেষ করে ফিরবার সমস্ত দুঃখ-কষ্টটা 'দশ সহস্রের প্রত্যাবর্তন' বলে একখানা বইয়ে লিখে রেখে গিয়েছেন—তাই ও বলছে—

ইয়ার হোসেন তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—ও!

জামাতুল্লা বললে—আমার একটা পরামর্শ শোন। কম্পাসে দিক ঠিক করে চল এবার উত্তর মুখে যাই—ওদিকটা দেখে আসা যাক।

সকলেই এ কথায় সায় দিলে। সূর্যের মুখ না দেখে সকলেরই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। ওরা প্রথম দিনেই সমুদ্রের বালির ওপরে অনেকগুলো বড়-বড় কচ্ছপ দেখতে পেলে। ইয়ার হোসেনের একজন অনুচর ছুটে গিয়ে একটাকে উল্টে চিৎ করে দিলে, বাকিগুলো তাড়াতাড়ি গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মালয় দেশীয় দায়ের (মালয়েরা বলে 'বোলো') সাহায্যে কচ্ছপটাকে কাটা হল, মাংসটা ভাগ করে রান্না করে সকলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলে। ভাগ করার অর্থ এই যে ইয়ার হোসেনের দল ও জামাতুল্লার রান্না হত আলাদা, সুশীল ও সনৎ-এর আলাদা রান্না সনৎ নিজেই করত।

একদিন সমুদ্রের ধারে বালির ওপরে কি একটা জানোয়ার দেখে সনৎ ছুটে এসে সবাইকে খবর দিলে।

সকলে গিয়ে দেখলে প্রকাণ্ড বড় শুয়োরের মত বড় একটা জানোয়ার বালির ওপর চুপ করে শুয়ে। তার থ্যাবড়া নাকের নিচে বড় বড় গোঁপ—মুখের দুদিকে দুটো বড় বড় দাঁত।

ইয়ার হোসেন বললে—এ এক ধরনের সীল—সিঙ্গাপুরের সমুদ্রে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায় বটে।

সীলের মূল্যবান চামড়ার লোভে সনৎ ওকে গুলি করতে উদ্যত হল।

ইয়ার হেসেন নিষেধ করে বললে—ওটা মেরো না—ও সীলকে বলে সী লায়ন, ও মারলে অলক্ষণ হয়।

পরদিন তাঁবু তুলে সকলে উত্তর দিকের জঙ্গল ভেদ করে রওনা হল।

উত্তর দিকের জঙ্গলে সমুদ্রের ধার দিয়ে অনেকটা গেল ওরা। এক গাছ থেকে আর এক গাছে বড় বড় পুষ্পিত লতা সারা বন সুগন্ধে আমোদ করে ঝুলে পড়েছে—সুবৃহৎ লতা যেন অজগর সাপের নাগপাশে মহীরুহকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করছে—রাশি রাশি বিচিত্র অর্কিড।

wapsip.com

বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের পাখির দল ডালে ডালে—অদ্ভুত সৌন্দর্য বনের। সুশীল বললে—মিঃ হোসেন, ও কী লতা জানেন? যেমন সুন্দর ফুল—আর লতা দেখা যাচ্ছে না ফুলের ভারে—গন্ধও অদ্ভুত। ইয়ার হোসেন লতার নাম জানে না—তবে বললে, সিঙ্গাপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ওরকম লতা সে দেখেছে।

সারা দ্বীপে গভীর বন। বনের ভেতর দিয়ে যাওয়া কঠিন ও অনবরত গাছপালা কেটে যেতে হয় পথ করবার জন্যে—কাজেই ওরা সমুদ্রের ধার বেয়ে চলছিল। এক জায়গায় একটা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে বনের মধ্যে দিয়ে, নদী পার হয়ে যাওয়া কষ্টকর বলে ওরা বাধ্য হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নদী সরু হবার নাম নেই—অনেক দূরে বনের মধ্যে ঢুকে এখনও নদী বেশ গভীর।

সুশীল বললে—ওহে, নদীটা আমাদের দেশের বড় একটা খালের মত দেখছি। এ দ্বীপে এত বড় নদী আসছে কোথা থেকে? তেমন বড় পাহাড় কোথায়?

—নিশ্চয়ই বড় পাহাড় আছে বনের মধ্যে, সেইদিকেই তো যাচ্ছি—দেখা যাক—

আরও আধঘণ্টা সকলে মিলে গভীর জনহীন বনের মধ্যে দিয়ে চলল। বনের রাজ্য বটে এটা—সত্যিকার বন কাকে বলে এতদিন পরে প্রত্যক্ষ করল সুশীল সনৎ।

হঠাৎ এক জায়গায় একটা নাগকেশর গাছ দেখে সুশীল বলে উঠল—এই দ্যাখ একটা আশ্চর্য জিনিস! এই গাছ কোথাও এদিকে দেখা যায় না। নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ থেকে আমদানি এ গাছটা।

খুঁজতে খুঁজতে আশেপাশে আরও কয়েকটা নাগকেশর গাছ পাওয়া গেল। এই গভীর বনের মধ্যে নাগকেশর গাছ থাকার মানেই হচ্ছে এখানে কোন ভারতীয় উপনিবেশের অস্তিত্ব ছিল পুরাকালে।

সনৎ বললে—কিন্তু এ গাছ তো খুব পুরোনো না, দেখেই মনে হচ্ছে। আট ন-শো বছরের নাগকেশর গাছ কি বাঁচে?

—তা নয়। ঔপনিবেশিক ভারতীয়দের নিজেদের হাতে পোঁতা গাছের চারা এগুলো। বড় গাছগুলোর থেকে বীজ পড়ে পড়ে এগুলো জন্মেছে। এ গাছ অধস্তন চতুর্থ বা পঞ্চম পুরুষ আসল গাছের।

সেদিনই সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সনৎ বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা কৃষ্ণপ্রস্তর-মূর্তি দেখে চিৎকার করে সবাইকে এসে খবর দিলে। ওরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখলে গভীর জঙ্গলের লতাপাতার মধ্যে একটা ভাঙা পাষাণ-মূর্তি—মূর্তির মুণ্ডু নেই, তবে হাত পা দেখে মন হয় শিবমূর্তি ছিল সেটা। দু-হাত উঁচু প্রস্তর-বেদীর ওপর মূর্তিটা বসানো, এক হাতে বরাভয়, অন্য হাতে ডমরু, গলায় অক্ষমালা—এত দূর দেশে এসে ভারতীয় সংস্কৃতির এই চিহ্ন দেখে সুশীল ও সনৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল—সেখান থেকে যেন সরে যেতে পারে না। এই দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দুধর্মের বাণী বহন করে এনেছিল একদিন এদেশে। সুলু সমুদ্রের ওই ডুবো পাহাড় অতিক্রম করতে চীনা জাঙ্কওয়ালা যে কৌশল দেখালে, এই কম্পাস ও ব্যারোমিটারের যুগের বহু বহু পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষেরা সে কৌশল একদিন না যদি দেখাতে পারতেন—তবে নিশ্চয়ই এ দ্বীপে পদার্পণ তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। মনে মনে সুশীল তাঁদের প্রণতি জানালে। নমো নমঃ দিগ্বিজয়ী পূর্বপুরুষগণ, আশীর্বাদ কর—যে বল ও তেজ তোমাদের বাহুতে, যে দুর্ধর্ষ অনমনীয়তা ছিল তোমাদের মনে, আজ তোমার অধঃপতিত দুর্বল উত্তরপুরুষেরা যেন সেই-বল ও তেজের আদর্শে আবার

wapsip.com

নিজেদের গড়ে তুলতে পারে, সার্থক করতে পারে ভারতের নাম বিশ্বের দরবারে!

জামাতুল্লা ও ইয়ার হোসেনও চমৎকৃত হল। এ বনেও একদিন মানুষ ছিল তাহলে! এই যে গভীর বন আজ শুধু অজগর আর ওরাং ওটাংয়ের বিচরণক্ষেত্র, এখানে একদিন সভ্য মানুষের পদশব্দ ধ্বনিত হয়েছে, মন্দির গড়েছে, মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে—এ-ই সকলের চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার বলে মনে হল এদের কাছে।

জামাতুল্লাকে সুশীল বললে—কেমন, এসব দেখেছিলে বলে মনে হয়?

—এসব দেখি নি। তবে এতে বোঝা যাচ্ছে মানুষের বাসের নিকটে এসে পড়েছি।

—সে জায়গাটা কেমন?

—সে একটা শহর বাবুজি। তার বাইরে পাঁচিল ছিল একসময়ে। এখন পড়ে গিয়েছে।

—কম্পাস দেখে দিক ঠিক করেছিলে? ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড ঠিক করেছিলে?

—না বাবুজি, ওসব কিছু করি নি। কম্পাস ছিল না।

সকলের মনে আশার সঞ্চার হল যে এবার নিশ্চয়ই সে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি আসা গিয়েছে। কিন্তু তার পর তিনদিন কেটে গেল, চারদিন গেল, পাঁচদিন গেল—আবার সামনে সমুদ্রের পূর্ব তীর, আবার সুনীল সুলু সী। কোথায় নগর, কোথায়ই বা কী। একখানা ইট বা পাথরও জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কারও চোখে পড়ল না আর। আবার হতাশ হয়ে পড়ল সকলে। জামাতুল্লাকে ইয়ার হোসেন বললে—জামাতুল্লা সাহেব, স্বপ্ন দেখো নি তো হিন্দু-মন্দিরের আর শহরের? জামাতুল্লা গেল রেগে। ইয়ার হোসেনের অনুচরেরা নিজেদের মধ্যে কি বিড়-বিড় করতে লাগল।

সুশীল সনৎ ও জামাতুল্লাকে গোপনে ডেকে বললে—ইয়ার হোসেনের ওই লোকগুলোকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে যদি কিছু চিহ্ন না পাওয়া যায়—দেখছি ওগুলো ভারি বদমাইশ!

জামাতুল্লা বললে—ভাববেন না বাবুজি, আমি ছুরি চালাব, আপনাদের জন্যে প্রাণ দেব! ওরা কী করবে? কাঠের ভেলা তৈরি করে সুলু সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিয়ে যাব—ওই হলদেমুখো চীনে জাঙ্ক্‌ওয়ালা বড় বাহাদুরি করে গেল আপনাদের কাছে—দেখব ও কত বাহাদুর!

একদিন সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক আগে সুশীল বনের মধ্যে পাখি শিকার করতে বেরুল বন্দুক নিয়ে। কিছুদূর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সে অস্পষ্ট গোধূলির আলোয় দূর থেকে একটা লম্বা পাহাড়-মত দেখতে পেলে। আরও কাছে গিয়ে সে দেখলে পাহাড় ও তার মধ্যে একটা খাল, তাতে জল আছে—গভীর খাল। জলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। ভাল করে চেয়ে দেখে সে বুঝলে ওপারে ওটা পাহাড় নয়, একটা উঁচু পাঁচিল হতে পারে ওটা। খাল নয়, মানুষের হাতে কাটা পরিখা হয়ত। পাঁচিলের ওপর বড় বড় গাছ গজিয়েছে, মোট মোটা শেকড় পাঁচিলের গা বেয়ে এসে মাটিতে নেমেছে—তাদের ডালপালার ফাঁক দিয়ে জায়গায় জায়গায় পাঁচিলের গায়ের বড়-বড় পাথরের চাঁইগুলো দেখা যাচ্ছে।

সুশীল আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল।

এই তবে সেই প্রাচীন নগরীর প্রাচীর ও পরিখা। এ বিষয়ে ভুল থাকতে পারে না—তবে, হয়ত সে উল্টোদিক থেকে এটাকে দেখছে। নগরীর সিংহদ্বার অন্যদিকে আছে কোথাও।

সে যখন সকলকে গিয়ে খবর দিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার সমগ্র বনভূমিকে আচ্ছন্ন করেছে। ইতিমধ্যেই ওরাং-ওটাং ও শৃগালের ডাক শোনা যাচ্ছে। দু-একটা নিশাচর পাখি ছাড়া

wapsip.com

অন্য পাখির কূজন থেমে গিয়েছে। ডালপালার ফাঁকে ঊর্ধে কৃষ্ণ আকাশে নক্ষত্রাদি দেখা দিয়েছে।

ইয়ার হোসেন বারণ করলে—এখন না, এ রাত্রিকালে তাঁবু ছেড়ে কোথাও যেও না, কাল সকালে দেখা যাবে।

সুশীলের আনা পাখি দিয়ে তাঁবুতে ভোজ হল রাত্রে।

জামাতুল্লা বললে—পাঁচিল যখন বেরিয়েছে—তখন আমায় মিথ্যেবাদী বলে বদনাম আর কেউ দিতে পারবে না। পরদিন সকলে গিয়ে দেখলে, সত্যই বিরাট প্রাচীর ও পরিখার অস্তিত্ব ওদের সেখানে কোন প্রাচীন নগরীর অস্তিত্বের নিদর্শনস্বরূপ বিরাজমান।

পরিখার জলে পদ্মফুল দেখে সুশীল ও সনৎ ভাবলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক যেন ঐ ফুল। আট শো বছর আগে যে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ প্রথম পদ্মলতা এনে দুর্গপরিখার জলে পুঁতে দেয়, তারা আজ কোথায়? কিন্তু জলে একবার শেকড় গেড়ে যে পদ্মলতা বেঁচে উঠেছিল, সে বংশানুক্রমে আজও অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে এই গভীর অরণ্যের মধ্যে। ইয়ার হোসেনের আদেশে তার দু-জন অনুচর জল মেপে দেখলে, এখানে পার হওয়া অসম্ভব। পরিখার জল বেশ গভীর। পরিখার এক বাহু ধরে এক দল ও অন্যদিকে অন্য বাহুর সন্ধানে অন্য দল বার হল।

শেষের দলে গেল সুশীল।

উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা প্রাচীর-পরিখার উত্তর দিকে আধ মাইল-টাক গিয়ে ওদের দল সবিস্ময়ে দেখলে প্রাচীরের এক স্থান ভগ্ন। মাঝখান বেয়ে বেশ একটা রাস্তা যেন ছিল সুপ্রাচীন কালে, এখন অবিশ্যি ঘন বন। দেখে মনে হয় শত্রু দ্বারা দুর্গ বা নগর-প্রাচীর হয়ত এখানে ভগ্ন হয়ে থাকবে, নতুবা এর অন্য কোন কারণ নির্দেশ যায় না।

দেখা গেল পরিখার সেইখানে প্রাচীন কালে বোধহয় কাঠের সেতু ছিল, এখন সেটা পড়ছে ভেঙে জলে। জলের গভীরতা সেখানে কম। কাঠের সেতু প্রথমে দেখা যায় নি। ইয়ার হোসেনের জনৈক অনুচর প্রথমে জলের ধারে একটা শেকল দেখতে পায়। শেকলটা টেনে জলের মধ্য থেকে একখণ্ড লোহার পাত বেরুল। আন্দাজ করা কঠিন নয় যে এই লোহার পাত কাঠের চওড়া তক্তার গায়ে লাগানো ছিল। অনুমানটুকু ছাড়া কাঠের সেতুর অস্তিত্বের জন্য কোন নিদর্শন এতকাল পরে কিভাবে পাওয়া সম্ভব হতে পারে!

ইয়ার হোসেন বললে—এখান দিয়ে পার হওয়া যাক—জল গভীর হবে না।

সুশীল সামান্য একটু আপত্তি করলে—অথবা কেন যে করলে তা সে নিজেই জানে না।

প্রথমে নামল ইয়ার হোসেন নিজে—তার পেছনে নামল সুশীল। হাত তিন চার মাত্র জলে যখন ওরা গিয়েছে তখন ওরা দেখলে সামনে জলের যা গভীরতা, তাতে আর অগ্রসর হওয়া চলবে না। ঠিক সেই সময় ওদের নিকট থেকে হাত পাঁচ ছয় দূরে ইয়ার হোসেনের একজন অনুচর—যে শিকল টেনে তুলেছিল জল থেকে—সে নামল, উদ্দেশ্য, ওদের পাশাপাশি সেও পরিখা পার হবে। কিন্তু পরক্ষণেই এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটল।

সুশীল চোখের কোণ দিয়ে অল্পক্ষণের জন্যে দেখতে পেলে, লোকটার ছ-সাত হাত দূরে ছোট্ট কাঠের মত কালো কি একটা জিনিস যেন ভাসছে। দু-সেকেন্ড মাত্র, পরেই হঠাৎ যেন ভূমিকম্পে বিরাট জলোচ্ছ্বাস উঠল, একটা আর্ত চিৎকার-ধ্বনি অল্পক্ষণের মধ্যে শোনা গেল···. কিসের একটা প্রবল ঝাপটা এসে ওদের জলের ওপর কাত করে ফেললে···ওদের দু-জনকে।

wapsip.com

পরক্ষণেই ইয়ার হোসেনের সেই অনুচর অদৃশ্য।

কী হল ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারলে না—অবিশ্যি এক মিনিটও হয় নি এর মধ্যে সব ঘটে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ডাঙায় যারা ছিল তারা চেঁচিয়ে উঠল—শয়তান! শয়তান!

ইয়ার হোসেন আকুলভাবে চিৎকার করে বললে—ডাঙায় ওঠো—ডাঙায় ওঠো!

হতভম্ব সুশীল কাদা হাঁচড়ে মরি-বাঁচি ডাঙায় উঠল—পাশাপাশি ইয়ার হোসেন উঠল, জলে চেয়ে দেখলে জল কাদা-ঘোলা হয়েছে, ইয়ার হোসেনের অনুচর নিশ্চিহ্ন।

সুশীল ও ইয়ার হোসেন তখনও হাঁপাচ্ছে; সুশীলের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে!

সে ভীত কণ্ঠে বললে—কী হল?

ইয়ার হোসেন বললে—আমাদের সাবধানে জলে নামা উচিত ছিল। এইসব প্রাচীন কালের জলাশয়ে কুমির থাকা সম্ভব, একথা ভুলে গিয়েছিলাম। খোঁজ সবাই—

কুমির! সুশীল অবাক হয়ে গেল। কে জানত নগরীর পরিখায় কুমির থাকতে পারে! দুর্গপরিখার প্রহরী এরা—হয়ত প্রাচীন দিনেই শত্রুরোধকল্পে জলের মধ্যে কুমির ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সুবিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় এখনও তারা বাইরের লোকের অনধিকার প্রবেশে বাধাদান করছে।

খুঁজে কিছু হল না—জল কিছুক্ষণ পরে হতভাগ্য অনুচরের রক্তে রাঙা হয়ে উঠল। ইয়ার হোসেন বললে—আজ থামলে আমাদের চলবে না—এগোও। নগরের ফটক খোঁজো—

সুশীল বললে—জলের মধ্যে অজানা বিপদ। জল পার হওয়ার দরকার নেই—হেঁটে বা সাঁতরে। কোথাও সেতু আছে কি না দেখা যাক।

আবার উত্তর মুখে সকলে চলল। মাইল দুই সোজা চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল—কারণ ভীষণ জঙ্গল কেটে কেটে অগ্রসর হতে হচ্ছে। আগুন জ্বেলে তাঁবু ফেলে সেদিন সকলে সেখানে রাত্রি কাটাবার আয়োজন করলে। এমন সময় বহু দূরে একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল—তার উত্তরে ওরাও একটা আওয়াজ করলে। দুটি দলের মধ্যে যোগসূত্র রাখবার একমাত্র উপায় এই বন্দুকের আওয়াজ—অনেক দূর থেকে দক্ষিণগামী দলের এ হল সঙ্কেতধ্বনি। পরদিন সকালে আরও এক মাইল গিয়ে প্রাচীরের উত্তর দিক থেকে পূর্ব দিকে মুখ ফেরালে। অর্থাৎ এ দিকে আর শহর নেই। প্রাচীর ধরে সবাই বাঁকতে গিয়ে দেখলে পরিখার এপারে অনেকগুলো স্তূপ, স্তূপের ওপর বিরাট জঙ্গল। বড় বড় পাথর গড়িয়ে এসে পড়েছে স্তূপ থেকে নিচে—সেগুলো বেশ চৌকশ করে কাটা। সম্ভবত স্তূপের ওপর কোন দুর্গ ছিল যা ঠিক নগর-প্রাচীরের উত্তর-পশ্চিম কোণ পাহারা দিত।

পশ্চিম মুখে কতটা যেতে হবে কেউ জানে না, কারণ তারা দৈর্ঘ্য ধরে যাচ্ছে, না প্রস্থ ধরে যাচ্ছে তা জানবার সময় এখনও আসে নি। সেদিনও কেটে গেল বনের মধ্যে; সন্ধ্যা নামল। সন্ধ্যায় যে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল, তার আওয়াজ খুব ক্ষীণ ও অস্পষ্ট।

সুশীল বললে—আমার দৈর্ঘ্য অতিক্রম করেছি—প্রস্থ ধরে চলেছি। বুঝেছেন মিঃ হোসেন।

—এবার বুঝলাম। ওদিকে যে দল গিয়েছে তারা ওদিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে বন্দুক ছুঁড়ছে। অন্তত সাত মাইল দূর এখান থেকে।

পরদিন বেলা দশটার মধ্যে নগরীর সিংহদ্বার পাওয়া গেল। সেখানটাতে পরিখার ওপর

wapsip.com

পাথরের সেতু। এপারে সেতু রক্ষার জন্যে দুর্গ ছিল, বর্তমানে প্রকাণ্ড ভরা ঢিবি।

সকলে ব্যস্ত হয়ে সেতু পার হয়ে সিংহদ্বার লক্ষ্য করে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হয়েই থেমে গেল।

সিংহদ্বারের খিলান ভেঙে পড়ত—যদি বট-জাতীয় কয়েকটি বৃক্ষের শিকড় আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে না জড়িয়ে ধরে রাখত! সিংহদ্বারের দুপাশে অদ্ভুত দুই প্রস্তর-মূর্তি— নাগরাজ বাসুকি ফণা তুলে আছে সামনে, পেছনে তিন-মুখ-বিশিষ্ট কোন দেবতার মূর্তি। সূর্যের আলো ওপরের বটবৃক্ষের নিবিড় ডালপালা ভেদ করে মূর্তি দুটির গায়ে বাঁকাভাবে এসে পড়েছে।

গম্ভীর শোভা। সুশীল শুধু নয়, দলের সকলেই দাঁড়িয়ে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রইল এই কারুকার্যময় সিংহদ্বার ও প্রাচীন যুগের শিল্পীর হাতের এই ভাস্কর্যের পানে।

সুশীল হাত জোড় করে প্রণাম করলে মূর্তি দুটির উদ্দেশ্যে। সে পুরাতত্ত্ব বা দেবমূর্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ না হলেও আন্দাজ করলে এ দুটি তিন-মুখ-বিশিষ্ট শিবমূর্তি।

সুলু সমুদ্রের এই জনহীন অরণ্যাবৃত দ্বীপে প্রাচীন ভারতের শক্তি ও তেজ একদিন এই দেবমূর্তিকে স্থাপিত করেছিল। আজ ভারত অধঃপতিত,—দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। হে দেব, তোমার যে ভক্তগণ তোমাকে এখানে বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারা আজ নেই—তাদের অযোগ্য বংশধরকে তুমি সেই শৌর্য ও সাহস ভিক্ষা দাও, তাদের বীরপুরুষদের বংশধর করে দাও, হে রুদ্রভৈরব!

ইয়ার হোসেন পর্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল। এই বিরাট ভাস্কর্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে বললে—যদি আমার দিন আসে, এই মূর্তি সিঙ্গাপুরের মিউজিয়মে দান করবার ইচ্ছে রইল—

সুশীল বললে—তা কখনো করবেন না মিঃ হোসেন, যেখানকার দেবতা সেইখানেই তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিন। অমঙ্গলকে ডেকে আনবেন না।

সিংহদ্বার অতিক্রম করে ওরা নগরীর মধ্যে ঢুকল। কিন্তু অল্প কিছুদূর গিয়েই দেখলে, এত দুর্ভেদ্য জঙ্গল যে দশ হাত এগিয়ে যাবার উপায় নেই বন না কাটলে। সিংহদ্বারের সামনেই নিশ্চয় প্রাচীন নগরের রাজপথ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সে রাজপথের ওপরই তিন চারশো বছরের পুরোনো বট-জাতীয় বৃক্ষ, বন্য রবার, বন্য ডুমুর গাছ। এইসব বড় গাছের নিচে আগাছা ও কাঁটালতার জঙ্গল। ওরাং-ওটাংও এই জঙ্গল ভেদ করে অগ্রসর হতে পারে না—মানুষ কোন্ ছার।

ইয়ার হোসেনের হুকুমে মালয় অনুচরেরা 'বোলো' দিয়ে জঙ্গল কেটে কোন রকমে একটু সুঁড়িপথ বার করতে করতে সোজা চলল।

সুশীল বললে—এ জঙ্গল তো দেখছি নগরের বাইরে যেমন ছিল এখানেও তেমনি। কেবল এটা পাঁচিলের মধ্যে এই যা তফাত। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল—দেখুন! দেখুন!

সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখল, সামনে প্রকাণ্ড একটা মন্দিরের চূড়া লতা-ঝোপের আবরণ থেকে অনেক উঁচুতে মাথা বের করে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের কাছে যাবার কোন উপায় নেই—অনেক দূর থেকে বড়-বড় দেওয়াল ভাঙা পাথর ছড়িয়ে জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে অন্তত দেড়শো হাত পর্যন্ত।

ওরা ডিঙিয়ে লাফিয়ে কোন রকমে মন্দিরের সামনে বড় চত্বরের কাছে এল—কিন্তু সামনেই গোপুরমের মত উঁচু পাইলন টাওয়ার। তার সুবিশাল পাথরের খিলান ফেটে চৌচির হয়ে সিংহদ্বারের মতই আষ্টেপৃষ্ঠে বড় বড় শেকড় আর লতার বাঁধনে আজ কত যুগ যুগ ধরে ঝুলছে—তার ঠিকানা কারও কাছে নেই। গোপুরম ছাড়িয়ে মন্দিরের দেওয়াল, বিকটাকার

wapsip.com

দৈত্যের মুখের মত সারি সারি অনেকগুলো মুখ দেওয়ালের গায়ে বেরিয়ে আছে—সুশীল আঙুল দিয়ে ওদের দেখিয়ে বললে—দেখ কী চমৎকার কাজ! হয় পাথরের কড়ি নয়ত পয়োনালি, যাকে ইংরাজিতে বলে গর্গয়েল। অর্থাৎ বিকট জানোয়ারের মুখ বসানো নালি।

সকলেই অবাক হয়ে সেই কল্পনাসৃষ্ট ভীষণ মুখগুলোর দিকে চেয়ে রইল। সুন্দরকে গড়ে তোলে সেও যেমন কৌশলী শিল্পী, ভীষণকে যে রূপ দেয়, সে শিল্পীও ঠিক তত বড়। সুশীলের মনে পড়ল আনাতোল ফ্রাঁসের সেই গল্প, শয়তানকে এমন বিকট করে আঁকলে শিল্পী যে, রাতের অন্ধকারে শয়তান এসে শিল্পীকে জাগিয়ে জিগ্যেস করলে—তুমি আমাকে এর আগে কোথায় দেখেছিলে যে অমন করে এঁকেছ? শিল্পী বললে—আপনি কে?

শয়তান বললে—আমি লুসিফার। যাকে তোমরা বল শয়তান। ও নামটায় আমার ভয়ানক আপত্তি তা জানো? তুমি কী বিশ্রী করে এঁকেছ আমায়! আমি কি অত খারাপ দেখতে? দেখ না আমার দিকে চেয়ে!

শিল্পী দেখলে শয়তানের মূর্তি দেখতে বেশ সুন্দর, তবে মুখশ্রী ঈষৎ বিষণ্ণ। ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললে—আমায় মাপ করুন, আমি এর আগে দেখি নি আপনাকে। আমি স্বীকার করছি আমার ভুল হয়েছে। আমি ভুল শুধরে নেব—

শয়তান হাসতে হাসতে বললে—তাই শুধরে নাও গে যাও—নইলে তোমার কান মলে দেব—

যাক। ওরা সবাই খিলানের তলা দিয়ে অগ্রসর হয়ে মন্দিরের মধ্যেকার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল। শুধু ভীষণ কাঁটাগাছ আর বেত, যা থেকে মলক্কা বেতের ছড়ি হয়।

সনৎ ছেলেমানুষ, ভাল বেত দেখে বলে উঠল—দাদা, একটা বেত কাটব?

ইয়ার হোসেন তাকে ধমক দিয়ে কি বলতে যাচ্ছে, এমন সময় একটি সুন্দর পাখি এসে সামনের বন্য রবারের গাছের ডাল থেকে মন্দিরের ভাঙা পাথরের কার্নিসে বসল। সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল পাখিটার দিকে। কী সুন্দর! দীর্ঘ পুচ্ছ ঝুলে পড়েছে কার্নিস থেকে প্রায় এক হাত—ময়ূরের পুচ্ছের মত। হলদে ও সাদা আঁখি পালকের গায়ে—পিঠের পালকগুলো ঈষৎ বেগুনি।

ইয়ার হোসেন বললে—টিকাটুরা, যাকে সাহেব লোক বলে বার্ড অব্ প্যারাডাইজ—খুব সুলক্ষণ।

সনৎ বললে—বাঃ কী চমৎকার! এই সেই বিখ্যাত বার্ড অব প্যারাডাইজ! কত পড়েছি ছেলেবেলায় এদের কথা—

সুশীল বললে—সুলক্ষণ কুলক্ষণ দুরকমই দেখছি। কুমির নিলে একজনকে, আবার বার্ড অব্ প্যারাডাইজ দেখা গেল এটা সুলক্ষণ—

মন্দিরের বিভিন্ন কুঠরি। প্রত্যেক কুঠরির দেওয়ালে সারবন্দী খোদাই কাজ। সুশীল একখানা পাথরের ইট মনোযোগের সঙ্গে দেখলে। একজন ভারতবর্ষীয় হিন্দু রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁর পাশে বোধহয় গ্রহবিপ্র পাঁজি পড়ছেন। সামনে একসার লোক মাথা নিচু করে যেন রাজাকে অভিবাদন করছে। রাজার এক হাতে একটা কী পাখি—হয় পোষা শুক, নয়ত শিক্‌রে বাজ।

ভারত! ভারত! কত মিষ্টি নাম, কী প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডার! তার নিজের দেশের মানুষ একদিন কম্পাস-ব্যারোমিটারহীন যুগে সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এখানে এসে হিন্দুধর্মের নিদর্শন রেখে গিয়েছিল, তাদের হাতে গড়া এই কীর্তির ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে

wapsip.com

গর্বে ও আনন্দে সুশীলের বুক দুলে উঠল। বীর তারা, দুর্বল হাতে অসি ও বর্শা ধরে নি, ধনুকে জ্যা রোপণ করে নি—সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে—এই অজ্ঞাত বিপদসঙ্কুল মহাসাগর—হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিগ্বিজয় করে নটরাজ শিবের পাষাণ-দেউল তুলেছে সপ্তসমুদ্র-পারে।

পরবর্তী যুগের যারা স্মৃতিশাস্ত্রের বুলি আউড়ে টোলের ভিটেয় বাঁশবনের অন্ধকারে বসে বলে গিয়েছিল—সমুদ্রে যেও না, গেলে জাতটি একেবারে যাবে, হিন্দুত্ব একেবারে লোপ পাবে,—তারা ছিল গৌরবময় যুগের বীর পূর্বপুরুষদের অযোগ্য বংশধর, তাদের স্নায়ু দুর্বল, মন দুর্বল, দৃষ্টি ক্ষীণ, কল্পনা স্থবির।

তারা হিন্দু নয়—হিন্দুর কঙ্কাল।

দুদিন ধরে ওরা বনের মধ্যে কত প্রাচীন দেওয়াল, ধ্বংসস্তূপ, দরজা, খিলান ইত্যাদি দেখে বেড়ালো। জ্যোৎস্না রাত্রি, গভীর রাত্রে যখন ওরাং-ওটাংয়ের ডাকে চারিপাশের ঘন জঙ্গল মুখরিত হয়ে ওঠে, অজ্ঞাত নিশাচর পক্ষীর কুস্বর শোনা যায়, বন্য রবারের ডালপালায় বাদুড় ঝটাপটি করে, তখন এই প্রাচীন হিন্দু নগরীর ধ্বংসস্তূপে বসে সুশীল যেন মুহূর্তে কোন্ মায়ালোকে নীত হয়—অতীত শতাব্দীর হিন্দু সভ্যতার মায়ালোক—দিগ্বিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্ত কবি ও বীন-বাজিয়ে যে মহাযুগের প্রতীক, হুনবিজেতা মহারথ স্কন্দগুপ্তের কোদণ্ড-টঙ্কারে যে যুগের আকাশ সন্ত্রস্ত।

সুশীল স্বপ্ন দেখে। সনৎকে বলে—বুঝলি সনৎ, জামাতুল্লাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ যে ও আমাদের এনেছে এখানে। এসব না দেখলে ভারতবর্ষের গৌরব কিছু বুঝতাম না!

সনৎ এ কথায় সায় দেয়। টাকার চেয়ে এর দাম বেশি।

ইয়ার হোসেন কিন্তু এসব বোঝে না। সে দিন-দিন উগ্র হয়ে উঠছে। এই নগরীর ধ্বংসস্তূপে প্রায় দশদিন কাটল। অথচ ধনভাণ্ডারের নামগন্ধও নেই, সন্ধানই মেলে না। জামাতুল্লাকে একদিন স্পষ্ট শাসালে—যদি টাকাকড়ির সন্ধান না মেলে তো তাকে এই জঙ্গলে টেনে আনবার মজা সে টের পাইয়ে দেবে।

জামাতুল্লা সুশীলকে গোপনে বললে—বাবুজি, ইয়ার হোসেন বদমাইস গুণ্ডা—ও না কী গোলমাল বাধায়!

সুশীল ও সনৎ সর্বদা সজাগ হয়ে থাকে রাত্রে, কখন কী হয় বলা যায় না। ইয়ার হোসেনের সশস্ত্র অনুচরের দল দিন-দিন অসংযত হয়ে উঠছে।

একদিন জামাতুল্লা বনের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় একটি বড় পাথরের থাম আবিষ্কার করলে। থামের মাথায় ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে পদ্ম তৈরি করা হয়েছে। সুশীলকে ডেকে নিয়ে গেল জামাতুল্লা, সুশীল এসব দেখে খুশি হল। সুশীল ও সনৎ দুজনে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে থামটা দেখতে গেল।

সেখানে গিয়েই সুশীল দেখলে থামটার সামনে আড়ভাবে পড়ে প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঙ—যেন একখানা চৌরশ করা শানের মাঝে। সুশীল ক্যামেরা এনেছে থামটার ফটো নেবে বলে, পাথরটা সরিয়ে না দিলে পদ্মটির ছবি নেওয়া সম্ভব না।

জামাতুল্লা বললে—পাথরখানা ধরাধরি করে এসো সরাই।

সরাতে গিয়ে পাথরখানা যেই কাত অবস্থা থেকে সোজা হয়ে পড়ল, অমনি সনৎ চিৎকার করে বললে—দেখ, দেখ—

সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, যেখানে পাথরটা ছিল, সেখানে একটা সুড়ঙ্গ যেন মাটির নিচে

wapsip.com

নেমে গিয়েছে। জামাতুল্লা ও সুশীল সুড়ঙ্গের ধারে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, সুড়ঙ্গটা হঠাৎ বেঁকে গিয়েছে, প্রথমটা সেজন্য মনে হয় গর্তটা নিতান্তই অগভীর।

সুশীল বললে—আমি নামব—

জামাতুল্লা বললে—তা কখনো করতে যাবেন না, বিপদে পড়বেন। কী আছে গর্তের মধ্যে কে জানে!

সুশীল বললে—নেমে দেখতেই হবে। আমি এখানে থাকি, তোমরা গিয়ে তাঁবু থেকে মোটা দড়ি হাত-চল্লিশ, টর্চ আর রিভলভার নিয়ে এসো। ইয়ার হোসেনকে কিছু বোলো না।

সব আনা হল। সুশীল জামাতুল্লা দুজনে সুড়ঙ্গের মধ্যে নামলে। খানিক দূর নামলে ওরা। পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি, পনেরো ষোল ধাপ নেমেই কিন্তু দুজনে হতাশ হল দেখে, সামনে আর রাস্তা নেই। সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে একটা গাঁথা দেওয়ালের সামনে।

সুশীল বললে—এর মানে কী জামাতুল্লা সাহেব?

—বুঝলাম না বাবুজি। যদি যেতেই দেবে না, তবে সিঁড়ি গেঁথেছে কেন?

রাত হয়ে আসছে। ওরা দুজনে টর্চ ফেলে চারিদিক ভাল করে দেখতে লাগল। হঠাৎ সুশীল চেঁচিয়ে উঠে বললে—দেখ, দেখ! দুজনেই অবাক হয়ে দেখলে মাথার ওপরে পাথরের গায়ে ওদের পরিচিত সেই চিহ্ন খোদা—পদ্মরাগ মণির ওপর যে-চিহ্ন খোদা ছিল। ভারতীয় স্বস্তিক চিহ্ন, প্রত্যেক বাহুর কোণে এক এক জানোয়ারের মূর্তি—সর্প, বাজপাখি, বাঘ ও কুমির।

—এই সেই আঁক-জোঁক বাবুজি! কিন্তু এর মানে কী, সিঁড়ি বন্ধ করলে কেন, বুঝলেন কিছু?

দুজনেই হতভম্ব হয়ে গেল। সুশীল সামনে পাথরখানাতে হাত দিলে, বেশ মসৃণ; মাপ নিয়ে চৌরশ করে কেটে কে তৈরি করে রেখেছে।

কিছুই বোঝা গেল না—অবশেষে হতাশ হয়ে ওরা গর্ত থেকে উঠে পড়ে তাঁবুতে ফিরে এল সনৎকে নিয়ে। সেখানে কাউকে কিছু বললে না। পরদিন দুপুরবেলা সুশীল একা জায়গাটায় গেল। আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে নামলে। ওর মনে একথা বিশেষভাবে জেগে ছিল, লোকে এইটুকু গর্তে ঢুকবার জন্যে এরকম সিঁড়ি গাঁথে না। এ সুড়ঙ্গ নিশ্চয় আরও অনেক বড়। কিন্তু তবে দশ ধাপ নেমেই পাথর দিয়ে এমন শক্ত করে বোজানো কেন?

এ গোলমেলে ব্যাপারের কোন মীমাংসা করা যায় না দেখা যাচ্ছে। সুশীল চারিদিকে চেয়ে দেখলে মাথার ওপরে পাথরের গায়ে সেই অদ্ভুত চিহ্নটি সুস্পষ্ট খোদাই করা আছে। এ চিহ্নই বা এখানে কেন? ভাল করে চেয়ে চিহ্নটি দেখতে দেখতে ওর চোখে পড়ল, যে পাথরের গায়ে চিহ্নটি খোদাই করা তার এক কোণের দিকে আর একটা কি খোদাই করা আছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকার খুব না হলেও আলোও তেমন নয়। সুশীল টর্চ ফেলে ভাল করে দেখলে—চিহ্নটি আর কিছুই নয়, ঠিক যেন একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রাখবার সামান্য খোল। খোলের চারিপাশে দুটি লতার আকারের বলয় কিংবা অন্য কোন অলঙ্কার পরস্পর যুক্ত। সুশীল কি মনে ভেবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের খোলে নিজের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে দেখতে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের পাথর যেন কলের দোরের মত সরে একটা মানুষ যাবার মত ফাঁক হয়ে গেল। সুশীল অবাক! এ যেন সেই আরব্য উপন্যাসের বর্ণিত আলিবাবার গুহা!

সে বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলে, সিঁড়ির পর সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে। সুশীল সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগে উঁকি মেরে চাইলে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে। বহু যুগ আবদ্ধ দূষিত

wapsip.com

বাতাসের বিষাক্ত নিশ্বাস যেন ওর চোখে মুখে এসে লাগল। তখন কিন্তু সুশীলের মন আনন্দে কৌতূহলে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, বসে ভাববার সময় নেই। ও তাড়াতাড়ি কয়েক ধাপ নেমে গেল।

আবার সিঁড়ি বেঁকে গিয়েছে কিছুদূর গিয়ে। এবার আর সামনে পাথর নেই, সিঁড়ি এঁকে-বেঁকে নেমে চলেছে। সুশীল একবার ভাবলে তার আর যাওয়া উচিত নয়। কতদূর সিঁড়ি নেমেছে এই ভীষণ অন্ধকূপের মধ্যে কে জানে? কিন্তু কৌতূহল সংবরণ করা ওর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। ও আরও অনেকখানি নিচে নেমে গিয়ে দেখলে এক জায়গায় সিঁড়ি হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। টর্চ জ্বেলে নিচের দিকে ঘুরিয়ে দেখলে, কোন দিকে কিছুই নেই—পাথর-বাঁধানো চাতাল বা মেঝের মত তলাটা সব শেষ, আর কিছু নেই। ইংরাজিতে যাকে বলে dead end, ও সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। সুশীল হতভম্ব হয়ে গেল।

যারা এ সিঁড়ি গেঁথেছিল তারা কী জন্যে এত সতর্কতার সঙ্গে এত কষ্ট করে সিঁড়ি গেঁথেছিল যদি সে সিঁড়ি কোথাও না পৌঁছে দেয়।

চাতালের দৈর্ঘ্য হাত-তিনেক, প্রস্থ হাত আড়াই। খুব একখানা বড় পাথরের দ্বারা যেন সমস্ত মেঝে বা চাতালটা বাঁধানো। তন্ন-তন্ন করে খুঁজে চাতালের কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। সুশীল বাধ্য হয়ে বোকা বনে উঠে চলে এসে জামাতুল্লা ও সনৎকে সব বললে, ওরা পরদিন লুকিয়ে তিনজনে সেখানে গেল, সিঁড়ি দিয়ে নামলে। সামনে সেই চাতাল। সিঁড়ির শেষ।

জামাতুল্লা বললে—এ কী তামাশা আছে বাবুজি—আমি তো বেকুব বনে গেলাম!

তিন জনে মিলে নানাভাবে পাথরটা দেখলে, এখানে টিপলে ওখানে চাপ দিলে—হিমালয় পর্বতের মতই অনড়। কোথাও কোন চিহ্ন নেই পাথরের গায়ে। মিনিট কুড়ি কেটে গেল। মিনিট কুড়ি সেই অন্ধকার ভূগর্ভে কাটানো বিপজ্জনকও বটে, অস্বস্তিকরও বটে।

সুশীল বললে—ওঠ সবাই, আর না এখানে।

হঠাৎ জামাতুল্লা বলে উঠল—বাবুজি, একটা কথা আমার মনে এসেছে।

দুজনেই বলে উঠল কী? কী?

—গাঁতি দিয়ে এই পাথরখানা খুঁড়ে তুলে দেখলে হয়। কী বলেন?

তখন ওরাও ভাবলে এই সামান্য কথাটা। যে কথা, সেই কাজ। জামাতুল্লা লুকিয়ে তাঁবু থেকে গাঁতি নিয়ে এল। পাথর খুঁড়ে শাবলের চাড় দিয়ে তুলে ফেলে যা দেখলে তাতে ওরা যেমন আশ্চর্য হল তেমনি উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবার সিঁড়ির ধাপ। কিন্তু দশ ধাপ নেমে গিয়ে সিঁড়ি বেঁকে গেল—আবার সামনে চৌরশ পাথর দিয়ে সুড়ঙ্গ বোজানো। মাথার ওপরকার পাথরে পূর্ববৎ চিহ্ন পাওয়া গেল। বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে আবার সে পাথর ফাঁক হল। আবার সিঁড়ি। কিন্তু কিছুদূর নেমে আবার পাথর-বাঁধানো চাতাল—আবার সেই dead end নির্দেশহীন শূন্য।

অমানুষিক পরিশ্রম। আবার পাথর তুলে ফেলা হল—আবার সিঁড়ি। সুশীল বললে, যারা এ গোলকধাঁধা করেছিল, তারা খানিকদূর গিয়ে একবার একখানা পাথর সোজা করে পথ বুজিয়েছে, তার পরেরটা সিঁড়ির মত পেতে বুজিয়েছে—এই এদের কৌশল, বেশ বোঝা যাচ্ছে। জামাতুল্লা ওদের সতর্ক করে দিলে—বললে—বাবুজি, অনেকটা নিচে নেমে এসেছি। খারাপ গ্যাস থাকতে পারে, দম-বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারি সবাই। তাঁবুতেও সন্দেহ করবে।

wapsip.com

চলুন আজ ফিরি।

তাঁবুতে ফিরবার পথে জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, ইয়ার হোসেনকে এর খবর দেবেন না।

—কেন?

—কী জানি কী আছে ওর মধ্যে। যদি রত্নভাণ্ডারের সন্ধানই পাওয়া যায়, তবে ইয়ার হোসেন কী করবে বলা যায় না। ওর সঙ্গে লোক বেশি। প্রত্যেকে গুণ্ডা ও বদমাইশ। মানুষ খুন করতে ওরা এতটুকু ভাববে না। ওদের কাছে মশা টিপে মারাও যা, মানুষ মারাও তাই।

ইয়ার হোসেনের মন যথেষ্ট সন্দিগ্ধ। তাঁবুতে ফিরতে সে বললে—কোথায় ছিলে তোমরা?

সুশীল বললে—ফটো নিচ্ছিলাম।

ইয়ার হোসেন হেসে বললে—ফটো নিয়ে কী হবে, যার জন্যে এত কষ্ট করে আসা—তার সন্ধান কর।

ইয়ার হোসেনের জনৈক মালয় অনুচর সেদিন দুপুরে একটা পাথরের বৃষমূর্তি কুড়িয়ে পেলে গভীর বনের মধ্যে। খুব ছোট, কিন্তু অতটুকু মূর্তির মধ্যেও শিল্পীর শিল্পকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় বর্তমান।

রাত্রে জ্যোৎস্না উঠল।

সুশীল তাঁবু থেকে একটু দূরে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসল। ভাবতে ভাল লাগে এই সমুদ্রমেখলা দ্বীপময় রাজ্যের অতীত গৌরবের দিনের কাহিনী। রাত্রের যামঘোষী দুন্দুভি যেন বেজে উঠল—ধারাযন্ত্রে স্নান সমাপ্ত করে, কুঙ্কুমচন্দনলিপ্ত দেহে দিগ্বিজয়ী নৃপতি চলেছেন অন্তপুরের অভিমুখে। বারবিলাসিনীরা তাঁকে স্নান করিয়ে দিয়েছে এইমাত্র—তারাও ফিরছে তাঁর পিছনে পিছনে, কারও হাতে রজত কলস, কারও হাতে স্ফটিক কলস···

আধো-অন্ধকারে কালো মত কে একটা মানুষ বনের মধ্যে থেকে বার হয়ে সুশীলের দিকে ছুটে এল আততায়ীর মত—সুশীল চমকে উঠে একখানা পাথর ছুঁড়ে মারল। মানুষটা পড়েই জানোয়ারের মত বিকট চিৎকার করে উঠল—তারপর আবার উঠে আবার ছুটল ওর দিকে। সুশীল ছুট দিলে তাঁবুর দিকে।

ওর চিৎকার শুনে তাঁবু থেকে সনৎ বেরিয়ে এল। ধাবমান জিনিসটাকে সে গুলি করলে। সেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দেখা গেল একটা ওরাং-ওটাং।

জামাতুল্লা ও ইয়ার হোসেন দু-জনে তিরস্কার করলে সুশীলকে।

এই বনে যেখানে সেখানে একা যাওয়া উচিত নয়, তারা কতবার বলবে একথা? কত জানা অজানা বিপদ এখানে পদে পদে!

পরদিন ছুতো করে সুশীল ও জামাতুল্লা আবার বেরিয়ে গেল। বনের মধ্যে সেই গুহায়। সনৎকে সঙ্গে নিয়ে গেল না। কেননা সকলে গেলে সন্দেহ করবে ওরা।

আবার সেই পরিশ্রম। আরও দুধাপ সিঁড়ি ও দুটো চাতাল ওরা ডিঙিয়ে গেল। দিন শেষ হয়ে গেল, সেদিন আর কাজ হয় না। আবার তার পরের দিন কাজ হল শুরু। এইরকম আরও তিন চার দিন কেটে গেল।

একদিন সনৎ বললে—দাদা, তোমরা আর সেখানে দিনকতক যেও না।

সুশীল বললে—কেন?

—ইয়ার হোসেন সন্দেহ করছে। সে রোজ বলে, এরা বনের মধ্যে কী করে? এত

wapsip.com

ফটো নেয় কিসের?

—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আর একদিনের কাজ বাকি। ওর শেষ না দেখে আমি আসতে পারছি নে।

—একা যাও—দু-জনে যেও না। জোট বেঁধে গেলেই সন্দেহ করবে। হাতিয়ার নিয়ে যেও।

—তুই তাঁবুতে থেকে নজর রাখিস ওদের ওপর। কাল খুব সকালে আমি বেরিয়ে যাব।

সুশীল তাই করলে। প্রায় ষাট ফুট নিচে তখন শেষ চাতাল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। সেদিন দুপুর পর্যন্ত পরিশ্রম করে সে চাতালটা ভেঙে ফেললে।

তারপর যা দেখলে তাতে সুশীল একেবারে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও হতভম্ব হয়ে পড়ল।

সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে ক্ষুদ্র একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে।

কক্ষের মধ্যে অন্ধকার সূচীভেদ্য।

টর্চের আলোয় দেখা গেল কক্ষের ঠিক মাঝখানে একটি পাষাণবেদিকার ওপর এক পাষাণ নারীমূর্তি—বিলাসবতী কোন নর্তকী যেন নাচতে নাচতে হঠাৎ বিটঙ্কবেদিকার ওপর পুত্তলিকার মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে কি দেখে।

একি!

এর জন্যে এত পরিশ্রম করে এরা এসব কাণ্ড করেছে!

সুশীল আরও অগ্রসর হয়ে দেখতে গেল।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। পাথরের বেদীর ওপর সেই চিহ্ন আবার খোদাই করা। ঘরের মধ্যে টর্চ ঘুরিয়ে দেখলে। তাকে ঘর বলা যেতে পারে, একটা বড় চৌবাচ্চাও বলা যেতে পারে। স্যাঁতসেতে ছাদ, স্যাঁতসেতে মেঝে—পাতাল-পুরীর এই নিভৃত অন্ধকার গহ্বরে এ প্রস্তরময়ী নারী-মূর্তির রহস্য কে ভেদ করবে?

কিন্তু কী অদ্ভুত মূর্তি! কটিতে চন্দ্রহার, গলদেশে মুক্তামালা, প্রকোষ্ঠে মণিবলয়। চোখের চাহনি সজীব বলে ভ্রম হয়।

সেদিনও ফিরে গেল। জামাতুল্লাকে পরদিন সঙ্গে করে নিয়ে এল—তন্ন-তন্ন করে চারিদিক খুঁজে দেখলে ঘরের, কোথাও কিছু নেই।

জামাতুল্লা বললে—কী মন হয় বাবুজি?

—তোমার কী মনে হয়?

—এই সিঁড়ি আর চাতাল, চাতাল আর সিঁড়ি ষাট ফুট গেঁথে মাটির নিচে শেষে নাচনেওয়ালী পুতুল! ছোঃ বাবুজি—এর মধ্যে আর কিছু আছে।

—বেশ, কী আছে, বার কর। মাথা খাটাও।

—তা তো খাটাব—এদিকে ইয়ার হোসেনের দল যে ক্ষেপে উঠেছে। কাল ওরা কী বলেছে জানেন?

—কী রকম?

—আর দুদিন ওরা দেখবে—তারপর নাকি এ দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে। তা ছাড়া আর এক ব্যাপার। আপনাকেও ওরা সন্দেহ করে। বনের মধ্যে রোজ আপনি কী করেন? আমায় প্রায়ই জিগ্যেস করে।

—তুমি কী বল?

—আমি বলি বাবুজি ফটো তোলে, ছবি আঁকে। তাতে ওরা আপনাকে ঠাট্টা করে।

wapsip.com

ওসব মেয়েলী কাজ।

—যারা এই নগর গড়েছিল, পুতুল তৈরি করেছিল, পাথরে ছবি এঁকেছিল—তারা পুরুষ মানুষ ছিল জামাতুল্লা। ইয়ার হোসেনের চেয়ে অনেক বড় পুরুষ ছিল—বলে দিও তাকে।

সুশীলকে রেখে জামাতুল্লা ফিরে যেতে চাইলে। নতুবা ইয়ার হোসেনের দল সন্দেহ করবে। যাবার সময় সুশীল বললে—কোন উপায়ে এখানে একটা আলোর ব্যবস্থা করতে পার? টর্চ জ্বালিয়ে কতক্ষণ থাকা যায়? আর কিছু না থাক সাপের ভয়ও তো আছে।

জামাতুল্লা বললে—আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি লণ্ঠন নিয়ে বাবুজি। আপনি ওপরে উঠে বসুন, এ পাতালের মধ্যে একা থাকবেন না—

সুশীল বললে—না, তুমি যাও—আমি এখানেই থাকব। পকেটে একটুকরো মোমবাতি এনেছি—তাই জ্বাল্‌াব।

একটুকরো বাতি জ্বালিয়ে সুশীল ঘরটার মধ্যে বসে ভাবতে লাগল। বাইরে এত বড় রাজ্য যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল, কোন্ জিনিস গোপন করবার-জন্যে তারা এই পাতালপুরী তৈরি করেছিল, এত কষ্ট স্বীকার করে নর্তকী-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে নয় নিশ্চয়ই।

হঠাৎ নর্তকী পুতুলটার দিকে ওর দৃষ্টি পড়তে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কী ব্যাপার এটা?

এতক্ষণ মূর্তিটার যতখানি তার দিকে ছিল, সেটা যেন সামান্য একটু পাক খেয়ে খানিকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

সুশীল চোখ মুছে আবার চাইলে।

হ্যাঁ, সত্যিই তাই। এই বাতিটার সামনে ছিল ওই পা-খানা—এখন পায়ের হাঁটুর পেছনের অংশ দেখা যায় কী করে? সে তো অতটুকু নড়েনি নিজে, যেখানে, সেখানেই বসে আছে।

সুশীলের ভয় হল। শ্মশানপুরীর ভূগর্ভস্থ কক্ষ, কত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দৈত্যদানোর দল জমা হয়ে আছে এসব জায়গায় কে বলতে পারে? কিসে মত্যু আর কিসে জীবন, এ বার্তা পৌঁছে দেবার লোক নেই। সরে পড়াই ভাল।

এমন সময় ওপর থেকে লণ্ঠনের আলো এসে পড়ল, পায়ের শব্দ শোনা গেল। জামাতুল্লা লণ্ঠন নিয়ে ঘরের মধ্যে ওপর থেকে উঁকি মেরে বললে—বাবুজি, ঠিক আছেন?

—তা আছি। ঘরের মধ্যে নামো জামাতুল্লা—

জামাতুল্লা ঘরের মেঝেতে নেমে ওর পাশে দাঁড়ালো. সুশীল ওকে মূর্তির ব্যাপারটা দেখিয়ে বললে—এখন তুমি কী মনে কর?

—কিছু বুঝতে পারছি নে বাবুজি—খুব তাজ্জব কথা!

—তুমি থাক এখানে—বোস—

কিন্তু জামাতুল্লা দাঁড়াল না। দুজনে এখানে বসে থাকলে ইয়ার হোসেনের দলের সন্দেহ ঘোরালো রকম হয়ে উঠবে, সে থাকতে পারবে না। জামাতুল্লা চলে যাবার পর সুশীল অনেকক্ষণ মূর্তিটার দিকে চেয়ে বসে রইল। মূর্তিটা এবার বেশ ঘুরে গিয়েছে, এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ওর আগের ভয়ের ভাবটা কেটে গিয়েছিল জামাতুল্লা লণ্ঠন নিয়ে আসবার পর থেকে, এখন ভয়ের চেয়ে কৌতূহল বেশি!

খুব একটু একটু করে ঘুরছে, ঘূর্ণ্যমান রঙ্গমঞ্চের মতই, মূর্তির পদতলস্থ বিটঙ্কবেদিকা।

কেন? কী উদ্দেশ্যে? অতীত শতাব্দীগুলো মূক হয়ে রইল, এর জবাব মেলে না। বেলা

wapsip.com

গড়িয়ে এল, সুশীলের হাতঘড়িতে বাজে পাঁচটা।

হঠাৎ সুশীল চেয়ে দেখলে আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার।

নর্তকী-মূর্তির সরু সরু আঙুলগুলির মধ্যে একটা আঙুল একটি মুদ্রা রচনা করার দরুন অন্য সব আঙুল থেকে পৃথক এবং একদিকে কী যেন নির্দেশ করবার ভঙ্গিতে ছিল। এবার যেন আঙুলের ছায়া পড়েছে দেওয়ালের এক বিশেষ স্থানে।

এমন ভঙ্গিতে পড়েছে যেন মনে হয় মূর্তিটি তর্জনী-অঙ্গুলির দ্বারা ভিত্তিগাত্রের একটি স্থান নির্দেশ করছে।

তখনি একটা কথা মনে হল সুশীলের। লণ্ঠনের আলোর দ্বারা এ ছায়া তৈরি হয়েছে, না কোন গুপ্ত ছিদ্রপথে দিবালোক প্রবেশ করেছে ঘরের মধ্যে?

তা-ই বলে মনে হয়, লণ্ঠনের আলোর কৃত্রিম ছায়া এ নয়। ও লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দিয়ে দেখলে—তখন অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারের মধ্যেও তর্জনীর ছায়া ভিত্তিগাত্রে পড়ে একটা স্থান যেন নির্দেশ করছে।

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে উঠে ও জায়গাটা দেখতে গেল।

দেওয়ালের সেই জায়গা একেবারে সমতল, চিহ্নহীন—চারিপাশের অংশের সঙ্গে পৃথক করে নেওয়ার মত কিছুই নেই সেখানে। তবুও সে নিরাশ না হয়ে দেওয়ালের সেই জায়গাটাতে হাত বুলিয়ে দেখতে গেল।

হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। ঠিক যেখানে আঙুলের অগ্রভাগ শেষ হয়েছে সেই স্থানের খানিকটা যেন বসে গেল—অর্থাৎ ঢুকে গেল ভেতরের দিকে। একা শব্দ হল পেছনের দিকে—ও পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে বিটঙ্কবেদিকার তলাটা যেন ঈষৎ ফাঁক হয়ে গিয়েছে।

ও ফিরে এসে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলে, গোলাকার বেদিকাটি তার নর্তকী-মূর্তিটা সুদ্ধ যেন একটা পাথরের ছিপি। বড় বোতলের মুখে যেমন কাঁচের স্টপার বা ছিপি থাকে, এ যেন পাষাণ-নির্মিত বিরাট এক স্টপার। কিসের চাড় লেগে স্টপারের মুখ ফাঁক হয়ে গিয়েছে।

ও নর্তকী-মূর্তির পাদদেশে এবং গ্রীবায় দুই হাত দিয়ে মূর্তিটাকে একটু ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই সেটা সবসুদ্ধ বেশ আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল। কয়েকবার ঘুরবার পরে ক্রমেই তার তলার ফাঁক চওড়া হয়ে আসতে লাগল। কী কৌশলে প্রাচীন শিল্পী পাথরের উপরটাকে ঘূর্ণ্যমান করে তৈরি করেছিল?

এই মূর্তিসুদ্ধ বেদিকা টেনে তোলা তার একার সাধ্যে কুলুবে না। জামাতুল্লা ও সনৎ দু-জনকেই আনতে হবে কোন কৌশলে সঙ্গে করে, ইয়ার হোসেনের দলের অগোচরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার বিলম্ব নেই। বহু দিন-রাত্রির ছায়া অতীতের এ নিস্তব্ধ কক্ষে জীবনের সুর ধ্বনিত করে নি, এখানে গভীর নিশীথ রাত্রির রহস্য হয়ত মানুষের পক্ষে খুব আনন্দদায়ক হবে না, মানুষের জগতের বাইরে এরা।

সুশীল লণ্ঠন হাতে উঠে এল আঁধার পাতালপুরীর কক্ষ থেকে। তাঁবুতে ঢুকবার পথে ইয়ার হোসেন বড় ছুরি দিয়ে পাখির মাংস ছাড়াচ্ছে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললে—কোথায় ছিলেন?

—ছবি আঁকতে, মিঃ হোসেন।

—লণ্ঠন কেন?

—পাছে রাত হয়ে যায় ফিরতে। বনের মধ্যে আলো থাকলে অনেক ভাল।

wapsip.com

—এত ছবি এঁকে কী হয় বাবু?

—ভাল লাগে।

—আসল ব্যাপারের কী? জামাতুল্লা আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। আমি ওকে মজা দেখিয়ে দেব!

—আমরা সকলেই চেষ্টা করছি! ব্যস্ত হবেন না মিঃ হোসেন—

—আমি আর পাঁচদিন দেখব। তারপর এখান থেকে চলে যাব—কিন্তু যাবার আগে জামাতুল্লাকে দেখিয়ে যাব সে কার সঙ্গে জুয়োচুরি করতে এসেছিল!

—জামাতুল্লার কী দোষ? আপনি বরং আমাকে দোষ দিতে পারেন—

—আরে আপনি তো ছবি-আঁকিয়ে পুরুষ মানুষ। এসব কাজ আপনার না।

সুশীল রাত্রে চুপি চুপি জামাতুল্লাদের নর্তকী পুতুলের ঘটনা সব বললে। ওদের দু-জনকেই যেতে হবে, নতুবা ছিপি উঠবে না।

জামাতুল্লা বললে—কিন্তু আমাদের দু-জনের একসঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয় বাবুজি।

—কেন?

—জানেন না,—এর মধ্যে নানারকম ষড়যন্ত্র চলছে। ওরা আপনাদের চেয়ে আমাকেই দোষ দেবে বেশি। আপনাকে ওরা নিরীহ, গোবেচারি বলে ভাবে—

—সেটা অন্যায়।

—আপনারা ভাল মানুষ, আমার হাতের পুতুল—পুতুল যেমন নাচায়, তেমনি আপনারা আমার হাতে—

শেষের কথাটা শুনে সুশীলের আবার মনে পড়ল নর্তকী-মূর্তির কথা। কাল হয়ত বেরুনো যাবে না, ইয়ার হোসেনের কড়া নজরবন্দীর দরুন। আজই রাত্রে অন্য দল ঘুমুলে সেখানে গেলে ক্ষতি কী?

সনৎকে বললে—সনৎ, তৈরি হও। আজ রাত্রে হয় আমাদের জীবন, নয়তো আমাদের মরণ। পাতালপুরীর রহস্য আজ ভেদ করতেই হবে। আজ আঁধার রাত্রে চুপি চুপি বেরুবে আমার সঙ্গে—দিনের আলোয় সব ফাঁস হয়ে যাবে।

জামাতুল্লা বললে—কেউ টের না পায় বাবুজি, জুতো হাতে করে সব যাবেন কিন্তু।

আহারাদির পর্ব মিটে গেল। দাবানল জ্বলে উঠেছে আজ ওদের মনে, বনের সাময়িক দাবানলকেও ছাপিয়ে তার শিখা সমস্ত মনের আকাশ ব্যেপে বেড়ে উঠল।

দুটো রাইফেল, একটা রিভলভার, একটা শাবল, একটা গাঁতি, খানিকটা দড়ি, চার-পাঁচটা মোমবাতি, কিছু খাবার জল, এক শিশি টিংচার আইডিন, খানকতক মোটা রুটি—তিনজনের মধ্যে এগুলো ভাগ করে নিয়ে রাত একটার পরে ওরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তাঁবু থেকে বেরুল।

ইয়ার হোসেনের একজন মালয় অনুচর উল্টোমুখে দাঁড়িয়ে 'বলো' (রামদাও) হাতে পাহারা দিচ্ছে। অন্ধকারে এরা বুক ঘেঁষে চলে এল···সে লোকটা টের পেলে না।

সনৎ বললে—আমি সে পুতুলটা একবার দেখব—

অদ্ভুত রাত্রি! বনের মাথায় মাথায় অগণিত তারা, বহুকালের সুপ্ত নগরীর রহস্যে নিশীথ রাত্রি অন্ধকার যেন থম-থম করছে, সমস্ত ধ্বংসস্তূপটি যেন মুহূর্তে শহর হয়ে উঠতে পারে—ওর অগণিত নরনারী নিয়ে। লতাপাতা, ঝোপ-ঝাপ, মহীরুহের দল খাড়া হয়ে সেই পরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় যেন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

wapsip.com

অন্ধকারে একটা সর-সর শব্দ হতে লাগল সামনের মাটিতে।

সকলে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। সনৎ ও সুশীল একসঙ্গে টর্চ টিপলে—প্রকাণ্ড একটা অজগর সাপ আস্তে আস্তে ওদের পাঁচ হাত তফাত দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলে পাথরের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল, সাপটা বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ওরা আবার চলল।

গহ্বরের মুখ ওরা লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রেখে গিয়েছিল, তিনজনে মিলে সেগুলো সরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল।

সনৎ বললে—এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি—

কিন্তু পাতালপুরীর কক্ষের সে নর্তকী-মূর্তিটা দেখে ওর মুখে কথা সরলো না। শিল্পীর অদ্ভুত শিল্পকৌশলের সামনে ও যেন হতভম্ব হয়ে গেল।

সুশীল বললে—শুধু এই মূর্তিটি কিউরিও হিসাবে বিক্রি করলে দশহাজার টাকায় যে-কোন বড় শহরের মিউজিয়ম কিনে নেবে—তবে, আমাদের দেশে নয়—ইউরোপে।

জামাতুল্লা বললে—ধরুন বাবুজি নাচনেওয়ালী পুতুলটা সবাই মিলে—পাক খাওয়াতে হবে একে বারকয়েক এখনও।

মিনিট দুই সবাই মিলে পাক দিয়ে মূর্তিটাকে ঘোরালো যেমন স্টপার ঘোরায় বোতলের মুখে। তারপর সবাই সন্তর্পণে মূর্তিটাকে ধরে উঠিয়ে নিলে। স্টপারের মতই সেটা খুলে এল।

সঙ্গে সঙ্গে বিটঙ্কবেদীর নিচের অংশে বার হয়ে পড়ল গোলাকার একটা পাথরের চৌবাচ্চা। সুশীল উঁকি মেরে দেখে বললে—টর্চ ধর, খুব গভীর বলে মনে হচ্ছে—

টর্চ ধরে ওরা দেখলে চৌবাচ্চা অন্তত সাত ফুট গভীর। তার তলায় কী আছে ওপর থেকে ভাল দেখা যায় না।

সনৎ বললে—আমি লাফ দিয়ে পড়ব দাদা?

জামাতুল্লা বারণ করলে। এ সব পুরোনো কূপের মধ্যে বিষধর সর্প প্রায়ই বাসা বাঁধে, যাওয়া সমীচীন হবে না।

দু-একটি পাথর ছুঁড়ে মেরে ওরা দেখলে, কোন সাড়াশব্দ এল না আধ-অন্ধকার কূপের মধ্যে থেকে। তখন জামাতুল্লাই ধুপ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ওর মধ্যে।

কিছুক্ষণ তার আর কোন সাড়া নেই।

সুশীল ও সনৎ অধীর কৌতূহলের সঙ্গে বলে উঠল—কী—কী—কী দেখলে?

তবুও জামাতুল্লার মুখে কথা নেই। সে যেন কি হাতড়ে বেড়াচ্ছে চৌবাচ্চার তলায়। একটু অদ্ভুতভাবে হাতড়াচ্ছে—একবার সামনে যাচ্ছে, আবার পিছু হঠে আসছে।

সুশীল বললে—কী হল হে? পেলে কিছু দেখতে?

জামাতুল্লা বললে—বাবুজি, এর মধ্যে কিছু নেই—

—কিছু নেই?

—না বাবুজি। একেবারে ফাঁকা—

—তবে তুমি ওর মধ্যে কী করছ জামাতুল্লা?

—এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। নেমে এসে দেখুন—

সুশীল ও সনৎ সন্তর্পণে একে-একে পাথরের চৌবাচ্চাটির মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। জামাতুল্লা দেখালে—এই দেখুন বাবুজি, এই লাইন ধরে একেবার সামনে, একবার পিছনে গিয়ে দেখুন—তা হলেই বুঝতে পারবেন—

—সামনে পেছনে গিয়ে কী হবে?

wapsip.com

সুশীল লক্ষ্য করে দেখলে চৌবাচ্চার ডানদিকের দেওয়ালের একটা কালো রেখা আছে সেইটে ধরে যদি সামনে বা পেছনে যাওয়া যায় তবে চৌবাচ্চার তালাটা একবার নামে, একবার ওঠে। ছেলেদের 'see-saw' খেলার তক্তাটার মত।

সনৎ বললে—ব্যাপারটা কী?

সুশীল বললে—অর্থাৎ এটা যদি কোনরকমে ওঠানো যায়, তবে এর মধ্যে আর কিছু রহস্য আছে। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

জামাতুল্লা বললে—বাবু, গাঁতি দিয়ে তলা ভেঙে ফেলতে পারি তো—অন্য কোন পথ যদি না পাওয়া যায়। কিন্তু আজ থাকলে হত না বাবুজি? বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ—সকাল হয় হয়—

হঠাৎ সুশীল চৌবাচ্চার এক জায়গায় টর্চের আলো ফেলে বলে উঠল—এই দ্যাখ সেই চিহ্ন—

সনৎ ও জামাতুল্লা সবিস্ময়ে দেখলে, চৌবাচ্চার কালো রেখার ওপরে উত্তর-দিকের কোণে, দু-খানা পাথরের সংযোগস্থলে তাদের অতিপরিচিত সেই চিহ্নটি আঁকা।

সুশীল বললে—হদিস পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে—

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ এই চিহ্নের ওপর টিপলেই চৌবাচ্চার তলার পাথরখানা একদিকে খুব বেশি কাত হয়ে, ভেতরে কি আছে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল। আজ থাক, চল।

জামাতুল্লাও তাতে মত দিলে। সবাই মিলে তাঁবুতে ফিরে এল যখন, তখনও ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি। ইয়ার হোসেনের মালয় ভৃত্য 'বলো' হাতে তাঁবুর দ্বারে চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। জামাতুল্লার ইঙ্গিতে সুশীল ও সনৎ উপুড় হয়ে পড়ে বুকে হেঁটে নিজেদের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

জামাতুল্লা বললে—ঘুমিয়ে পড়ুন বাবুজিরা—কিন্তু বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমুবেন না, আমি উঠিয়ে দেব সকালেই। নইলে ওরা সন্দেহ করবে।

সুশীল বললে—আমাদের অবর্তমানে ওরা ঘরে ঢোকে নি এই রক্ষে—

সনৎ অবাক হয়ে বললে—কী করে জানলে দাদা?

—দেখবে? এই দেখ। তাঁবুর দোরে সাদা বালি ছড়ানো, যে-কেউ এলে পায়ের দাগ পড়ত। তা পড়ে নি।

ওরা যে যার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

*　　　　*　　　　*

সুশীলকে কে বললে—আমার সঙ্গে আয়।

গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষের পিছু পিছু ও গভীর বনের কতদূর চলল। ইয়ার হোসেনের মালয় ভৃত্যগণ ঘোর তন্দ্রাভিভূত, উষার আলোকের ক্ষীণ আভাসও দেখা যায় না পূর্ব দিগন্তে। বৃক্ষলতা স্তব্ধ, স্বপ্নঘোরে আচ্ছন্ন। সারি সারি প্রাসাদ একদিকে, অন্যদিকে প্রশস্ত দীর্ঘিকার টলটলে নির্মল জলরাশির বুকে পদ্ম ফুল ফুটে আছে। সেই গভীর বনে, গভীর অন্ধকারের মধ্যে দেউলে দেউলে ত্রিমূর্তি মহাদেবের পূজা হচ্ছে। সুগন্ধ দীপবর্তিকার আলোকে মন্দিরাভ্যন্তর আলোকিত। প্রসাদের বাতায়ন বলভিতে শুকসারী তন্দ্রামগ্ন।

wapsip.com

সুশীল বললে—আমায় কোথা নিয়ে যাবেন?

—সে কথা বলব না। ভয় পাবি—

—তবুও শুনি, বলুন—

—বহুদিনের বহু ধ্বংস, অভিশাপ, মৃত্যুর দীর্ঘশ্বাসে এ পুরীর বাতাস বিষাক্ত। এখানে প্রবেশ করবার দুঃসাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু এর মূল্য দিতে হবে।

—কী?

—একজনের প্রাণ। সমুদ্রমেখলা এ দ্বীপের বহু শতাব্দীর গুপ্ত কথা ঘন বন ঢেকে রেখেছিল। ভারত মহাসমুদ্র স্বয়ং এর প্রহরী, দেখতে পাও না?

—আজ্ঞে, তা দেখছি বটে।

—তবে সে রহস্য ভেদ করতে এসেছ কেন?

—আপনি তো জানেন সব।

—সম্রাটের ঐশ্বর্য গুপ্ত আছে এর মধ্যে। কিন্তু সে পাবে না। যে অদৃশ্য আত্মারা তা পাহারা দিচ্ছে, তারা অত্যন্ত সতর্ক, অত্যন্ত হিংসুক। কাউকে তারা নিতে দেবে না। তবে তুমি ভারতবর্ষের সন্তান, তোমাকে একেবারে বঞ্চিত করব না আমি—রহস্য নিয়ে যাও, অর্থ পাবে না। যা পাবে তা সামান্য। তারই জন্যে প্রাণ দিতে হবে।

—আপনি বিষ্ণমুনি?

—মূর্খ! আমি এই নগরীর অধিদেবতা। ধ্বংসস্তূপ পাহারা দিচ্ছি শতাব্দীর পর শতাব্দী। অনেকদিন পরে তুমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছ—আটশ বছর আগে তোমাদের সাহসী পূর্বপুরুষরা অস্ত্র হাতে এখানে এসে রাজ্যস্থাপন করেন। দুর্বল হাতে তাঁরা খড়্গ ধরতেন না। তোমরা সে দেশ থেকেই এসেছ কি? দেখলে চেনা যায় না কেন?

—সেটা আমাদের অদৃষ্টের দোষ, আমাদের ভাগ্যলিপি।

তারপরেই সব অন্ধকার। সুশীল সেই অদৃষ্টপূর্ব পুরুষের সঙ্গে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন চলেছে··· চলেছে··· মাথার ওপর কৃষ্ণা নিশীথিনীর জ্বলজ্বলে নক্ষত্রভরা আকাশ।

পুরুষটি বললেন—সাহস আছে? তুমি ভারতবর্ষের সন্তান—

—নিশ্চয়ই, দেব।

নগরী বহুদিন মৃতা, কিন্তু বহু যুগের পুরাতন কৃষ্ণাগুরুর ধূপগন্ধে আমোদিত অরণ্যতরুর ছায়ায় ছায়ায় অজানা পথযাত্রার যেন শেষ নেই।

বিশাল পুরী, প্রেতপুরীর সমান নিস্তব্ধ। রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত কক্ষে, দামী নীলাংশুকের আস্তরণে ঢাকা স্বর্ণ-পর্যঙ্ক কোন্ অপরিচিতের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। সুশীলের বুক গুরুগুরু করে উঠল, গৃহের রত্নপ্রস্তরের ভিত্তিতে যেন অমঙ্গলের লেখা। ভবনদর্পণে প্রতিফলিত হয়ে উঠবে এখনি যেন কোন্ বিভীষণা অপদেবীর বিকট মূর্তি!

পুরুষ বললেন—ঐ শোন—

সুশীল চমকে উঠল। যেন কোন নারীকণ্ঠের শোকার্ত চিৎকারে নিশীথ নগরীর নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। সে নারীর কণ্ঠস্বরকে সে চেনে। অত্যন্ত পরচিত কণ্ঠস্বর! খুব নিকট আত্মীয়ার বিলাপধ্বনি। সুশীলের বুক কেঁপে উঠল। ঠিক সেইসময় বাইরে থেকে কে ডাকলে—বাবুজি—বাবুজি—

তার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ঘামে ভেসে গিয়েছে। জামাতুল্লা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে

wapsip.com

ডাকছে। দিনের আলো ফুটছে তাঁবুর বাইরে।

জামাতুল্লা বললে—উঠুন বাবুজি।

সুশীল বিমূঢ়ের মত বললে—কেন?

—ভোর হয়েছে। ইয়ার হোসেনের লোক এখনও ওঠে নি—আমাদের কেউ কোন সন্দেহ না করে। সনৎবাবুকে ওঠাই—

একটু বেলা হলে ইয়ার হোসেন উঠে ওদের ডাকলে। বললে—পরশু এখান থেকে তাঁবু ওঠাতে হবে। জাঙ্ক্‌ওয়ালা চীনেম্যান আমার নিজের লোক। ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর থাকতে চাইছে না। এখানে আপনারা এলেন ফটো তুলতে আর ছবি আঁকতে। এত পয়সা খরচ এর জন্যে করি নি।

সুশীল বললে—যা ভাল বোঝেন মিঃ হোসেন।

সনৎ বললে—তাহলে দাদা, আমাদের সেই কাজটা এই দু-দিনের মধ্যে সারতে হবে।

ইয়ার হোসেন সন্দেহের সুরে বললে—কি কাজ?

সুশীল বললে—বনের মধ্যের একটা মন্দিরের গায়ে পাথরের ছবি আছে, সেটা আমি আঁকছি। সনৎ ফটো নিচ্ছে তার।

ইয়ার হোসেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললে—ওই করতেই আপনারা এসেছিলেন আর কি! করুন যা হয় এই দুদিন।

সনৎ বললে—তাহলে চল দাদা আমরা সকাল-সকাল খেয়ে রওনা হই।

ইয়ার হোসনের অনুমতি পেয়ে ওদের সাহস বেড়ে গেল। দিন দুপুরেই ওরা দু-জন রওনা হয়ে গেল—শাবল, গাঁতি, টর্চ ওরা কিছুই আনে নি, সিঁড়ির মুখের প্রথম ধাপে রেখে এসেছে। শুধু ক্যামেরা আর রিভলভার হাতে বেরিয়ে গেল।

জামাতুল্লা গোপনে বললে—আমি কোন ছুতোয় এরপরে যাব। একসঙ্গে সকলে গেলে চালাক ইয়ার হোসেন সন্দেহ করবে। আজ কাজ শেষ করতে হবে মনে থাকে যেন, হয় এসপার নয় তো ওসপার। আর সময় পাব না।

সনৎ বললে—মনে থাকে যেন এ-কথা। আজ আর ফিরব না শেষ না দেখে।

সুশীলের বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল সনতের কথায়। সনতের মুখের দিকে ও চাইলে। কেন সনৎ হঠাৎ এ কথা বললে?

আবার সেই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে রহস্যময় গহ্বরে সুশীল ও সনৎ এসে দাঁড়াল। আসবার সময় সিঁড়ির প্রথম ধাপ থেকে ওরা গাঁতি ও টর্চ নিয়ে এসেছে। পাথরে নর্তকী মূর্তি দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায় কাত করে রাখা হয়েছে। যেন জীবন্ত পরী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়। সুশীল সেদিকে চেয়ে বললে—আর কিছু না পাই, এই পুতুলটা নিয়ে যাব। সব খরচ উঠে এসেও অনেক টাকা লাভ থাকবে—শুধু ওটা বিক্রি করলে।

তারপর দু-জনে নিচের পাথরের চৌবাচ্চাটাতে নামল।

সনৎ বললে—উত্তর কোণের গায়ে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছ দাদা!

—এখন কিছু কোরো না, জামাতুল্লাকে আসতে দাও।

সনৎ ছেলেমানুষ, সে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাংলা-দেশের পাড়াগাঁয়ে জন্মগ্রহণ করে একদিন যে জীবনে এমন একটা রহস্যসঙ্কুল পথযাত্রায় বেরিয়ে পড়বে, কবে সে এ কথা ভেবেছিল? সুশীল কিন্তু বসে বসে অন্য কথা ভাবছিল।

wapsip.com

গত রাত্রের স্বপ্নের কথা তার স্পষ্ট মনে নেই, আবছাভাবে যতটুকু মনে আছে, সে যেন গতরাত্রে এক অদ্ভুত রহস্যপুরীর পথে পথে কার সঙ্গে অনির্দেশ যাত্রায় বার হয়েছিল, কত কথা যেন সে বলেছিল, সব কথা মনে হয় না। তবুও যেন কি এক অমঙ্গলের বার্তা সে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছে, কী সে বার্তা, কার সে অমঙ্গল কিছুই স্পষ্ট মনে নেই—অথচ সুশীলের মন ভার-ভার, আর যেন তার উৎসাহ নেই। এ কাজে ফিরবার পথও তো নেই।

ওপরের ঘর থেকে জামাতুল্লা উঁকি মেরে বললে—সব ঠিক।

—এসেছ?

—হাঁ বাবুজি। অনেকটা দড়ি এনেছি লুকিয়ে—

—নেমে পড়।

—আপনার ক্যামেরা এনেচেন?

—কেন বল তো?

—ইয়ার হোসেনকে ফাঁকি দিতে হলে ক্যামেরাতে ফটো তুলে নিয়ে যেতে হবে—

—সব ঠিক আছে।

জামাতুল্লা ওদের সঙ্গে এসে যোগ দেবার অল্পক্ষণ পরেই সনৎ হঠাৎ কি ভেবে দেওয়ালের উত্তর কোণের সে চিহ্নটা চেপে ধরলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাথরের চৌবাচ্চার তলা একদিকে কাত হয়ে উঠতেই ফাঁক দিয়ে সনৎ নিচের দিকে অতলস্পর্শ অন্ধকারে লাফিয়ে পড়ল।

সুশীল ও জামাতুল্লা দুজনেই চমকে চিৎকার করে উঠল। অমন অতর্কিতভাবে সনৎ লাফ মারতে গেল কেন, ওরা ভেবে পেল না।

কিন্তু লাফ মারলে কোথায়।

জামাতুল্লা সভয়ে বললে—সর্বনাশ হয়ে গেল বাবুজি!

তারপর ওরা দু-জনেই কিছু না ভেবেই পাথরের চৌবাচ্চার তলার ফাঁক দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল।

ওরা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেলে।

সনৎ অন্ধকারের ভেতর থেকেই বলে উঠল—দাদা, টর্চ জ্বালো আগে, জায়গাটা কি রকম দেখতে হবে—

ওরা টর্চ জ্বেলে চারিদিক দেখে অবাক হয়ে গেল। ওরা একটা গোলাকার ঘরের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেলে—ঘরের দু-কোণে দুটো বড় পয়োনালীর মত কেন রয়েছে ওরা বুঝতে পারলে না। ছাদের যে জায়গায় কড়িকাঠের অগ্রভাগ দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবার কথা, সেখানে দুটো বড়-বড় পাথরের গাঁথুনি পয়োনালী, একটা এদিকে, আর একটা ওদিকে। সমস্ত ঘরটায় জলের দাগ, মেঝে ভয়ানক ভিজে ও স্যাঁৎসেঁতে, যেন কিছুক্ষণ আগে ও ঘরে অনেকখানি জল ছিল।

জামাতুল্লা বললে—এ ঘরে এত জল আসে কোথা থেকে বাবুজি?

সুশীল কিছু বলতে পারলে না; প্রকাণ্ড ঘর, অন্ধকারের মধ্যে ঘরের কোথায় কি আছে ভাল বোঝা যায় না।

সনৎ বললে—ঘরের কোণগুলো অন্ধকার দেখাচ্ছে, ওদিকে কী আছে দেখা যাক—

টর্চ ধরে তিন জনে ঘরের একদিকের কোণে গিয়ে দেখে অবাক চোখে চেয়ে রইল।

ঘরের কোণে বড়-বড় তামার জালা বা ঘড়ার মত জিনিস, একটার ওপর আর একটা

wapsip.com

বসানো, ঘরের ছাদ পর্যন্ত উঁচু। সেদিকের দেওয়ালের গা দেখা যায় না—সমস্ত দেওয়াল ঘেঁসে সেই ধরনের রাশি-রাশি তামার জালা—ওরা এতক্ষণ ভাল করে দেখেনি, সেই তামার জালার রাশিই অন্ধকারে দেওয়ালের মত দেখাচ্ছিল।

জামাতুল্লা বললে—এগুলো কী বাবুজি?

সুশীল বললে—আমার মনে হয় এটাই ধনভাণ্ডার।

সনৎ বললে—আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি—

জামাতুল্লা হঠাৎ অন্য দেয়ালের দিকে গিয়ে বললে—এই দেখুন বাবুজি—

সেদিকে দেয়ালের গায়ে বড় বড় কুলুঙ্গির মত অসংখ্য গর্ত। প্রত্যেকটার মধ্যে ছোট বড় কৌটোর মত কি সব জিনিস।

সুশীল বললে—যাতে-তাতে হাত দিও না; এসব পাতাল-ঘরে সাপ থাকা বিচিত্র নয়। এই ঘোর অন্ধকারে পাতালপুরী বিষাক্ত সাপের রাজ্য হওয়াই বেশি সম্ভব।

কিন্তু চারিদিকে ভাল করে টর্চ ফেলে দেখেও সাপের সন্ধান পাওয়া গেল না।

সনৎ ও জামাতুল্লা কুলুঙ্গি থেকে একটা কৌটো বার করে দেখলে। ভেতরে যা আছে তা দেখে ওরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল না। এ কি সম্ভব, এত বড় একটা প্রাচীন সাম্রাজ্যের গুপ্ত ধনভাণ্ডারে এত কাণ্ড করে পাতালের মধ্যে ঘর খুঁড়ে তাতে পুরোনো হর্তুকি রাখা হবে?

ওদের হতভম্ব চেহারা দেখে সুশীল বললে—কী ওর মধ্যে?

সনৎ বললে—পুরোনো হর্তুকি দাদা—

—দূর পাগল—হতুর্কি কী রে?

—এই দেখ—

সুশীল গোল-গোল ছোট ফলের মত জিনিস হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে বললে—আমি জানি নে এ কী জিনিস, কিন্তু যখন এত যত্ন করে একে রাখা হয়েছে, তখন এর দাম আছে। থলের মধ্যে নাও দু-এক বাক্স—

সব কৌটোগুলোর মধ্যে সেই পুরোনো হর্তুকি!

ওরা দস্তুরমত হতাশ হয়ে পড়ল। এত কষ্ট করে পুরোনো হর্তুকি সংগ্রহ করতে ওরা এতদূর আসেনি।

হঠাৎ সুশীল বলে উঠল—আমার একটা কথা মনে হয়েছে—

সনৎ বললে—কী দাদা?

—এ জিনিস যাই হোক, এ-ই ছিল পুরোনো সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রা—কারেন্সি—এই আমার স্থির বিশ্বাস। সঙ্গে নাও কিছু পুরোনো হর্তুকি—

জামাতুল্লা অনেক কৌশল করে একটা তামার জালা পাড়লে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তার ঢাকনি খোলা গেল না। জামাতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে—এ কি রিবিট করে এঁটে দেওয়া বাবুজি? এ খুলবার হদিস পাচ্ছি নে যে—

টানাটানি করতে গিয়ে একটা ঢাকনি খটাং করে খুলে গেল।

সনৎ বললে—দেখো ওর মধ্যে থেকে আবার পুরোনো আমলকি না বার হয় দাদা—

কিন্তু জালাটা উপুড় করে ঢাললে তার মধ্যে থেকে বেরুলো রাশি রাশি নানা রঙবেরঙের পাথর। দামী জিনিস বলে মনে হয় না। সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে যে-কোন নদীর ধারে এমনি নুড়ি অনেক পাওয়া যায়।

জামাতুল্লা বললে—তোবা! তোবা! এসব কী চিজ বাবুজি?

wapsip.com

কতকগুলো কৌটোর মধ্যে শনের মত সাদা জিনিসের গুলির মত। মনে হয় বহুকাল আগে শনের নুড়িগুলোতে কোন গন্ধদ্রব্য মাখানো ছিল—এখনও তার খুব মৃদু সুগন্ধ শনের নুড়িগুলোর গায়ে মাখানো।

সনৎ বললে—দাদা, এটা তাদের ওষুধ-বিষুদ রাখার ভাঁড়ার ছিল না তো?

জামাতুল্লা বললে—কী দাওয়াই আছে এর মধ্যে বাবুজি?

—তা তুমি আমি কী জানি? প্রাচীন যুগের লোকের কত অদ্ভুত ধারণা ছিল। হয়ত তাদের বিশ্বাস ছিল এই সবই অমর হওয়ার ওষুধ।

হঠাৎ সুশীল একটা জালার মুখ খুলে বলে উঠল—দেখি, বোধ হয় টাকা! জালা উপুড় করলে তার মধ্যে থেকে পড়ল একরাশ বড় বড় চাকতি, বড় বড় মেডেলের আকারের প্রায় সিকি ইঞ্চি পুরু।

সুশীল একখানা চাকতি হাতে করে বললে—সোনা বলে মনে হয় না?

জামাতুল্লা বললে—আলবৎ সোনা—তবে টাকা বা মোহর নয়।

সুশীল বললে—কোন রকম ছাপ নেই। মুদ্রা করবার জন্যে এগুলো তৈরি করা হয়েছিল—কিন্তু তারপর ছাপ এতে মারা হয় নি। এ অনেক আছে—

সনৎ বললে—সবরকম কিছু কিছু নাও দাদা—

জামাতুল্লা বললে—এ যদি সোনা হয়—এই এক জালার মধ্যেই লাখ টাকার সোনা—

সুশীল আর একটা জালা পেড়ে ঢাকনি খুলে উপুড় করে ঢাললে। তার মধ্যেও অবিকল অমনি ধাতব চাকতি একই আকারের, একই মাপের।

জামাতুল্লা বললে—শোভানাল্লা! দু-লাখ হল—যদি আমরা দেখি সব জালাতেই এ-রকম—

এই সময় সুশীল প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল—শিগগির এদিকে এস—

ওরা গিয়ে দেখলে অন্ধকার ঘরের কোণে কতকগুলো মানুষের হাড়গোড়—ভাল করে টর্চ ফেলে দেখা গেল, দুটো নরকঙ্কাল!

সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার পাতালপুরীর মধ্যে নরকঙ্কালদুটো যেন ওদের সমস্ত আশা ও চেষ্টাকে দাঁত বার করে উপহাস করছে। কাল রাত্রে স্বপ্নের কথা ওর মনে এল, মৃত্যুর চেয়ে মহা রহস্য জগতে কী আছে? মূঢ় লোকে চারিপাশে মৃত্যু অহরহ দেখছে, অথচ ভাবে না কী গভীর রহস্যপুরীর দ্বারপাল-স্বরূপ ইহলোক ও পরলোকের পথে মৃত্যু আছে দাঁড়িয়ে।…

নরকঙ্কালটি কী কথা না জানি বলত যদি এরা এদের মরণের ইতিহাস ব্যক্ত করতে পারত? সে হয়ত দুর্নিবার লোভ ও নৃশংস অর্থলিপ্সার ইতিহাস, হয়ত তা রক্তপাতের ইতিহাস, জীবন মরণ নিয়ে খেলার ইতিহাস, ভাই হয়ে ভায়ের বুকে ছুরি বসানোর ইতিহাস…

জামাতুল্লা কঙ্কালগুলো সরিয়ে রাখতে গিয়ে বললে—হাড় ভেঙে যাচ্ছে বাবুজি বহুৎ পুরোনো আমলের হাড়গোড় এসব। কমসে কম একশো দেড়শো বছরের পুরোনো—কিন্তু দেখুন বাবুজি মজা, হাড়ের গায়ে এসব কী?

ওরা হাতে করে নিয়ে দেখলে।

প্রায় এক ইঞ্চি করে লবণের স্তর শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে আছে কঙ্কালের ওপরে। সুশীল ভাল করে টর্চের আলো ফেলে বললে—চোখের কোটরগুলো নুনে বুজোনো—দ্যাখো চেয়ে!

এর যে কী কারণ ওরা কিছুই ঠিক করতে পারলে না।

wapsip.com

অন্ধকার পাতলপুরীর শহরে ওদের হাড়ে নুন মাখাতে এসেছিল কে?

সে সময়ে সনৎ বললে—দ্যাখ দাদা, দ্যাখ জামাতুল্লা সাহেব—এটা কিসের দাগ?

ওরা পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে সনৎ টর্চ ফেলে দেওয়ালের গায়ের একটা সাদা রেখার দিকে চেয়ে কথা বলছে। রেখাটা লম্বা অবস্থায় দেওয়ালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টানা।

জামাতুল্লা বললে—এ দাগ নোনা জলের দাগ—খুব টাটকা দাগ।

সুশীল ও সনৎ হতভম্ব হয়ে বললে—তার মানে? জল আসবে কোথা থেকে?

জামাতুল্লা বললে—বড্ড অন্ধকার জায়গা, ভাল করে কিছুই তো মালুম পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু একবার ভাল করে ঘরের চারিধারে দেখা দরকার। অজানা জায়গায় সাবধান থাকাই ভাল। এত স্যাঁতসেঁতে কেন ঘরটা, আমি অনেকক্ষণ থেকে তাই ভাবছি।

জামাতুল্লা ও সনৎ হাতড়ে হাতড়ে সোনার চাকতি বের করে থলের মধ্যে একরাশ পুরে ফেললে—পাথরের নুড়িও কিছু নিলে—বলা যায় না যদি এগুলো কোন দামী পাথর হয়ে পড়ে! বলা যায় কি! সনৎ ছেলেমানুষ, সে এত সোনার চাকতি দেখে কেমন দিশেহারা হয়ে গেল—উন্মত্তের মত আঁজলা ভরে চাকতি সংগ্রহ করে তার তামার জালার মধ্যে থেকে, আর থলের ভেতর পুরে নেয়। যেন এ আরব্য উপন্যাসের একটা গল্প—কিংবা রূপকথার মায়াপুরী—পাতালপুরীর ধনভাণ্ডার! বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় বেলা দশটা থেকে বিকেল ছ-টা এস্তেক কলম পিষে সাঁইত্রিশ টাকা ন-আনা রোজগার করতে হয় সারা মাসে। সেই হল রূঢ় বাস্তব পৃথিবী—মানুষকে ঘা দিয়ে শক্ত করে দেয়। আর এখানে কী, না—হাতের আঁজলা ভরে যত ইচ্ছে সোনা নিয়ে যাও, হীরে নিয়ে যাও—এ আলাদা জগৎ—পৃথিবীর অর্থনৈতিক আইন-কানুনের বাইরে।

বহু প্রাচীন কালের মৃত সভ্যতা এখানে প্রাচীন দিনের সমস্ত বর্বর প্রাচুর্য ও আদিম অর্থনীতি নিয়ে সমাধিগর্ভে বিস্মৃতির ঘুমে অচেতন—এ দিন বাতিল হয়ে গিয়েছে, এ সমাজ বাতিল হয়ে গিয়েছে.—একে অন্ধকার গহ্বর থেকে টেনে দিনের আলোয় তুলে বিংশ শতাব্দীর জগতে আর অর্থনৈতিক বিভ্রাট ঘটিও না।...

হঠাৎ কিসের শব্দে সুশীলের চিন্তার জাল ছিন্ন হল—বিরাট, উন্মত্ত, প্রচণ্ড শব্দ—যেন সমগ্র নায়েগ্রা জলপ্রপাত ভেঙে ছুটে আসছে কোথা থেকে—কিংবা শিবের জটা থেকে যেন গঙ্গা ভীম ভৈরব বেগে ইন্দ্রের ঐরাবতকে ভাসিয়ে মর্ত্যে অবতরণ করছেন!

জামাতুল্লার চিৎকার শোনা গেল সেই প্রলয়ের শব্দের মধ্যে—জল! জল! পালান—ওপরে উঠুন—

জামাতুল্লার কথা শেষ না হতে সুশীলের হাঁটু ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত জল উঠল—কোমর থেকে বুক লক্ষ্য করে দ্রুতগতিতে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে জামাতুল্লা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ঐ দেখুন বাবু!

সুশীল সবিস্ময়ে ও সভয়ে চেয়ে দেখলে ঘরের ছাদের কাছাকাছি সেই দুটো পয়োনালা দিয়ে ভীষণ তোড়ে জল এসে পড়ছে ঘরের মধ্যে। চক্ষের নিমেষে ওরা ইঁদুর-কলে আট্‌কা পড়ে জলে ডুবে দম বন্ধ হয়ে মরবে!... কিন্তু উঠবে কোথায়! উঠবে কিসের সাহায্যে? এ ঘরে সিঁড়ি নেই আগেই দেখে এসেছে।

সুশীল চিৎকার করে বললে—সনৎ—সনৎ ওপরে ওঠ—শিগ্‌গির—

সনৎ বললে—দাদা! তুমি আমার হাত ধর—হাত ধর—

wapsip.com

তারপর হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল—পুরোনো রাজাদের পোষ-মানা বেতাল যেন কোথায় হা হা করে বিকট অট্টহাস্য করে উঠল—সম্মুখে মৃত্যু! উদ্ধার নেই!

এজলে সাঁতার দেওয়া যাবে না সুশীল জানে—এ মরণের ইঁদুরকল। বুক ছাপিয়ে জল তখন উঠে প্রায় নাকে ঠেকে-ঠেকে—

কে যেন অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল—দাদা—দাদা—আমার হাত ধর—দাদা—

একজোড়া শক্ত বলিষ্ঠ হাত ওকে ওপরের দিকে তুললে টেনে। ঘন অন্ধকার। টর্চ কোথায় গিয়েছে সেই উন্মত্ত জলরাশির মধ্যে। সুশীলের প্রায় জ্ঞান নেই। সে ডাকছে—কে? সনৎ?

কোন উত্তর নেই। কেউ কাছে নেই।

সুশীলের ভয় হল। সে চেঁচিয়ে ডাকলে—সনৎ! জামাতুল্লা!

তার পায়ের তলায় উন্মত্ত গর্জনে যেন একটা পাহাড়ের মাথার হ্রদ খসে পড়েছে! উত্তর দেয় না কেউ—না সনৎ, না জামাতুল্লা।

প্রায় দশ মিনিট পরে জামাতুল্লা বললে—বাবু, জলদি আমার হাত পাকড়ান—

—কেন?

—পাকড়ান হাত—উপরে উঠব—সাবধান!

—সনৎ, সনৎ কোথায়? তাকে রেখে এলে উপরে!

—জল্‌দি হাত পাকড়ান—হুঁ—

কত যুগ ধরে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে সে ওঠা প্রলয়ের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে—তারপর কতক্ষণ পরে পৃথিবীর ওপর এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা পাতালপুরীর গহ্বর থেকে! বনের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার যেন ঘনিয়ে এসেছে। সুশীল ব্যগ্রভাবে বললে—সনৎ কই? তাকে কোথায়—

জামাতুল্লা বিষাদ-মাখানো গম্ভীরসুরে বললে—সনৎবাবু নেই—আমাদের ভাগ্য বাবুজি—

সুশীল বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বললে—নেই মানে?

—সনৎবাবু তো পাতালপুরী থেকে ওঠেন নি—তাঁকে খুঁজে পাইনি। আপনাকে তুলে ওপরে রেখে তাঁকে খুঁজতে যাব এমন সময় ঘরের মেঝে দুলে উঠে এঁটে গেল। তিনি থেকে গেলেন তলায়—আমরা রয়ে গেলাম ওপরে। তাঁকে খুঁজে পাই কোথায়?

—সেকি! তবে চল গিয়ে খুঁজে আনি!

জামাতুল্লা বিষাদের হাসি হেসে বললে—বাবুজির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, এখন কিছু বুঝবেন না। একটু ঠাণ্ডা হোন, সব বলছি। সনৎবাবুকে যদি পাওয়া যেত তবে আমি তাঁকে ছেড়ে আসতাম না।

—কেন? সনৎ কোথায়? হ্যাঁরে, আমি তোকে ছেড়ে বাড়ি গিয়ে মার কাছে, খুড়ীমার কাছে কী জবাব দেব?—কেন তুমি তাকে পাতালে ফেলে এলে?

জামাতুল্লা নিজের কপালে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে—নসীব, বাবুজি—

উদ্‌ভ্রান্ত সুশীলের বিহ্বল মস্তিষ্কে ব্যাপারটা তখনও ঢোকে নি। জলের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে দম বন্ধ হয়ে সনৎ ওপরে উঠবার চেষ্টা করেও উঠতে পারে নি। অন্ধকারের মধ্যে জামাতুল্লাও ওকে খুঁজে পায়নি। ওরই হাত ধরে টেনে তুলবার পরে ঘরের মেঝে এঁটে গিয়ে রত্নভাণ্ডারের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ওই ঘরে ছাদ পর্যন্ত জল ভর্তি হয়ে

wapsip.com

গিয়েছে এতক্ষণ—সেখান মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে?

সুশীল ক্রমে সব বুঝলে ওপরে উঠে এসে মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগানোর পরে। একটা গভীর শোক ও হতাশায় সে একেবারে ডুবে যেত হয়ত, কিন্তু ঘটনাবলীর অদ্ভুতত্বে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। কোথায় অন্ধকার পাতালপুরীতে পুরাকালের ঘন-ভাণ্ডার, সে ধণভাণ্ডার অসাধারণ উপায়ে সুরক্ষিত··· এমন কৌশলে, যা একালে হঠাৎ কেউ মাথায় আনতেই পারত না!

জামাতুল্লা বললে—পানি দেখে তখনি আমার সন্দেহ হয়েছে। আমি ভাবছি, এত নোনা পানি কেন ঘরের মধ্যে।

সুশীল বললে—আমাদের তখনই বোঝা উচিত ছিল জামাতুল্লা। তাহলে সনৎ আজ এভাবে—

—তখন কী করে জানব বাবুজি? ঐ নালিদুটো গাঁথা আছে—ও দিয়ে জোয়ারের সময় সমুদ্দুরের নোনা পানি ঢোকে—দিনে একবার রাতে একবার। আমার কী মনে হয় জানেন বাবুজি, ওই দুটো নালি এমন ফন্দি করে গাঁথা হয়েছিল যে—

সুশীল বললে—আমার আর একটা কথা মন হয়েছে জানো? ওই দুটো নরকঙ্কাল যা দেখলে, আমাদেরই মত দুটো লোক কোন কালে ওই ঘরে ধনরত্ন চুরি করতে গিয়ে সমুদ্রের নোনা জলে হাবুডুবু খেয়ে ডুবে মরছে। মুর্খের মত ঢুকেছে, জানত না। যেমন আমরা—সনৎ যেমন—

—কী জানত না?

—যে স্বয়ং ভারত মহাসমুদ্র প্রাচীন চম্পারাজ্যের রত্নভাণ্ডারের অদৃশ্য প্রহরী। কেউ কোনদিন সে ভাণ্ডার থেকে কিছু নিতে পারবে না, মানমন্দিরের রত্নশৈল তার একখানি সামান্য নুড়িও হারাবে না।—সুশীল বললে—কিন্তু জল যায় কোথায় জামাতুল্লা? এত জল? আমার কী মনে হয় জানো—

আমারও তা মনে হয়েছে। ওই ঘরের নিচে আর-একটা ঘর আছে, সেটা আসল ধনভাণ্ডার। বেশি জল বাধলে ঘরের মেঝে একদিকে ঢাল হয়ে পড়ে জলের চাপে—সব জল ওপরের ঘর থেকে নিচের ঘরে চলে যায়।

সুশীল বললে—স্টীম পাম্প আনলেও তার জল শুকোনো যাবে না, কারণ—তাহলে গোটা ভারত মহাসাগরকেই স্টীম পাম্প দিয়ে তুলে ফেলতে হয়—ওর পেছনে রয়েছে গোটা ভারত সমুদ্র। সে জামাতুল্লার দিকে চেয়ে বিষাদের সুরে বললে—এই হল তোমার আসল বিস্মমুনি সমুদ্র, বুঝলে জামাতুল্লা?

ওরা সেই বনের গভীরতম প্রদেশের একটা পুরোনো মন্দির দেখলে। মন্দিরের মধ্যে এক বিরাট দেবমূর্তি, সুশীলের মনে হল, সম্ভবত বিষ্ণুমূর্তি।

যুগযুগান্ত কেটে গেছে, মাথার ওপরকার আকাশে শত অরণ্যময়ূরীদের নর্তন শেষ হয়ে আবার শুরু হয়েছে, রক্তাশোকতরুর তলে কত সুখসুষুপ্ত হংসমিথুনের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে—সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে ঘৃতপক্ক অমৃতচরুর চারু গন্ধে মন্দিরের অভ্যন্তর কতদিন হয়েছে আমোদিত—কত উত্থান, কত পতনের মধ্যে দেবতা অবিচল দৃষ্টিতে বহুদূর অনন্তের দিকে চেয়ে আছেন, মুখে সুকুমার সব্যঙ্গ মৃদু চাপা হাসি—নিরুপাধি চেতনা যেন পাষাণে লীন, আত্মস্থ।

সুশীল সসম্ভ্রমে প্রণাম করল—দেবতা, সনৎ ছেলেমানুষ—ওকে তোমার পায়ে রেখে

wapsip.com

গেলুম—ক্ষমা কর তুমি ওকে!

*　　　　*　　　　*

সুশীল কলকাতায় ফিরেছে।

কারণ যা ঘটে গেল, তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। ইয়ার হোসেন সন্দেহ করে নি। সনৎ একটা কূপের মধ্যে পড়ে মরে গিয়েছে শুনে ইয়ার হোসেন খুঁজে দেখবার আগ্রহও প্রকাশ করে নি। চীনা মাঝি জাঙ্ক্ নিয়ে এসেছিল—তারই জাঙ্কে সবাই ফিরল সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়ান মেলবোট ধরে কলম্বো।

কলম্বোর এক জহুরীর দোকানে জামাতুল্লা সেই হর্তুকির মত জিনিস দেখাতেই বললে—এ খুব দামী জিনিস, ফসিল অ্যাম্বার—বহুকালের অ্যাম্বার কোন জায়গায় চাপা পড়ে ছিল।

দু-খানা পাথর দেখে বললে—আনকাট্ এমারেল্ড, খুব ভাল ওয়াটারের জিনিস হবে কাটলে। আন্নামালাইয়ের জহুরীরা এমারেল্ড কাটে, সেখানে গিয়ে কাটিয়ে নেবেন। দামে বিকোবে।

সবসুদ্ধ পাওয়া গেল প্রায় সত্তর হাজার টাকা। ইয়ার হোসেনকে ফাঁকি না দিয়ে ওরা তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দশ হাজার টাকা পাঠালে—সেই মাদ্রাজী বিধবাকে পাঠালে বিশ হাজার—বাকি টাকা তিন ভাগ হল জামাতুল্লা, সনতের মা ও সুশীলের মধ্যে।

টাকার দিক থেকে এমন কিছু নয়, অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেকখানি। কত রাত্রে গ্রামের বাড়িতে নিশ্চিন্ত আরাম-শয়নে শুয়ে ওর মনে জাগে মহাসমুদ্র-পারের সেই প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের অরণ্যাবৃত ধ্বংসস্তূপ··· সেই প্রশান্ত ও রহস্যময় বিষ্ণুমূর্তি··· হতভাগ্য সনতের শোচনীয় পরিণাম···অরণ্যমধ্যবর্তী তাঁবুতে সে রাত্রির সেই অদ্ভুত স্বপ্ন। জীবনের গভীর রহস্যের কথা ভেবে তখন সে অবাক হয়ে যায়।

জামাতুল্লা নিজের ভাগের টাকা নিয়ে কোথায় চলে গেল, তার সঙ্গে আর সুশীলের দেখা হয় নি।

wapsip.com

সুন্দরবনে সাত বৎসর

wapsip.com

wapsip.com

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সরকার
১৫৪, হরিশ মুখুজ্যে রোড
কলিকাতা-২৫

টেলিফোন—সাউথ ৯৩২
৭২, বকুলবাগান রোড
কলিকাতা-২৫
১৫/১০/৫২

প্রীতিভাজনেসু

'সুন্দরবনে সাত বৎসর' বইখানি খুব ভাল লাগল, লেখা ছবি ছাপা কাগজ সবই উত্তম। ছোট ছেলেমেয়েরা অ্যাডভেঞ্চার পড়তে ভালবাসে। এরকম রচনা রূপকথা বা ডিটেকটিভ গল্পের চাইতে হিতকর মনে করি, কারণ, পড়লে মনে সাহস হয়, কিছু জ্ঞানলাভও হয়। সাহসিক অভিযান বা বিপৎসংকুল ঘটনাবলীর জন্য আফ্রিকায় বা চন্দ্রলোকে যাবার দরকার দেখি না, ঘরের কাছে যা পাওয়া যায় তার বর্ণনাই বাস্তবের সঙ্গে বেশি খাপ খায় এবং স্বাভাবিক মনে হয়। সুন্দরবন রহস্যময় স্থান, নিসর্গশোভা নদী সমুদ্র নানারকম গাছপালা বন্যজন্তু আর সংকটের সম্ভাবনা সবই সেখানে আছে। এই সবের বর্ণনা এবং চিত্র থাকায় আপনার বইখানি অতি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। যাদের জন্য লিখেছেন তারা পড়লে খুব খুশি হবে সন্দেহ নেই।

ভবদীয়
রাজশেখর বসু

wapsip.com

‘সুন্দরবনে সাত বৎসর’ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে বিভূতিভূষণের মৃত্যুর দু’বছর পরে। বইটি প্রকাশ করেন ৬৪ কলেজ স্ট্রীট ঠিকানা থেকে সুধীন্দ্রনাথ সরকার। ‘প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত’ থেকে জানতে পারি বিভূতিভূষণ রচনাস্বত্ব প্রকাশককে দিয়েছিলেন। সাড়ে তিনটাকা দামের সর্বমোট ১২৪ পৃষ্ঠার বইটির প্রচ্ছদ এবং ভিতরের মোট ৩৫টি ছবি এঁকে দিয়েছিলেন বিখ্যাত শিল্পী হিতেন্দ্রমোহন বসু (‘কুন্তলীন’-খ্যাত এইচ বোসের জ্যেষ্ঠপুত্র)। আমরা এই বইতে সেসব ছবি দিতে পারলাম না। বইটি পড়ে রাজশেখর বসু মহাশয় প্রকাশককে যে চিঠি লেখেন তাও এখানে ছাপা হল।

বইটিতে বিভূতিভূষণের হাতের লেখায় একটি ভূমিকাকল্প রচনা শুরুতেই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু এই লেখাটি পরবর্তীকালে পাঠকদের কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়। মনে হয়েছে গোটা বইটি তাঁর লেখা নয়, শেষের কয়েকটি অধ্যায় মাত্র তাঁর রচনা। বইটিতে প্রকৃতপক্ষে কোনও অধ্যায়বিভাগ নেই। ১৯৭৩ সালে বইটির পুনর্মুদ্রণ করেন শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ। তাতে লেখক-পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত সংযোজন-ভূমিকা মুদ্রিত হয়। এখানে ১৩০২ সালে ‘সখা ও সাথী’ পত্রিকায় বইয়ের সূচনা অংশ ভুবনমোহন রায় কর্তৃক আরব্ধ হয়েছিল উল্লিখিত হয়েছে। আমরা অনুসন্ধান করে ঐ রচনার সন্ধান পাইনি।

wapsip.com

মাঘ মাসে মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষে সাগর-দ্বীপে প্রতি বৎসরই একটি খুব বড় রকমের মেলা বসিয়া থাকে। মকর-সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর-স্নান করিতে তখন নানা দেশের লোক আসিয়া জড়ো হয়। এইস্থানে সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলন হইয়াছে, এইজন্য ইহা একটি তীর্থ-স্থান। প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং নেপাল ও পাঞ্জাব প্রভৃতির দূর দেশ হইতেও এইখানে এই যোগ উপলক্ষে আসিয়া থাকে। বহু সাধু-সন্ন্যাসীরও সমাগম হয় এবং মেলায় নানা দেশ হইতে ব্যবসায়ী লোক আসিয়া উপস্থিত হয়।

সমুদ্র-তীরে বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর এই বৃহৎ মেলাটি বসিয়া থাকে। তীর্থের কাজে তিন দিনের বেশি লাগে না বটে, কিন্তু মেলাটি চলে অনেক দিন। যাত্রীরা ভোরে উঠিয়া সাগরে স্নান করে; তারপর পঞ্চরত্ন দিয়া সাগরে পূজা করিয়া কপিল মুনির মন্দিরে গিয়া মুনির প্রতিমূর্তি দর্শন করে এবং সেখানেও পূজা দেয়। মন্দিরের বাহিরে একটি বটগাছ আছে, তাহার তলায় রাম এবং হনুমানের মূর্তি এবং কপিল মুনিরও একটি মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের পিছনে একটি কুণ্ড আছে তাহার নাম সীতা-কুণ্ড। যাত্রীরা পাণ্ডাদিগকে পয়সা দিয়া এই কুণ্ডের এক বিন্দু জল প্রত্যেকেই পান করিয়া থাকে। কপিল মুনির মন্দিরের ভিতর যাইতেও প্রত্যেক যাত্রীকে চারি আনা করিয়া দিতে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, সমুদ্র-তীরে বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর এই মেলাটি বসিয়া থাকে। মেলার জন্য যে সমস্ত কুঁড়ে-ঘর তোলা হয়, তাহা ছাড়া কোন ঘরবাড়ি এখানে নাই; অন্তত আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে দেখি নাই। সুতরাং নৌকা ভিন্ন অন্য কোন আশ্রয় যাত্রীদিগের ছিল না। তখন স্টীমার ছিল না, যাত্রীদিগকে নৌকা করিয়াই গঙ্গাসাগরে যাইতে হইত। কিন্তু সেই তীর্থস্থানে নৌকায় বাস করা অপেক্ষা, সেই অনাবৃত বালুকারাশির উপর শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করায় বেশি পুণ্য বলিয়া অনেকে তাহাই করিত!

তীর্থস্থানে অনেকে যেমন পুণ্য সঞ্চয় করিতে যায়, তেমনি অনেকে আবার কু-মতলবেও গিয়া থাকে। একদিকে যেমন সাধু-সন্ন্যাসীরা আসেন, অন্যদিকে তেমনি চোর-ডাকাতেরও অভাব থাকে না। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সেসময় দেশে চোর-ডাকাতের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল।

তখন আমার বয়স বড় বেশি নয়। আমি দাদামহাশয়ের সহিত গঙ্গাসাগর গিয়াছিলাম। দাদামহাশয় সাগরে গিয়াছিলেন পুণ্যস্নানে; আমি গিয়াছিলাম মেলা দেখিতে। বাড়ির কাহারও ইচ্ছা ছিল না, যে আমি যাই এবং দাদামশায়ও আমাকে প্রথমটা সঙ্গে লইয়া যাইতে রাজী হন নাই। কিন্তু আমি জেদ ধরিয়া বসিলাম—যাইবই। জানিতাম, আমার আবদার কখনই অপূর্ণ থাকে না। যখনই যে আবদার করিতাম, তাহা যতই কেন অসঙ্গত হউক না, যতই কেন অসম্ভব হউক না, তাহা অপূর্ণ থাকিত না। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, ন্যায্য আবদার ছাড়িয়া ক্রমে আমি নানা প্রকার অন্যায় আবদার করিতে সাহসী হইয়াছিলাম। যদি প্রথম হইতেই আমার জেদ বজায় না থাকিত, যদি প্রথম হইতেই একটু শাসন হইত তাহা হইলে আমি অত আবদারে হইতাম না। কিন্তু যখন দেখিলাম, আমি যখনই যে জেদ করি, তাহাই বজায় থাকে; যে আবদার করি, তাহাই পূর্ণ হয় তখন আমার সাহস বাড়িয়া গেল। সে যাহা হউক, আমি তো জেদ করিয়া বসিলাম—যাইব-ই; হইলও তাহাই। দাদামহাশয় আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না।

wapsip.com

যথাসময়ে গঙ্গাসাগরে আমাদের বজরা আসিয়া পৌঁছিল। সাগরযাত্রীদের নৌকাগুলি যেখানে সারি সারি বাঁধা ছিল, আমাদের বজরা সেইখানে বাঁধা হইল। ছোট বড় অনেকগুলি নৌকা সেখানে ছিল বটে, কিন্তু বজরা আর একখানিও ছিল না। তাই আমাদের বজরা লাগিবামাত্র দলে দলে লোক আসিয়া আমাদের বজরা দেখিতে লাগিল। যাহাদের কাজকর্ম আছে, তাহারা একটু দেখিয়াই চলিয়া গেল। আর যাহাদের কাজকর্ম নাই, তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে বসিল; বসিয়া বসিয়া বজরার আকৃতি সৌন্দর্য সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা করিল। বজরার মালিক যে একজন খুব বড়লোক, সে সম্বন্ধে সকলেই একমত হইল এবং একজন যে খুব বড়লোক সাগর-স্নানে আসিয়াছে, অল্পক্ষণ মধ্যে সে সংবাদটা প্রচার হইয়া গেল।

আমরা বজরা হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, বহু নিষ্কর্মা লোক এবং ভিক্ষুক বজরার কাছে জড়ো হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা তীরে উঠিলাম। দাদামহাশয় একজন বিশ্বস্ত লোকের হাতে আমার ভার দিয়া নিজে তীর্থকার্য করিতে গেলেন। আমি সেই লোকটির সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেলা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

দাদামহাশয় সমস্ত দিন তাঁহার নিজের কাজ লইয়া থাকিতেন, আমি কি করিতাম না করিতাম তাহা দেখিবার তাঁহার অবসর ছিল না। আমি সমস্ত দিন মেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম। মেলায় যে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতাম, তাহা নয়। দাদামহাশয়ের হুকুম ছিল, আমি যখন যাহা চাহিব, তখনই তাহা দিতে হইবে। সুতরাং আমার খুব মজা। আমি নাগরদোলায় চড়িতাম, যাহা খুশি কিনিতাম—তিন দিন কি আনন্দেই না কাটাইয়াছিলাম! কেবল সেই তিন দিনের মধ্যে মেলায় যে সমস্ত জিনিস আসিয়াছিল, এটা ওটা করিয়া তাহার প্রায় সমস্ত জিনিসের অন্তত এক-একটি করিয়া আমি সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

আমার চলাফেরা এবং ভাবগতিক দেখিয়া সকল লোকই আমাকে লক্ষ্য করিত এবং অনেক নিষ্কর্মা লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত। আমরা যেদিন সেখানে পৌঁছিলাম, তাহার পরদিন হইতে দেখিলাম, মগের মত চেহারা একটা লোক, প্রায় সমস্ত দিনই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিল। কিন্তু সে লোকটি অন্যান্য লোকের মত আমাদের কাছে কাছে বড় থাকে নাই এবং কোন কথাও আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে নাই, দূরে দূরে থাকিয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিল। পরদিন আমরা মেলায় গিয়া সে লোকটাকে আর দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু একটি মগ বালক সেদিন আমার সঙ্গ লইল। সে ছিল আমার সমবয়সী। সুতরাং অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহার সহিত আমার বেশ ভাব হইয়া গেল। মেলায় বেড়াইতে সে সেই স্থানের অনেক বিবরণ আমাকে দিল, অনেক গল্প করিল এবং আমাদের বাড়ি-ঘরের কথাও জিজ্ঞাসা করিল। ছেলেটিকে আমি মেলা হইতে কয়েকটা জিনিস কিনিয়া দিলাম এবং সন্ধ্যার সময় বজরায় ফিরিলাম। মনে পড়ে ছেলেটি আমার সঙ্গে সঙ্গে বজরা পর্যন্ত আসিয়াছিল; আমি বজরায় উঠিলে সে ফিরিয়া যায়। এই মগ বালকটির উপর আমার কেমন একটু মায়া হইয়াছিল, আমি বজরার ভিতরে যাইয়া, সে চলিয়া গিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য তীরের দিকে চাহিলাম। চাহিয়া দেখি, সেই বালকটি তীরের কিছু দূরে পূর্বদিনের সেই লোকটার সঙ্গে দাঁড়াইয়া কি যেন কথা কহিতেছে। মগ বালকটির উপর সেদিন আমার যেমন একটু মায়া হইয়াছিল, সেই লোকটার প্রতি তেমনি পূর্বদিন আমার কেমন একটা বিরক্তি জন্মিয়াছিল। তাই সেই মগ বালককে লোকটার সহিত কথা কহিতে দেখিয়া আমার কেমন যেন ভাল বোধ হইল না।

wapsip.com

যাহা হউক পরদিন প্রাতঃকালে আমাদের বাড়ি ফিরিবার কথা; সুতরাং তাহার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। দাদামহাশয় সন্ধ্যার সময় আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, তিনি সমস্ত রাত্রি কপিল মুনির মন্দিরে বসিয়া জপ-তপ করিবেন, ভোরে বজরায় ফিরিয়া আসিবেন এবং এবং তখনই বজরা খোলা হইবে।

সন্ধ্যার পরেই আমাদের খাওয়া শেষ হইল এবং সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর অল্পকাল মধ্যেই আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না। হঠাৎ কি একটা শব্দে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। অন্ধকারে জাগিয়া অকারণেই কেমন যেন একটু ভয়-ভয় করিতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য আমি বজরার এক ধারের জানালা তুলিয়া তীরের দিকে চাহিলাম, কিন্তু এ কি, তীর কোথায়! চাহিয়া দেখিলাম, যত দূর দৃষ্টি যায়, কেবল জল! নদীর দিকের জানালাটা খুলিয়াছি মনে করিয়া, ফিরিয়া গিয়া অন্য দিকের জানালাটা খুলিলাম; দেখিলাম,—সেদিকেও তাহাই, চারিদিকেই জল, কূলকিনারা নাই। বড় ভয় হইল। আমার যিনি অভিভাবক ছিলেন তাঁহাকে ডাকিলাম এবং তিনি উঠিলে তাঁহাকে সমস্ত বলিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া বাহিরে গেলেন, গিয়া দেখিলেন—সত্যসত্যই বজরা আর তীরের কাছে বাঁধা নাই, অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মাঝিদিগকে ডাকিয়া তুলিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন বুঝি কোন প্রকারে বজরার বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে এবং সেইজন্য বজরা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। মাঝিরা তাড়াতাড়ি উঠিল এবং উঠিয়া যাহা দেখিল তাহাতে একটু ভীত হইল। একজন মাঝি তাড়াতাড়ি হালের দিকে যাইবে, এমন সময় হালের নিকট হইতে কে অতি কর্কশ কণ্ঠে কহিল, "খবরদার, কেউ এক পা নড়েছ কি মরেছ!"

মাঝি চাহিয়া দেখিল, হালের কাছে তিনজন লোক তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া আছে! ওদিকে বজরার সম্মুখের দিকে ছয়-সাতজন লোক নিঃশব্দে বসিয়াছিল, তাহারাও এই কথায় উঠিয়া দাঁড়াইল। রাত্রির ক্ষীণ আলোকে আমি নৌকার ভিতর হইতে দেখিলাম, তাহাদের প্রত্যেকের হাতেই তলোয়ার রহিয়াছে। আমার অভিভাবক তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "সর্বনাশ হয়েছে, আমরা আরাকানী দস্যুদের হাতে পড়েছি।"

ডাকাতের হাতে পড়িয়াছি শুনিয়া আমার সর্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল। আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। বজরায় আমাদের সঙ্গে দুইজন বরকন্দাজ ছিল। তাহারাও ঘুমাইতেছিল। গোলমালে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে, কোন্ হ্যায়রে, কোন্ হ্যায়রে—বলিতে বলিতে তাহারাও উঠিল। উঠিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে মুহূর্তের জন্য তাহারাও একটু থতমত খাইয়া গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র, পরমুহূর্তে তাহারা তলোয়ার খুলিয়া বজরার দরজা চাপিয়া দুইজনে দাঁড়াইয়া বলিল, "খবরদার, এদিকে এসো না, যতক্ষণ হাতে তলোয়ার আছে, ততক্ষণ কারও সাধ্যি নেই যে মনিবের চুলটিও স্পর্শ করে।" আমাদের নৌকায় ছয়জন মাঝি, দুইজন বরকন্দাজ, দুইজন চাকর, আমার অভিভাবক ও আমি। এদিকে ডাকাতেরা প্রায় সাত-আটজন। বরকন্দাজের কথা শুনিয়া একজন ডাকাত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, অকূল সমুদ্রে রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই বিকট হাসি আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল; সে হাসিতে আমার বুকের রক্ত যেন শুকাইয়া গেল। পরমুহূর্তেই অস্ত্রের ঝনঝনা আমার কানে গেল। চাহিয়া দেখি, উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে বরকন্দাজদের তলোয়ারের আঘাতে দুইজন দস্যু জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আমাদের একজন বরকন্দাজও দস্যুদের হাতে প্রাণ হারাইল। আমি ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিলাম, তারপর আবার

wapsip.com

এই ভয়ানক দৃশ্য চোখের উপর দেখিয়া আমার চক্ষু আপনি মুদ্রিত হইয়া আসিল। ক্রমে যেন চেতনা হারাইলাম। তারপর কি হইল, তাহা আর কিছুই জানিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ চেতনাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না, যখন চেতনা হইল, তখন ধীরে ধীরে চাহিলাম। চাহিয়া দেখিলাম, আমাদের সে বজরাও নাই, সঙ্গের লোকজনও নাই। একখানি খোলা নৌকার উপর আমি শুইয়া রহিয়াছি। রাত্রি তখন প্রভাত হইয়াছে। আমি ধীরে ধীরে নৌকার উপরে উঠিয়া বসিলাম। উঠিয়া দেখি, একটা খালের মধ্য দিয়া নৌকাখানি যাইতেছে। সেখানি ছিপ নৌকা। ছিপটি বহিতেছিল আট-দশজন খুব বলিষ্ঠকায় লোক। কাজেই ছিপখানি তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই খালের দুই কূলে এত ঘন জঙ্গল যে সূর্যের কিরণও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আমি সেই অল্প আলোকে যাহা দেখিলাম, তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, ইহারা গত রাত্রের সেই আরাকানী দস্যুদল। আমাদের বজরা লুঠপাট করিয়া ইহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি উঠিয়া বসিবামাত্র পশ্চাৎ দিক হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল, "কি গো বাবু, ঘুম ভাঙলো?" সেই কথায় ফিরিয়া চাহিয়া আমি দেখিলাম, যে লোকটি মেলায় আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল—এ সে-ই! তখন আমি সব বুঝিতে পারিলাম। মেলায় আমার চলা-ফেরা ভাব-গতিক দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিল যে, আমরা খুবই বড়লোক। এ লোকটাও তাহাই মনে করিয়া আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল এবং দূরে দূরে থাকিয়া খোঁজখবর লইতেছিল। পরদিন যে মগ বালকটি আমার সঙ্গে ফিরিতেছিল এবং যাহাকে শেষে আমি ইহার সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়াছিলাম, সেও বোধ হয় ইহাদেরই লোক এবং বোধ হয় ঐ উদ্দেশ্যেই আমার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিন ফিরিতেছিল। তখন সেই মগ বালকটির সঙ্গে অত ভাব করিয়াছিলাম বলিয়া মনে অনুতাপ হইল।

সেই লোকটার কথায় কোন উত্তর না দিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদের বজরা কোথায়, আমাদের লোকজন কোথায়, তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? যাব না আমি তোমাদের সঙ্গে, তোমরা আমাকে আমার সঙ্গীদের কাছে দিয়ে এসো।" এই কথা শুনিয়া ছিপের লোকগুলি সকলেই একসঙ্গে বিকট রবে হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে আমি চমকিয়া উঠিলাম। তোমরা হয়ত মনে করিতেছ, হাসির রবে আবার চম্‌কায় কে? কিন্তু তোমরা নিশ্চয় তেমন বিকট হাসি শুন নাই, তাই ও-কথা মনে করিতেছ। আমি তো বালক মাত্র, একটা হিংস্র জন্তু পর্যন্ত সে হাসির রবে ভয় পাইয়াছিল। হঠাৎ সেই সময় তীরের দিকে চোখ পড়ায় আমি দেখিলাম, তীরের কাছে জঙ্গলের মধ্যে একটা চিতাবাঘ বোধ হয় মাছ ধরিতেছিল, হঠাৎ সেই বিকট হাসির রবে চমকিয়া উঠিয়া সে দৌড় দিল।

যাহা হউক, লোকটা আমাকে বলিল, "তোমাদের বজরা এবং লোকজন এতক্ষণ জলের নীচে বিশ্রাম করছে। সেখানে যাওয়ার চেয়ে, বোধ হয় আমাদের সঙ্গে যাওয়া মন্দ নয়। আর কে-ই বা তোমাকে সেখানে দিয়ে আসতে যাবে, কি বল?" বুঝিলাম, ডাকাতেরা আমাদের সঙ্গের লোকজনকে হত্যা করিয়া বজরা সমেত সমুদ্র-জলে ডুবাইয়া দিয়াছে।

প্রথম প্রথম আমার মনে খুব ভয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু যখন শুনিলাম যে ডাকাতেরা আমাদের বজরা ডুবাইয়া দিয়াছে, লোকজনদিগকেও হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে এবং যখন দেখিলাম যে, আমি সম্পূর্ণরূপে ইহাদের হাতেই পড়িয়াছি, তখন আমার ভয় একেবারে চলিয়া গেল। বিপদে পড়িবার ভয়েই লোকে ভয় পায়। কিন্তু বিপদের মধ্যে পড়িলে তখন আর সে ভয় থাকে না। আমারও তাহাই হইল। আমি রাগিয়া উঠিয়া বলিলাম, "জলে ডুবে

wapsip.com

মরতে হয় সেও ভাল, তবু আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না; চোর-ডাকাতের সঙ্গে একত্রে থাকার চেয়ে মরাও ভাল। নামিয়ে দাও তোমরা আমাকে এইখানেই।”

লোকটি আবার তেমনি বিকট করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং অন্যেরাও তাহার হাসিতে যোগ দিল। বলিল, “কোথায় নামবে এখানে? এ যে সুন্দরবন! এখানে জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ, সেকথা কি জান না? বিশ্বাস না হয়, ঐ দেখ”—এই বলিয়া সে কূলের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। আমি চাহিয়া দেখিলাম একটা বাঘ খালের তীরে আসিয়া জল পান করিতেছে। তখন ভাবিলাম, কথা তো মিথ্যা নয়! আমাকে ডাকাতেরা সুন্দরবনের মধ্যে লইয়া আসিয়াছে, এখানে এই ভয়ঙ্কর স্থানে কোথায় গিয়া আমি দাঁড়াইব? বুঝিলাম ইহাদের সঙ্গে জোর করিয়া লাভ নাই। বাধ্য হইয়াই আমাকে ইহাদের প্রস্তাবে রাজী হইতে হইল, সুতরাং আমি আর কোন কথা কহিলাম না। নীরবে সহিয়া নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলাম। সেই ছিপের উপর বসিয়া বসিয়া বাড়ির কথা, দাদামহাশয়ের কথা, মা-বাবার কথা, ভাইবোনের কথা—সমস্ত একে একে মনে উঠিতে লাগিল। তখন একবার মনে হইয়াছিল, কেন সকলের অবাধ্য হইয়া গঙ্গাসাগরে আসিয়াছিলাম? এই ঘটনার মূলই আমি। আমার জন্যই এতগুলি লোক ডাকাতের হাতে প্রাণ হারাইল। আমার চলাফেরা ভাবগতিক দেখিয়াই তো ডাকাতেরা ঠাহর পাইয়াছিল ; আমি না আসিলে তাহারা কোন সন্ধানই পাইত না। দাদামহাশয় সমস্ত রাত্রি কপিল মুনির মন্দিরে ছিলেন, ভোরবেলা নদীতীরে আসিয়া বজরা দেখিতে না পাইয়া তিনিই বা কি করিতেছেন? ডাকাতেরা সকলকে হত্যা করিল, আমাকে কেন হত্যা করিল না এবং কেনই বা আমাকে তাহারা লইয়া আসিল? এই সকল নানা চিন্তায় আমি একেবারে ডুবিয়া গেলাম। সেই সময় হঠাৎ একটা বিকট শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। সেই লোকটা বলিল, “ঐ শুনছো, এখানে নামবে? ঐ চেয়ে দেখ!” আমি কূলের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড বাঘ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বুঝিলাম সে বিকট রব আর কিছু নয়, এই বাঘেরই ডাক।

সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যে সেই খালে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া ছিপখানি এক স্থানে গিয়া লাগিল। আমরা সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র, পূর্বদিনের সেই বালকটি কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিল এবং চিরপরিচিতের ন্যায় আমাকে আসিয়া বলিল, “ভাই এসেছ, এই আমাদের বাড়ি!” আমি আশ্চর্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন, আমি যে আসব তুমি কি তা জানতে?” সে বলিল, “বাবা বলেছিল যে আমি যদি তার কথামত কাজ করি, তবে আমার খেলবার সাথী করবার জন্য তোমাকে এনে দেবে।”

সে যাহাই হউক, নৌকায় বসিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে ইহারা যেখানে গিয়া নৌকা রাখিবে, আমি সেইখান হইতে চলিয়া যাইব। কিন্তু পরে দেখিলাম এই অচেনা অজানা স্থানে, এই ভয়ঙ্কর সুন্দরবনের মধ্যে ইহারাই আমার একমাত্র আশ্রয়। ইহাদিগের নিকট হইতে পলাইতে চেষ্টা করা বৃথা এবং পলাইয়া যাইবই বা কোথায়? চারিদিকে হিংস্র জন্তুর ভয়। সেই দিন বিকালেই একটি ঘটনায় আমি প্রাণ হারাইতেছিলাম। বিকালে আমি ও সেই মগ বালকটি বেড়াইতে গিয়াছিলাম। একস্থানে দেখিলাম একরকম বনফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহারই একটি লইবার বড় ইচ্ছা হইল এবং আমি ধীরে ধীরে জলের কাছে গেলাম। একটি ফুল ধরিবার জন্য যেমন হাত বাড়াইতেছি, অমনি সেই মগ বালকটি একটা চিৎকার করিয়া উঠিল। আমি সেই চিৎকারে চমকিত হইয়া পা পিছলাইয়া জলে পড়িয়া গেলাম, জলের স্রোতে খানিকটা দূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিলাম, কিন্তু উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার

wapsip.com

হাত-পা একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। আমার সেই অবস্থা দেখিয়া আমার সঙ্গী দৌড়াইয়া আসিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং হাতে ধরিয়া আমাকে টানিয়া তীরে তুলিল।

আমি যখন ফুলটির প্রত্যাশায় জলের কাছে যাইতেছিলাম, তখন জঙ্গলের ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড বাঘ ও একটা প্রকাণ্ড কুমীর একই সময় আমাকে লক্ষ্য করিতেছিল। বাঘ যখন আমাকে ধরিবার জন্য লাফ দেয়, তখন আমার সঙ্গী বালক তাহা দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠে এবং আমি ঠিক সেই সময়েই জলের মধ্যে পড়িয়া যাই। এদিকে ঠিক যে সময় বাঘ লাফ দেয়, কুমীরও সেই সময় আমাকে ধরিতে আসে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় পা পিছ্লাইয়া জলে পড়িয়া যাওয়াতে আমি উভয়ের হাত হইতে রক্ষা পাই। বাঘটা লম্ফ দিয়া কোথায় আমাকে ধরিবে না কুমীরের মুখের মধ্যে পড়িয়া গেল!

মগ বালকটির সহিত অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমার খুব ভাব হইয়া গেল। কিসে আমি সুখী হইব, কি করিলে সুন্দরবনের সেই জঙ্গলবাসের কষ্ট আমার দূর হইবে, সে কেবল দিনরাত্রি সেই চেষ্টায় থাকিত। তাহার নাম ছিল মউংনু। আমি তাহাকে 'মনু' বলিয়া ডাকিতাম। মনুর মা-ও আমাকে আপনার ছেলের মত দেখিতেন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবহীন সেই জঙ্গলে যাহাতে আমি মায়ের অভাব না বুঝিতে পারি, তিনি প্রাণপণে সে চেষ্টা করিতেন।

সেই নিষ্ঠুর দস্যুদলের মধ্যে যে এমন দুইটি স্নেহমাখা কোমল হৃদয় আছে, তাহা আমি আগে বুঝিতে পারি নাই। এবং এমন যে থাকিতে পারে, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি নাই। বাস্তবিকই মনু ও তাহার মায়ের যত্ন, আদর স্নেহ ও ভালোবাসায় আমি কোন কষ্ট বা অভাবই বোধ করিতাম না। বাড়ির জন্য প্রথম প্রথম যে কষ্ট হইত, তাহাও যেন ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম।

মনু ছায়ার মত সর্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে; আমরা একত্রে খাই, একত্রে শয়ন করি, একত্রে বেড়াইতে যাই। মনুর বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ ছিল এবং সে আমার সমবয়স্ক ছিল। আমার বয়স তখন তেরো বৎসর। ইংরাজিতে আমি যে সকল বাঘ-ভালুকের গল্প পড়িয়াছিলাম, মনুকে তাহা বলিতাম, তাহা ছাড়া, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প তাকে শুনাইতাম। খেলা করা, গল্প করা এবং ক্ষুধার সময় খাওয়া ভিন্ন আমাদের আর কোন কাজ ছিল না। মনুও সুন্দরবনের বাঘ-ভালুকের অনেক গল্প আমাকে শুনাইত। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের গল্প তাহার কাছে সম্পূর্ণ নতুন ছিল। সে খুব আগ্রহের সহিত সেই সকল গল্প শুনিত। ক্রমে তাহার সেই সকল পড়িবার একটা আগ্রহ জন্মিল। আমারও ইচ্ছা হইল, তাহাকে লিখিতে পড়িতে শিখাই।

মনু একদিন তাহার বাবাকে গিয়া বলিল, "আমাকে বই এনে দাও, আমি লেখাপড়া শিখবো।" মনুর বাবা তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল এবং বলিল—" বাঙালীর ছেলেটা দেখছি তোকে একেবারে বাঙালী করে তুলেছে! লেখাপড়া শিখে তুই কি পণ্ডিতী রকমে ডাকাতি করবি নাকি? লেখাপড়া শিখলে তুই কি আর মানুষ থাকবি, ঐ বাঙালীর ছেলেদের মত ভীরু হয়ে যাবি, জুজু হয়ে থাকবি। কলম বাঙালীর ছেলের অস্ত্র, আমাদের অস্ত্র তীর-ধনুক, তলোয়ার-বন্দুক। বাঙালীর অস্ত্র কলমে বাঘ-ভালুকও শিকার করা যায় না, ডাকাতিও চলে না। যে বিদ্যে তোর কাজে লাগবে তুই তাই শেখ, অন্য বিদ্যে শিখে তোর দরকার নেই।" মনু ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিল, "তুমি জান না তাই ও-কথা বলছ, বইয়ে যে সকল বীর পুরুষদিগের কথা লেখা আছে, যে সকল যুদ্ধের কথা লেখা আছে, তা শুনেই আমার

wapsip.com

শরীর গরম হয়ে ওঠে, সে সব যদি নিজে পড়তে পারি, তবে তাতে আমার সাহস আরও বেড়ে যাবে। তোমরা ডাকাতি করো লুঠপাট করো, আমি রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো, আর তাদের হারিয়ে দিয়ে রাজা হবো।" কথাগুলি বলিবার সময় যেন মনুর শরীর উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। চক্ষু দিয়া যেন একটা তেজ বাহির হইতেছিল। মনুর বাবা তাহার কথায় একটু অবাক হইয়া গেল। আর কোন কথা না বলিয়া তাহাকে বিদায় করিল।

মনু আমার সমবয়স্ক হইলেও তাহার শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল। এত অল্প বয়সে এ প্রকার সাহসী বালক আমি এ পর্যন্ত দেখি নাই। তীর চালনা, তলোয়ার খেলা এবং বন্দুকের ব্যবহার সে এই বয়সেই সুন্দর শিখিয়াছে। তাহার সঙ্গে থাকিয়া আমারও সে সকল কিছু অভ্যাস হইয়াছিল।

সুন্দরবনে অনেক মধুর চাক জন্মে। সেই সকল চাক ভাঙিয়া মধু সংগ্রহ করা কতকগুলি লোকের ব্যবসায় আছে। আমাদেরও একদিন সখ হইল, একটি চাক ভাঙিব। খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটি চাকও পাইলাম। কিন্তু কাছে গিয়া দেখি, তাহাতে এত মৌমাছি বসিয়া আছে যে, একবার যদি তাহারা টের পায়, তাহা হইলে আমাদের চাক ভাঙার সখ মিটাইবে। সুতরাং আমাদের চাক ভাঙা হইল না। আমরা দুঃখিত মনে বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় একটা হরিণ দেখিতে পাইলাম। আমরা যখনই বাড়ির বাহির হইতাম, তখনই তীরধনুক ও বন্দুক লইয়া বাহির হইতাম, কেননা কখন কোন্ বিপদে পড়ি তাহার ঠিকানা নাই। হরিণটা দেখিয়া মনু বলিল, "বেশ হয়েছে, শুধু-হাতে আর বাড়ি ফিরতে হল না। কিন্তু এখান থেকে হরিণটাকে মারবার সুবিধা হবে না, মাঝখানে ঐ একটা ঝোপ রয়েছে। খুব পা টিপে টিপে আমার পেছনে পেছনে এসো, একটু ঘুরে গেলে বেশ সুবিধা পাওয়া যাবে?" মনুর কথামত আমি তাহার পিছনে চলিলাম। কিন্তু একটু যাইয়াই মনু থমকিয়া দাঁড়াইল। আমি হরিণটার দিকে চাহিতে চাহিতে চলিতেছিলাম, একেবারে মনুর গায়ের উপর গিয়া পড়িলাম।

সে আমার গা টিপিয়া কানে কানে বলিল, "চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। এক চুলও নড়ো না কথাও কয়ো না, ঐ দেখ।" মনু হাত বাড়াইয়া সম্মুখের দিকে দেখাইয়া দিল। চাহিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দেখিলাম, আমাদের সম্মুখে ৮/১০ হাত দূরে একটা মাটির ঢিবির কোলে একটা বাঘ ঐ হরিণটাকে লক্ষ্য করিয়া আড়ি পাতিয়াছে। আমার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা হয়ত চিৎকার করিয়াই উঠিতাম। তাহা হইলে আমাদের যে দশা হইত তাহা তো বুঝিতেই পারিতেছ। মনুর দেখিলাম অসীম সাহস, সে এক হাতে আমাকে এবং আর এক হাতে বন্দুকটি লইয়া স্থির হইয়া একদৃষ্টে বাঘের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বোধ হইল, তাহার নিঃশ্বাসও পড়িতেছে না। বাঘটা প্রকাণ্ড, অত বড় একটা জানোয়ার চলিতেছে, অথচ একটুও শব্দ হইতেছে না। এও বড় আশ্চর্য বোধ হইল। পরে জানিতে পারিলাম যে, কিজন্য ইহারা এত নিঃশব্দে চলিতে পারে। বিড়ালের পায়ের পাতার গঠন তোমরা দেখিয়া থাকিবে, ইহাদের পাও ঠিক সেইরকম, ইহাদের আঙুলের মাথায় খুব তীক্ষ্ণ নখ আছে, আবশ্যক মত এই নখ বাহির হয় এবং অন্য সময়ে ইহা কচ্ছপের শুঁড়ের ন্যায় ভিতরে ঢুকিয়া থাকে, তখন পায়ের পাতাটি বেশ গদির মত হয়। সুতরাং হাঁটিবার সময় কিছুমাত্র শব্দ হয় না। সে যাহাই হউক, বাঘ আড়ি পাতিয়া এক লাফে গিয়া হরিণটার উপর পড়িল এবং তাহার সম্মুখের পায়ের এক আঘাতেই হরিণটার ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিল, তারপর তাহাকে লইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল । আমরাও প্রাণ লইয়া সে যাত্রায় বাড়ি ফিরিলাম।

wapsip.com

আর একদিন একটা বাঘ ভারি জব্দ হইয়াছিল। তাহার যে দুর্দশা হইয়াছিল, বলি শুন। বাঘ সুন্দরবনের বলিলেই হয়, কিন্তু সুন্দরবনের মহিষগুলিও বড় ভয়ঙ্কর, অত বড় ও বলবান মহিষ অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বাঘে-মহিষে সুন্দরবনে প্রায়ই লড়াই হয়। কখনও বাঘের জিৎ হয়, কখনও বা মহিষকে জিতিতে দেখা গিয়া থাকে। সে যাহাই হউক, একদিন একটা মহিষের বাচ্চা চরিতে চরিতে বাথান হইতে একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। একটা বাঘ বেচারাকে দেখিয়া লোভ সামলাইতে না পারিয়া, যেমন তাহাকে ধরিবার জন্য লাফ দিতে যাইবে, এমন সময় বাচ্চাটি তাহা দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই শব্দে একেবারে ছয় সাতটা মহিষ সেইদিকে দৌড়িয়া আসিল। বাঘ তখন আর পালাইবার অবসরটুকুও পাইল না। সেই ছয়-সাতটা মহিষে মিলিয়া শিং এবং পায়ের আঘাতে বাঘটাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া মারিয়া ফেলিল।

কয়েকদিন ধরিয়া একটা বাঘ আমাদের বাড়ির কাছে ভারি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। রাত্রিতে তাহার ভয়ে আমাদিগকে শশব্যস্ত থাকিতে হয়। কখনও ঘরের আনাচে কানাচে কোন ছোট জন্তুর উপর লাফাইয়া পড়িতেছে, কখনও উঠানের উপর দাঁড়াইয়া ডাক ছাড়িতেছে। সকালে উঠিয়া প্রতিদিনই দেখিতে পাই—এখানে একটা হরিণের মাথা, ওখানে দুটো শুয়োরের দাঁত, কোথাও বা খানিকটা মহিষের পা। দিনকতক বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বাঘটাকে মারিবার জন্য খুব চেষ্টা হইতে লাগিল। তীর-ধনুক ও বন্দুক লইয়া সকলে ফিরিতে লাগিলাম, কিন্তু সে এত সতর্কভাবে চলাফেরা করিত যে, কোনমতেই তাহাকে মারিতে পারা গেল না। একদিন এক ঝোপের কাছ দিয়া আমরা যাইতেছি, এমন সময় ঝোপের আড়ালে পায়ের শব্দ পাইয়া মনে করিলাম, বোধ হয় বাঘ যাইতেছে। বন্দুক ভরাই ছিল। ঠিক করিয়া হাতে লইয়া ঝোপের ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে গেলাম; কিন্তু দেখিলাম—বাঘ নয়, একটা গণ্ডার। যথা লাভ, আর গণ্ডারও বড় সাধারণ শিকার নয়—গণ্ডার গণ্ডারই সই। মনু বলিল, "খুব আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে এসো, একটু ঘুরে গিয়ে গুলি করতে হবে।" আমি দেখিলাম, সেই ঝোপের আড়াল থেকে গুলি করাই সুবিধা। আমরা গণ্ডারটিকে বেশ দেখিতে পাইতেছি; অথচ সে আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছে না। কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, নির্বিঘ্নে গুলি করা যাইবে। মনুকে সে কথা বলায় সে বলিল, "সে কি। তুমি কি জান না যে গণ্ডারের চামড়া এত পুরু যে তাতে গুলি বসে না? এখান থেকে ওর শরীরের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে, গুলি করলে সে গুলি ওর গায়ে বসবে না, অথচ বন্দুকের আওয়াজে শিকার পালাবে। গণ্ডারকে মারতে হলে ওর নাকের ভেতর দিয়ে গুলি করতে হবে। কাজেই ঘুরে সমুখদিকে না গেলে ওকে মারতে পারা যাবে না।" এই বলিয়া মনু আগে আগে চলিল। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম এবং এমন একটি জায়গায় গিয়া দাঁড়াইলাম, যেখান থেকে গণ্ডারের নাকটি বেশ লক্ষ্য হয়। তখন মনু আমাকে গুলি করিতে বলিল। অত বড় একটা জানোয়ার শিকার করিয়া একটু যশলাভ করিবার আশা আমার না হইয়াছিল তা নয়, কিন্তু আমার হাত তখনও খুব সই হয় নাই। বিশেষত অত বড় শরীরটার সমস্তই বাদ দিয়া কোথায় নাকের একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র, সেইখানে গুলি করিতে হইবে, কাজেই আমি রাজী হইলাম না। তখন মনু বলিল, "তবে বন্দুকটা ঠিক করে দাঁড়াও, যদি গুলি নাকে না লাগে আর আমাদের দিকে রোখ করে আসে, তবে আর রক্ষে থাকবে না।" এই বলিয়া সে বন্দুক সই করিল। গণ্ডারটা চোখ বুজিয়াছিল, আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই। আমরা মনে করিলাম, ভারি সুবিধাই হইয়াছে। গণ্ডারটা আমাদের দেখিতে পায় নাই বটে, কিন্তু তাহার শরীরের উপর গোটাকতক পাখি বসিয়াছিল,

wapsip.com

তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া ভারি ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। শেষে ডাকাডাকি ছাড়িয়া গণ্ডারটার চোখেমুখে পাখার ঝাপটা মারিতে লাগিল। ঝাপটা খাইয়া গণ্ডারটা তখন চোখ খুলিল। চোখ খুলিয়াই আমাদিগকে দেখিয়া ভোঁ-দৌড়। মনু যদিও ঠিক সেই সময়েই বন্দুকের ঘোড়া টানিয়াছিল, কিন্তু গুলি সে পর্যন্ত পৌঁছিতে না পৌঁছিতে গণ্ডারটা সরিয়া যাওয়ায়, গুলিও লাগিল না, শিকারও পলাইল। বেলা তখন অনেক হইয়াছে, কাজেই সেদিনকার মত আমাদের বাড়ি ফিরিতে হইল।

বাড়ি ফিরিয়া গেলে মনুর বাবা জিজ্ঞাসা করিল, "কি, আজ কি শিকার করলে"? আমরা সকল ঘটনা তাহাকে বলিলাম এবং এমন শিকারটা পাখিগুলোর জ্বালায় হাতছাড়া হইল বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলাম। মনুর বাবা সেই কথা শুনিয়া বলিল, "আমার প্রায়ই হয়। কেবল গণ্ডার কেন, পাখির জ্বালায় অনেক শিকারই ঐ রকম করে হাতছাড়া হয়। গণ্ডারের গায়ে এক রকম খুব ছোট ছোট কীট আছে তারা গণ্ডারকে বড় যাতনা দেয়। পাখিরা সেই কীট ঠোঁট দিয়ে খুঁটেখুঁটে খায়, এতে গণ্ডারেরও উপকার হয়, তাদেরও পেট ভরে। শুধু শরীরের নয়, নাকের মধ্যে, চোখের কোণে, কানের বা মুখের ভেতর হতেও এরা ঐ কীট খুঁটে খুঁটে বার করে। চোখ বা কান প্রভৃতি নরম জায়গা থেকে কীট বার করবার সময় গণ্ডারদের সময় সময় বেশ একটু যাতনা পেতে হয়। কিন্তু কীটের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা সে কষ্ট সহ্য করে থাকে। এই পাখিরা যে কেবল কীটের হাত থেকেই গণ্ডারকে রক্ষা করে তা নয়, মানুষের হাত থেকেও এদের রক্ষা করে। যখনই গণ্ডারের কোন বিপদ দেখে, তখনই এরা খুব চীৎকার আরম্ভ করে এবং তাতেই গণ্ডারের হুঁশ হয়—গণ্ডার তখন বিপদ বুঝতে পেরে পালায়।

"গোরু-মহিষ প্রভৃতির গায়ে ও মাথায় বসে একরকম পাখিকে তোমরা ঠোকরাতে দেখে থাকবে। তাদেরও ঐ কাজ। গোরু বা মহিষের গায়েও একরকম কীট আছে, তারা এদের বড় কষ্ট দেয়, পাখিরা ঐ সকল কীট ঠুকরে খায় এবং কোন বিপদের আশঙ্কা দেখলে তারা ঐরকম করে গোরু, মহিষ প্রভৃতিকে সতর্ক করে দেয়।"

"এ তো গেল গোরু, মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতির কথা। পাখিদের ঠোকরানিতে ওরা ব্যথা পেলেও তাদের কিছু বলে না। আর কিছু করবার ক্ষমতাও তাদের বড় একটা নেই। পিঠের ওপর বেশ ঠোকরাচ্ছে, ব্যথা পেলে বড় জোর একবার শিং নাড়া দেবে, আর তখনি পাখিরা উড়ে সরে যায়, শিং নাড়াই সার। যেখানে বিপদের বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে, সেখানেও পাখিদের খুব যেতে দেখা যায়। একবার আমি দেখলাম জলার ধারে একটা প্রকাণ্ড কুমীর চোখ বুজে হাঁ করে বেশ স্থিরভাবে পড়ে আছে। আমি মনে করলাম, বেশ সুবিধাই হয়েছে—হাঁ করে আছে, ঠিক মুখের ভেতর গুলিটি চলিয়ে দিলেই কাজ হবে। এই ভেবে যেমন বন্দুক তুলেছি অমনি কতকগুলো পাখি ভারি ডাকাডাকি আরম্ভ করলো। কুমীরটা সেই ডাকে চোখ খুলেই মুহূর্তের মধ্যে জলে লাফিয়ে পড়লে। আমার আর গুলি করা হল না। কুমীরের দাঁতের ভেতর একরকম কীট জন্মায়, সেই কীটের জ্বালায় দাঁতের গোড়া ফুলে কুমীরকে এক এক সময় ভারি কষ্ট পেতে হয়। তাই প্রায়ই সন্ধ্যার আগে দেখতে পাওয়া যায় যে, জলের ধারে কুমীর হাঁ করে পড়ে আছে আর এক জাতীয় পাখি নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে তার সেই মুখের ভেতর গিয়ে দাঁতের ভেতর থেকে পোকাগুলো খুঁটেখুঁটে বার করছে। এমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে। কুমীর হাঁ করেই আছে, পাখিরাও ঘুরে ফিরে পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কুমীর বিলক্ষণ হিংস্র জন্তু, যখন হাঁ করে থাকে, তখন এক-একবারে চার-পাঁচটারও

wapsip.com

বেশি পাখি তাদের মুখের মধ্যে যায়। ইচ্ছা করলে একবার মুখ বন্ধ করলেই পাখিগুলো উদরসাৎ হয়। কিন্তু যারা তাদের এত উপকার করে দাঁতের পোকা ভাল করে, তাদের সঙ্গে তারা এমন অধর্ম করে না। তবে কখনও কখনও এমন হয় যে, খুব বেশিক্ষণ হাঁ করে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে হয়ত হঠাৎ মুখ বন্ধ করে বসে। তখন যদি কোন পাখি বেরুতে না পেরে মুখের ভেতর থেকে যায়, তবে সে এমন জোরে ঠোঁট দিয়ে মুখের ভেতরে আঘাত করতে থাকে যে, কুমীরকে বাপের সুপুত্তুর হয়ে তখনই আবার হাঁ করতে হয়।”

সে যাহা হউক, কথায় কথায় আমরা আসল কথাই ভুলিয়া গিয়াছি, বাঘটা তো এ পর্যন্ত কোন মতেই মারা পড়িল না। কিন্তু একদিন ভারি মজা হইল। সকালবেলা বাঘের ভয়ানক ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল, আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। উঠিয়া শুনিলাম, মনুর বাবা বলিতেছে, “আপদ ঢুকেছে, বাঘ ফাঁদে পড়েছে।”' তখন আর বিলম্ব না করিয়া তীর-ধনুক, বন্দুক ও লাঠি প্রভৃতি লইয়া সকলেই বাহির হইয়া পড়িল। আমরাও সঙ্গে গেলাম। বাঘটাকে মারিবার জন্য যেমন সকলে বন্দুক ও তীর-ধনুক লইয়া বেড়াইত, তেমনি এক জায়গায় জাল দিয়া একটা ফাঁদও পাতিয়া রাখা হইয়াছিল। অনেক সময় এই সকল ফাঁদে বাঘ ধরা পড়ে। আমরা গিয়া দেখিলাম, আমাদের সেই জালে বাঘটা ধরা পড়িয়া ভয়ানক তর্জন-গর্জন করিতেছে এবং জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইবার জন্য ভারি লম্ফঝম্ফ করিতেছে। কিন্তু বড় বেশিক্ষণ লম্ফঝম্প করিতে হইল না। জালের মধ্যে অধিকক্ষণ রাখাটা নিরাপদ নয় বলিয়া তখনই গুলি করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলা হইল।

কিছুকাল পরে মনু একদিন আমায় চুপি চুপি বলিল—চলো, আজ শিকারে যাওয়া যাক—

বলিলাম—কোথায়?

সে বলিল—সেখের ট্যাকে।

—সে আবার কোথায়?

—চলো দেখাবো।

একদিন দুপুরের আগে আহারাদি সারিয়া দুজনেই রওনা হইলাম। উহাদের বাড়িতে ভাত খাইতে আমার প্রথম প্রথম বড়ই অসুবিধা হইত। মনুকে বলি—কি রে এটা?

ও বলে—শুঁট্‌কি মাছ।

—পারবো না খেতে। কখনও না।

—কেন?

—অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে যে রে!

—দু'পাঁচ দিন খেতে খেতে ভালো লাগবে দেখো।

—হ্যাঁ, তা আবার কখনও লাগে?

—আচ্ছা দেখে নিও।

সেই থেকে মাস দুই কাটে। শুঁটকি মাছে আর দুর্গন্ধ পাই না। মন্দ লাগে না ও জিনিসটা আজকাল। মনুর কথাই ঠিক।

মনুদের বাড়ির নীচে ছোট্ট একটা খাল। এই খালের ধারে ছিল একটা ডিঙি বাঁধা। দুজনে ডিঙিতে গিয়ে তো উঠলাম। খানিক পরে আর একজন ছেলে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহার নাম নিবারণ মাঝি। মনুদের নৌকা চালায় যে মাঝি তাহারই ছেলে। সে খুব ভালো নৌকা চালায় বলিয়াই তাহাকে লওয়া হইল।

wapsip.com

একটা জিনিস দেখিলাম। নিবারণ একটা থলিতে অনেক চিঁড়ামুড়ি আনিয়াছে। এত চিঁড়ামুড়ি আনার কারণ কি বোঝা তখন যায় নাই বটে, কিন্তু বেশি দেরিও হয় নাই। বুঝিতে।

খালের পাশে কেওড়া ও গোলপাতা বনের গায়ে ছলাৎ ছলাৎ করিয়া জোয়ারের জল লাগিতেছে। রোদ পড়িয়া চক্‌চক্ করিতেছে নদীজল। ঘন নিবিড় অরণ্যের বন্যবৃক্ষের গুঁড়িতে গুঁড়িতে জলের কম্পমান স্রোতধারার ছায়া।

আমার মনে চমৎকার একটা আনন্দ। মুক্তির একটা আনন্দ—যাহার ঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারিব না। দাদামশায়ের সঙ্গে সুন্দরবনে না আসিলে এ আনন্দ পাইতাম কি? ছিলাম ক্ষুদ্র গৃহকোণে আবদ্ধ তেরো বছরের বালক। বিশাল পৃথিবীর বুকে যে কত আনন্দ, কি যে তাহার মুক্তিরূপা মহিমা, আমার কাছে ছিল অজানা। নিবারণ অনেক দূরে লইয়া আসিয়াছে, বনের প্রকৃতি এখানে একটু অন্যরকম। বনের দিকে চাহিয়া দেখি একটা গাছে অনেক বাতাবী লেবু ফলিয়া আছে—ডাঙার খুব কাছে।

বলিলাম—নিবারণ, নিবারণ, থামাও না ভাই। ওই দেখো—

নিবারণ ডিঙি ভালো করিয়া না থামাইয়াই ডাঙার দিতে চাহিয়া বলিল—কি?

—ওই দেখো। পাকা বাতাবী লেবু!

—না বাবু।

—ওই যে, দেখো না! মনু, চেয়ে দেখ ভাই—

নিবারণ হাসিয়া বলিল—একটা খেয়ে দেখবে বাবু?

—কেন?

—ওকে বলে 'পশুর' ফল। পাখিতে খায়। মানুষের খাবার লোভে গাছে থাকতো?

মনুও হাসিয়া নিবারণের কথায় সায় দিল।

খালের মুখ গিয়া একটা বড় নদীতে পড়িল—তাহার অপর পাড় দেখা যায় না। এইবার আমাদের ডিঙি সামনের এই বড় নদীতে পড়িবে। নদীর চেহারা দেখিয়া আমার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। এত ঢেউ কেন এ নদীতে?

বলিলাম—এ কি নদী ভাই?

নিবারণ এ অঞ্চলের অনেক খবর রাখে। সে বলিল—পশোর নদী। খুলনা জেলার বিখ্যাত নদী। হাঙর-কুমীরে ভরা। শিবসা আর পশোর যেখানে মিশেছে, সে জায়গা দেখলে তো তোমার দাঁত লেগে যাবে ভাই।

—খুব বড়?

—সাগরের মত। চলো সেখানে একটা জিনিস আছে, একদিন নিয়ে যাবো।

—কি জিনিস?

—এখন বলবো না। আগে সেখানে নিয়ে যাবো একদিন। এইবার পশোর নদীতে আমাদের ডিঙি পড়িয়া কূল হইতে ক্রমশ দূরে চলিল। খানিকটা গিয়া হঠাৎ নিবরণ দাঁড় ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বহুদূর ওপারের দিকে চাহিয়া বলিল—কি ওটা?

মনু বলিল—কই কি?

—ওই দেখো। একটু একটু দেখা যাচ্ছে।

ভালো দেখা গেল না কি?

—কি জিনিস ওটা?

আমিও ততক্ষণে ডিঙির ওপর দাঁড়াইয়া উঠিয়াছি। ভাল করিয়া চাহিলাম বটে, কিন্তু

wapsip.com

কিছু দেখা গেল না। নিবারণ নদীতে পাড়ি দিতে দিতে প্রায় মাঝখানে আসিল। এবার বেশ দেখা যাইতেছিল ব্যাপারটা কি। এক পাল হরিণ কেওড়াবনে জলের ধারে চরিতেছে। একটা হরিণ কেওড়া গাছের গুঁড়ির গায়ে সামনের দুই পা দিয়া উঁচু হইয়া গাছের ডালের কচিপাতা চর্বণ করিতেছে। কি সুন্দর ছবিটা! নিবারণ মনুকে বলিল—ভাই, আজ যাত্রা ভালো। ওই হরিণের পালের মধ্যে একটা মারা পড়বে না? এক-একটাতে এক মণ মাংস। দু'মণ মাংসওয়ালা হরিণও ওর মধ্যে আছে।

মনু বলিল—চলো।

নিবারণ বলিল—শক্ত করে হাল ধরতে যদি না সাহস কর, তবে তুমি দাঁড় নাও। এর নাম পশোর নদী। খুব সাবধান এখানে।

আমি সভয়ে বলিলাম—দে মনু, ওর হাতে হাল।

মনু নির্ভয়ে কণ্ঠে বলিল—মগের ছেলে অত ভয় করে না। হাল ধরতে পারবো না তো কি? খুব পারবো। টানো দাঁড়।

অত বড় নদীতে পাড়ি দিতে অনেকক্ষণ লাগিল। আমরা যেখানে নামিলাম, সে জায়গাটা একেবারে জনহীন অরণ্য, একটু দূরে একটা ছোট খাল জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়াছে, তীরে গোলপাতা ও বেতের ঝোপ।

কোথায় হরিণ! সব সরিয়া পড়িয়াছে!

মনু ছাড়িবার পাত্র নয়। সে নৌকা থামাইয়া আমাদের সঙ্গে করিয়া ডাঙায় নামিল। বলিল—চলো, জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে দেখি—

নিবারণ হরিণের পায়ের দাগ অনুসরণ করিয়া অনেকদূর লইয়া চলিল আমাদের। এক জায়গায় কি একটা সরু ছুঁচালো জিনিস আমার পায়ে ঢুকিয়া যাইতেই আমি বসিয়া পড়িলাম। ভয় হইল সাপে কামড়ায় নাই তো?

নিবারণ ছুটিয়া আসিয়া আমাকে তুলিয়া দাঁড় করাইল। বলিল—এঃ রক্ত পড়ছে যে? শূলো ফুটেছে দেখছি—সাবধানে যেতে হয় জঙ্গলের মধ্যে—

—শূলো কি?

—গাছের শেকড় উঁচু হয়ে থাকে কাদার ওপরে। তাকে শূলো বলে।

মনু বলিল—আমার বলতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। শূলোর জন্যে একটু সাবধানে হেঁটো জঙ্গলে।

জঙ্গলের শোভা সে স্থানটিকে মনোহর করিয়াছে। কেওড়া ও গরান গাছের মাথায় একরকম কি লতার বেগুনি ফুল। বড় গাছে এক প্রকারের সাদা ফুল জেয়ারের জলে নামিয়া শূলোর দল কাদার উপর মাথা তুলিয়া সারবন্দী বর্শার ফলার মত খাড়া হইয়া আছে। কুস্বরে কি একটা পাখি ডাকিতেছে গাছের মগডালে।

নিবারণ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—দাঁড়াও না? মাছজটা ডাকছে, নিকটে বাঘ আছে কোথাও, ওরা হরিণদের জানিয়ে দেয় ডাক দিয়ে। ভারি চালাক পাখি।

মনু বলিল—বাঘ নয়। মানুষ-বাঘা, মানে আমরা।

—তাও হতে পরে। এ ত্রিসীমানায় হরিণ থাকবে না আর।

আমি বিস্ময়ের সুরে বলিলাম—সত্যি?

নিবারণ বলিল—দেখো। ও আমার কতবার পরখ করা। এ-সব বনে নানা অদ্ভুত জিনিস আছে। এক রকম গুবরে পোকা আছে, তাদের গা অন্ধকারে জ্বলে। হাঙুরে শিঙি মাছ আছে,

wapsip.com

কাঁটা হেনে তোমার সমস্ত শরীর অবশ করে দেবে।

নিবারণের কথাই ঠিক। আমরা খালের পাড় পর্যন্ত খোঁজ করিয়াও হরিণের দলের কোন সন্ধানই পাইলাম না। এক জায়গায় কাদার উপর মোটা কাঠের গুঁড়ি টানিয়া লইয়া যাইবার দাগ দেখিতে পাইয়া নিবারণ মনু একসঙ্গেই ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—ওরে বাবা!—এ কি?

চাহিয়া দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম—কি এটা?

নিবারণ বলিল—বড় অজগর সাপ এখান দিয়ে চলে গিয়েছে, এটা তারই দাগ। একটু সাবধানে থাকবে সবাই—অজগর বড় ভয়ানক জিনিস। একবার ধরলে ওর হাত থেকে আর নিস্তার নেই। বলিতে বলিতে একটা কেওড়া গাছের দিকে উত্তেজিত ভাবে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিতে লাগিল—ওই দেখো—চট করে এসো—

দেখি, এক বিরাটকায় সর্প কেওড়া গাছের ডালে লেজ জড়াইয়া নিশ্চলভাবে খালের জলের হাতচারেক উপরে ঝুলিয়া আছে। সর্পের গায়ের রং গাছের ডালের রঙের সঙ্গে মিশিয়া এমন হইয়া গিয়াছে যে সর্পদেহকে মোটা ডাল বলিয়া ভ্রম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। নিশ্চল হইয়া থাকার দরুন এ ভ্রম না হইয়া উপায় নাই।

আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম, নিবারণ বলিল—আস্তে, একদম চুপ—

—কি?

—দেখো না—চুপ—

আমরা গাছের গুঁড়ির আড়ালে নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়াইয়া। নিবারণ আমাদের আগের দিকে। কি হয় কি হয় অবস্থা! মনু হয়তো কিছু বোঝে, আমি নতুন লোক কিছুই বুঝি না ব্যাপার কি। ঘণ্টাখানেক এইভাবে কাটিল। আমি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। কতক্ষণ এভাবে থাকা যায়। কেনই বা এখানে খাড়া হইয়া আছি কাঠের পুতুলের মত? সর্পদেহও আমাদের মত নিশ্চল। গাছের ডাল নড়ে তো সাপ নড়ে না। এমন সময়ে এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। আজও সে ছবি আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

একটা বড় শিঙেল হরিণ বেতঝোপের পিছন হতে সন্তর্পণে খালের দিকে আসিতে লাগিল। বেতঝোপের ডানদিকে একটা ছোট হেঁতাল গাছ; তারপরই বড় গাছটা, যাহার ডালে সর্প ঝুলিতেছে। হরিণটা একবার আসে, শুকনো পাতার মচ্‌মচ্ শব্দ হয়, আবার খানিকটা দাঁড়ায়, আবার কি শোনে, আর একটু আসে। সর্পের ধ্যানমগ্ন অবস্থা—সে কি হরিণটা দেখিতে পায় নাই? নড়ে না তো? হরিণটা এইবার আসিয়া খালের কাদা পার হইয়া জলে নামিয়া চকিতে একবার এদিক ওদিক চাহিয়া জলে মুখ দিল। জল খানিকটা পানও করিল। যেখানে হরিণ জলপানরত, সর্পের দূরত্ব সেস্থান হইতে দু'হাতের বেশি। হঠাৎ সর্পের ধ্যান ভাঙিয়া গেল। বিদ্যুতের চেয়েও বেশি বেগে সেই বিশালদেহ অজগর দেহ লম্বা করিয়া দিয়া হরিণের ঘাড় কামড়াইয়া ধরিতেই হরিণ আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর সব চুপ। সাপটা ডাল হইতে নিজের দেহ ছাড়াইয়া ক্রমে ক্রমে হরিণের সমস্ত দেহ জড়াইয়া প্যাঁচের উপর প্যাঁচ দিতে লাগিল। খানিকটা পরে হরিণের শিং আর পা দুটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। গলাটা বোধ হয় প্রথমেই চাপিয়াছিল।

মনু ইসারা করিয়া জানাইল সে তীর ছুঁড়িবে কিনা।

নিবারণ ইঙ্গিতে বারণ করিল।

সাপ তখন হরিণের দেহটাকে পায়ের দিক হইতে গিলিতে শুরু করিয়াছে। অজস্র

wapsip.com

লালারস সর্পের মুখবিবর হইতে নিঃসৃত হইয়া হরিণের সর্বদেহ সিক্ত হইতেছে, স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। যখন পা দু'খানা সম্পূর্ণ গেলা হইয়া গিয়াছে, তখন নিবারণ প্রথম কথা কহিয়া বলিল—ব্যাস্! এইবার সবাই কথা বলো—

আমি বলিলাম—বলবো?

—কোন ভয় নেই, বলো।

চোখের সামনে এই ভীষণ দৃশ্য ঘটিতেছে, বিস্ময়ে ও ভয়ে কেমন হইয়া গিয়াছি দুজনেই। অত সাহসী মগ বালক মনুর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, চোখে অদ্ভুত বিস্ময়ের দৃষ্টি। সে প্রথম কথা বলিল—পালাই চলো।

নিবারণ বলিল—পালানোর দরকার ছিল বরং আগে। এখন আর কি।

আমি বলিলাম—কেন?

—ও সাপ যদি আগে আমাদের টের পেতো তবে ডালের প্যাঁচ খুলে আমাদের আক্রমণ করবার চেষ্টা করতো—এখন ওর নড়ন-চড়ন বন্ধ, শিকার গিলছে যে।

—তাহলে আমরা ওকে শেষ করে দিই?

মনু ও নিবারণ দুইজনে হাসিয়া উঠিল। নিবারণ বলিল—অত সোজা নয়।

বলিলাম—কেন, তীর ছুঁড়ে?

—ছুঁড়ে দেখতে পারো। কিছুই হবে না। দু-একটা তীরের কর্ম নয়। অজগর শিকার।

—তবে?

—ওর অন্য উপায় আছে। এখন শুধু দেখে যাও।

দেখব আর কি সে বীভৎস দৃশ্য! অত বড় শিঙেল হরিণের প্রায় সমস্তটা অজগর গিলিয়া ফেলিয়াছে, কেবল মুখ আর শিং দুইটা বাদে। কিছুক্ষণ পরে মনে হইল একটা বিশালকায় শিংওয়ালা অজগর জলের ধারে হেঁতাল গাছের নীচে শুইয়া আছে। চার ঘণ্টা লাগিল সমস্ত ব্যাপারটা ঘটিতে। আমরা আসিয়া আমাদের ডিঙিতে চড়িলাম। বেলা বেশি নাই। নিবারণ ডিঙি ছাড়িল। পশোর নদীতে জোয়ার আসিতেছে। একটু একটু বাতাস উঠিতেছে দেখিয়া মনু বলিল—সাবধান—সাবধান—

নিবারণ বলিল—জোর করে হাল ধরো।

আমি বলিলাম—কেন, কি হয়েছে?

—কিছু না। সাবধান থেকো।

—কিসের ভয়

—পরে সেকথা হবে।

বেশি দূর যাইতে না যাইতেই নিবারণের কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। জোয়ার বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মাঝনদীতে জোরে হাওয়া উঠিল। এক-একটা ঢেউয়ের আকার দেখিয়া আমার মুখ শুকাইয়া গেল, বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল। সে কি ঢেউ! ঢেউ যে অত বড় হয়, তাহা কি করিয়া জানিব? সমুদ্রে বড় ঢেউ হয় শুনিয়াছি কিন্তু এ তো নদী, এখানে এমন ঢেউ? আমাদের ডিঙি দুই পাশের পর্বত-প্রমাণ ঢেউয়ের খোলের মধ্যে একবার একবার পড়িতে লাগিল, আবার খানিকক্ষণ বেশ যায়, আবার ঢেউয়ের পাহাড় উত্তাল হইয়া উঠে।

মনুর দেখিলাম ভয় হইয়াছে। বলিল—নিবারণ!

—কি?

—তুমি হালে এসো—

—এখন দাঁড় ছেড়ে দিলে ডিঙি বানচাল হয়ে যাবে।

wapsip.com

—তুমি এসো, আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে!

—ঠিক থাকো। বাঁয়ে চাপো।

—কতটা আছে?

—কি জানি, ডাঙা দেখা যায় না। তুমি বসে থেকো না, দাঁড়িয়ে উঠে হাল ধরো। বসে হাল ধরলে জোর পাবে না।

আমার এসময় হঠাৎ একরকম মরিয়ার সাহস জোগাইল। যদি ওরা বিপন্ন হয়, তবে আমার কি উচিত নয় এদের সাহায্য করা?

বলিলাম—নিবারণ, ও নিবারণ!

সে বিরক্ত হইয়া বলিল—কি?

—আমি তোমার হয়ে বাইবো?

—যেখানে বসে আছ বসে থাকো। মরবে?

—তোমাদের সাহায্য করবো।

—আবার বক্-বক্ বকে? দেখছো না নৌকোর অবস্থা?

—দেখেই তো বলছি।

—কোন কথা বলবে না।

এবার বিশালকায় পশোর উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। এমন দৃশ্য কখনও দেখিনি। ডিঙির ডাইনে বাঁয়ে আর কিছু দেখা যায় না, শুধু পাহাড়ের মত ঢেউ, জলের পাহাড়। সেই পাহাড়ের জলময় অধিত্যকায় আমাদের ডিঙিখানা মোচার খোলার মত দুলিতেছে, নাচিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, নাকানি-চুবানি খাইতেছে।

একবার বোঁ করিয়া ডিঙিখানা ঘুরিয়া গেল।

নিবারণ চীৎকার করিয়া উঠিল—সামাল! সামাল!

ডিঙি একধারে কাত হইয়া ছপাৎ করিয়া বড় এক ঝলক জল উঠিয়া পড়িল ডিঙির খোলে। নিবারণ আমাকে হাঁকিয়া বলিল—ডান দিকে চেপে—

কি করিতেছি না বুঝিয়া ডান দিকেই চাপ দিতেই ডিঙি সেদিকে ভীষণ কাত হইয়া গেল। বোধ হয় ডিঙি উপুড় হইয়া পড়িত, নিবারণ দাঁড় দিয়া এক হাঁচ্‌কা টান দিতে ডিঙি খানিকটা সোজা হইল।

নিবারণ বলিল—জল ছেঁচতে হবে বাবু, পারবে?

বলিলাম—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু খুব সাবধানে। একটু টলে গেলেই নদীতে ডুবে মরবে।

—ঠিক আছে।

—সেঁউতি খুঁজে বার করো সাবধানে। খোলের মধ্যে আছে। মনু ভাই, সামলে—বাঁয়ে কসো। আমি সেঁউতি খুঁজিতে উপুড় হইয়া খোলের মধ্যে মুখ দিতে গিয়াছি, এমন সময় পিছন হইতে কে যেন আমায় এক প্রবল ধাক্কা দিয়া একেবারে খোলের মধ্যে আমাকে চাপিয়া ধরিল। আর একটু হইলে মাথাটা নৌকার নীচের বাড়ে লাগিয়া ভাঙিয়া যাইত। সঙ্গে সঙ্গে আমি ডিঙির উপরের পাটাতনের বাড় ডান হাতে সজোরে চাপিয়া না ধরিলে দ্বিতীয় ধাক্কার বেগ সামলাইতে না সামলাইতে তৃতীয় ধাক্কার প্রবল ঝাপটায় একেবারে জলসই হইতাম।

মনু আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল—গেল! গেল!

এইটুকু শুনিতে না শুনিতে আবার প্রবল এক ধাক্কায় আমাকে যেন আড়কোলা করিয়া

wapsip.com

তুলিয়া উপরের পাটাতনে চিৎ করিয়া শুয়াইয়া দিয়া গেল। কি করিয়া এমন সম্ভব হইল বুঝিলাম না। আমার তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। চক্ষে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। শুধু নিবারণের কি একটা চীৎকার আমার কানে গেল অতি অল্পক্ষণের জন্যে।

তারপর বাঁ হাতের উপরের দিকে একটা যন্ত্রণা অনুভব করিলাম। দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তখন দেখি নিবারণ ও মনু আমার পাশে আসিয়া হাজির হইয়াছে দাঁড় ও হাল ছাড়িয়া। এ উত্তাল নদীগর্ভে এ কাজ যে কতদূর বিপজ্জনক, এটুকু বুঝিবার শক্তি তখনও আমার ছিল। আমি বলিলাম—ঠিক আছি, তোমরা যাও, ডিঙি সামলাও—

ভগবানের আশীর্বাদে আমার বিপদ সেযাত্রা কাটিয়া গেল। একটু পরে আমি উঠিয়া বসিলাম। তখনও আমাদের ডিঙি অকূল জলে, সেই রকম পর্বতপ্রমাণ ঢেউ চারদিকে, জল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। নিবারণ আমাকে হাঁক দিয়া আবার বলিল—সেঁউতি খোঁজ—ডিঙি যাবে এবার—ডুবু-ডুবু হয়ে আসছে।

সেবার সেঁউতি খুঁজতে গিয়াই বিপন্ন হইয়াছিলাম। এবার অতি কষ্টে আধখোল ভর্তি জলের মধ্যে হাতড়াইয়া সেঁউতি বাহির করিয়া দুই হাতে প্রাণপণে জল ছেঁচিতে লাগিলাম। দেহে যেন মত্ত হস্তীর বল আসিল। আমার অক্ষমতার জন্য আমার দুই বালক-বন্ধু জলে ডুবিয়া মারা যাইবে? তাহা কখনও হতে দিব না। ভগবান আমার সহায় হউন। অনেকখানি জল ছেঁচিয়া ফেলিলাম। সেই অবস্থাতেও আমার ঘাম বাহির হইতেছিল। ভগবান আমার প্রার্থনা শুনিলেন। ডিঙি অনেকটা হালকা হইয়া গেল। মনু বা নিবারণ কেহ কথা বলে নাই। এবার নিবারণ বলিয়া উঠিল—সাবাস!

—কি?

—ডিঙি হালকা লাগছে।

—কেন, বলছিলে যে আমার কিছু করবার নেই?

—বেশ করেছ।

—ডিঙি ভেড়াতে পারবে ডাঙায়?

—আলবৎ। স্থির জলে এসে পড়েছি, আর ভয় নেই। নদীর সব জায়গায় সমান স্রোত কাটিয়ে এসেছি।

আরও এক ঘণ্টা পরে আমাদের পাড়ে ডিঙি আনিয়া লাগাইয়া দিল নিবারণ।

একদিন রাত্রে মনু আমায় চুপি চুপি বলিল—এক জায়গায় যাবে? কাউকে না বলে বেরিয়ে চলো—

দ্বিতীয়বার অনুরোধের অপেক্ষা না করিয়া উহার সঙ্গে বাড়ির বাহির হইলাম। দেখিলাম, একটু দূরে নিবারণ দাঁড়াইয়া। যেখানে নিবারণ সেইখানে মস্ত বড় কিছু আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে!

নিবারণ বলিল—বাবু, চলো রাত্রে একটা কাজ করে আসি—

—কি কাজ এত রাত্রে?

—বাঘ মারবো।

—বাঘ কি করে মারবে? বন্দুক কই?

—দেখবে চলো।

তিনজনে গিয়া খালের নীচে ডিঙিতে চড়িলাম। ছোট খাল, দুই ধারে গোলপাতার জঙ্গল নত হইয়া জল স্পর্শ করিয়াছে। জোনাকি-জ্বলা অন্ধকার রাত্রে এই নিবিড় বনভূমির শোভা

wapsip.com

এমনভাবে কখনও দেখি নাই। মনু ও নিবারণকে মনে মনে অনেক ভালোবাসা জানাইলাম আমাকে এভাবে জঙ্গলের রূপ দেখাইবার জন্য।

এক জায়গায় ডিঙি বাঁধা হইল কেওড়া গাছের গুঁড়িতে।

আমি বলিলাম—অন্ধকারে নামবো?

নিবারণ গিয়া খোলের ভিতর হইতে দুইটা মশাল বাহির করিল। মনু ও আমি দুইটা মশাল হাতে আগে আগে চলি, ও আমাদের পিছনে পিছনে আসে। কিছু দূরে জঙ্গলের মধ্যে গিয়া নিবারণ হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল! আনন্দের সুরে বলিয়া উঠিল—বোধ হয় হয়েছে।

মনু বলিল—পড়েছে?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—এগিয়ে চলো।

একটা গাছের তলায় দেখি অদ্ভুত উপায়ে পাতা একটা ফাঁদে একটা ছোট বাঘের ছানা ধরা পড়িয়া বেড়ালের মত মিউমিউ করিতেছে। বড় একটা গাছের গুঁড়ির দুই দিক দিয়া দুইটা তার বাঁধিয়া সামনের ফাঁদের ফাঁস বাঁধা। একটি বড় তার গাছটি বেষ্টন করিয়া ফাঁদ পর্যন্ত গিয়াছে। এই তারের কাজ বোধ হয় ফাঁদের ফাঁস শক্ত ও আঁটো করিয়া রাখা। বাঘ বা যে কোন জানোয়ার অন্ধকারে এই স্থান দিয়া যাইবার সময় তারটি ঢিলা করিয়া দিবে, দিলেই তৎক্ষণাৎ নীচের ফাঁদে ফাঁস পড়িয়া যাইবে এবং জন্তুটি ফাঁসের মধ্যে আটকা পড়িবে।

আমাদের অত্যন্ত নিকটে আসিতে দেখিয়া ধৃত জন্তুটি লম্ফঝম্প দিতে আরম্ভ করিল। আমরা সকলেই বিষম আগ্রহে ও কৌতূহলে ছুটিয়া কাছে গেলাম। শুনিতে পাইলাম জন্তুটির ক্রুদ্ধ গর্জন।

হঠাৎ নিবারণ ও মনু হতাশ সুরে বলিয়া উঠিল—এঃ—

বলিলাম—কি? পালাচ্ছে নাকি?

নিবারণ বলিল—যাদু পালাবে সে পথ নেই। কিন্তু দেখছো না—

—দেখছি তো! বাঘের বাচ্ছা!

—বাঘের বাচ্ছা অত সোজা নয়। মিথ্যে মিথ্যে ফাঁদ পাতা পরিশ্রম।

—এঃ—

—কি এটা তবে?

—জানোয়ার চেনো না? এটা কি জানোয়ার ভাল করে দেখে বলো না?

—বাঘের বাচ্ছা।

—ছাই! তা হলে তো দুঃখ করতাম না।

মনু বলিল—ছুঁচো মেরে হাত কালো!

বলিলাম—তবে কি বেড়াল?

—ঠিক ধরেছেন। সাবাস—এটা বনবেড়াল, তবে খুব বড় বনবেড়ালও নয়। এর চেয়েও বড় বনবেড়াল সুন্দরবনে অনেক আছে দেখতে পাবে। এটা ছোট বনবেড়াল। সব মাটি!

বাঘ মারা পড়ে কিনা এমন ফাঁদে—আমি উহাকে জিজ্ঞাসা করি।

ও বলিল—নিশ্চয়ই।

—এই রকম বাঘ?

—না। দেখলে তোমার দাঁত লাগবে এমন বড়।

—এখন এই বনবেড়ালটা নিয়ে কি করবে? ছেড়ে দেবে?

wapsip.com

—ও তো এখুনি ছাড়তে হবে। বাড়ি নিয়ে গেলে বকুনি শুনবে কে?

ফাঁস খুলিয়া বনবিড়ালটিকে মুক্ত করিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। উহার একখানা পা সম্ভবত খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল। আমি কাছে গেলাম ধরিতে, কিন্তু সেটার গায়ে হাত দিবার আগেই থাবা তুলিয়া ফ্যাঁচ করিয়া কামড়াইতে আসিল।

মনু বলিল—আঁচড়ে কামড়ে দেবে, বনের জানোয়ার, খবরদার ওর কাছেও যেও না।

—তা তো যাবো না, কিন্তু বাঘের কি হল?

—নিবারণ জানে।

নিবারণ মুখ ফিরাইয়া বলিল—বাঘ দেখাবো তবে ছাড়বো, বড্ড হাসাহাসি হচ্ছে!

মনু বলিল—না ভাই, আমি হাসি নি। আমি তো জানি তোমায়।

—আজই পারবো না, তবে বাঘ দেখাবোই। তবে আমার নাম নিবারণ।

বলিলাম—বেশ দেখিও। ফাঁদটা পাতো দেখি।

—রাত্রে?

—দোষ কি?

—আজ রাত্রেই এ ফাঁদে বাঘ এনে ফেলতে পারি, তবে একটা টোপ চাই তা হলে।

—কিসের টোপ? ছাগল?

—দ্যুৎ! বড় বাঘে ছাগল খেতে আসবে না, ও আসে কেঁদো বাঘে। হয় গরু নয়তো দু'বছরের বাছুর; কিন্তু মোষ হলে সব চেয়ে ভাল টোপ হোত—মোষ বা মোষের বাচ্ছা। চলো আজ রাত্রে ফিরি। কাল সকালে ফাঁদ আবার পাতবো।

নিবারণের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ এক ভীষণ গর্জন শোনা গেল বাঘের। যেন হাঁড়ির ভিতর হইতে শব্দ বাহির হইতেছে নিকটে কোথাও। সমস্ত বন যেন কাঁপিয়া উঠিল। নিবারণ বলিল—আরে!

মনু বলিল—গাছে উঠবে?

—না দাঁড়াও, আবার ডাকবে এখুনি। আগে বুঝি ও কি করছে।

তখন আবার সেই বিকট গর্জনধ্বনি। কেওড়া গাছের ডালপালা যেন কাঁপিয়া উঠিল। এত রাত্রে গভীর বনমধ্যে বাঘের ডাক কখনও শুনি নাই। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

আবার একবার গর্জন। এবার খুব যেন কাছে।

মনু আমার হাত ধরিয়া একটা কেওড়া গাছে উঠিল। নিবারণ আমাদের পাশের একটা গরান গাছের আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াইল, গাছে উঠিল না। খানিকটা পরে সে দেখি গাছের গুঁড়ির ওদিক হইতে এদিকে ঘুরিতেছে। আমরা গাছে উঠিবার সময় জ্বলন্ত মশাল দুইটি মাটিতে নামাইয়া রাখিয়াছি, তাই বোধ হয় নিবারণ বাঁচিয়া গেল।

মনু আমার গা ঠেলিয়া নিঃশব্দে আঙুল দিয়া আমাদের ডানদিকের একটা বেতঝোপের দিকে দেখাইল। মশালের আলোতে দেখিয়া আমার গা কেমন করিয়া উঠিল। সমস্ত হাত-পা অবশ হইয়া গেল। প্রকাণ্ড একটা বাঘ ডানদিকের বেতঝোপ হইতে বাহির হইয়া খানিকটা আসিয়া দাঁড়াইয়া নিবারণের দিকে চাহিয়া আছে। মশালের আলো পড়িয়া উহার চক্ষু দুইটি জ্বলিয়া উঠিল। আবার নিবিয়া গেল। আবার জ্বলিয়া উঠিল। মনু জাতে মগ, সাহসী বীর বটে! ও দেখি নামিয়া পড়িতে চাহিতেছে নিবারণকে বাঁচাইবার জন্য। অথচ আমি জানি মনু সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। মনু যদি লাফায়, তবে আমাকেও লাফাইয়া পড়িতে হইবে—আমি গাছে বসিয়া থাকিব

wapsip.com

না। কিন্তু কি লইয়া নামি? মাথার উপরের দিকে একটা মোটা ডালের সন্ধানে চাহিলাম। মরিতে হয় তো যুদ্ধ করিয়া মরিব। এমন সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। মনু উত্তেজিতভাবে আমাকে আর এক ঠেলা মারিল। সম্মুখে চাহিলাম। ওদিকের বড় কেওড়া গাছের ওপার হইতে একটা বাঘিনী বাহির হইয়া আমাদের গাছের তলার দিকে আসিতে আসিতে দাঁড়াইল, সম্ভবত জ্বলন্ত মশালের আলোয় ভয় পাইয়া। ঠিক বলা কঠিন। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা আরও আগাইয়া আসিল। তারপর দুটিতে একত্র হইতেই বাঘিনী জিভ বাহির করিয়া বাঘের গা চাটিতে লাগিল। নিবারণ ঠিক উহাদের পাশেই কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া আড়ষ্ট হইয়া আছে। উহার দিকে ইহারা দুটিতে যেন অবজ্ঞাভরেই দৃষ্টি দিলে না। না, বেঁচে গেল এযাত্রা। বাঘ ও বাঘিনী ক্রমশ খালের উজানের জঙ্গলের দিতে চলিয়া গেল। আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। নিবারণের হাতের ইশারায় আমরা গাছ হইতে নামিলাম।

মনু বলিল—খুব বেঁচে গিয়েছ!

নিবারণ শুকনো মুখে হাসি আনিয়া বলিল—ভারি।

আমি বলিলাম—নিবারণ, গিয়েছিলে আর একটু হলে।

—তা আর না!

—ভয় করছিল?

—করবে না? সাক্ষাৎ যম। জানিস মনু, আমি ভাবছিলাম যদি বাঘে থাবা মারে, তবে কোথায় আগে মারবে। কানে যেন না মারে, ক'দিন থেকে আমার কানে ব্যথা। আবার ভাবছি, বাবুদের ঐ নতুন ছেলেটা কখনও বনে আসেনি, ওটাকে কেন মরতে নিয়ে এলাম।

—আমরাও চুপ করে বসে থাকতাম না নিবারণ। মনু লাফ দিয়েছিল আর একটু হলে।

—মনু, লাফিয়ে কি করতো? নিজে মরতো, তোমাকেও মারতো বই তো নয়!

অনেক রাত্রে আমরা বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন নিবারণ আসিয়া আমাদের ডাকিল।

বলিলাম—কোথায়?

—নেমন্তন্ন খেতে চলো।

—কোথায় আবার?

—মনু আর তুমি চলো।

তিনজনেই আমরা চলি। অনেক দূর চলি খালের পথে। সুন্দরবনে ডিঙি ছাড়া চলার পথ নাই। সব দিকে ডিঙি, সব দিকে খালের পথ। দুইটি বাঁক ছাড়াইয়া দেখি, একটা উঁচু ট্যাকে অনেক লোক একত্র হইয়া কি উৎসব করিতেছে। ডিঙি হইতে নামিতে তাহাদের ভিতর হইতে কয়েকজন আগাইয়া আসিয়া আমাদের বলিল—আসুন বাবু, আপনাকে এনেছে বুঝি নিবারণ? এসো গো মনু সাহেব—

মনু বলিল—আমি সাহেব নই—

তাহারা হাসিয়া বলিল—বেশ, চলে এসো। তুমি যা আছ, তা আছ।

নিবারণকে বলিলাম—কে এরা?

—আমাদের গাঁয়ের লোক। আমাদের গাঁয়ের নাম ঝাউতলা। ওরা আজ এখানে এসেছে বনবিবির দরগায় পুজো দিতে।

একজন বলিল—সেজন্যেই বাবু এ জায়গাটার নাম বনবিবির ট্যাক।

আমি উহাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ করিলাম। উহারা বেশ সরল, অমায়িক।

wapsip.com

একজনের নাম কালু পাত্র। বয়স আমার বাবার চেয়েও বেশি বলিয়া মনে হইল। কিন্তু একেবারে ছোট ছেলের মত সরল। আমার সঙ্গে কালু পাত্রের বড় ভাব হইয়া গেল। কালু পাত্র আমাকে সঙ্গে করিয়া গিয়া দেখাইল, একটা প্রাচীন কেওড়া গাছের তলায় চার পাঁচটি ছাগল বাঁধা। অনেক মেয়েপুরুষ গাছতলায় বসিয়া গল্প করিতেছে। একটা হাঁড়িতে অনেকখানি খেজুরগুড়। এক কলসীভর্তি দুধ।

নিবারণকে বলিলাম—পুজো করবে কে?

—আমরাই।

—পুরুত আসেনি?

—না, পুরুত থাকে না। কালু পাত্র সব করবে।

বাজনা বাজিয়া উঠিল। তিনটি ঢোল এবং একটা কাঁসি বাজিতেছিল। একটি মেয়ে গরানফুলের মালা ঢুলির গলায় পরাইয়া দিল। উহাই নাকি নিয়ম। আজ ঢুলিকে সম্মান দেখানো মস্ত বড় নিয়ম। ইহাদের পূজার কিছু বুঝিলাম না। কোন নিয়ম নাই। পাঁচটা ছাগল প্রাচীন দরগাতলায় বলি দেওয়া হইল। সেই মাংস পাক হইল।

কালু পাত্র আমার কাছে আসিয়া বলিল—বাবু, ঝাল খান?

—বেশি নয়। কম করে দিতে বলো।

—এটা আমাদের বছরের পুজো। বনবিবির দরগায় পুজো না দিয়ে কোন কাজ হবে না আমাদের।

—কি কাজ?

—যে কোন কাজ। আমরা এই জঙ্গলের লোক। বনবিবিকে তুষ্ট না রাখলে বাঘে নিয়ে যাবে।

—বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস করেন না, ও-কথা বলবেন না বাবু।

—কেন?

—আমার চোখে দেখা। এখানে বাস করে বনবিবিকে মানিনে যিনি বলেন, তাঁর মস্ত বড় বুকের পাটা।

—আমি তো বলছি।

—আপনি বিদেশী লোক, আপনার কথা আলাদা। আমরা মোম-মধু সংগ্রহ করি, কাঠ কাটি, এই ভাবে পয়সা যোগাড় করি। জঙ্গলের মধ্যে আমাদের মুখের অন্ন। বনবিবিকে পুজো না দিলে চলে?

—আমি বনবিবিকে পুজো করবো, যদি তিনি আমার একটা কাজ করেন।

—কি কাজ?

—সে এখন বলবো না। তোমাকে বলবো গোপনে।

তারপর সে কি নাচ আর ঢুলির বাদ্য। ঢুলিরাও নাচে, লোকজনও নাচে। অনেক বেলায় সেই প্রাচীন কেওড়াতলায় আমরা খাইতে বসিয়া গেলাম। আমাদের মাথার উপর নীল আকাশ। নীচে দিয়া ভাঁটার টানে খালের জল কল্‌কল্‌ করিয়া পাশের নদীর দিকে চলিয়াছে। নিবারণ ও কালু পাত্র পরিবেশন করিল। মোটা চালের রাঙা ভাত, বেগুনপোড়া ও প্রসাদী মাংস। মাংস প্রচুর দিল, যে যত খাইতে পারে। মেয়েরা আসিয়া আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া যত্ন করিয়া আমাদের খাওয়ার তদারক করিতেছিলেন।

wapsip.com

একটি মেয়ে আমাকে বলিলেন—তুমি কে বাবা? কোথায় থাকো?

মনু বলিল—আমাদের বাড়ি। কেন?

মেয়েটি থতমত খাইয়া গেলেন। অপ্রতিভ মুখে বলিলেন—না, তাই বলছি।

মনু বলিল—যাও এখেন থেকে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—কেন, উনি মন্দ কথা কি বলেছেন?

মনু উত্তেজিত স্বরে বলিল—তুমি চুপ করো।

—কেন চুপ করবো?

—আলবৎ চুপ করবে।

—মুখ সামলে কথা বলো, মনু।

—তুমি মুখ সামলে কথা বলো কিন্তু বলে দিচ্ছি। জানো কি, কোথায় এসেছ?

—জানি বলেই বলছি। তোমরা ডাকাত, আমাকে চুরি করে এনেছ। আনো নি? তুমিও তাদের সাহায্য করেছো। আমার মা-বাপ নেই, তাঁদের জন্য আমার মন কাঁদে না? তুমি ভেবেছ কি মনু?

—যিনি এনেছেন, তাঁর কাছে এসব কথা বলো ভাই, আমি আনিনি।

—তুমি জানো না কে এনেছে? তুমি কেন তাকে অনুরোধ করো না আমাকে ছেড়ে দিতে?

—আমি ছেলেমানুষ, আমার কথা কে শুনবে? তবে একটা কথা তোমায় বলে দিচ্ছি, কখনও আমায় 'ডাকাত'—এ কথা আর বলবে না। আমি তোমাকে বন্ধুর মত ভালবাসি, তাই বলছি এ কথা।

—বললে না হয় তোমরা আমাকে মেরে ফেলবে, এ ছাড়া আর কি করবে?

আমাদের কাছে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা বেগতিক বুঝিয়া অনেকে সরিয়া পড়িল ইতিমধ্যে। কিন্তু সেই মেয়েটির কথা কখনও ভুলিব না। তিনি আমাদের কাছে আসিয়া মনুর ও আমার ঝগড়া থামাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আমাকে বার বার বলিলেন—চুপ করো বাবা—

—না, কেন চুপ করবো? আমি ভয় করি না।

—থামো বাবা থামো!

নিবারণ আসিয়া মনুকে হাত ধরিয়া অন্যদিকে লইয়া গেল। সেই সময় মেয়েটিও চলিয়া গিয়া অন্য মেয়েদের ভাত খাওয়াইতে লাগিলেন। এক সময় আড়চোখে উহাদের দিকে চাহিয়া দেখিয়া মেয়েটি চট্ করিয়া আমার কাছে আসিলেন। আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—এসো—লুকিয়ে—

আমরা গিয়া একটি গোলপাতার ঝোপে দাঁড়াইলাম। তাঁহার প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া আমার মাকে দেখিতে পাইলাম। এই বিজন অরণ্যের মধ্যেও বিশ্বের পিতা ভগবান এমন স্নেহরস পরিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বলিলাম—কি মা?

—তুমি কে বাবা?

—আমার নাম নীলু রায়, আমার দাদামহাশয়ের নাম ভৈরবচন্দ্র মজুমদার, বাড়ি পলাশগাছি, জেলা খুলনা। আমাকে ওরা ধরে এনেছে।

—কি করে?

wapsip.com

—আমি সব খুলিয়া বলিলাম। মায়ের মত স্নেহ পাইয়া এতদিন পরে আমার বড় কান্না পাইল। আমার বাবা নাই, জ্ঞান হইয়া অবধি মাকে ছাড়া আর কাহাকেও চিনি না। আমার স্নে মা আমার অভাবে কি কষ্টই না জানি পাইতেছে! রোজ রাত্রে মার কথা ভাবিয়া আমি কাঁদি। ভগবান ছাড়া আর কে সে কথা জানে!

মেয়েটি আমার চোখের জল নিজের আঁচল দিয়া মুছিয়া দিলেন।

—চুপ করো বাবা, কেঁদো না ছিঃ—

—আমি সেজন্যে কাঁদিনি। শুধু ভাবছি মা কেমন করে আছেন—

—সব বুঝেছি। আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল। একটা কথা বলি—

—কি?

—তোমার হাতে টাকা আছে?

—কিছু না। গলায় সোনার হার ছিল, সে ওরা খুলে নিয়েছে।

—মনু জানে?

—না। ও ভালো ছেলে। আমাকে খুব ভালবাসে।

মেয়েটি আঁচলের গিরো খুলিয়া আমার হাতে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন—এই নাও, রাখো।

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম—না, এ আপনি রাখুন।

—নাও না। আমার কথা শোনো।

—না।

—আবার একগুঁয়েমি। ছিঃ, রাখো!

আমি মেয়েটির মুখের দিকে আবার চাহিলাম। আমার মায়ের গলার স্নেহ-ভর্ৎসনার সুর। না, মেয়েটির মনে কষ্ট দিতে পারিব না, যেমন পারিতাম না আমার মায়ের মনে।

মেয়েটি বলিলেন—এই টাকা যত্ন করে রাখবে। কাজে লাগবে এর পরে।

—কি আর কাজে লাগবে! ওরা দেখলে কেড়ে নেবে। আচ্ছা ওরা কি করে—আমাকে নিয়ে কি করবে?

—শুনেছি হাটে বিক্রি করে।

—কোথাকার হাটে?

—যাদের ধরে, তাদের কেনা-বেচার হাটে বেচে। এরা অমন কেনে-বেচে, আমি শুনেছি। মনুর কোন দোষ নেই। ওর সঙ্গে ভাব রেখো। আমি চেষ্টা করবো তোমাকে ছাড়াতে। কিন্তু আমরা ওদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করি। ওদের ভয়ে আমাদের কিছু করবার যো নেই। ওদের তুষ্ট না রাখলে সুন্দরবনে আমাদের কাজ চলবে না। তবুও আমি বলছি, আমি চেষ্টা করবো। তোমাকে উদ্ধার করবার যা চেষ্টা দরকার, তা আমার দ্বারা হবে। এ কথা কিন্তু কারও কাছে প্রকাশ করবে না, কেমন?

—ঠিক আছে।

—আমি যাই আজ।

—দাঁড়ান, আপনাকে প্রণাম করি।

—না, আমার পায়ে হাত দিও না। আমরা ছোট জাত।

—আপনি মা, মায়ের আবার জাত কি? দাঁড়ান।

আমি প্রণাম করিলাম, তিনি চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইলেন, মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ

wapsip.com

করিলেন।

অনেকদিন পরে মনে বল ও আনন্দ পাইলাম। আজ আমার বনবিবির দরগায় আসা সার্থক। কিংবা দয়াময়ী বনবিবিই একটি অসহায় ছোট ছেলের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছিল, আমরা নিবারণের সঙ্গে ফিরিলাম। মনুর দিকে চাহিয়া বলিলাম—আমার ওপর রাগ করেছ ভাই?

মনু বলিল—না।

—আমি অন্যায় কথা বলিনি।

—ওর সামনে বললে, তাই রাগ হয়েছিল। যা হোক, তুমিও কিছু মনে কোরো না।

ব্যাপারটা মনুকে সব খুলিয়া বলি নাই। কি জানি কি মনে করিবে হয়তো। মগ ডাকাতের ছেলে, উহার মনের খবর আমি সব কি জানি?

জলের ধারের জঙ্গলে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল। হেঁতাল গাছের ঝোপ ঠিক জলের ধারেই। কি সুন্দর সাদা ফুল ফুটিয়া আছে ঝোপের মাথায়! আমি যেমন সেদিকে চাহিয়াছি, অমনি ঝোপের ভিতর হইতে নিঃশব্দে কি একটা আসিয়া জলের ধারে দাঁড়াইল। কালোমত কি একটা জানোয়ার । চুপ করিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল। আমি মনুকে দেখাইব ভাবিতেছি, এমন সময় সেটা জলে ঝাঁপ মারিল এবং নৌকার দিকে সাঁতরাইয়া আসিতে লাগিল।

চিৎকার করিয়া বলিলাম—মনু! নিবারণ!

উহাদের সাড়া নাই। ভাঁটার টানে নৌকা আপনা-আপনি চলিয়াছে, উহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নাকি?

এমন সময় নিবারণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবেগে দাঁড়ের বাড়ি মারিল জানোয়ারটার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ গর্জন বাঘের এবং নিবারণ ও মনু দুইদিক হইতে জানোয়ারটার মাথায় দুড়দাড় মারিতে লাগিল। বাঘটা মুখ ঘুরাইয়া ডাঙার দিকে চলিল। তাহার দেহের বেগ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ডাঙায় উঠিয়া সেটা হেঁতাল ঝোপের মধ্যে মিশিয়া গেল। তারপর একটা আর্ত চিৎকার করিয়া উঠিল।

এতক্ষণে নিবারণ বলিল—উঃ, আজ তোমাকে নিয়েছিল আর একটু হলে!

মনু বলিল—ঝগড়া করতে ব্যস্ত ছিলে, এদিকে যে হয়ে গিয়েছিল! নিবারণ আর আমি দুজনেই টের পাই। আমরা দাঁড় হাতে তৈরি ছিলাম। তুমি চেঁচিয়ে উঠে সব মাটি করলে। আরও কাছে এলে ওটার মাথার খুলি গুঁড়ো করে দিতাম।

নিবারণ বলিল—আমার মনে হয় ওটা ঘায়েল হয়েছে। কাল খুঁজতে হবে এই ঝোপে। ওঃ, আজ তোমাকে যমের মুখ থেকে বাঁচানো হয়েছে।

মনু বলিল—উঃ, আর একটু হলে কি সর্বনাশ হত!

দেখিয়া খুশি হইলাম—আমার বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য উহারা সকলেই সুখী। পরদিন সকালে একটু রৌদ্র উঠিলে আমরা ডিঙি করিয়া সেই হেঁতালঝোপ খুঁজিতে গেলাম। অনেক দূর পর্যন্ত খুঁজিয়াও কোথাও মৃত বাঘের চিহ্নও পাইলাম না। নিবারণ এক স্থানে রক্তের দাগ পাইল বটে, বাঘের থাবার দাগও দেখা গেল কিন্তু কিছু দূর পর্যন্ত, তারপর যেন বাঘটা হঠাৎ আকাশপথে উড়িয়া গিয়াছে।

মনু বলিল—কি ভাই নিবারণ, বাঘ কোথায় গেল?

—তাই তো! পায়ের দাগ কোথায় গেল?

wapsip.com

—বাঘ এখানেই আছে, কোথাও যায়নি।

—তা হয় তো খুঁজে বার করো।

নিবারণ এইবার খুঁজিয়া খালের ধারের কাদায় আসিয়া কি একটা চিহ্ন দেখিয়া উত্তেজিত সুরে বলিল—শীগগির এসো, বাঘ পাওয়া গেছে।

আমরা ছুটিয়া গেলাম। কই বাঘ? কোথায়? কিছুই তো আমাদের চোখে পড়ে না। নিবারণ একটা শুকনো হিজলপাতার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—ওই দেখছো না! রক্তমাখা হিজলপাতাটা বাঘের থাবায় উলটে গিয়েছে? থাবার রক্ত?

মনু বলিল—বাঘ কোথায়?

—বাঘ ওপারে। ডিঙিতে ওঠো—কোথায় আছে, আমি বুঝতে পেরেছি।

ডিঙিতে খাল পার হইয়া মস্ত বড় একটা বেতঝোপ। তাহার পাশে একটা ভাঙা বাড়ির ইটের স্তূপ। সেই ঘন জঙ্গলে ইটের বাড়ির ধ্বংসস্তূপ কোথা হইতে আসিল! আমি খুব অবাক হইয়া গেলাম। নিবারণকে বলিলাম কথাটা? তাহার বা মনুর এ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল দেখিলাম না।

নিবারণ বলিল—অত কথায় আমাদের দরকার কি বাপু? যা করতে এসেছ তাই করো।

—দেখতেও তো এসেছি।

—দেখবে আবার কি?

—কারা এই জঙ্গলে বাড়ি করেছিল, এটা জানবার কথা নয়?

—বাপ-দাদাদের মুখে শুনেছি, দেবতারা করেছিল।

—দেবতাদের কি গরজ?

—তা জানিনে বাপু, যা শুনেছি তাই বল্লাম।

ব্যাস্! ইহার বেশি উহাদের কৌতূহলের দৌড় নাই, ও কি করিবে? আমরা সেই ইষ্টক স্তূপে উঠিয়া এখানে ওখানে খুঁজিতেছি, এমন সময়ে নিবারণ বিজয়গর্বে চিৎকার করিয়া বলিল—ওই যে!

গিয়া দেখি এক জায়গায় ইটের আড়ালে বাঘটা মরিয়া পড়িয়া আছে। হাঁ করিয়া উঁচু দিকে মুখ করিয়া দাঁতের পাটি বাহির করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া আছে।

মনু এক লাফে বাঘটার কাছে যাইতেই নিবারণ সতর্ক চিৎকারে তাহাকে সাবধান করিয়া দিল।

—মরবে! মরবে! খবরদার!

তাই মনু বাঁচিয়া গেল।

সে এক অদ্ভুত ও ভীষণ দৃশ্য। মৃত বাঘটা হঠাৎ এক লম্ফে চিৎ অবস্থা হইতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। পরক্ষণেই একটা লাফ দিল আমার দিকে।

আমার দূরত্ব ছিল তাহার লাফের পাল্লার বাহিরে, তাই রক্ষা পাইলাম। মনু মরিত যদি নিবারণ তাহাকে সতর্ক না করিত। বাঘটার সেই শেষ লাফ—সেই যে মাটিতে পড়িয়া গেল, আর উঠিল না। আমরা দেখিলাম, নিবারণ আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ। সে এখনও আমাদের বারণ করিতেছে—খবরদার, বিশ্বাস নেই, ও হল সাক্ষাৎ যম, ওর কাছেও যেও না। আগে দেখি ভাল করে—

নিবারণ ভূপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত বাঘটার গায়ে একটা ঢিল মারিল।

আমি বলিলাম—নট্ নড়ন-চড়ন নট্ কিচ্ছু—

wapsip.com

নিবারণ আর একটা ঢিল ছুঁড়িল। এবারও বাঘ নড়িল না। তখন আমরা সবাই মিলিয়া কাছে গেলাম। বাঘের মাথার পিছনদিকে নিবারণের দাঁড়ের জবর ঘা লাগিয়া খুলি চিরিয়া ঘিলু ঝরিতেছে। বাঘের শক্ত প্রাণ বটে! এ অবস্থাতেও অমন লাফ দিতে পারা সোজা শক্তির কথা! মস্ত বড় বাঘ। আমরা তিনজনে সেটাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া জলের ধারে আনিলাম। ডিঙিতে উঠানো বড় কঠিন কাজ। এক হাঁটু কাদার মধ্য দিয়া অত বড় ভারি মৃত জন্তু ডিঙি পর্যন্ত নেওয়াই মুশকিল।

বলিলাম—এটা এখানে থাক, চলো লোক ডেকে আনি—

নিবারণ বলিল—তা থাকবে না, চামড়া নষ্ট হবে—

—কিসে?

—এখুনি শকুন পড়বে এর ওপর, চামড়াখানা যাবে। সুন্দরবনে শেয়াল নেই।

—তবে আমি আর মনু থাকি, তুমি যাও।

—এই বনে তোমাদের রেখে যেতে সাহস করিনে। তোমরা জঙ্গলের জানো কি? কত রকম বিপদ ঘটতে পারে, তুমি কি খবর রাখ? দেখি দাঁড়াও, একটা মোটা ডাল—

এমন সময় খাল দিয়া আর একখানা ডিঙি যাইতে যাইতে আমাদের ও-অবস্থা দেখিয়া থামিল। নিবারণের মুখে সব শুনিয়া বলিল—বা রে ছোকরার দল। বলিহারি সাহস! সুন্দরবনে দাঁড় দিয়ে বাঘ মারা এই নতুন শোনা গেল বটে।

আমরা বলিলাম বাঘের মৃতদেহটা ডিঙিতে তুলিতে সাহায্য করিতে। তাহারা আমাদের সঙ্গে বাঘটা আমাদের ডিঙিতে তুলিয়া দিয়া গেল।

আমি তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কোথাকার নৌকো?

—সরষেখালির।

—সে কত দূর?

—পাঁচ-ছ' কোশ এখান থেকে।

—যাবেন কোথায়?

—আমরা বড় চরের ট্যাঁকে মাছ ধরতে যাবো। তুমি কোথায় থাকো বাবু?

মনু আমার গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিল—চলো চলো, বাজে কথা বলে লাভ নেই। ও আমাদের বাড়ির ছেলে। কেন, কি দরকার তোমাদের?

—কেন, বললে দোষ কি?

—না, বলার দরকার নেই। আমি ভালো ভাবেই তোমায় বলছি, ওতে আমাদের বিপদ হতে পারে।

—কি বিপদ?

—পুলিশে ধরবে আমার বাবাকে। বুঝলে?

আমি কথা বলিলাম না! বুঝিলাম মনুর সঙ্গ আমাকে ছাড়িতে হইবে। ও আমায় নজরবন্দী রাখিয়াছে—পাছে ওর বাবা বিপদে পড়েন, পাছে আমি পালাই। এ জীবন আমার মন্দ লাগিতেছে না। মনুকে আমি ভাইয়ের মত ভালবাসি। কিন্তু আমার মায়ের কাছে যাইতে আমার কি আকুল আগ্রহ, ও তাহার কি বুঝিবে?

সেদিন হইতে মনু আমার প্রতি খুব প্রসন্ন হইল। আমাকে ভাগ না দিয়া কোন জিনিস খায় না, কোথাও গেলে আমায় সঙ্গে না লইয়া যায় না।

একদিন আমাকে বলিল—তোমাকে একটা নতুন জিনিস দেখাবো—চলো যাই—

wapsip.com

সেদিন নিবারণ আমাদের সঙ্গে ছিল না, শুধু আমি আর ও । আমি দাঁড় টানি, ও হাল ধরে। অবশ্য খালের ভিতর দিয়া যাইতে হাল ধরিতে কোন কষ্ট নাই।

কিছু দূরে গিয়া দুজনে জঙ্গলের মধ্যে নামিলাম। বড় বড় গোলপাতা গাছ জঙ্গলের ধারে নত হইয়া আছে। বেতডাঁটার অগ্রভাগ ভাঁটার টানে দুলিতেছে। বাতাবী লেবুর মত সেই ফলগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়া গাছতলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। বাঁদরের পাল হুপ হুপ করিয়া এগাছে ওগাছে লাফালাফি করিতেছে। ইহারা মুখপোড়া হনুমান জাতীয় বানর নয়, রাঙামুখ বুপীবাঁদর। হনুমান হইতে আকারে কিছু ছোট।

একস্থানে গিয়া মনু বলিল—চেয়ে দেখো, তুমি অবাক হয়ে যাবে।

—কি দেখবো?

—এগিয়ে চলো।

সত্যিই অবাক কাণ্ড!

সেই ঘন বনের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। শুধু একটা বাড়ি নয়, আশপাশে আরও অনেক বাড়ির চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বড় বড় পাথরের খিলান খসিয়া পড়িয়াছে, দুর্ভেদ্য বেতজঙ্গলে পাথরে কড়ির হাঙরমুখ ঢাকা পড়িয়াছে। মনু বলিল—আরও দেখবে?

—হুঁ।

—চলো রানীর জঙ্গল দেখিয়ে আনি—

—কত দূর?

—এখান থেকে দূর আছে। বাঘের ভয় আছে পথে।

—চলো যাবো।

কিন্তু বেশি দূর যাইতে না যাইতে আর একটি বড় বাড়ির ধ্বংসস্তূপে আমাদের পথ আটকাইয়া গেল। বড় বড় পাথর ও ইটের জমাট চাঁই, বেতলতার শক্ত বাঁধনে আবদ্ধ। এক স্থানে একটা মন্দির। মন্দিরের ছাদটা দাঁড়াইয়া আছে, অন্ধকার গর্ভগৃহে মনে হইল এখনও বিগ্রহ জীবন্ত।

মনু তাড়াতাড়ি বলিল—ও কি? কোথায় যাও? ঢুকো না, ঢুকো না। আমি ততক্ষণে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। মন্দিরের বহু শতাব্দীর জমাট অন্ধকারে দেবতার বেদী আবিষ্কার করিতে পারিলাম না, মনে হইল কোন্ অতীত কালের বাংলায় পূজাবেদীতে অর্ঘ্য সাজাইয়া নিবেদন করিতে আসিয়া পথভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি—সে অতীত দিনে ফিরিয়া যাইবার সকল পথ আজ আমাদের রুদ্ধ।

কে আমাকে হাত ধরিয়া সে বাংলায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবে?

কেহ নাই।

আমাদের সে অতীত দিনের পূর্বপুরুষদের আজ আমরা আর চিনিতে পারিব না।

তাহারাও আমাদের আর চিনিতে পারিবে কি তাহাদের বংশধর বলিয়া?

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কিসের গর্জন শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। মনু বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, সে আমাকে দেখিতে পাইতেছে না ভগ্নদেউলের অন্ধকারে।

বিকট ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে অন্ধকার যেন আমার দিকে দাঁত খিঁচাইতেছে। কোথায় আছে কালসর্প আমার অতি কাছে, এই ঘন আঁধারের মধ্যে সে আমার জীবনলীলার অবসান বুঝি করিয়া দিল! উচ্চরবে আর্তকণ্ঠে ডাকিলাম—মনু! মনু! সাপ! সাপ! শীগ্‌গির এসো—

wapsip.com

আমার ডান পায়ের পাশেই আবার সেই ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার গায়ে কে যেন শক্ত লাঠির ঘা বসাইয়া দিল। আবার ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ।

মনু আসিয়া বলিল—কি? কি?

—খেয়ে ফেল্লে, বড় সাপ!

—সরে এসো। এক লাফে ঐ ইটের ওপর উঠে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান পায়ে আর একটা লাঠির বাড়ি এবং ঝাঁটার কাঠি ফোটানোর মত বেদনা। একটা মস্ত ইট কি পাথর ছোঁড়ার শব্দ শুনিলাম। মনু বোধ হয় কালসর্পের দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কামড়েছে?

—হুঁ।

—কোথায়? চলো তাড়াতাড়ি বাইরে! একশবার বারণ করলাম, ওর মধ্যে ঢুকো না। আমার সব কথা তোমার টক লাগে!

—এখন ভাই কথা বোলো না বেশি। চলো বাইরে যাচ্ছি।

—আমি ধরে নিয়ে যাই।

—কিছু না, আমি নিজে যেতে পারবো।

দুইটা ছোট ছিদ্র দেখা গেল গোড়ালির কাছে। মনু আমার কোমরের কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তিনটি শক্ত বাঁধন দিল। তারপর আমার হাত ধরিয়া ডিঙিতে উঠাইয়া অতি দ্রুত ডিঙি বাইতে লাগিল—কিন্তু উলটা দিকে, যেদিকে বাড়ি সেদিকে নয়। আমি ভুল দেখিতেছি না তো?

বলিলাম—ভাই মনু—

—চুপ—

—আমার শেষ হয়ে এসেছে—

—আবার!

—মার সঙ্গে ভাই দেখা হল না—

—আঃ—

—তুই আমার বড় বন্ধু ছিলি—

—আবার বকে! চুপ!

আমার মনে হইল আমরা উল্টা দিকে চলিয়াছি। আগেই মনে হইয়াছিল—বলিয়াছি। ও কোথায় চলিয়াছে পাগলের মত এ অন্ধকারের মধ্য দিয়া?

একটা জায়গায় ডিঙি রাখিয়া সে আমাকে নামাইয়া লইল। জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় গোলপাতায় ছাওয়া একখানা কুটির। কুটিরের সামনে গিয়া সে ডাকিল—ওস্তাদজী, ওস্তাদজী—

ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাদের সামনে যে আসিল তাহাকে দেখিয়া হাসিব কি কাঁদিব বুঝিতে পারিলাম না। লোকটা কি যাত্রাদলের নারদ? কারণ সেই রকমই সাদা লম্বা দাড়ি, তাহার বয়স যে কত তাহা আমার বুঝিবার কথা নয়। তবে সে যে অতি বৃদ্ধ, এ বিষয়ে কোন ভুল নাই।

বৃদ্ধ আসিয়া অন্ধকারের মধ্যে আমাদের দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। থতমত খাইয়া বলিল—কে বাবা তোমরা?

মনু বলিল—আমি। ভালো করে চেয়ে দেখো। আমার এই ভাইকে জাতসাপে

wapsip.com

কামড়েছে। সময় নেই—একে বাঁচাও।

ওস্তাদ তখনি আমার কাছে আসিয়া বলিল—দেখি দেখি, কোথায়?

—এই যে, দাঁতের দাগ দেখো।

—ঠিক।

—বাঁচবে?

—তেনার হাত, আমি কি জানি? যা বলি তা করো।

—বলো।

—একে আরও বাঁধন দিতে হবে; দড়ি দিচ্ছি।

আমাকে ইহারা দুজনে মিলিয়া কি কসিয়াই বাঁধিল! এ যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যু বোধ হয় ভালো ছিল।

হঠাৎ কানে গেল মনু বলিতেছে—ঘুমিও না ভাই—এই, ঘুমিও না—

ঘুমাইতেছি? কে বলিল?

কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে হইল দেশের বাড়ির দাওয়ায় আমি বসিয়া আছি। মা একবার আসিয়া বলিলেন—কি হয়েছে নীলু, বাবা আমার, কোথায় কি হয়েছে দেখি?

মা আমার গায়ে তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিলেন। তারপর একথালা গরম ভাত ও মাগুরমাছের ঝোল আনিয়া আমায় খাওয়াইতে বসিলেন।

আমি বলিলাম—মা তোমাকে কত দিন দেখিনি—

মা হাসিলেন, কি প্রসন্ন হাসি!

বলিলাম—ওরা ধরে রেখেছিল, তোমার কাছে আসতে দিচ্ছিল না। এই সময়ে আরও অনেক লোক আসিল আমাদের পাড়ার। বিলু পিসি, কার্তিক, সুনু, বৃন্দাবনদা। উহারা আমায় দেখিয়া বড় খুশি। সকলেই বলিল—ওমা, আমাদের নীলু যে আবার ফিরে এসেছে! ও নীলু? নীলু?

আমি তন্দ্রা থেকে জাগিয়া উঠিলাম যেন। না, কেহ কোথাও নাই। মনু আমার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতেছে আর বৃদ্ধ ওঝা আমার পায়ের উপর ছপাৎ ছপাৎ বেতের বাড়ি মারিতেছে।

মনু উহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কি রকম বুঝছো ওস্তাদজী।

ওস্তাদ বৃদ্ধ বলিল—আশা আছে। ঘুমিয়ে না পড়ে আবার! ঘুমুলে চলবে না—ঘুমের মধ্যেই মরে যাবে। আমাকে ডাকিয়া বলিল—জলতেষ্টা পাচ্ছে?

—হুঁ।

—মনু, ওকে গরমজলটা খাইয়ে দাও এবার।

——তুমি ততক্ষণ মারো বেত। এই দেখো ঢুলছে—

দুজনে মিলিয়া কি মার আমায় মারিল আর কি পরিশ্রমটাই করিল। ছেলের জন্যে বাবা যেমন কষ্ট ও চেষ্টা করে, বৃদ্ধ ওঝা তাহার চেয়ে একটুও কম কষ্ট আমার জন্যে করেনি।

মনু বলিল—ওস্তাদজী , এবার কি মনে হয়?

—হয়ে গেল।

—শেষ হয়ে গেল?

—আমাদের কাজ শেষ হল।

—বেঁচে গেল তো?

wapsip.com

—আলবৎ। নইলে আর ওঝাগিরি করবো না।

বেলা হইল। গাছের মাথায় প্রাতঃসূর্যের রোদ পড়িয়াছে। বসন্তবৌরি পাখির ডাক শোনা যায় বনের মধ্যে। অনেকক্ষণ আগে বাঁধনগুলি কাটা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার পা অবশ, কসিয়া বাঁধন দেওয়ার ফলে আমার পা আড়ষ্ট—হাঁটিবার উপায় নাই।

ওস্তাদ খাইতে দিল আমাকে। একটা পাতায় গরমভাত ও গরম ফ্যান, জংলী গোঁড়া লেবু একটা আস্ত আর নুন। কোন উপকরণের বাহুল্য নাই। সেই ভাত আর লেবুর রস সোনা হেন মুখ করিয়া খাইলাম। ডিঙিতে উঠিবার সময় ওস্তাদ-বৃদ্ধকে নমস্কার করিয়া বলিলাম—আবার আসবো।

—অবিশ্যি আসবে, বাবা।

—তুমি খুব বাঁচা বাঁচিয়েছ আজ।

—তেনার হাত, তিনি বাঁচিয়েছেন।

ডিঙি বাহিয়া যাইতে যাইতে কেবলই মনে হইতেছিল, এ আমার জীবনের এক নূতন প্রভাত। মানুষের মধ্যে যে ভগবান বাস করেন, তাহা আজ বুঝিয়াছি। নতুবা মনু আমার কে? কেন সে এত প্রাণের টান দেখাইল আমাকে বাঁচাইতে? বৃদ্ধ ওঝা আমার কে? কেন সে সারারাত্রি জাগিল আমায় জীবন দিতে? মনুকে আজ নূতন চোখে দেখিতেছি। ও আমার ভাই। উহাদের কাছে সারাজীবন থাকিতে পারি। মা না থাকিলে নিশ্চয় থাকিতাম।

মনু বলিল—ভালো মনে হচ্ছে!

—হুঁ।

—বলছিলে যে শেষ হয়ে গেল।

—তুমি না থাকলে তাই হত। তুমি আমার ভাই।

—থাক। কাল না কত কথা বলছিলে, মনে নেই?

—সে সব ভুলে যা মনু। দুই ভাইয়ের মত থাকবো এখন থেকে।

—একটা কথা।

—কি?

—বাড়ি গিয়ে এসব কথা কিন্তু বলতে পারবে না মাকে বা বাবাকে। কেমন?

—তুমি যা বলবে ভাই। বল্লাম তো, তুমি আমার ভাই আজ থেকে।

মনু কথার উত্তর না দিয়া একটুমাত্র হাসিল।

ইতিমধ্যে শীতকাল পড়িল। জঙ্গলের মধ্যে বর্ষার কাদা অনেকটা শুকাইয়া আসিল। পাশের নদীর দুইধারের ঝোপে পেতনীপোতার সাদা ফুল পেঁজাতুলার রাশির মত শোভা পাইতে লাগিল। এই সময় মনুর বাবা দেখি বজরা সাজাইয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রোজই কোথায় বাহির হইয়া যায়। অনেক রাত্রিতে ফেরে। আমাদের ঘরে অনেক কাপড়চোপড়, খাবার জিনিস আর ধরে না।

একদিন মনুকে বলিলাম কথাটা।

মনু বলিল—ভাই, আমাকেও তো বড় হলে ওই করতে হবে। বাবাকে বারণ করবো কেন?

—তুমি আমার ভাইয়ের মত। তোমাকে আমি ভাল পথে নিয়ে যেতে চাই।

—তা হবে না। বাবা যা বলেন তাই হবে, তবে একটা কথা।

—কি?

wapsip.com

—বাবা বলছিলেন, ক্রমে পুলিশের ভয় বাড়ছে। এ কাজ আর চলবে না?

—তবে?

—কি করি বলো তুমি।

—আমি পথ বলে দিতে পারি। সেকথা কি তোমার বাবা শুনবেন? লেখাপড়া শেখো। কানাইডাঙায় ডাক্তারবাবু স্কুল খুলেছেন। সেখানে ভর্তি হও। কি করে খাবে দেখতে হবে তো?

—তুমি বাবাকে বোলো।

নিবারণ আমাদের লইয়া মাছ ধরিতে চলিত রোজই দুপুরের পর। এদিনও আসিল। বলিল—একটা জিনিস তোমাকে দেখাবো। ফাঁদে বাঘ পড়ে না, বলেছিলে না?

বলিলাম—পড়েছে নাকি?

—চলো দেখবে।

দূর হইতে দেখিলাম চার-পাঁচখানা ডিঙি পশোর নদীর দিকে চলিয়াছে। আমাদের ডিঙিও সেগুলির পিছনে পিছনে চলিল। নিবারণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহারা মাছ ধরিতে চলিয়াছে।

কিন্তু সেদিন অমন বিপদে পড়িতে হইবে জানিলে বোধহয় নিবারণের সঙ্গে যাইতাম না।

পশোর নদীর মধ্যে গিয়া দেখি সেখানে আরও অনেক জেলেডিঙি। ইহারা ডাঙায় নামিয়া রান্না করিয়া খাইতেছিল। আমরা জাল ফেলিতেই মস্ত বড় একটা দয়ে-ভাঙন জালে আটকাইল। মাছটার ওজন আধ মণের উপর। দয়ে-ভাঙন সামুদ্রিক মাছ, এতদিন ইহাদের মধ্যে থাকিবার ফলে আমি এই মাছ চিনিয়াছিলাম। খাইতে খুব সুস্বাদু। অন্য সামুদ্রিক মাছ আমার মুখে রুচিত না, কেবল এই মাছ ছাড়া।

মাছটা ডিঙিতে তুলিতে গিয়া ডিঙি কাত হইয়া গেল।

কি ভাবে পা পিছলাইয়া আমি জলে পড়িয়া গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে সেই মস্ত মাছটা আমার দিকে তাড়া করিয়া আসিল; দয়ে-ভাঙন মাছ মানুষকে তাড়া করে কখনও শুনি নাই; চিৎকার করিতেই নিবারণ দাঁড় তুলিয়া মাছটার গায়ে এক ঘা মারিল। সেটা একবার ঝাপটা মারিতেই জালের দড়ি ছিঁড়িয়া গেল। মাছ আসিয়া আমার হাঁটু কামড়াইয়া ধরিল। আমি ডিঙির কানা ধরিতে চেষ্টা করিলাম, নাগাল পাইলাম না। মাছটার টান এবং ভাঁটার টানে মিলিয়া আমাকে ডিঙি হইতে দূরে লইয়া ফেলিল। একবার এক ঝলক লোনা-জলের খাবি খাইয়া বুঝিলাম মাছ আমাকে জলের তলায় নেওয়ার চেষ্টা করিতেছে।

সেই সময় নিবারণ চীৎকার করিয়া অন্য ডিঙির লোকেদের ডাক দিল। একজন দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া এই দিকে ডিঙি বাহিয়া দ্রুত আসিতেছিল।

এসব এক মিনিটের মধ্যে ঘটিয়া গেল। পরের মিনিটে মনে হইল, আমি একটা অন্ধকার অতলস্পর্শ গুহার দিকে চলিয়াছি। গুহাটা ক্রমশ বড় হইতেছে, ক্রমশ আমাকে গিলিয়া খাইতে আসিতেছে।

অনেক লোক মিলিয়া কোথায় যেন চিৎকার করিতেছে শুনিলাম। তারপর আমি নিজের চেষ্টায় গুহা হইতে জোর করিয়া মাথা উঠাইয়া আবার দেখি সামনে বিস্তৃত পশোর নদী, ওপারের সবুজ গোলগাছ ও হেঁতালঝোপের সারি। অস্পষ্ট দেখাইতেছে দূরের তটরেখা। নদীর বুকে রৌদ্র চিকচিক করিতেছে।

কে একজন বলিয়া উঠিল কানে গেল—বেঁচে আছে! বেঁচে আছে!

wapsip.com

আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবিলাম—কে বাঁচিয়া আছে, কাহার কথা বলিতেছে ডিঙির লোকেরা?

অমনি আবার বুঝিলাম মাছটা আমাকে একটা প্রবল ডানার ঝাপটা মারিয়া অবশ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। আমরা হাঁটু তখন মুক্ত, যে কারণে হউক, মাছটা আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এবার কামড়াইবার পূর্বেই আমাকে ডিঙিতে উঠিতেই হইবে। জলের জানোয়ার জলে বাঘের মত শক্তি ধরে। আমি সেখানে অসহায়। এবার আমাকে ডুবাইয়া মারিবে।

আমি সাঁতার দিয়া ডিঙির দিকে আসিবার চেষ্টা করিতেই আর একটা ভীষণ ডানার ঝাপটা খাইলাম। এবারের ঝাপটায় আমার সারাদেহ যেন অবশ হইয়া গেল। আমি দুই পা জলের উপর ভাসাইয়া জল ঠেলিয়া ডিঙির কাছে আসিতে চেষ্টা করিলাম।

অনেকগুলো হাত একসঙ্গে আমাকে টানিয়া ডিঙির উপর তুলিয়া লইল। ডিঙির উপর উঠিতেই আমি হাঁটুর নীচে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিলাম। এতক্ষণ যন্ত্রণা বুঝিতে পারি নাই। হাঁটুর নীচে চাহিয়া দেখি, রক্তে সে জায়গাটা লাল হইয়া গিয়াছে।

নিবারণ বলিল—এঃ, কি কামড় দিয়েছে দেখো!

যন্ত্রণায় আমি মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছিলাম—মাঝে মাঝে জ্ঞান হইতেছিল। অনেকে কি সব শিকড়-বাকড়ের রস মাখাইতে লাগিল, বাঁধাবাঁধি করিল। যখন ভালো জ্ঞান হইল, তখন দেখি মনু আমার শিয়রে। আনন্দে উহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম—ভাই মনু, আমি কোথায়?

—চুপ করো। তুমি বাড়িতে।

—কি করে এলাম?

—কাল রাতে দিয়ে গিয়েছে।

সে কি কথা! কাল রাত্রির কথার মানে বুঝিলাম না। দুপুরে আমাকে মাছে কামড়াইয়াছিল জানি। এতক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল না—

বলিলাম—এখন বেলা কত?

—বিকেল হয়েছে।

—মাছটা মারা হয়েছে?

—কোন্ মাছ?

—যে মাছ আমাকে কামড়েছিল?

—তোমাকে মাছ কামড়ায় নি।

—কে কামড়ে ছিল?

—হাঙরে।

—সে কি? আমি যে দেখলাম দয়ে-ভাঙন মাছ জালে পড়লো—

—সেটা দয়ে-ভাঙন নয়, সেটা মস্ত ভীষণ মানুষ-খেকো হাঙর।

আমার সারদেহ শিহরিয়া উঠিল, চৈতন্য আবার লোপ পাইবার উপক্রম হইল। হাঙরের হাতে পড়িয়া কি করিয়া বাঁচিয়া ফিরিলাম? সর্বনাশ! বাঁচিয়া আছি তো?

ডাকিলাম—ও ভাই মনু—

—কথা বোলো না!

—হাঙর কি করে জানা গেল? কে বললে হাঙর?

—সেটা মারা পড়েছে। কাল দেখো তার পেটে একটা মানুষের হাতের বালা পাওয়া

wapsip.com

গিয়েছে। হাঙর মিষ্টি জলেও যায়। কোনো গ্রামের কাউকে ধরেছিল—ছোট মেয়ের হাতের বালা।

—দেখি বালাটা?

—না, এখন চুপ করে থাকো। কাল সব দেখাবো।

পরদিন অনেকখানি সুস্থ হইয়া উঠিলাম। নিবারণ আসিয়া বলিল—বাঘ দেখেছ? ফাঁদে পড়েছিল যে—

—কোথায় বাঘ?

—তোমাকে যে বাঘ প্রায় শেষ করেছিল হে! জলের বাঘ!

—তুমি কি আমাকে ওই বাঘ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলে?

—না, ডাঙার বাঘও দেখাবো। দাঁড়াও জলের বাঘ দেখাই।

নিবারণ সেই প্রকাণ্ড হাঙর আমার সামনে টানিয়া আনিল। তাহার বিকট দশনপাটি দেখিয়া বুঝিলাম কাল জলের মধ্যে আমার কি বিপদ গিয়াছে। এই ভীষণ বাঘের হাত হইতে নিতান্ত যে রক্ষা পাইয়াছি, তাহা ভগবানের দয়া।

মনু বলিল—এই দেখো সেই বালা। এর আসল দাঁত তুমি দেখোনি। চামড়ার খাপে ঢাকা থাকে, এই দেখো দেখাই।

ছোট্ট বালা দুইটি হাতে করিয়া কষ্ট হইল। কোন্ বালিকার প্রাণনাশ করিয়াছে এই হিংস্র নরখাদক জানোয়ারটা? দেখিতে অবিকল দয়ে-ভাঙন অথবা আড়মাছের মত। কে জানে সেটা অত ভীষণ জানোয়ার! খাপে ঢাকা উহার ছেদনদন্তগুলি ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ ও ভয়ানক।

পায়ের নীচের দিকে চাহিয়া দেখি অনেকটা পটি দেওয়া বাঁধা। এক মাস পরে জংলী লতাপাতার রস মাখাইতে মাখাইতে ঘা সারিয়া গেল। সকলে বলিল, পুনর্জন্ম! কারণ হাঙরের দাঁতের বিষে ঘা পচিয়া মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এদেশে প্রবাদ আছে—কুমীরে নিলে বরং বাঁচে, হাঙরের ঘায়ে সাবাড়!

রোগশয্যায় শুইয়া বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।

বাড়ি হইতে বেশিদূর কোথাও যাই না আজকাল। একটা কেওড়া গাছের ছায়ায় বসিয়া ছবি আঁকি মনে মনে, নয়তো মনুর সঙ্গে গল্প করি। বই পড়িতে ভালবাসি—কিন্তু এখানে বাংলা বই কোথায়? দেশে আমার বাবার কত ভাল ভাল বই আছে—এখন মনে পড়িল। সেদিন বিকালে কেওড়াতলায় বসিয়া বড় মন খারাপ হইয়া গেল। যদি এযাত্রা মরিয়া যাইতাম তবে মার সঙ্গে দেখার আশাও চিরতরে লুপ্ত হইত। মা কি ভাবিতেছেন কি জানি? তিনি কি রোজ আমার কথা ভাবিয়া চোখের জল ফেলেন না? মনু পিছন হইতে আসিয়া চোখ টিপিয়া ধরিল।

—ছেড়ে দাও হে, আমি জানি।

—কি ভাবছো?

উহার দিকে চাহিয়া বলিলাম—জানো না?

সে বলিল—জানবো কি করে?

—খুব জানো!

—বাড়ির কথা তো?

—তবে? মার কথা!

মনু চুপ করিয়া গেল। আমার বড় দুঃখ হয়, আমার দুঃখের কথায়, কষ্টের কথায় ও সহানুভূতি দেখায় না কেন? মনু আমাকে বলিল—আমাকে লেখাপড়া শেখাবে? আমি

wapsip.com

বলিলাম—বাংলা না ইংরিজি? মগ-ভাষা তো জানিনে। কত গল্প হইত দুজনে। সবই ভালো। কিন্তু বাড়ির কথা বলিলে মনু চুপ হইয়া যায়। কিছুক্ষণ বসিয়া সে চলিয়া গেল। তারপরে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে। আমার পিছন হইতে কে আসিয়া আমার মাথায় হাত দিল। চমকিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম সেদিনকার বনবিবিতলার সেই মা! আমার হাতে এক ছড়া পাকা কলা ও চারিটি বড় মুড়ির মোয়া দিয়া বলিলেন—তোমার জন্যে এনেছি, খাও। সব শুনলাম নিবারণের কাছে, হাঙরে নাকি ধরেছিল তোমায়?

অবাক হইয়া মার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম—হুঁ।

—কোথায় দেখি?

—এই যে হাঁটুতে।

—আহাহা, কি সর্বনাশ!

তিনি আমার পাশে বসিয়া অনেক ভালো ভালো কথা বলিলেন। আমাকে কলা ও মুড়ির সব মোয়াগুলি খাওয়াইলেন, আমার নিজের মা আজ এখানে থাকিলে এরকমই করিতেন। এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিলেন—তোমাকে বাড়ি পাঠাবার চেষ্টা করেছি অনেক, কিন্তু পেরে উঠছি না। এদের সবাই ভয় করে কিনা।

আমি বলিলাম—কি চেষ্টা করেছেন?

—ডিঙি ভাড়া করে তোমাকে পাঠাবার চেষ্টা করেছি, কেউ যেতে চায় না।

—দরকার নেই এখন। আপনার কোন বিপদ হয় এ আমি চাই না।

—কতদিন হল এনেছে তোমায়?

—তিন বছর হয়ে গিয়েছে। তেরো বছর বয়সে এনেছিল, এখন আমার বয়েস ষোল।

—আহা-হা! কি করে আছেন তোমার মা? তোমার যেতে ইচ্ছে হয় তো?

—অনেক সয়ে গিয়েছে মা। আপনাকেই মা বলে ডাকি।

তিনি হাসিয়া আমরা মাথায় হাত দিয়া আদর করিলেন। আমার জন্যে আবার খাবার লইয়া আসিবেন বলিলেন। আমি কি খাইতে ভালবাসি—মুড়ির মোয়া? মাছের তরকারি? উহারা মগ—মাছের তরকারি রান্নার কি জানে? তিনি ভালো ভাবে তরকারি রান্না করিয়া আমাকে খাওয়াইতে আসিবেন! মা চলিয়া গেলেন।

কতক্ষণ পর্যন্ত আমি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম সেদিকে।

মনু একদিন আমায় বলিল—ভাই, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে। চলো নিবারণ আসবার আগে আজ আমরা ডিঙি নিয়ে বার হই।

পশোর নদীর মধ্যে পড়িয়া আমরা ধীরে ধীরে অনেক দূরে গেলাম। জঙ্গলের মধ্যে সেখানে একস্থানে ডিঙি বাঁধিয়া মনু আমায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে লইয়া গেল। তখন গ্রীষ্মের শেষ, বর্ষা দেখা দিয়েছে। নাবাল জমি ডুবিতে শুরু হইয়াছে। মৌমাছির উপদ্রবে জঙ্গলে হাঁটা নিরাপদ নয়, কারণ এ সময় মৌমাছির ঝাঁক গৃহহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। বেতের টক ফল খাইতে খাইতে আমরা কত দূর গেলাম।

সেখানে জঙ্গলের মধ্যে একটা গোলপাতার ঘর দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া মনুকে জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিল—এখানে এসো, বসা যাক। এ আমাদের ঘর। তোমাকে আর আমাকে আজ এখানে আসবার কথা বাবা বলে দিয়েছে।

—কেন?

—আজ আমাদের বোম্বেটের কাজে ভর্তি হতে হবে।

wapsip.com

—সে কি কথা।

—তাই। এটা জলের ডাকাতদের ঠাকুরঘর। এখানে দীক্ষা হয়।

—দীক্ষা?

—ডাকাতদের কাজে ভর্তি হবার আগে এখানে পুজো দিতে হয়। অনেক কিছু করতে হয়। তোমাদের কথায় তাকে দীক্ষা বলে তো, সেদিন বইয়ে পড়লে যে!

মনুকে ইতিমধ্যে আমি বই পড়াইয়াছি খানকতক, বাংলা বেশ ভাল শিখাইয়াছি। বিদ্যার গুণে উহার মন যে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতেছে, এ আমি বুঝিয়াছি। হাজার হউক, আমাদের বয়স বাড়িয়াছে, অনেক কিছু বুঝি, অনেক কিছু ভাবি। মনুর বাবা এ সমস্ত তত পছন্দ করেন না, তাও জানি। মনুর অনুরোধে তিনি খুলনা হইতে বাংলা বই মাঝে মাঝে আনিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাকে বলেন, বেশি বই পড়িয়া কি বাঙালী বনিয়া যাইবি নাকি? অত বই পড়ার মধ্যে কি আছে?

মনুর কথা শুনিয়া প্রমাদ গনিলাম। আমাকেও কি ডাকাত হইতে হইবে না কি?

মনু বলিল—আমার অনুরোধে তোমাকে বিক্রি করা হয় নি। তোমার আমার ভাব দেখে বাবা ঠিক করেছেন আমাদের একসঙ্গে রাখবেন। নইলে আরাকানে কিংবা রেঙ্গুনে তোমাকে বিক্রি করা হত।

—বলো কি!

—তাই।

—এখন কি করবে ভাবছো?

—তুমি যা বলবে তাই করবো। ঐ জন্যেই একটু আগে এখানে তোমাকে নিয়ে এলাম।

বেশি কথা বলিবার সময় পাওয়া গেল না। মনুর বাবা ও আরও কয়েকজন লোক একখানা ছিপে আসিয়া পড়িল। এই দস্যুদের আমি দেখিতে পারি না। মনুর বাবার মধ্যে মানুষের হৃদয় নাই জানি, থাকিলে আমায় এভাবে বন্দী করিয়া রাখিতে পারেন কি?

মনুর বাবা বলিলেন—সব তৈরি হয়ে নাও। আজ তোমাদের ভর্তি হবার দিন। নেয়ে এসো নদীর জলে। মুরগী বলি দিয়ে আমরা কাজ আরম্ভ করবো।

আমি বলিলাম—কি কাজ?

—বললাম যে, আমাদের দলে তোমাদের ভর্তি করে নেবো আজ!

—মনুকে নিন। আমি ডাকাতি করবো না।

—তোমার কথায় হবে?

—দেখুন আপনি আমার বাবার মত। মিথ্যে কথা বলবো না আপনার সঙ্গে। আমি ভদ্রবংশের ছেলে, এ কাজ আমার নয়। আমার বয়েস হল সতের বছর, সব বুঝি।

—ওসব চলবে না।

—মানুষ খুন আমার দ্বারা হবে না। লুঠপাটও হবে না।

—তোমাকে বিক্রি করে দেবো, জানো? কেনা চাকর হয়ে চীন দেশে গিয়ে থাকতে হবে।

—যা হয় করুন। ডাকাতি আমার দ্বারা হবে না।

মনু বলিল—বাবা , আমারও এই মত।

মনুর বাবা ভয়ানক রাগিয়া গেলেন। আমাকে বলিলেন—তোমার সঙ্গে মিশে মনুও উচ্ছন্নে গিয়েছে তা আমি সন্দেহ করেছি আগে থেকেই। আজ শুধু তোমাদের পরীক্ষা করবার

wapsip.com

জন্যেই এখানে এনেছি, তা জানো? কি করতে চাও তোমরা? কি করে খাবে এর পরে?

আমি আকাশের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলাম—ওঁর ওপর নির্ভর করুন। তিনি যা করেন। পরের জিনিস লুঠ করে খেতে তিনি নিশ্চয় বলবেন না। আপনারও বয়েস হয়েছে, ভেবে দেখুন।

মনুর বাবা একে রাগিয়া ছিলেন, এবার আমার মুখে ভগবানের কথা শুনিয়া তেলেবেগুনে জ্বলিয়া আমাকে লাঠি তুলিয়া মারিতে আসিলেন। মনু গিয়া তাঁহার হাতের লাঠি ধরিয়া ফেলিল। তাঁহার সঙ্গের লোকেরাও বাধা দিল। উহাদের মধ্যে একজন বলিল—এরা যা বলছে ভেবে দেখুন সর্দারজী। ডাকাতি করা চলবে না। দুখানা পুলিশ লঞ্চ্ সর্বদা ঘুরছে শুধু এক পশোর নদীতে। ফরেস্ট বিভাগের লোকও আজকাল খুব সতর্ক।

মনু বলিল—বাবা, আপনারা যা করেছেন, তা করেছেন। কাল বদলাচ্ছে না? ভেবে দেখুন, আগে যা করেছেন, তা এখন আর করতে পারেন কি?

এই পর্যন্ত কথা হইয়াছে, এমন সময় জঙ্গলের ওধারে হুইসিল শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একবার বন্দুকের আওয়াজ হইল। আমরা জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া যাইতেছি, এমন সময় জনচারেক পুলিসের পোশাক পরা লোককে অদূরে দেখিতে পাইলাম। ইহারা সকলেই বাঙালী, দেখিয়াই মনে হইল।

একজন আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিল। চাহিয়া দেখিলাম, মনুর বাবার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি বেশ বুঝিয়াছেন, এবার আর কোন উপায় নাই। পুলিস কি তাঁহার সন্ধানে আসিল। পরক্ষণেই দেখা গেল তাহা নহে, পুলিশ ইহারা নয়, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক। আমাদের বলিল—কে?

মনুর বাবা বলিলেন—যাত্রী।

—কিসের?

—পুজো দিতে এসেছি ঠাকুরের কাছে।

—কিসের ঘর এ?

—বনবিবির দরগাঘর।

—তুম তো দেখছি মগ, কী নাম, কী করো?

—আমার নাম টুং পে নু। আমি মাছ-ধরা-জেলে, এরা সব আমার লোক।

—কোথায় মাছ ধর?

—পশোর নদীর মধ্যে আর খালে।

—মাছ-ধরা পাশ আছে? দেখাও!

—এখানে তো মাছ ধরতে আসিনি হুজুর। দরগাতলায় পুজো দিতে এসেছি।

—খবরদার গাছ কাটবে না।

—না না, সে কি কথা! গাছ কাটবো কেন?

তাহাদের মধ্যে একজন আমার দিকে অনেকক্ষণ হইতে চাহিয়া ছিল, আমার কাছে আসিয়া বলিল—এ কে?

মনুর বাবা বলিলেন—আমার এখানে কাজ করে।

—এ তো দেখছি বাঙালী।

—ওর কেউ নেই। অনেকদিন থেকে আমার কাছে আছে।

—তোমার নাম কি ছোকরা?

wapsip.com

আমার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিতেছে। চাহিয়া দেখি উহাদের সকলের মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে। এমন কি মনুরও। এই তো আমার অবসর, এই সময় কেন বলি না আমার আসল কথা? উহারা দুজন বন্দুকধারী লোক। উহাদের কাছে ইহারা কি করিবে? আমার মুক্তির এই তো শুভক্ষণ উপস্থিত!

মনুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাহার চোখ-মুখে কাতর প্রার্থনার আকুতি। মনুর বাবার মুখও শুকাইয়া গিয়াছে। উদ্বিগ্ন দৃষ্টি আমার মুখের দিকে নিবদ্ধ। ভগবান এবার কি সুবিচার করিয়াছেন, দয়া করিয়া কি শুভক্ষণ জুটাইয়া দিয়াছেন? একবার মুখের কথা খসাই না কেন?

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, ইহাও এক প্রকারের বিশ্বাসঘাতকতা। মনুকে ভাই বলিয়া ডাকি, তাহার বাবাকে এরূপ হীনভাবে ধরাইয়া দিলে আমার ভাল হইবে বটে কিন্তু উহাঁদের সর্বনাশ হইবে। মনু কোন অপরাধ করে নাই, সে তখন নিতান্ত বালক ছিল—বাবা যাহা করেন, সে কি ভাবে তাহাতে বাধা দিতে পারিত?

এসব চিন্তা ভাবনা চক্ষের নিমেষে মনের মধ্যে করিয়া ফেলিলাম। ভাবিবার সময় কই? বড় হইয়াছি, আগের চেয়ে অনেক কিছু বুঝি। পুলিশের লোকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, আমার নাম নীলমণি রায়। আমি এদের এখানে কাজ করি? অনেক দিন আছি।

পুলিশের লোক বলিল—তোমার কেউ নেই?

ঢোক গিলিয়া বলিলাম—না।

—আচ্ছা যাও, গাছ যেন কাটা না পড়ে।

উহারা সবাই একযোগে চলিয়া গেল।

মনুর বাবা আমার কাছে আসিয়া আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া কি দেখিল, তারপর আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—সাবাস ছেলে! বাহবা বাবা! মনু আমার হাত দু'খানা ব্যাগ্রতার সহিত জড়াইয়া ধরিল। সঙ্গের দু'একজন লোক বলিল—ভালোবংশের ছেলে বটে, বাঃ!

মনুর বাবা আমার ও মনুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বোসো এখানে! আমি আজ বড় বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম একটা কাঁচা কাজ করবার জন্যে। এমন কাঁচা কাজ জীবনে কখনও করিনি। জীবনটি আজ চলে যেত। এই ছোকরা আজ আমাদের সকলের প্রাণ বাঁচিয়েছে। যে আমার বন্দী, তাকে নিয়ে দিনমানে কখনও একত্র বার হইনি, আজ তা বার হয়েছিলাম। নীলু বড় ভাল ছেলে, তাই আজ আমরা সবাই বেঁচে গেলাম। চলো আজ বাড়ি যাই, আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি খেতে চাও বলো? বড় মাছ না খাসির মাংস? যা ইচ্ছে বলো!

আমার মনের মধ্যে একটি অপূর্ব ভাব আসিয়াছে তখন। খাওয়া অতি তুচ্ছ তাহার কাছে।

বলিলাম—যা হয় খাওয়াবেন, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু আমার দু'একটি কথা শুনবেন কি দয়া করে? মনুকে ভাইয়ের মত দেখি, এ মুখের কথা নয়, তা তো দেখলেন!

মনুর বাবা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—না না, আগে বলো কি খাবে? বড় মাছ না খাসির মাংস?

—খাসির মাংস।

—বেশ, আমি এখুনি যোগাড় করে আনছি। তুমি আর মনু বাড়ি যাও। তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।

আমাকে সন্ধ্যার পর মনুর বাবা তাঁহার কাছে ডাকিলেন। আমি কোন কথা না বলিয়া

wapsip.com

চুপ করিয়া রহিলাম। মনুর বাবা বলিলেন—দেখো, আজ তোমার কাজে বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমাদের আজ পুলিশে না ধরিয়ে দিয়ে একটা অদ্ভুত কাজ করেছ। তুমি যা খেতে চাও—অর্থাৎ খাসির মাংস, কাল সকালে তোমাকে খাওয়াবো—

আমি মাথা নিচু করে বলিলাম—আমাকে মুক্তি দিন—

—সে তো তুমি আজ নিজের ইচ্ছেতে নাও নি! তোমাকে ছেড়ে দিতাম আজই, কিন্তু মনু তোমাকে বড় ভালবাসে, তাই ভেবে পিছিয়ে যাচ্ছি। ওর লেখাপড়া যদি একটু হয়, তবে এ কাজ বন্ধ করে দেবো। পুলিশ বড় পেছনে লেগে আছে, এ কাজ আর চলবে না।

—আমাকে এখন কি করতে বলেন?

—তোমাকে আমি ছেড়েই দিলাম। যেখানে খুশি যেও, ইচ্ছে হয় আমাকে বোলো। যা খেতে চাও তোমাকে খাওয়াবো, কিন্তু একেবারে চলে যেও না। তুমি আমার ছেলের মত। তুমি চলে গেলে তো আমাদের বড় কষ্ট হবে। মনুকে তুমি মানুষ করে দাও।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। এ জীবন আমার বেশ লাগিতেছিল। বদ্ধ জীবনের চেয়ে অনেক ভাল। দিনে দিনে এ জীবনকে আমি ভালবাসিয়াছি। কেবল ভাবি, মা কেমন আছেন, কি ভাবে আছেন! সেদিন বসিয়া অনেক কিছু ভাবিলাম। বাড়ি তো যাইবই, কিন্তু এ জীবনের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে—আর এখানে ফিরিতে পারিব না, আর এ জীবনে ফিরিতে পারিব না। তার চেয়ে আর কিছুদিন থাকিয়া যাই। মনুর উপর একটা মায়া পড়িয়াছে, হঠাৎ ছাড়িয়া গেলে সে তো কষ্ট পাইবে।

মনুকে লইয়া বিকালে বাহির হইলাম। এক জায়গায় একটা গাছের গুড়ির মধ্যে কি পাখি বাসা বাঁধিয়াছিল, মনু আমাকে দেখাইতে লইয়া গেল।

আমি বলিলাম—ওর মধ্যে হাত দিও না যেন, সাপ থাকে।

—সে আর আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না। মনে নেই সেই সাপের কথা!

—মনে নেই আবার?

কথা শেষ হইতে না হইতে মস্ত বড় একটা গোখুরা সাপ গাছের খোড়লের ভিতর হইতে ফোঁস্ করিয়া উঠিল। মনুর অমনি সাপটার গলা চাপিয়া ধরিল ডানহাতে। সাপটা তাহার হাতে পেঁচ দিয়া জড়াইতে লাগিল। সে এক ভয়ানক দৃশ্য হইল দেখিতে। আমি তাড়াতাড়ি হাতের দা দিয়া সাপটাকে খানিকটা কাটিয়া ফেলিলাম—তাহাতে সে এমন জোর করিতে লাগিল যে মনু তাহার মুখ আর চাপিয়া রাখিতে পারে না। মনুর হাতের উপর আমিও জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলাম। ইতিমধ্যে বিপদের উপর বিপদ—কোথা হইতে আর একটা সাপ দেখি আমাদের দুজনের মাথার উপর দুলিতেছে। ডালে তাহার লেজ আটকানো। আমি চিৎকার করিয়া উঠিলাম। কিন্তু সাপটা আমার কাছেও আসিল না, ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল এবং থুথুর মত জিনিস আমাদের দিকে জোরে ফেলিতে লাগিল।

মনু বলিল—সাবধান! চোখ ঢাকো—চোখ ঢাকো—চোখ অন্ধ হয়ে যাবে—

আমি চোখ ঢাকিলে মনু মারা পড়ে, মনুও চোখ ডাকিতে পারে না। চোখ অন্য দিকে ফিরাইয়া যতদূর সম্ভব চোখ বাঁচাইতেছি—মনুকে বলিলাম—খুব সাবধান, চোখ সাবধান—

সাপের থুথু লাগিতেছে আমার ঘাড়ে, মাথার চুলে, কানের পাশে। চোখ ভয়ে চাহিতে পারিতেছি না, মনুরও নিশ্চয় সেই অবস্থা। মিনিট দশ বারো এই অবস্থায় কাটিল, সাপের থুথু-বৃষ্টি আর থামে না। চাহিয়া দেখিতে ভরসা পাইতেছি না, সাপটা আমাদের কাছে আসিতেছে না দূরে যাইতেছে।

wapsip.com

আমাদেরও সেখান হইতে চলিয়া যাইবার কোন উপায় নাই। সাপটা একটা কেয়াঝোপের মধ্যে—যে জায়গাটুকু ফাঁক, সেখানেই ঐ সাপটা থুথু ছুঁড়িতেছে। কেয়াকাঁটার মধ্যে হাতে সাপ জড়ানো অবস্থাতেই শেষে সন্তর্পণে ঢুকিয়া গেলাম দুজনে। হাত-পা কাঁটায় ছড়িয়া গিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। সেই কেয়াবনের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি সন্তর্পণে সাপটাকে প্যাঁচাইয়া কাটিয়া তিনটুকরা করিলাম—শোল কিংবা নেটা মাছের মত। রক্তে মনুর কাপড় ভাসিয়া গেল। মরা সাপটাকে হাত হইতে খুলিয়া ফেলিয়া আমরা সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরি।

রাত্রে কিন্তু ভাত খাইয়া মনু আমাকে বলিল—আবার সেই গাছের খোড়লে যেতে হবে এখন!

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম—কেন?

—আছে মজা।

—কি শুনি না? একবার বিপদে পড়ে আশ মেটে নি?

—তা নয়। আমি ওখানে বিনা কারণে তখন যাইনি।

—কি কারণে বলো। সেবার তো প্রাণ যেতে বসেছিল।

—ওখানে সাপের মণি আছে।

—কি সাপ?

—সে আমি কি জানি, চলো দেখাবো।

সত্যই সাপের মণি আছে। আমি কখনও শুনিনি। মনু আমাকে সে অন্ধকার-রাত্রে বনের মধ্যে কেয়াগাছের কাঁটার পাশে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইল। দুজনে তারপর সেই গাছটার ডালে উঠিয়া বসিলাম।

আমি বললাম—মণি কই? গাছে উঠলে কেন?

—সাপ আমাদের গাছের তলা দিয়ে যাবে একটু পরে।

—কি সাপ?

—গোখুরা বা অজগর। নিজের চোখেই দেখো।

কিছুক্ষণ পরে ঘোর অন্ধকারে আমাদের গাছের নীচে একটা জোনাকির মতো কি জিনিস চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্নিগ্ধ স্থির আলো, জোনাকির মত একবার জ্বালিয়া আবার নিবিয়া যায় না। মনু বলিল—দেখেছ?

—অই নাকি?

—অই তো! তোমার কি মনে হয়?

—বুঝতে পারছি নে।

জিনিসটা অনেকক্ষণ নড়িয়া বেড়াইল। তারপরে আমাদের গাছটার ঠিক নীচে আসিয়া স্থির হইয়া রহিল। কি জিনিস কিছুই বুঝিলাম না।

মনু বলিল—সেই সাপটা!

—কোন্‌টা?

—যেটা থুথু ফেলেছিল?

—তুমি কি করে জানলে?

—আমি অনেক দিন থেকে দেখছি।

—মণি কি করে নেবে?

wapsip.com

এক তাল গোবর ওর ওপর চাপা দিতে হবে। একটু পরে মণি নাবিয়ে রেখে সাপটা পোকামাকড় খুঁজবে, সেই সময়।

কিন্তু সে সুযোগ সাপটা আমাদের দিল না! খানিকটা এদিক ওদিক নাড়িয়া চড়িয়া সেটা চলিয়া গেল। আমরা আবার পরদিন সন্ধ্যার পর সেখানে গেলাম। সেদিনও সাপ আসিল বটে কিন্তু মণি নামাইতে তাহাকে দেখিলাম না। সে-রাত্রে আর কিছু হইল না, পরের রাত্রেও সেরকম গেল।

আরও দু'দিন কাটিল। মনু বল্লম লইয়া গিয়াছিল সেরাত্রে। বল্লম তুলিয়া মারিতে গেলে আমি উহার হাত ধরিয়া বারণ করিলাম। সাপের মণি আছে কিনা জানি না, কিন্তু শুনিয়াছি এভাবে মণি সংগ্রহ করিলে অমঙ্গল হয়। মনু ও আমি ফিরিয়া আসিলাম। দিনদশেক পরে মনু একটি মরা সাপ আমাকে দেখাইল। তাহার মাথার উপর একটা সাদা আঁশ। মনু বলল—এই দেখো মণি, কাল রাতে একা গিয়ে সাপটাকে মারি। আলো তখুনি নিবে গেল। বুড়ো সাপের মাথায় এই রকম আঁশ হয়, রাত্রে জ্বলে। একেই বলে সাপের মণি। সব সাপের হয় না, কোন কোন সাপ বুড়ো হয়ে গেলে এই আঁশ গজায়।

আমাদের ছোট গ্রামটি থেকে কিছু দূরে একটা জায়গা আছে, তার নাম 'মগের ট্যাঁক'।

এখানে আমরা হরিণ মারিতে আসিয়াছি—নিবারণ, মনু ও আমি। আমি কখনও এখানে আসি নাই। হরিণ মারিব বলিয়াও আসি নাই, আমি আসিয়াছি এজন্য যে এখানে সমুদ্রের শোভা দেখিতে পাইব। মগের ট্যাঁক একেবারে সমুদ্রের ধারে। ঘোলা জলের সমুদ্র নয়, নীল ঊর্মিমুখর বিশাল সমুদ্র মগের ট্যাঁকের ঘন সবুজ দীর্ঘ তৃণভূমির একেবারে নীচে। অনেক সময় জোয়ারের জল তৃণভূমি ছুঁইয়া থাকে।

একটা বড় কেওড়া গাছে উঠিয়া আমরা সকলে বসিয়া আছি। সামনে হাত-পঞ্চাশ দূরে অকূল সমুদ্র! গাছের উপর হইতে কি অদ্ভুত সে দৃশ্য! বড় বড় ঢেউয়ের দল আছাড় খাইয়া পড়িতেছে মগের ট্যাঁকের নীচের বেলাভূমিতে। সাদা সাদা ফেনার ফুল ঢেউয়ের মাথায়।

মনু বলিল—কেমন মাছ ধরবার জায়গা!

—তার চেয়েও ভাল এর চমৎকার দৃশ্য!

—সে তো সব জায়গায় আছে। এমন মাছের জায়গা কিন্তু কোথাও নেই। আরাকান থেকে মগ জেলেরা এসে এখানে আগে আগে মাছ ধরতো। তাই এর নাম মগের ট্যাঁক। গোলপাতার ঘর বানিয়ে এখানে দু-তিন মাস বাস করতো। মাছও যা ধরতো—

—ভুল করছো মনু—চমৎকার দৃশ্য সব জায়গায় নেই। এদিকে চেয়ে দেখো—এমন আকাশ, এমন নীল রং—

—আমি তো কিছু দেখতে পাই না—

—খুব দেখতে পাও। দেখার চেষ্টা করলে দেখতে পাবে—দেখতে শেখো।

এমন সময় আর একটি নতুন দৃশ্য আমাদের চোখে পড়িল। একপাল হরিণ অদূরের জঙ্গল থেকে বাহির হইয়া তৃণক্ষেত্রের মধ্যে সুঁড়িপথ দিয়া এদিকেই আসিতেছে। সরু পথ সুতরাং হরিণগুলো একটির পিছনে আর একটি—দীর্ঘ সারি একটি। পথও আঁকবাঁকা, হরিণের দীর্ঘ সারির গতিও আঁকাবাঁকা। সবসুদ্ধ মিলিয়া একটি ছবি। মনু আমার দিকে চাহিল। তাহার হাতে বন্দুক। আমি ইশারায় বারণ করিলাম। এমন সুন্দর মনোরম হরিণের সারি কি বন্দুকের গুলির নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙিয়া দেওয়া যায়? সেটা মানুষের কাজ কি?

মনু না বুঝিয়া আমায় চুপি চুপি বলিল—তুমি গুলি করবে?

wapsip.com

—না।

—তবে আমি মারি?

—না, চুপ করে থাকো। শুধু দেখে যাও।

মনু আগের মত আর নাই; নতুবা আমার কথা শুনিত না। সে মগ ডাকাতের ছেলে, বোঝে লুঠপাট, রক্তপাত। আমার সঙ্গে মিশিয়া সে বুঝিতেছে, নিষ্ঠুর রক্তপাতই জীবনের শেষ কথা নয়। দয়া বলিয়া জিনিস আছে, সৌন্দর্য বলিয়া জিনিস আছে। সবটা বুঝিতে পারে না, তবুও বুঝিতে চেষ্টা করে। হরিণের দল সমুদ্রের ধারে গিয়া দাঁড়াইল—মগের ট্যাকে নির্জন নাকে, নাক যেখানে সমুদ্রে ঢুকিয়াছে। সম্মুখে নীল সমুদ্র, তাহার তটে নির্জন তৃণভূমিতে বিচরণরত একদল হরিণ—ইহার মত সুন্দর ছবি জীবনে দেখি নাই। বন্দুকের বেখাপ্পা আওয়াজ করিয়া সে ছবি নষ্ট করিতে দিব না।

নিবারণ শিস দিল। শিসের শব্দে হরিণগুলি চমকিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

নিবারণ বলিল—মারো, মারো, এইবার মারো—

মনু বলিল—আঃ, সব পালালো!

আমি বলিলাম—এমন ছবিটা ভেঙে দিলে নিবারণ?

নিবারণ গাছ হইতে লাফাইয়া হরিণের দলের পিছু পিছু ছুটিল। হরিণেরা প্রাণের ভয়ে তৃণভূমিতে ইতস্তত বিশৃঙ্খলভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই বা কি সুন্দর ছবি। সবগুলি ঢুকিয়া পড়িল বনের মধ্যে এবং অদৃশ্য হইয়া গেল চক্ষের পলকে। নিবারণ উহাদের সঙ্গে বনের মধ্যে ঢুকিল।

মনু বলিল—ও কি দিয়ে হরিণ মারবে?

—কি জানি!

আমরা সেই তৃণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সমুদ্র দেখিতেছি; মিনিট দশেক কাটিয়া গিয়াছে, এমন সময়ে জঙ্গলের মধ্যে নিবারণের আর্ত চিৎকার শুনিয়া দুজনেই জঙ্গলের দিকে ছুটিলাম। আমার মনে হইল গাছের উপর হইতে স্বরটি আসিয়াছে। মনুকে সাবধান করিয়া দিলাম—অজানা জঙ্গলে এভাবে না ছুটিয়া পথ দেখিয়া চলো। খানিকটা গিয়া দেখি নিবারণ একটা কেওড়াগাছের উপর বসিয়া পরিত্রাহি চিৎকার করিতেছে। কেন সে চিৎকার করিতেছে কিছু বুঝিলাম না। মনুকে আবার সাবধান করিয়া দিলাম।

মনু বলিল—কি নিবারণ?

নিবারণ হাত নাড়িয়া বলিল—এসো না, এসো না হোদো গাছের তলায় বাঘ—হরিণের দল তাড়া করেছিল। আমার গাছের তলায় বাঘ দাঁড়িয়ে আছে, তোমরা উঠে পড়।

উহার গাছের তলায় বড় বড় হোদো গাছের জঙ্গল। হোদো জঙ্গলে বাঘ লুকাইয়া থাকিলে বাহির হইতে বোঝা যায় না। হোদো গাছের পাতা বিদ্যাপাতার মত, তবে চার হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। এগুলিকে ইংরাজিতে টাইগার ফার্ন বলে, তাহা পরে জানিয়াছিলাম। মনু আমার হাত ধরিয়া নিকটের গাছে উঠিতে যাইবে, এমন সময় হোদো জঙ্গল দুলাইয়া বাঘ নিঃশব্দে এক লাফ দিয়া, মনু পূর্বে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে আসিয়া পড়িল। অর্থাৎ মনু আমাকে লইয়া না সরিলে সেই ভীষণ বাঘটা অব্যর্থ লক্ষ্যে তাহাকে ও আমাকে পিষিয়া দিত। বাঘে খাওয়া কিংবা আঁচড়ানো কামড়ানো পরের কথা—সাত আট মণ ওজনের একটা বাঘের তীব্র লাফের পূর্ণ ঝাপটেই তো আমাদের প্রাণ বাহির হইয়া যাইতে পারে!

মনু সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তুলিয়া গুলি করিল। গুলি খাইয়া বাঘ আর একটা লাফ মারিল

wapsip.com

যেখানে আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম। মনু গুলি করিয়া বাঁদিকে লাফ দিয়া সরিয়া গিয়াছে। বাঘ এবার আর এক লাফ মারিল কিন্তু আমাদের দিকে নয়—সেই টাইগার ফার্নের জঙ্গলের মধ্যে।

ততক্ষণ আমি আর মনু গাছের উপর ঠেলিয়া উঠিয়াছি।

নিবারণ বলিল—ভাই, আমাকে বাঁচাও।

আমরা বলিলাম—কেন, তুমিও তো গাছের ওপর—

—আমার হাতে কি আছে, আমি নামবো কেমন করে? ও যদি লাফ দিয়ে গাছে ওঠে।

—কিছু ভয় নেই। চুপ করে থাকো। আহত বাঘ বড় ভয়ানক জানোয়ার।

সেই অবস্থায় রাত্রি নামিয়া আসিল। ভয়ে আমরা কেহ গাছ হইতে নামিতে সাহস করিলাম না। আহত বাঘটা হয়তো ওৎ পাতিয়া আছে টাইগার ফার্নের জঙ্গলে, কে জানে? নামিলেই লাফ দিয়া ঘাড়ের উপর পড়িবে। আকাশে নক্ষত্র উঠিল। সমুদ্রের তীর হইতে হাওয়া বহিতে লাগিল। সমুদ্রে ঢেউয়ে আলো জ্বলে, রাশি রাশি জোনাকি জ্বলে প্রত্যেক ঢেউয়ের উলটানো পালটানোর খাঁজেখাঁজে। বাঃ রে!

মনু চেঁচাইয়া বলিল—নিবারণ! ঘুমিয়ে পড়ো না। পড়ে যাবে একেবারে, বাঘের মুখে—

নিবারণ বলিল—খিদে পেয়েছে, পেট জ্বলছে খিদেতে।

—চুপ করে থাকো।

আমি বলিলাম—নক্ষত্র দেখো। মনু ও আমি দুজনেই হাসিয়া উঠি।

সকাল হইলে আমরা গাছ হইতে নামিয়া, শিশির-ভেজা তৃণক্ষেত্রের মধ্য দিয়া সমুদ্রতীরে আসিলাম, সেখানে বসিয়া বসিয়া সমুদ্রের শোভা দেখিলাম। পরে ডিঙিতে চড়িয়া বাড়ি ফিরি। আসিবার সময় নিবারণকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সেই জিজ্ঞাসাটা আমার জীবনে একটা মস্ত বড় কাজ করিল। এখনও তাহা ভাবি। নিবারণকে বলিলাম—নিবারণ, আমাদের বাড়ি থেকে মগের ট্যাঁক কতদূর?

নিবারণ বলিল—কোশ-খানেক।

আমি উহাকে কিছু বলি নাই, কিন্তু মনে ভাবি, এক ক্রোশ তো দূর, তবে মাঝে মাঝে একাই আসিব। সমুদ্রের এমন দৃশ্য—কোথায় পাইব এমন রূপ!

মনুর বাবা আজকাল আমার উপর খুব সন্তুষ্ট। কোথাও যাইতে আসিতে আমার আর কোন বাধা নাই। সেদিন ইহারা আমার মেজাজ বুঝিয়া লইয়াছেন। আমার সঙ্গে অনেক পরামর্শ করিয়াছেন, পুলিশের ভয় ক্রমেই বাড়িতেছে, সেদিন আর নাই। মনুকে লেখাপড়া শিখাইয়া আরাকানে সেগুন কাঠের ব্যবসা করিয়া দিলে কেমন হয়। আমরা দুই ভাই সেই ব্যবসা চালাইতে পারিব না? আমি বলিয়াছি—আমাকে ছাড়িয়া দিন, দেশের ছেলে দেশে ফিরিয়া যাই। মনুর বাবা না-ও বলেন না, হাঁ-ও বলেন না।

কিন্তু ও বিষয়ে পাকাপাকি স্থির করিল নিয়তি! তাহাই বলিতেছি। আমার সেদিনের উদারতার পুরস্কার-স্বরূপ নিয়তি আমাকে হাত ধরিয়া চালাইল।

শরৎকাল তখন শেষ হইয়া আসিতেছিল। এই সময় মগের ট্যাঁকে তৃণভূমি জাগিয়া উঠে। নতুন তৃণভূমিতে হরিণের দল আসে। তাহা ছাড়া আছে সেই নীলসমুদ্রের মুক্তরূপ! একবার-দুইবারে দেখায় সাধ কি মিটে!

একাটি ডিঙি বাহিয়া চলিলাম—দুপুরের পর। আমি একা কখনও এ পথে আসি নাই! একটা খাড়ির মধ্যে ডিঙি ঢুকাইয়া ভাবিলাম সামনের খাল দিয়া বাহির হইব। অমন অনেক

wapsip.com

খাড়ি এদিকে ওদিকে গোলপাতার ও গরান জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে। মন অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ মনে হইল এ কোথায় আসিলাম? আমার বাঁ-পাশে অগণিত হেঁতালঝোপ ও টাইগার ফার্নের জঙ্গল। হেঁতাল গাছ দেখিতে সরু খেজুর গাছের মত, অমনি কাঁটাওয়ালা ঝাঁকড়ামাথা গাছ। তবে অত লম্বা বা মোটা হয় না। হেঁতাল ও টাইগার ফার্ন যেখানে থাকে, বাঘের ভয় সেখানে বেশি, তাহা জানিতাম। ডিঙি ভিড়াইবার ভরসা হয় না এমন জনহীন পাড়ে। কোথা হইতে বাঘ আসিয়া ঘাড়ে পড়িবে ঠিক কি?

অনেক দূর বাহিয়া আসিয়া দেখি মস্ত বড় একটি নদীর মোহানার সামনে পড়িয়াছি। এটা কোন্ জায়গা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যদি পশোর ও শিবসার মিলন-স্থল হয়, তবে তো অনেকদূর আসিয়া পড়িলাম। মগের ট্যাঁকে যাইতে হইলে বাঁদিকের ডাঙার কূলে যাই না কেন? তবে নিশ্চয় বাহির-সমুদ্রের মুখে পড়িব। খানিকটা গিয়া দেখি, আর একটা বড় নদী আসিয়া মোহানাতে পড়িতেছে। এ আবার কোন্ নদী?

মাথা ঠিক রাখিতে পারিলাম না তারপর হইতে। পদে পদে বিচারে ভুল হইতে লাগিল। কোথা হইতে কোথায় যাইতেছি—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না কেন? একটা লোকও কি কোথাও নাই? হঠাৎ দেখিলাম সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, ক্ষুধা পাইতেছে বিলক্ষণ। ফলের গাছের সন্ধানে চারিদিকে চাহিলাম। গোলগাছের ফল খাইতে ঠিক কচি তালের মত, কিন্তু এ সময় একটাও চোখে পড়িল না। ভয় হইল, একা রাত্রে ডাঙায় নৌকা বাঁধিয়া থাকা নিরাপদ নয়, বাঘ ডিঙি হইতে আমাকে হালুম্ করিয়া একগাল মুড়ি-মুড়কির মত মুখে করিয়া উধাও হইলেই মিটিয়া গেল!

অগত্যা নৌকা বাহিতে লাগিলাম। থামাইতে ভরসা হইল না। নদীরও কি শেষ নাই? রাত আন্দাজ চারিটার সময় অন্ধকারের মধ্যে দেখি দূরে আলো-জ্বলা-ঢেউ। আমার বৈঠার আলোড়নেও জলে জোনাকি জ্বলিতেছে। এইবার সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছি। আমার সামনে অকূল বাহির-সমুদ্র। আর আগাইবার রাস্তা নাই। ডিঙি লইয়া সমুদ্রের মধ্যে গেলেই মৃত্যু। দিক-দিশা তো এমনি হারাইয়া ফেলিয়াছি—ভালো করিয়াই হারাইব।

শেষরাত্রে চাঁদ উঠিলে দেখিলাম আমার পিছনের জঙ্গল খুব ঘন। এখানে ডিঙি বাঁধিতে ভরসা হয় না। কিন্তু উপায়ই বা কি? কি চমৎকার রূপ হইয়াছে সেই গভীর রাত্রে সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত অনন্ত সাগরের। দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়াও ফুরায় না। অদ্ভুত স্থানটি বটে। পিছনের জঙ্গলে বাঘের গর্জন দু-একবার কানে গেল। ভোরের দিকে ভাঁটার সঙ্গে আর এক সমূহ বিপদ; ঢেউ উত্তাল হইয়া উঠিয়া কূলে যেভাবে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তাহাতে ডিঙি বাঁচানো এক মহাসমস্যা। এখনি তো ঢেউয়ের আছাড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে—ডিঙি সামলাইতে গিয়া ডুবিয়া মরিব শেষে?

ডিঙি হইতে নামিয়া ডিঙির মুখ ধরিয়া বাহির-সমুদ্রের দিকে ফিরাইলাম। একমাত্র ভরসা সমুদ্রের মধ্যে ডাঙা হইতে দূরে যাওয়া। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে লইয়া যাওয়া কি সোজা কথা? ভাঁটার টান অবশ্য খানিকটা সাহায্য করিতেছিল বটে। খানিক পরে মনে হইল সমুদ্রের নীচের কোন সোঁতার মুখে পড়িয়া ডিঙি ক্রমাগত বাহিরের দিকেই চলিয়াছে। এ আবার আর এক বিপদ! কি করি উপায়? দু'বার লোনাজলের ঢেউ আছড়াইয়া পড়িয়াছিল ডিঙির উপর। সেঁউতি দিয়া জল সেচিতেছিলাম। ডুবো সোঁতার অস্তিত্ব এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। মস্ত কি এক শুশুকের মত সামুদ্রিক জানোয়ার আমার সামনে জলে উলট-পালট খাইয়া গেল, আমি নিরুপায় অবস্থায় বসিয়া রহিলাম। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছি। সমুদ্রের কূল আর

wapsip.com

দেখা যায় না। সুন্দরবনের কালো রেখা কোথায় মিশিয়া গিয়াছে। সম্মুখে অনন্ত নীল জলরাশি। কোথায় চলিয়াছি? এবার সত্যই কি এ জীবন হইতে বিদায় লইবার দিন আসিয়া গিয়াছে?

দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলিতেছি, সূর্যের অবস্থান দেখিয়া মনে হইল। তটরেখা অদৃশ্য হইয়াছে বহুক্ষণ। দক্ষিণ-মেরুর দিকে চলিয়াছি নাকি? ক্ষুধা অপেক্ষা তৃষ্ণা বেশি কষ্ট দিতেছিল। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, ক্ষুধায় তত নয়—যতটা তৃষ্ণায়। সারাদিন কাটিয়া গেল। আবার সূর্যাস্ত দেখিলাম। আবার আকাশে নক্ষত্র উঠিল। মাথার উপর অগণিত নক্ষত্রখচিত আকাশ, নীচে অনন্ত সমুদ্র—মরণের আগে কি রূপই অনন্ত আমার চোখের সামনে খুলিয়া দিলেন! মরিব বটে কিন্তু কাহাকে বলিয়া যাইব যে কি দেখিয়া মরিলাম।

অনেক রাত্রে কোথায় যেন বাঁদিকে বুম্ বুম্ করিয়া কামানের আওয়াজের মত কানে আসিল। অন্ধকারের মধ্যে চাহিয়া দেখিলাম। কিছু বুঝিতে পারিলাম না। শেষরাত্রে খুব শীত করিতে লাগিল।

বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। উঠিয়া দেখি ডিঙি সমুদ্রে স্থির হইয়া আছে। সূর্য অনেক দূর উঠিয়া গিয়াছে। চারিদিকের নীল জলরাশি চিক্‌চিক্ করিতেছে খর-রোদে। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা বাড়িল। বিকালের দিকে মনে হইল আমার বহু দূরে ডান দিক দিয়া একখানা জাহাজ যাইতেছে। পরনের কাপড় খুলিয়া উড়াইয়া দিলাম, নাড়িতে লাগিলাম। তাহারা বুঝিতে পারিল না। অন্য দিকে চলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কি কুক্ষণে কাল বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছি! মনুর জন্য বড় কষ্ট হইতেছিল। বার বার উহার কথা মনে হইতেছে—উহার কথা আর দুই মার কথা। বনবিবিতলার মার কথাও যে কতবার মনে হইল।

আবার রাত্রি আসিল। আবার নক্ষত্র উঠিল। সেই রাত্রে শেষে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম কি অজ্ঞান হইলাম, জানি না। পৃথিবী ও সমুদ্র সেরাত্রে সব মুছিয়া গেল।

জ্ঞান হইলে দেখি একটা কাঠের ঘরে শুইয়া আছি—কাঠের ঘর কি কাঠের বাক্স। আমার পাশে একজন চাটগাঁয়ের মুসলমান বসিয়া। সে বলিল সেখানকার বুলিতে, আমি সারিয়াছি কিনা। আমি বলিলাম—আমি কোথায়? একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি আসিয়া আমার শিয়রে বসিল। তাহার দিকে চাহিয়া মনে হইল ইহাকে দেখিতে আমার বাবার মত। আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল, চাটগাঁয়ের ভাষায় আমি কেন এভাবে সমুদ্রে ভাসিতেছিলাম? সব খুলিয়া বলিলাম। চাহিয়া দেখিলাম চারিদিকে। একটি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে আমি একটা কাঠের ঘরে শুইয়া আছি মনে হইল। উহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহারা চাটগাঁয়ের মুসলমান জেলে। এই গ্রাম কোন স্থায়ী বাসিন্দার গ্রাম নয়। মাছ আর সামুদ্রিক ঝিনুক তুলিতে এখানে বৎসরে তিন মাস ইহারা আসিয়া বাস করে। ইহাদের সামপান (নৌকা) কূলের অদূরে সমুদ্রে আমার নৌকা দেখিতে পায়। তারপর এখানে আনে। আমি চার-পাঁচ দিনের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলাম। সামুদ্রিক মাছের ঝোল আর ভাত, এছাড়া আর কোন খাদ্য সেখানে ছিল না। আমাকে তাহারা সঙ্গে লইয়া আর একটা দ্বীপে গেল, দ্বীপের নাম কুমড়াকাটা। সেখানে পাশাপাশি অনেকগুলি দ্বীপ আছে, সবগুলিই জনহীন, মৎস্যশিকারীরা মাঝে মাঝে বসতি স্থাপন করে আবার চলিয়া যায়। একটা দ্বীপের নাম চাঁদডুবি, একটার নাম সাহাজাদখালি। সব দ্বীপেই ভীষণ জঙ্গল। মিষ্ট জলের খাড়ি কেবল চাঁদডুবি ছাড়া অন্য কোন দ্বীপে নাই বলিয়া আমরা সেখানে নৌকা লাগাইয়া মিষ্ট জলের সন্ধানে গেলাম। ডাঙায় উঠিয়া বাঁদিকে ছোট

wapsip.com

একটা বালিয়াড়ি, তাহার পিছনে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের গাছ আমি চিনিলাম না, শুধু কয়েক ঝাড় মূলী বাঁশ ছাড়া। একজাতীয় বড় গাছে রাঙা ফুল ফুটিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ঐ গাছের নাম ছাপলাস গাছ। জঙ্গলের মধ্যে ছাপলাস আর মূলী বাঁশই বেশি। এই দ্বীপের সমুদ্রতীরে বালুকারাশির উপর কত ঝিনুক ও শাঁখের ছড়াছড়ি, তাহার একটু দূরে ঘন সবুজ বনভূমি, লতার ঝোপে কত কি অজানা বনপুষ্প। চাঁদডুবি দ্বীপটি স্বর্গের মত সুন্দর।

একা কতক্ষণ দ্বীপের বালির চড়ায় বসিয়া থাকি। সারাদিন এমনি বসিয়া বসিয়া নীল সমুদ্রের গান যদি শুনিতে পাই তবে কোথাও যাইতে চাই না। এমন সুন্দর নামটি কে রাখিয়াছিল এ দ্বীপের?

বনবেণুকুঞ্জের মধ্যে পাখি ডাকে। কেহ শুনিবার নাই সে পাখির কলকূজন। যাহারা এখানে আসে, তাহারা মাছ ধরিতে ব্যস্ত। পাখির ডাক শুনিবার কান তাহাদের নাই।

বামদিকের বাঁশবনের তলা দিয়ে সুঁড়িপথ মিষ্ট জলের খাড়ির দিকে চলিয়া গিয়াছে। জেলেদের পায়ে চলার চিহ্ন এ পথের সর্বত্র। আমি সে পথে একা অনেক দূরে চলিয়া গেলাম। ঠিক যেন সুন্দরবনের একটি অংশ, তেমনি ঘন বন, তবে কেয়াগাছ ছাড়া সুন্দরবনের পরিচিত কোন গাছ নাই। এক জায়গায় দেখি অনেক জংলী গোঁড়া লেবুর গাছ, যেন কে লেবুর বাগান করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দরবনেও এ লেবুর জঙ্গল অনেক জায়গায় আছে।

জল লইয়া জেলেরা চলিয়া গেল। আমি এক জায়গায় লেবুবাগানের মধ্যে একটি আশ্চর্য দ্রব্য হঠাৎ আবিষ্কার করিলাম। সেটি একটি ছোট কামান। এই কামানের গায়ে বাংলা অক্ষরে লেখা আছে কি সব কথা, পড়িতে পারিলাম না।

একজনকে ডাকিয়া বলিলাম—শোনো—

সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—কি?

—এটা কি?

—দেখতেই পাচ্ছ কামান!

—কি করে এল এখানে?

—জানিনে।

—জানতে ইচ্ছে করে না?

—কি দরকার—

মিটিয়া গেল। ইহাদের কোন কৌতূহল নাই কোন বিষয়ে। আমার ইচ্ছা হইল কামানটা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই। কিন্তু অত ভারী জিনিস একা আমার সাধ্য নাই বহিবার। লোকটার সহিত অনিচ্ছার সহিত চলিয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় সে এমন একটা কথা বলিল যাহাতে আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। সে বলিল—শুধু কি একটা কামান দেখছো বাবু, ওই জঙ্গলের মধ্যে গড় আছে, ভেঙে পড়ে আছে মস্ত গড়!

—সে কি?

—গড় মানে কেল্লা। এটাকে বলে চাঁদডুবির গড়। কত আশ্চর্য জিনিস এখানে ছিল, এখনও আছে। কত লোক কত টাকা পেয়েছে এখানে। গড়ের ইটের মধ্যে আমার গাঁয়ের এক বুড়ো লোক সোনার পাত আর আকবরী আমালের সোনার টাকা পেয়ে খুব বড় মানুষ হয়েছিল। তবে বাবু ওতে বিপদ আছে—

—কি বিপদ?

—বাবু, ওতে বংশ থাকে না।

wapsip.com

—বয়ে গেল!

—তুমি ছেলেমানুষ তাই এমন বলছো। বড় হলে আর বলবে না। তাছাড়া—

—তাছাড়া কি?

—অপদেবতার ভয়—

—মানি না।

—নেই বল্লেই সাপের বিষ চলে যায়? সন্ধ্যের পর তেষ্টায় গলা শুকিয়ে মরে গেলেও কেউ চাঁদডুবির খাড়িতে জল নিতে আসবে না।

—বলো কি?

—তাই, তুমি যাকে হয় জিগ্যেস করে দেখো—

—আমি যদি সন্ধ্যের পর এখানে থাকি?

—প্রাণ একবার খোয়াতে বসেছিলে, আবার খোয়াবে। চলো, তোমাকে একটা গল্প বলবো।

আমার কিন্তু ভূতের গল্প শুনিবার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপ দেখিয়াছিলাম সুন্দরবনে, এখানে শুনিয়াছি কেল্লা আছে। কাহাদের এসব জিনিস? কাহারা এখানে কেল্লা বা রাজাবাড়ি বানাইয়াছিল অতীত দিনে? কাহারা এখানে তাহাদের অতীত গৌরবদিনের চিহ্ন ফেলিয়া রাখিয়া অজানা পথে চলিয়া গেল? কে তাহারা? কি দিয়া ভাত খাইত তাহারা? কি ভাষায় কথা বলিত? কি করিয়া দিন কাটাইত? কি ভাবিত মনে মনে?

এই সব কথা আমাকে এখনই কেহ বুঝাইয়া বলিতে পারে?

এই সব আমি জানিতে চাই। কোন অপদেবতার কাহিনী নয়—যাহা সত্য ঘটিয়াছিল, তাহাই জানিতে চাই, কোন মন-গড়া ঘটনা নয়। ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া বুড়ো মাঝি বদরুদ্দীনকে সব কথা বলিলাম। সে কি কিছু দেখিয়াছে। এখানে আরও কোন দ্বীপে কি এমন আছে?

বদরুদ্দীন বলিল—সুন্দরবনে এমন কোন্ কোন্ জায়গায় আছে। এদিকের মধ্যে চাঁদডুবিতে আছে, আর সোনার দ্বীপে আছে। ওসব সেকেলে রাজাদের কাণ্ড—সোনার মোহর পাওয়ার কথাও সত্যি। আমি নিজে একবার একখানা সেকেলে তলোয়ার পেয়েছিলাম, তলোয়ারখানার বাঁটে কত কি কাজ করা! আমার জামাই সেখানা নিয়ে গিয়ে মহকুমার হাকিমকে দেখায়। তিনি বলেন—এখানা সেকালে দামী জিনিস—যাদুঘরে দিয়ে দাও। আমার জামাই তা দেয় নি, ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এখনও আমার বাড়িতে আছে সেখানা।

সেখান হইতে আমরা আর একটি দ্বীপের কূলে চলিয়া গেলাম। জায়গাটির নাম ইদ্রিশখালির চর। এখানে বড় হাঙরের ভয়। জেলেরা কেহ জলে নামিতে সাহস করে না। দিগন্তরেখায় সূর্য উঠিতে দেখিয়াছি এখানে কত দিন। সমুদ্রের বুকে সূর্যোদয় কখনও দেখি নাই—শুনিলাম এখান হইতে এ দৃশ্য যেমন দেখা যায়, এমন আর এদিকে আর কোন দ্বীপ হইতে দেখা যায় না।

এই সূর্যোদয় দেখিতে গিয়া একদিন বিপদে পড়িয়া গেলাম।

একটা ছোট ডিঙি করিয়া কূল হইতে কিছুদূরে গিয়াছিলাম শেষরাত্রির দিকে। বৃদ্ধ বদরুদ্দীন আমাকে বলিয়াছিল—সমুদ্রের মধ্যে খানিকটা গিয়ে সূর্যোদয় দেখো বাবু।

কি যে সে অদ্ভুত দৃশ্য। জলের উপর একস্থানে একটা সরু আগুনের রেখা দেখা দিল প্রথমে। মনে হইল জলে আগুন লাগিয়াছে। পরক্ষণেই সূর্য হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল যেন

wapsip.com

জলরাশির মধ্য হইতে একটা আগুনের গোলার মত। তখনও সেটাকে সূর্য বলিয়া বোধ হইতেছিল না, একটা রঙীন ফানুস যেন জলের উপর কে উড়াইয়া দিয়াছে। বদরুদ্দীন ঠিকই বলিয়াছিল, ডাঙা হইতে এ শোভা দেখা যায় না।

এই পর্যন্ত ভাবিয়াছি, হঠাৎ দেখিলাম ডিঙিখানি কূল হইতে দক্ষিণপূর্ব দিকে চলিয়াছে; ফিরাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। আবার কি চোরা সোঁতায় পড়িলাম? এই জিনিসটি বড় ভয়ের ব্যাপার এসব গভীর সমুদ্রে! মনু আমাকে অনেকবার বলিয়াছিল। বদরুদ্দীনও সেদিন বলিয়াছে। একবার নাকি উহারা এই চাঁদডুবি আর ইদ্রিশখালির মধ্যে কুমড়াবোঝাই একটা সামপান পায়। সামপানে তিনটি মৃতদেহ ছিল। দেখিয়া মনে হয়, তাহারা জল না খাইয়া মারা গিয়াছে। এ অবস্থায় লোকে সমুদ্রে জল পান করে, বেশি পরিমাণে সমুদ্রের জল পান করিলে পাগল হইয়া যায়।

বলিয়াছিলাম—পাগল হয় কেন?

—তা জানিনে। মাথা খারাপ হয়ে যেতে দেখেছি বাবু।

—তারপর? কোথাকার লোক ওরা?

—বর্মাদেশের লোক বলে মনে হল। ঠিক বলতে পারবো না। তারা কুমড়ো বোঝাই করে কোন নদীপথে কিংবা দুটো দ্বীপের মাঝখানের সমুদ্রে নৌকো বাইতে বাইতে চোরা সোঁতায় পড়ে গিয়ে বার-সমুদ্রে চলে এসেছিল। তারপর যা হবার তাই হয়েছে। ওরা ডাঙার লোক ছিল নিশ্চয়, নইলে কুমড়ো আনবে কোথা থেকে? সামপানে কুমড়ো বোঝাই দিয়ে কেউ সমুদ্রে পাড়ি জমায় কি?

এইসব কথা আমার মনে পড়িল, আমি ঘর-পোড়া গরু। এই সেদিন ডুবো সোঁতা হইতে মরিয়া যাইতে যাইতে বাঁচয়াছি না নিজে? বদরুদ্দীন আমায় কি শিখাইবে?

যেমন একথা মনে হওয়া সঙ্গে সঙ্গে অমনি এক লাফ দিলাম ডিঙি হইতে। ভুলিয়া গেলাম যে সমুদ্র হাঙর-সংকুল ও অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সাঁতরাইতে ভালই জানিতাম, ডাঙাও খুব বেশি দূরে ছিল না। একটু হয়তো সাঁতরাইতে পারিব, ইহার বেশি হইলে আমার পক্ষে ডাঙায় উঠা সম্ভব হইবে না।

বেশ সাঁতরাইতেছি, হঠাৎ আমার নিকট হইতে হাত-ষোলো-সতেরো দূরে একটা চওড়া মাছের ডানা জলের উপর একবার ভাসিয়া পরক্ষণেই ডুবিয়া যাইতে দেখিয়া আমার হাত-পা অবশ হইয়া গেল। এ তো কোনো মাছের ডানা বলিয়া মনে হয় না। এ নিশ্চয় সামুদ্রিক হাঙরের ডানা! কামটের ডানা এত বড় হইবে না।

আবার সেই বড় ডানাটা ভাসিয়া উঠিল আমার নিকট হইতে আট নয় হাত মাত্র দূরে। আমার মনে হইল যে করিয়াই হউক আমাকে এই ভীষণ জানোয়ারের হাত এড়াইতেই হইবে। একবার যদি ইহার হাতে পড়ি, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। এই সময় ডানাটা আবার ডুবিয়া গেল। এইবার বোধ হয় ইহা ভাসিয়া উঠিবে আমাকে মুখে শক্ত করিয়া কামড়াইয়া ধরিয়া। চট্ করিয়া বাঁদিকে ঘুরিয়া গেলাম এবং খুব চিৎকার করিতে লাগিলাম। এমন সময় ডানাটি ভাসিয়া উঠিল ইতিপূর্বে এক সেকেন্ড আগে আমি যেখানে ছিলাম সেখানে। এই সময় সেই ভীষণ-দর্শন সামুদ্রিক হাঙরের মুখটিও ভাসিয়া উঠিল, কিন্তু আমি যেদিকে আছি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। হাঙরের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছে বুঝিলাম। কিন্তু এইবেলা যাহা করিতে পারি, বিলম্বে আর রক্ষা নাই। সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত্তা সাঁতার দিয়া ডাঙার দিকে আসিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ আমার হাঁটুতে কে যেন শক্ত মুগুরের এক ঘা লাগাইল, জলের মধ্যে

wapsip.com

যেন পা-খানা কাটিয়া পড়িয়া গেল মনে হইল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া তখনো সাঁতার দিতেছি—যাক একখানা পা, ডাঙায় উঠিতে না পারিলে সমস্ত দেহখানাই যে চলিয়া যাইবে।

এইসময় একটা বড় ঢেউ আসিয়া আমাকে ডাঙার দিকে হাতদশেক আগাইয়া দিয়া গেল। পরক্ষণেই দেখি আমি আবার অন্য দিকে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছি, কিন্তু ডাঙাটা আর কোনদিকেই দেখা যায় না। অনেক কষ্টে ডাঙার দিকে যদি বা দু'হাত আসি, আবার চার হাত জলের মধ্যে চলিয়া যাই ডুবো সোঁতার টানে। এই জন্যই আমার ডিঙি বাহির-সমুদ্রে অতটা গিয়া পড়িয়াছিল, এইবার ভাল করিয়া বুঝিলাম।

আমার চিৎকার শুনিয়া দুই-তিনজন আমাদের দলের জেলে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জল হইতে টানিয়া তুলিল। তখন আমি এমন অবসন্ন যে উহাদের কথার জবাব পর্যন্ত দিতে পারিলাম না। তাহারা বার বার বলিতে লাগিল, আমি খুব বাঁচিয়া গিয়াছি। এই সমুদ্রে পড়িয়া সাঁতার দেওয়া যে কি জিনিস তাহা যে জানে না, তাহাকে বলিয়া লাভ কি?

আমি বলিলাম—জানি হে জানি। আমাকেও ছাড়েনি, হাঙরে তাড়া করেছিল!

উহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—কক্ষনো হয় না।

রাগের সহিত বলিলাম—কি হয় না?

তাহারা বলিল—কক্ষনো বাঁচতে পারে না হাঙরের মুখ থেকে—

—আলবৎ বেঁচেছি। আমার পাশে চার হাত তফাতে ওর ডানা লেগেছিল, ওর মুখও দেখেছি।

—ডানা? হাঙরের নয়।

—নিশ্চয় হাঙরের।

বদরুদ্দীন সব শুনিয়া বলিল—বাবু, ওরা ঠিক বলেছে। হাঙর ওভাবে একবার জাগবে একবার ভাসবে না—হাঁ করে তাড়া করে এসে কামড়ে ধরবে, ও হাঙর নয়।

—কি তবে ওটা?

—ওটা মহাশির মাছ, হাঙরের মত দেখতে, মুখও অনেকটা হাঙরের মত।

আমি প্রথমটা বিশ্বাস করি নাই। বদরুদ্দীন বলিল—ও মাছ তোমাকে দেখাবো, আমাদের আড়তে চলো—

—কোথায়?

—তার নাম কাছিমখালি। একটা ছোট দ্বীপ।

—আর কে আছে সেখানে?

—কেউ না। শুধু আমরাই থাকি।

—কি হয় সেখানে?

—গেলেই দেখবে।

—চাঁদডুবির মত সুন্দর জায়গা?

—মন্দ নয়।

একদিন কাছিমখালি দ্বীপে আমরা গিয়া নোঙর করিলাম। এখানে খড় দিয়া ইহারা ছোট্ ছোট ঘর তৈয়ারী করিয়াছে। অকূল সমুদ্রের ধারে বাঁশের লম্বা আলনা ও বন্য লতা টাঙানো আলনা। মাছের রাশি এখানে রৌদ্রে শুকাইবার জন্যই এই আলনার ব্যাপার। শুঁটকি মাছের দুর্গন্ধে সমুদ্রতীরের বাতাস ভারাক্রান্ত।

খাদ্যও এখানে শুধু মাছ ও ভাত। না ডাল, না কোন তরকারি। বেশিদিন কাঁচা তরকারী

wapsip.com

না খাইলে নাকি একপ্রকার রোগ হয়, সেজন্য বদরুদ্দীন সেদিন আমাকে লইয়া নিকটবর্তী আর একটি দ্বীপে গেল। সেখানে বনের ছায়ায় ছায়ায় একরকম শাক গজায়, দুজনে তাহাই তুলিয়া নৌকার খোলে জমা করিলাম। শাকগুলির পাতা অবিকল থানকুনি পাতার মত—কিন্তু আমরুল শাকের মত টক।

এখানে এক ব্যাপার ঘটিল।

আমি শাক তুলিতে তুলিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি, বদরুদ্দীন ডিঙিতে তামাক সাজিতে গিয়াছে, এমন সময় দেখি একজন বৃদ্ধ আমার দিকে আসিতেছেন। দু'মিনিটের মধ্যে বৃদ্ধটি আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমার দিকে অতি স্নেহপূর্ণ করুণ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। ঠিক যেন আমার দাদামহাশয়। একবার অতি অল্প সময়ের জন্য মনে হইল আমার সেই দাদামহাশয় আমার সন্ধানে বাহির হইয়া এখানে আসিয়া বুঝি পৌঁছিয়াছেন। আমার মন কেমন করিয়া উঠিল আমার দাদামহাশয়ের জন্য।

কিন্তু না, এই বৃদ্ধের রং আমার দাদামহাশয়ের চেয়ে সামান্য একটু কালো। সাদা দাড়িটিও বেশি লম্বা। পরনের কাপড় অতি ছিন্নভিন্ন ও মলিন। আমার দিকে খানিকটা চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন—বাঙালী?

উত্তর দিলাম—আজ্ঞে হাঁ।

—কোথায় বাড়ি?

—অনেক দূর।

—এখানে কি করে এলে?

—মাছ ধরতে এসেচি কাছিমখালি। এখানে শাক তুলতে এসেছি।

—হিন্দু না মুসলমান?

—হিন্দু।

—তোমার সঙ্গী কই?

—তামাক সাজতে গিয়েছে ডিঙিতে। আপনি কে?

—আমিও বাঙালী হিন্দু। আমি এখানে থাকি।

—এখানে?

—কেন, এ জায়গা কি খারাপ?

—না, তা বলিনি। খুব চমৎকার জায়গা। কিন্তু এখানে আপনি কি করেন?

—ব্যবসা করি।

আমি অবাক হইয়া বৃদ্ধের স্নেহকোমল মুখের দিকে চাহিয়া থাকি। লোকটি পাগল না কি? মুখ ও চোখের ভাবে কিন্তু পাগল বলিয়া তো মনে হয় না। তবে এমন আবোল-তাবোল বলিতেছেন কেন? আমার চোখের বিস্ময়ের দৃষ্টি বৃদ্ধ বুঝিতে পারিলেন! বলিলেন—বিশ্বাস হয় না?

—এখানে কিসের ব্যবসা?

—এসো আমার সঙ্গে। কাউকে কিছু বলো না। তোমার সঙ্গী কোথায়?

—সে এখন আসবে না। তামাক খেয়ে নাইবে সমুদ্রে, বলে গিয়েছে।

—সে হিন্দু না মুসলমান?

—মুসলমান।

—আমাকে খেতে দেবে সে?

wapsip.com

—খাবেন? নিশ্চয়ই। আমি নিজে আনছি।

—সেজন্যে নয়, আমি সকলের হাতেই খাই। কি আছে?

—চিঁড়ে খাবেন?

—উঃ, কতদিন চোখে দেখিনি! কিন্তু শোনো, এখন থাক। আগে চলো আমার সঙ্গে। তোমাকে দেখাই আগে, কেউ এসে পড়বার আগে। বড্ড গোপন জিনিস কিনা!

আমার খানিকটা ভয় না হইল এমন নয়। এই অদ্ভুত-দর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে এই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে কি আমার যাওয়া উচিত? কিন্তু ভয় বা কিসের? আমি নবীন যুবক। আমার সঙ্গে শরীরের শক্তিতে এই বৃদ্ধ কতক্ষণ যুঝিবেন?

গেলাম উঁহার সঙ্গে।

কিছুদূর গিয়া একটা বনের পিছনে পাতা-লতার একটি কুটির দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। বৃদ্ধ আমাকে কুটিরের সামনে লইয়া গেলেন। আমি বলিলাম—চারিদিকে এত কচ্ছপের খোলা কেন?

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন—ওই আমার ব্যবসা।

—কি ব্যবসা?

—কচ্ছপের খোলার।

—এখানে কচ্ছপ ধরেন কি করে?

—এখানকার নাম কাছিমখালির চর। এখানকার সব দ্বীপের চরে সমুদ্র থেকে বড় কচ্ছপ উঠে রোদ পোয়ায়, ডিমে তা দেয়। লোক তো নেই কোন দিকে!

—কি করে ধরেন?

—উলটে দিলেই হল। আর নড়তে পারে না।

—তারপর?

—তারপর ওদের কাটি। মাংস খাই, ডিম খাই, আর কাছিমের খোলা বিক্রি করি। লোকে নৌকো করে এসে জমানো খোলা কিনে নিয়ে যায়। ওরাই চাল দিয়ে যায়। অনেক দিন আসে নি, চাল ফুরিয়ে গিয়েছে, শুধু কাছিমের মাংস খেয়ে ভাল লাগে না—তাও আজ তিন দিন একটা কাছিমও ডাঙায় ওঠে নি।

—আমার সঙ্গে দেখা না হলে কি খেতেন?

—কেন? ঝিনুক?

—ঝিনুক!

—খুব ভালো খেতে ওর শাঁসটা। তোমাকে খাওয়াবো, এসো ঘরের মধ্যে এসো।

কুটিরের মধ্যে ঢুকিলাম। একটি ছিন্ন খেজুরপাতার চাটাই একপাশে পাতা, তাহার উপরে একটি ছেঁড়া বালিশ। একটি ঝক্‌ঝকে মাজা কাঁসার জামবাটি ছাড়া অন্য কোন মূল্যবান জিনিস নাই ঘরের মধ্যে? একটি তীর-ধনুক ঘরের এক কোণে হেলানো। খাবার জলের জন্য একটি মাটির কলসী, তাও কানা-ভাঙা। অতি গরিব লোকের ঘরে ইহার চেয়ে অনেক বেশি জিনিস থাকে। আমি খুব অবাক হইয়া চারিদিকে দেখিতেছি দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—ভাবছ কি করে থাকি, না? তা নয় বাবা, বেশ থাকি।

—সত্যি?

—ঠিক তাই। খুব ভাল থাকি। কোন মানুষ আমার নিন্দে করবে না, আমিও কারও নিন্দে করবো না। মানুষ যেন কখনও মানুষের নিন্দে না করে। ওটা আমি সব চেয়ে অপছন্দ

wapsip.com

করি।

—কি?

—কেউ কারও নিন্দে করা। এখানে বেশ আছি।

—কি করে দিন কাটান আপনি এখানে?

বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দূরে সমুদ্রের নীল জলরাশির দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন ভাবিলেন। আমার সে সময় মনে হইল, ইনি অতি অদ্ভুত ব্যক্তি। ইঁহার মত মানুষ আমি এই প্রথম দেখিতেছি। ইঁহার আগে যেসব মানুষ দেখিয়াছি তাহারা যে ধরনের, ইনি অন্য ধাতের মানুষ উহাদের থেকে। ইঁহার মত চোখের দৃষ্টি তো কাহারও দেখি নাই এ পর্যন্ত।

আমিও কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—দিন এখানে বড় সুন্দর কাটে, বুঝলে? এত সুন্দর কাটে যে আমি এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইনে!

—কি করেন সারাদিন?

—সারাদিন বসে থাকি।

—বসে?

—ওই সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে!

তারপর হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—আরে না না, তা ঠিক নয়। আমাকে তো খেতে হবে। কাছিমকে চিৎ করিয়ে দিয়ে তার মাংস কাটি—একটা বড় কাজ না? ঝিনুক কুড়োই বালুর চর থেকে। বড় একটা কাজ। শাঁস ছাড়াই—বড় একটা কাজ—কি বলো?

আমিও হাসিতে লাগিলাম। না, বৃদ্ধ যেন শিশুর মত সরল। আমার বড় ভাল লাগে। আমার দাদামহাশয়ের মতই বটে। মনে হইল যেন ইনি আমার বহুদিনের পরিচিত।

উনি বললেন—তুমি ভাবছ, কেমন করে থাকেন? এ দ্বীপের রূপ দিনের মধ্যে এতবার বদলায়! যত দেখবে তত আরও দেখতে ইচ্ছে হবে। দেখে দেখে বুদ্ধি ফুরোয়। ভাল কথা, আজ সন্ধ্যের সময় সূর্য অস্ত যাওয়াটা একবার এ দ্বীপের একটা জায়গা থেকে দেখো তো! একটা গাছ আছে, তার ওপর আমি চড়ে থাকি। তোমাকেও চড়াব। দেখলে মোহিত হয়ে যাবে।

—আমি দেখেছি।

—কি দেখেছ?

—উদয় ও অস্ত দুই-ই। আমি বার-দরিয়ায় হারিয়ে গিয়েই তো এখানে এসেছি। সে সময় নৌকায় বসে তিন দিন তিন রাত আমি দেখেছি।

—তা হলে তুমি বুঝতে পারবে। সবই তো জানো। এ জিনিস অনেকেই দেখতে পায় না। এমন দ্বীপ না হলে এ রকমটি তো দেখা যায় না। দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।

বৃদ্ধ উঠিয়া গিয়া ঘরের কোণ হইতে একটা ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলি আনিয়া আমার সামনে খুলিয়া বলিলেন—এই দেখো। আমি বিস্ময়ে অবাক হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলাম—এ কি! এ যে অতি সুন্দর অনেকগুলা মুক্তা। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার অত্যন্ত বড় বড়। সবসুদ্ধ গুনিয়া দেখিলাম—ছাব্বিশটা মুক্তা। পাঁচটি খুব বড় ও খুবই সুন্দর। আমি জীবনে কখনও একজায়গায় এত মুক্তা দেখি নাই।

wapsip.com

বৃদ্ধ বিজয়ীর গর্বভরে বলিলেন—সব কিন্তু ঝিনুক থেকে সংগ্রহ করেছি। শাঁস খাবো বলে ঝিনুক কাটতে গিয়ে এই সব পেয়েছি।

—কত দিনে?

—দুবছরে তিনবছরে।

—আপনি কাছিমের খোলা বিক্রি করেন, মুক্ত বেচেন না?

—না। কাউকে দেখাই না। অনেক টাকার মাল। টাকা হলে মনে অহঙ্কার আসবে, বিলাসের ইচ্ছা আসবে—এমন সুন্দর জায়গা থেকে হবে চিরনির্বাসন।

—আপনার মুক্তো কত টাকার?

—বলো?

—আমি ছেলেমানুষ, কি জানি বলুন!

—বললে বিশ্বাস করবে?

—আপনি বললে ঠিক বিশ্বাস হবে।

—যদি বলি দু'লাখ টাকার ওপর?

আমি চমকিয়া উঠিলাম, দু'লাখ! আমি হাজার দুই তিনেক-এর কথা ভাবিয়াছিলাম। লাখের কোন ধারণা আমার মাথার মধ্যেই নাই। এ কি আশ্চর্য ধরনের বৃদ্ধ তাহা জানি না। এই খেজুর-চাটাইয়ে শোন, ভাঙা কলসীতে জলপান করেন, খান কাছিমের মাংস ও ঝিনুকের শাঁস—এদিকে উঁহার ভাঙা কুঁড়েঘরে দু'লাখ টাকার মুক্তা অবহেলায় এক কোণে মাকড়সার জালে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে। আমাকে নির্বাক দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—কি? বিশ্বাস হল না?

—তা না, বিশ্বাস হয়েছে। আপনি অদ্ভুত লোক।

—কিচ্ছু অদ্ভুত না। আমার দরকার থাকলে আজ বড়মানুষ হতাম। শহরে বাড়ি করতাম। জুড়িগাড়ি করতাম। আমার দরকার নেই।

—সংসারে আপনার কেউ নেই?

—সবাই আছে।

—তাদের টাকা দিয়ে দিন। তাদের দরকার আছে। কত গরিব লোক আছে, তাদের দিয়ে দিন।

—তুমি এসেছ খুব ভাল। এখানে থাকো। সে মুসলমান মাঝিকে আমি বুঝিয়ে বলবো। দুজনে এখানে থাকি, রাজি?

—রাজি।

—ঝিনুকের শাঁস খেয়ে থাকতে হবে।

—আমি আপনার মুক্তো চাই না, আপনাকে আমার ভাল লেগেছে, আপনার কাছে থাকবো।

বৃদ্ধ বদরুদ্দীনকে আমি সব বলিলাম। অবশ্য মুক্তার কথা বাদে। সে আমাকে অনেক নিষেধ করিল। ঐ বৃদ্ধ উন্মাদ, উহাকে সবাই জানে, আজ অনেকদিন ধরিয়া এই দ্বীপে আছেন একা। কচ্ছপের খোলায় বাস করেন, তাহাও শোনা গিয়াছে। উহার সঙ্গে থাকিয়া কি লাভ? অবশেষে আমার দৃঢ়তা দেখিয়া চলিয়া গেল। বলিল, সে আবার আসিবে। যদি কোন অসুবিধা হয়, সে আসিয়া লইয়া যাইবে।

সেই হইতে আমার এক নূতন জীবন আরম্ভ হইল।

দুই মাস কাটিয়া বর্ষা নামিল। এখানে বর্ষাটা বড় বেশি। দিনরাতের মধ্যে বিরাম নাই।

wapsip.com

বৃদ্ধকে ঘরের বাহির হইতে দিই না। জেলেদের সঙ্গে থাকিয়া মাছ ধরিবার পদ্ধতি শিখিয়াছিলাম। নানা রকমের সামুদ্রিক মাছ ধরি। ঝিনুকের শাঁস আমি বড় একটা খাই না। বৃদ্ধও আমার কাজে খুব সন্তুষ্ট। ভাল মাছ ধরিয়া বৃদ্ধকে রান্না করিয়া খাওয়াই। ঝিনুক কুড়াইয়া আনি। একদিন বৃদ্ধ আমাকে আরও দুটি লুকানো মুক্তা দেখাইলেন। মস্ত বড় দুইটি মুক্তা। বলিলেন—দাম জানো? বল তো? চৌদ্দ হাজারের কম নয়! তুমি বিশ্বাস করো?

এসব সময় মনে হয় বৃদ্ধ বোধ হয় কিছু মাথা-খারাপ হইবেন। আমার অবিশ্বাসে কি আসে যায়? কেনই বা উনি এত টাকা এখানে নির্জন বালুচরে পুঁতিয়া রাখিয়াছেন? জগতের কত না উপকার হইতে পারিত এ টাকার দ্বারা?

বলিলাম—দাদু আমাকে একদিন মুক্তোর ঝিনুক দেখান না?

—বেশ, চিনিয়ে দেবো। সব সময় কি পাওয়া যায়। কালেভদ্রে।

—তবে এতগুলো কি করে পেলেন?

—একদিন তোমাকে বলবো।

আমি ছাড়িবার পাত্র নই। তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলাম, না এখনি বলিতে হইবে। এতগুলি মুক্ত কিরূপে পাইলেন?

বৃদ্ধ বলিলেন—মুক্তোর ঝিনুক এখানেই পাওয়া যায়। সেইজন্যেই আমি তো বলছি, চিনিয়ে দেবো।

—এখুনি দিন।

—এসো আমার সঙ্গে।

তারপর দ্বীপের উত্তর-পূর্ব-কোণে একটা সম্পূর্ণ নিভৃত স্থানে আমাকে লইয়া গিয়া একটা গাছের তলায় বসাইলেন। সে স্থানে একরাশি ঝিনুক ছিল। আমায় বলিলেন—এর নীচের সমুদ্রে একটা পাহাড় আছে জলের তলায়। সেই পাহাড়ের গায়ে লেপটিয়ে থাকে যেসব ঝিনুক—সবগুলিই প্রায় মুক্তগর্ভা ঝিনুক।

—সব?

—একশোটার মধ্যে সাত-আটটা।

—এই হল আপনার সব?

—ওরই নাম সব। ওই বেশি। ডুব দিয়ে পাহাড়ের গা থেকে ওগুলো তুলতে হয়। হাঙরের ভয় এখানকার জলে। একটু সাবধান হতে হয়। চলো তোমায় দেখিয়ে দিই।

একটা গাছের নীচের পথ দিয়া আমরা সোজা নামিয়া আসি সমুদ্রের বালুতটে। জলে নামিয়া হঠাৎ বামদিকে এককোমর জলে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ বলিলেন—এসো। সোজা চলো দশ পা। তারপর ডুব দিলেই পাহাড়। আমি বৃদ্ধের কথামত সেখানটাতে ডুব দিয়া দেখিলাম ছোট পাথরের একটা চড়া সেখানটাতে আছে বটে। ডুব দিয়া পাথরের গা হইতে আমি আট-দশটা ঝিনুক তুলিয়া আনিলাম। উত্তেজনার মাথায় সেগুলি তখনই ভাঙিয়া ফেলিলাম ডাঙায় বসিয়া। কিছুই নাই। আমার হতাশা দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—সারাদিন তুলে যদি একটা মুক্তোও পাওয়া যায়—তা হলে যথেষ্ট হয়েছে বিবেচনা করবে। এ কাজে বড় পরিশ্রম।

—তা তো দেখছি। তাতে ভয় কি?

—আমি রোজ ঝিনুক খেতাম, মুক্তো হত বাড়তি।

—কত দিনে কত পেতেন? মাসে কত পেতেন?

—দশ হাজার টাকার মাল।

wapsip.com

—তবে কাছিমের খোলার ব্যবসা করেন কেন?

—আমি কোন ব্যবসাই করি না।

—না?

—ঠিক। সে সব তুমি ছেলেমানুষ, বুঝবে না। খোলা দিলে চাল-ডাল পাই।

—মুক্তো দিলে তো অনেক চাল-ডাল-টাকা পান।

—তাহলে আমার শান্তি নষ্ট হবে, ডাকাতের হাতে প্রাণও যেতে পারে। এখন জানে সবাই গরিব মানুষ—সকলে দয়া করে। পাগল ভেবে করুণাও করে। কিন্তু আজ যদি তারা জানে আমি মুক্তোর মালিক, এই বদরুদ্দীনের দলই আমায় খুন করবে।

—সে কথা ঠিক।

—আমার দরকার নেই অর্থের। বেশ আছি।

—আপনার না থাকে, দেশের বহু ভাল কাজ হয় এই অগাধ টাকায়। হাসপাতাল হয়, স্কুল হয়, গরিব ছেলেদের লেখাপড়া হয়।

—সব বুঝি। সময় হলে করবো একদিন।

আমি সব সহ্য করিলাম এখানে। এই নির্জনতা, এই খাওয়ার কষ্ট, এই গাছতলায় দিনরাত্রি কাটানো। আমার অত্যন্ত ভাল লাগিল বৃদ্ধকে। কুবেরের মত ধনী মানুষ আজ এই ব্যক্তি। কিসের আশায় এই নির্জন দ্বীপে কাছিমের মাংস আর ঝিনুকের শাঁস খাইয়া কাল কাটাইতেছেন? কতবার জিজ্ঞাসা করি, কোন স্পষ্ট উত্তর পাই না। এমন আশ্চর্য নিস্পৃহ মন! আমাকে গোপনীয় মুক্তার ভাঁড়ার দেখাইয়া দিয়া এমন নিশ্চিন্ত থাকেন কি করিয়া। আমি চুরি করিতে পারি তো? অন্য কোথাও লুকাইয়া রাখিতে পারি। যেখানে সেখানে এত টাকার মুক্তা ফেলিয়া রাখিয়া একবার খোঁজও করেন না।

একদিন আমি বলিলাম—আমাকে এত বিশ্বাস করলেন কি করে?

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন—কেন?

—আমি মুক্তো নিতে পারি নে ভাবছেন?

—নাও তো নেবে।

—আপনি কিছু ভাববেন না?

—কেন ভাববো, নিও।

—বেশ।

—সত্যি বলছি, তোমার দরকার থাকে নিও।

—দাদু, আমার কিছু দরকার নেই। আপনি আমাকে নিজের কাছে রাখুন, এই আমার দরকার।

—থাকবেই তো।

কিছুদিন ধরিয়া দাদুর কাছে থাকিয়া এটুকু বুঝিলাম, এমন অদ্ভুত ও অসাধারণ ধরনের লোক সদাসর্বদা দেখা যায় না। শরীরে বা মনের কোন বিলাস নাই। অথচ মনে সর্বদা আনন্দ। এই খাইয়া ও এভাবে থাকিয়া কি করিয়া একটা লোক এত আনন্দ পাইতে পারেন, আমার মাথায় আসে না। দাদু আমাকে সারাদিন লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন—মুখে মুখেই সব। সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা কেন হয়, গ্রহনক্ষত্র কি, কত রকমের ঝিনুক আছে, কতগুলো সমুদ্র আছে পৃথিবীতে, পৃথিবীটাই বা কি—নিত্য নূতন শিক্ষার আনন্দে আমার মন মাতিয়া গেল। কত যত্নে কত স্নেহের সঙ্গে দাদু আমাকে সব কথা বুঝাইয়া বলেন, কত ধৈর্যের সঙ্গে বার

wapsip.com

বার বুঝাইয়া দেয়। বর্ষা কাটিয়া শরৎ পড়িয়া গেল। সমুদ্র শান্ত হইল। সেদিন সমুদ্রের ধারে বসিয়া দাদু আমাকে দেশের অতীত ইতিহাস বলিতেছিলেন, আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম—দাদু, একটা কথা বলবো?

—কি বলো?

—আপনি কোন্ জেলার লোক? কেন এখানে এলেন?

দাদু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিলেন, বলিলেন—আমি একজন সাধারণ লোক, ব্যস!

—না, ওসব শুনবো না। খুলে বলুন, কেন এখানে এলেন?

—আমার নাম কালীবর রায়, আমি বরিশাল কোটালিপাড়ার সিদ্ধেশ্বর তর্কাচার্যের সেজো ছেলে। আমি সংসার করি নি, বাবা আমাকে দেখে বাল্যেই নাকি বলেছিলেন—এ ছেলে সংসার করবে না। বাবা ও মায়ের মৃত্যুর পর দেশ ছেড়ে বহু তীর্থ বহু দেশ যাই। সেখান থেকে একদল মাঝির সঙ্গে এখানে এসে পড়ি ঘটনাচক্রে। বেশ লেগে গেল এর নির্জনতা আর এর চমৎকার দৃশ্য। সে তো তোমায় দেখিয়ে আসছি রোজ এত দিন ধরে। তবুও ফুরিয়ে যায় না, এমনি মজা! সেই থেকেই এখানে রয়ে গেলাম এবং আছিও এবং থাকবো। টাকার মালিক হয়ে আর অশান্তির সৃষ্টি করতে চাই না। বেশ সুখে আছি।

দাদুর মুখে তাঁহার জীবনের ইতিহাস শুনিয়া আমার কেবলই মনে হইতেছিল, ঝিনুকের মধ্যে বড় মুক্তার সন্ধান পাইয়াছি। অন্য কোন ঐশ্বর্যে আমার দরকার কি? ইঁহার পদতলে বসিয়া কত শিখিতে পারি, কত জানিতে পারি। সারা জীবন ধরিয়া শিখিলেও ফুরাইবে না।

দাদু আমাকে সেই প্রথম দিনটি হইতে বড় স্নেহ করিতেন। কত গল্প বলিতেন, কত উপদেশ দিতেন। তাঁহার একটি অমূল্য উপদেশ—সময় কখনও নষ্ট করিতে নাই।

খুব সাধারণ কথা বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু এত বড় উপদেশ আমার জীবনে আমি শুনি নাই।

একদিন বলিলাম—দাদু, একবার দেশে যাবার বড় ইচ্ছে করে, কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যেতে মন সরে না।

—যাও না, ঘুরে এসো। আমি তো এখানেই আছি। এবার বদরুদ্দীনের নৌকো এলে ওদের সঙ্গে যেও।

—আবার আসবো কিন্তু।

—বা রে, তুমি না এলে আমারও কি কষ্ট কম হবে?

এই কথাবার্তার পর বহুদিন কোন নৌকো আসিল না। সে বোধ হয় আমার সৌভাগ্যবশতই। অমন মহাপুরুষের সঙ্গ পাওয়া কি অতই সস্তা?

ঋতু পরিবর্তনের অপূর্ব রূপ সেবার সমুদ্রের উপর প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ হইল। বিরাট আকাশের রং পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট সমুদ্রের রং বদলাইল। সমুদ্রও যেন আকাশের দর্পণ। আকাশে মৌসুমী হাওয়ায় ঘন বর্ষার মেঘ জমিবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের রং ঘষা পয়সার মত হইয়া গেল। বৃষ্টি-ঝরা মেঘপুঞ্জের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দাদু সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিতেন। কোন্ নাকি এক বড় কবি, নাম তাঁহার কালিদাস, তিনি আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে মেঘরাশির ছন্দ কাব্যে গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমি মূর্খ, সংস্কৃত জানি না। দাদু মস্ত বড় পণ্ডিতের সন্তান। আমাকে সুর করিয়া সংস্কৃত কবিতার ছন্দলালিত্য যখন বুঝাইতেন, পিছনে বহিত অনন্ত নীল সাগর, মাথার উপরে মেঘভারাক্রান্ত নভঃস্থল—যেন কোন নূতন দেশের,

wapsip.com

নূতন জীবনের সন্ধান পাইলাম এতদিনে। সমস্ত টাকাকড়ির স্বপ্ন যাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়।

বদরুদ্দীন মাঝি আসিল!

দাদু বলিলেন—কি দাদু, চললে সত্যি?

—আপনি যা বলেন।

—যাও, দেশ থেকে ঘুরে এসো।

—ঠিক আসবো।

—আমার শিষ্য করে নেবো তোমাকে।

—আমি শুধু আপনার এখানে থাকতে চাই।

—আমার কি অনিচ্ছে? দেশে অনেকদিন যাও নি, ঘুরে এসো।

যাইবার আগের দিন সন্ধ্যার সময় দাদু আমাকে সমুদ্রের ধারে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, দাদু সাবধানে থেকো। আবার এসো। একটা কথা—

—কি?

—কি নেবে বলো?

—কি নেবো?

—যা ইচ্ছে , মুক্তো নিয়ে যাও।

—এ কথা ভেবে বলবো।

—ভাবার কি আছে এর মধ্যে?

—আপনার শিষ্য কি বৃথা হয়েছি? ভেবে দেখবো, তবে বলবো।

একা একা বিস্তীর্ণ বালুতটে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিলাম। দাদুর মুক্তা লইব! দাদু কিছুই বলিবেন না জানি, যত খুশি লইতে পারি বটে, কিন্তু বেশি টাকা হাতে পাইলে আমি শান্তি পাইব না। তবে দাদুর স্নেহের উপহার-স্বরূপ, তাঁহার মলিন স্মৃতির চিহ্ন হিসাবে একটি মাত্র মুক্ত তাঁহার হাত হইতে গ্রহণ করিব।

দাদু পরদিন বলিলেন—কি নেবে?

—কিছুই না, কেবল একটা মুক্তো নেবো আপনার হাত থেকে।

—খুব বিস্মিত হলাম। তুমি ছেলেমানুষ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সোজা কথা নয়। অনেক বড় বড় লোক পারে না। আশীর্বাদ করি, মানুষ হও।

—মানুষ হও মানে বড়লোক হও না তো?

—টাকার বড়লোক না,—এসো—

দাদা একটা পুঁটুলি খুলিয়া একটি মুক্তা আমার হাতে দিলেন। পুঁটুলিটি ঘরের এক কোণে অযত্নে পড়িয়াছিল। মুক্তাটি কখনও দেখি নাই, দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম—এ দিলেন কেন?

দাদু স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বলিলেন—আমার সাধ এটা। নিয়ে যাও—

বদরুদ্দীনের নৌকাতে উঠিবার সময় তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিলাম। তাঁহার চোখে জলের মত ও কি চিকচিক করিতেছে। অনেক দূর হইতে দেখি, তিনি ছবির মত সমুদ্রবেলায় দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে আমাদের নৌকার দিকে চাহিয়া আছেন।

বাড়ি ফিরিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মা নাই, দাদামহাশয় আছেন

wapsip.com

বটে, কিন্তু একেবারে শয্যাশায়ী, শরীর জীর্ণ-শীর্ণ, অস্থিকঙ্কালসার। আমাকে হারাইয়া দারুণ দুঃখে মৃতপ্রায়।

এই দীর্ঘ সাত বৎসরে আমার চেহারায় অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল, তবু দেখিবামাত্র কষ্টে গাত্রোত্থান করিয়া 'দাদু রে আমার' বলিয়া দাদামহাশয় আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, আমার প্রত্যাগমনের পর হইতে তিনি ক্রমশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন, হাতে-পায়ে বল পাইলেন।

একদিন তাঁহাকে প্রথম হইতে আমার সমস্ত ঘটনা বসিয়া বসিয়া বলিলাম! দাদুর কথা শুনিয়া দাদামহাশয় দু'হাত জোড় করিয়া বার বার তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন।

বলিলাম—দাঁড়ান, একটা জিনিস দেখাই।

পরে মুক্তাটি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। দাদামহাশয় বৈষয়িক ব্যক্তি, মুক্তা চিনিতেন। বিস্ময়ে তাঁহার চোখ বড়বড় হইয়া উঠিল। বলিলেন—এ কি, কে দিলেন, তিনি?

—হ্যাঁ

—এর দাম কত তোমার আন্দাজ হয়?

—জানিনে।

—অন্তত বিশ হাজার টাকা। এ নিয়ে একটা ব্যবসা করো দাদু। আমি সব ঠিক করে দেবো।

—আপনি যা বলেন।

—সত্যি বড়লোকের দেখা পেয়েছিলে!

দাদামহাশয়কে ছাড়িয়া যাইতে পারিলাম না কোথাও। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মায়া হইত। আমাকে পুনরায় হারাইলে বৃদ্ধ এবার আর বাঁচিবেন না।

ব্যবসা করিতেছি, উন্নতিও হইয়াছে। বৎসরখানেক কাটিয়াছে। নির্জন দ্বীপের আমার সেই দাদুকে কখনও ভুলি নাই, তাঁহার সেই ছবির মত মূর্তিটি মনের পটে চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকিবে। জানি না আবার কবে দেখা হইবে!

মাঝে মাঝে রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে দেখি তিনি বলিতেছেন—দাদু, মানুষ হও, সময় কখনও নষ্ট কোরো না—কথাটা ছোট, কিন্তু মস্ত বড় উপদেশ জীবনের পক্ষে।

স্বপ্নের মধ্যেই বলি—আপনি আশীর্বাদ করুন।

সেই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপটি, সেই নীল জলরাশি, সেই চিৎ-করানো কচ্ছপগুলো আবার যেন চোখের সামনে তখন ফুটিয়া উঠে।

wapsip.com

wapsip.com

wapsip.com

তালনবমী

ঝমঝম বর্ষা।

ভাদ্র মাসের দিন। আজ দিন পনেরো ধরে বর্ষা নেমেচে, তার আর বিরামও নেই, বিশ্রামও নেই। ক্ষুদিরাম ভট্‌চাজের বাড়ি আজ দু'দিন হাঁড়ি চড়ে নি।

ক্ষুদিরাম সামান্য আয়ের গৃহস্থ। জমিজমার সামান্য কিছু আয় এবং দু-চার ঘর শিষ্য-যজমানের বাড়ি ঘুরে-ঘুরে কায়ক্লেশে সংসার চলে। এই ভীষণ বর্ষায় গ্রামের কত গৃহস্থের বাড়িতেই পুত্র-কন্যা অনাহারে আছে,—ক্ষুদিরাম তো সামান্য গৃহস্থ মাত্র! যজমান-বাড়ি থেকে যে ক'টি ধান এসেছিল, তা ফুরিয়ে গিয়েচে।—ভাদ্রের শেষে আউশ ধান চাষীদের ঘরে উঠলে তবে আবার কিছু ধান ঘরে আসবে, ছেলেপুলেরা দু-বেলা পেট পুরে খেতে পাবে।

নেপাল ও গোপাল ক্ষুদিরামের দুই ছেলে। নেপালের বয়স বছর বারো, গোপালের দশ। ক'দিন থেকে পেট ভরে না-খেতে পেয়ে ওরা দুই ভায়েই সংসারের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেচে।

নেপাল বললে, "এই গোপলা, ক্ষিদে পেয়েচে না তোর?"

গোপাল ছিপ চাঁচতে চাঁচতে বললে, "হুঁ, দাদা!"

"মাকে গিয়ে বল্; আমারও পেট চুঁই চুঁই করচে।"

"মা বকে; তুমি যাও দাদা!"

"বকুক গে। আমার নাম করে মাকে বলতে পারবি নে?"

এমন সময় পাড়ার শিবু বাঁড়ুজ্যের ছেলে চুনিকে আসতে দেখে নেপাল ডাকলে, "ও চুনি, শুনে যা!"

চুনি বয়সে নেপালের চেয়ে বড়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ছেলে, বেশ চেহারা। নেপালের ডাকে সে ওদের উঠোনের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, "কি?"

"আয় না ভেতরে।"

"না যাবো না, বেলা যাচ্ছে। আমি জটি পিসীমাদের বাড়ি যাচ্ছি। মা সেখানে রয়েচে কিনা, ডাকতে যাচ্ছি।"

"কেন, তোর মা এখন সেখানে যে?"

"ওদের ডাল ভাঙতে গিয়েচে। তালনবমীর বের্তো আসচে এই মঙ্গলবার; ওদের বাড়ি লোকজন খাবে।"

"সত্যি?"

"তা জানিস নে বুঝি? আমাদের বাড়ির সবাইকে নেমন্তন্ন করবে। গাঁয়েও বলবে।"

"আমাদেরও করবে?"

"সবাইকে যখন নেমন্তন্ন করবে, তোদের কি বাদ দেবে?"

চুনি চলে গেলে নেপাল ছোট ভাইকে বললে, "আজ কি বার রে? তা তুই কি জানিস? আজ শুকুরবার বোধহয়। মঙ্গলবারে নেমন্তন্ন।"

গোপাল বললে, "কি মজা! না দাদা?"

"চুপ করে থাক,—তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই; তালনবমীর বের্তোর তালের বড়া করে, তুই

wapsip.com

জানিস?”

গোপাল সেটা জানতো না! কিন্তু দাদার মুখে শুনে খুব খুশি হয়ে উঠলো। সত্যিই তা যদি হয়, তবে সে সুখাদ্য খাবার সম্ভাবনা বহুদূরবর্তী নয়, ঘনিয়ে এসেচে কাছে। আজ কি বার সে জানে না, সামনের মঙ্গলবারে। নিশ্চয় তার আর বেশি দেরি নেই।

দাদার সঙ্গে বাড়ি যাবার পথে পড়ে জটি পিসীমার বাড়ি। নেপাল বললে, “তুই দাঁড়া, ওদের বাড়ি ঢুকে দেখে আসি। ওদের বাড়ি তালের দরকার হবে, যদি তাল কেনে।”

এ গ্রামের মধ্যে তালের গাছ নেই। মাঠে প্রকাণ্ড তালদীঘি, নেপাল সেখান থেকে তাল কুড়িয়ে এনে গাঁয়ে বিক্রি করে।

জটি পিসীমা সামনেই দাঁড়িয়ে। তিনি গ্রামের নটবর মুখুজ্যের স্ত্রী, ভালো নাম হরিমতী; গ্রামসুদ্ধ ছেলে-মেয়ে তাঁকে ডাকে জটি পিসীমা।

পিসীমা বললেন, “কি রে?”

“তাল নেবে পিসীমা?”

“হ্যাঁ, নেব বই কি। আমাদের তো দরকার হবে মঙ্গলবার।”

ঠিক এই সময় দাদার পিছু পিছু গোপালও এসে দাঁড়িয়েচে। জটি পিসীমা বললেন, “পেছনে কে রে? গোপাল? তা সন্ধ্যেবেলা দুই ভায়ে গিয়েছিলি কোথায়?”

নেপাল সলজ্জমুখে বললে, “মাছ ধরতে।”

“পেলি?”

“ওই দুটো পুঁটি আর একটা ছোট বেলে···তাহলে যাই পিসীমা?”

“আচ্ছা, এসোগে বাবা, সন্ধ্যে হয়ে গেল; অন্ধকারে চলাফেরা করা ভালো নয় বর্ষাকালে।”

জটি পিসীমা তাল সম্বন্ধে আর কোনও আগ্রহ দেখালেন না বা তালনবমীর ব্রত উপলক্ষে তাদের নিমন্ত্রণ করার উল্লেখও করলেন না,—যদিও দুজনেরই আশা ছিল হয়তো জটি পিসীমা তাদের দেখলেই নিমন্ত্রণ করবেন এখন। দরজার কাছে গিয়ে নেপাল আবার পেছন ফিরে জিগ্যেস করলে, “তাল নেবেন তা হলে?”

“তাল? তা দিয়ে যেও বাবা। ক’টা করে পয়সায়?”

“দুটো করে দিচ্ছি পিসীমা। তা নেবেন আপনি, তিনটে করেই নেবেন।”

“বেশ কালো হেঁড়ে তাল তো? আমাদের তালের পিঠে হবে তালনবমীর দিন—ভালো তাল চাই।”

“মিশ্‌কালো তাল পাবেন। দেখে নেবেন আপনি।”

গোপাল বাইরে এসেই দাদাকে বললে, “কবে তাল দিবি দাদা?”

“কাল।”

“তুই ওদের কাছে পয়সা নিস নে দাদা!”

নেপাল আশ্চর্য হয়ে বললে, “কেন রে?”

“তাহলে আমাদের নেমন্তন্ন করবে না, দেখিস এখন।”

“দূর! তা হয় না। আমি কষ্ট করে তাল কুড়বো—আর পয়সা নেবো না?”

রাত্রে বৃষ্টি নামে। হু হু বাদলার হাওয়া সেই সঙ্গে। পুবদিকের জানলার কপাট দড়িবাঁধা; হাওয়ায় দড়ি ছিঁড়ে সারারাত খট্‌খট্ শব্দ করে ঝড়বৃষ্টির দিনে। গোপালের ঘুম হয় না, তার যেন ভয় ভয় করে। সে শুয়ে শুয়ে ভাবচে—দাদা তাল যদি বিক্রি করে,—তবে ওরা আর

wapsip.com

নেমন্তন্ন করবে না। তা কখনও করে?

খুব ভোরবেলা উঠে গোপাল দেখলে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে। কেউই তখন ওঠে নি। রাত্রের বৃষ্টি থেমে গিয়েচে,—সামান্য একটু টিপটিপ বৃষ্টি পড়চে। গোপাল একছুটে চলে গেল গ্রামের পাশে সেই তালদীঘির ধারে। মাঠে এক হাঁটু জল আর কাদা। গ্রামের উত্তরপাড়ার গণেশ কাওরা লাঙল ঘাড়ে এই এত সকালে মাঠে যাচ্ছে। ওকে দেখে বললে, "কি খোকা ঠাকুর, যাচ্ছ কনে এত ভোরে?"

"তাল কুড়ুতে দীঘির পাড়ে।"

"বড্ড সাপের ভয় খোকাঠাকুর! বর্ষাকালে ওখানে যেও না একা-একা।"

গোপাল ভয়ে ভয়ে দীঘির তালপুকুরের তালের বনে ঢুকে তাল খুঁজতে লাগলো। বড় আর কালো কুচকুচে একটা মাত্র তাল প্রায় জলের ধারে পড়ে; সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসবার পথে আরও গোটা-তিনেক ছোট তাল পাওয়া গেল। ছেলেমানুষ, এত তাল বয়ে আনার সাধ্য নেই, দুটি মাত্র তাল নিয়ে সোজা একেবারে জটি পিসীমার বাড়ি হাজির।

জটি পিসীমা সবেমাত্র সদর দোর খুলে দোরগোড়ায় জলের ধারা দিচ্ছেন, ওকে এত সকালে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "কিরে খোকা?"

গোপাল একগাল হেসে বললে, "তোমার জন্যে তাল এনিচি পিসীমা!"

জটি পিসীমা আর কিছু না বলে তাল দুটো হাতে করে নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন।

গোপাল একবার ভাবলে, তালনবমী কবে জিগ্যেস করে; কিন্তু সাহসে কুলোয় না তার। সারাদিন গোপালের মন খেলাধুলোর ফাঁকে কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ঘন বর্ষার দুপুরে, মুখ উঁচু করে দেখে—নারকোল গাছের মাথা থেকে পাতা বেয়ে জল ঝরে পড়চে, বাঁশ ঝাঁড় নুয়ে নুয়ে পড়চে বাদলার হাওয়ায়, বকুলতলার ডোবায় কট্‌কটে ব্যাঙের দল থেকে থেকে ডাকচে।

গোপাল জিগ্যেস করলে, "ব্যাংগুলো আজকাল তেমন ডাকে না কেন মা?"

গোপালের মা বলেন, "নতুন জলে ডাকে, এখন পুরোনো জলে তত আমোদ নেই ওদের।"

"আজ কি বার, মা?"

"সোমবার। কেন রে? বারের খোঁজে তোর কি দরকার?"

"মঙ্গলবারে তালনবমী, না মা?"

"তা হয়তো হবে। কি জানি বাপু! নিজের হাঁড়িতে চাল জোটে না, তালনবমীর খোঁজে কি দরকার আমার?"

সারাদিন কেটে গেল। নেপাল বিকেলের দিকে জিগ্যেস করলে, "জটি পিসীমার বাড়িতে তাল দিইছিলি আজ সকালে? কোথায় পেলি তুই? আমি তাল দিতে গেলে পিসী বললেন, 'গোপাল তাল দিয়ে গেচে, পয়সা নেয় নি।'—কেন দিতে গেলি তুই? একটা পয়সা হলে দুজনে মুড়ি কিনে খেতাম!"

"ওরা নেমন্তন্ন করবে, দেখিস দাদা, কাল তো তালনবমী!"

"সে এমনিই নেমন্তন্ন করবে, পয়সা নিলেও করবে। তুই একটা বোকা!"

"আচ্ছা দাদা, কাল তো মঙ্গলবার না?"

"হুঁ।"

wapsip.com

রাত্রে উত্তেজনায় গোপালের ঘুম হয় না। বাড়ির পাশের বড় বকুল গাছটায় জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে; জানলা দিয়ে সেদিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবে—কাল সকালটা হলে হয়। কতক্ষণে যে রাত পোহাবে!···

জটি পিসীমা আদর করে ওকে বললেন খাওয়ানোর সময়, "খোকা, কাঁকুড়ের ডাল্না আর নিবি? মুগের ডাল বেশি করে মেখে নে।" জটি পিসীমার বড় মেয়ে লাবণ্য-দি একখানা থালায় গরম-গরম তিল-পিটুলি ভাজা এনে ওর সামনে ধরে হেসে বললেন, "খোকা, ক'খানা নিবি তিল-পিটুলি?"—বলেই লাবণ্য-দি থালাখানা উপুড় করে তার পাতে ঢেলে দিলে। তার পর জটি পিসীমা আনলেন পায়েস আর তালের বড়া। হেসে বললেন "খোকা যাই তাল কুড়িয়ে দিয়েছিলি, তাই পায়েস হল!···খা, খা,—খুব খা—আজ যে তালনবমী রে!"···কত কি চমৎকার ধরনের রাঁধা তরকারির গন্ধ—বাতাসে! খেজুর গুড়ের পায়েসের সুগন্ধ—বাতাসে! গোপালের মন খুশি ও আনন্দে ভরে উঠলো। সে বসে বসে খাচ্ছে, কেবলই খাচ্ছে!···সবারই খাওয়া শেষ, ও তবুও খেয়েই যাচ্ছে···লাবণ্য-দি হেসে হেসে বলছে, "আর নিবি তিল-পিটুলি?"···

"ও গোপাল?"

হঠাৎ গোপাল চোখ চেয়ে দেখলে—জানলার পাশে বর্ষার জলে ভেজা ঝোপ-ঝাড়, তাদের সেই আতা গাছটা···সে শুয়ে আছে তাদের বাড়িতে। মার হাতের মৃদু ঠেলায় ঘুম ভেঙেচে, মা পাশে দাঁড়িয়ে বলচেন, "ওঠ ওঠ বেলা হয়েচে কত! মেঘ করে আছে তাই বোঝা যাচ্ছে না।"

বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে সে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"আজ কি বার, মা···?"

"মঙ্গলবার।"

তাও-তো বটে! আজই তো তালনবমী! ঘুমের মধ্যে ওসব কি হিজিবিজি স্বপ্ন সে দেখছিল!

বেলা আরও বাড়লো, ঘন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার দিনে যদিও বোঝা গেল না বেলা কতটা হয়েচে। গোপাল দরজার সামনে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর ঠায় বসে রইলো। বৃষ্টি নেই একটুও, মেঘ-জমকালো আকাশ। বাদলের সজল হাওয়ায় গা সিরসির করে। গোপাল আশায় আশায় বসে রইলো বটে, কিন্তু কই, পিসীমাদের বাড়ি থেকে কেউ তো নেমন্তন্ন করতে এল না!

অনেক বেলায় তাদের পাড়ার জগবন্ধু চক্কোত্তি তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে সামনের পথ দিয়ে কোথায় যেন চলেছেন। তাদের পেছনে রাখাল রায় ও তাঁর ছেলে সানু; তার পেছনে কালীবর বাঁড়ুজ্যের বড় ছেলে পাঁচু আর ও-পাড়ার হরেন···

গোপাল ভাবলে, এরা যায় কোথায়?

এ-দলটি চলে যাবার কিছু পরে বুড়ো নবীন ভট্‌চাজ ও তার ছোট ভাই দীনু, সঙ্গে এক পাল ছেলেমেয়ে নিয়ে চলেচে।

দীনু ভট্‌চাজের ছেলে কুড়োরাম ওকে দেখে বললে, "এখানে বসে কেন রে? যাবিনে?"

গোপাল বললে, "কোথায় যাচ্ছিস তোরা?"

wapsip.com

"জটি পিসীমাদের বাড়ি তালনবমীর নেমন্তন্ন খেতে। করে নি তোদের? ওরা বেছে বেছে বলেচে কিনা, সবাইকে তো বলেনি..."

গোপাল হঠাৎ রাগে, অভিমানে যেন দিশেহারা হয়ে গেল। রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "কেন করবে না আমাদের নেমন্তন্ন? আমরা এর পরে যাবো..."

রাগ করবার মতো কি কথা সে বলেচে বুঝতে না পেরে কুড়োরাম অবাক হয়ে বললে, "বারে! তা অত রাগ করিস কেন? কি হয়েচে?"

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের চোখে জল এসে পড়লো—বোধ হয় সংসারের অবিচার দেখেই। পথ চেয়ে সে বসে আছে কদিন থেকে! কিন্তু তার কেবল পথ চাওয়াই সার হল? তার সজল ঝাপসা দৃষ্টির সামনে পাড়ার হারু, হিতেন, দেবেন, গুট্‌কে তাদের বাপ-কাকাদের সঙ্গে একে একে তার বাড়ির সামনে দিয়ে জটি পিসীমাদের বাড়ির দিকে চলে গেল...

রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ

জীবনে অনেক জিনিস ঘটে, যাহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি। জানি না, হয়তো খুঁজিতে জানিলে তাহাদেরও সহজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ বাহির করা যায়। মানুষের বিচার, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ কারণগুলি ছাড়া অন্য কারণ হয়তো তাহাদের থাকিতে পারে—ইহা লইয়া তর্ক উঠাইব না, শুধু এইটুকু বলিব, সেরূপ কারণ যদিও থাকে—আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বারা তাহার আবিষ্কার হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই তাহাদিগকে অতিপ্রাকৃত বলা হয়।

আমার জীবনে একবার এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার যুক্তি-যুক্ত কারণ তখন বা আজ কোনদিনই খুঁজিয়া পাই নাই—পাঠকদের কাছে তাই সেটি বর্ণনা করিয়াই আমি খালাস; তাঁহারা যদি সে রহস্যের কোনও স্বাভাবিক সমাধান নির্দেশ করিতে পারেন, যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিব।

ঘটনাটা এইবার বলি।

কয়েক বছর আগেকার কথা। মানভূম জেলার চেরো নামক গ্রামের মাইনর স্কুলে তখন মাস্টারি করি।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, চেরো গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য এমনতর যে এখানে কিছুদিন বসবাস করিলে বাঙলাদেশের একঘেয়ে সমতলভূমির কোনও পল্লী আর চোখে ভালো লাগে না। একটি অনুচ্চ পাহাড়ের ঢালু সানুদেশ জুড়িয়া লম্বালম্বি ভাবে সারা গ্রামের বাড়িগুলি অবস্থিত—সর্বশেষ সারির বাড়িগুলির খিড়কি দরজা খুলিলেই দেখা যায় পাহাড়ের উপরকার শাল, মহুয়া, কুরীচ, বিল্ববৃক্ষের পাতলা জঙ্গল, একটা সুবৃহৎ বটগাছ ও তাহার তলায় বাঁধানো বেদী, ছোট বড় শিলাখণ্ড ও ভেলা কাঁটার ঝোপ।

আমি যখন প্রথম ও-গ্রামে গেলাম তখন একদিন পাহাড়ের মাথায় বেড়াইতে উঠিয়া এক জায়গায় শালবনের মধ্যে একটি পাথরের ভাঙা মন্দির দেখিতে পাইলাম।

সঙ্গে ছিল আমার দুটি উপরের ক্লাসের ছাত্র—তাহারা মানভূমবাসী বাঙালী। একটা কথা—চেরো গ্রামে বেশির ভাগ অধিবাসী মাদ্রাজী, যদিও তাহারা বেশ বাংলা বলিতে পারে,

wapsip.com

অনেকে বাংলা আচার-ব্যবহারও অবলম্বন করিয়াছে। কি করিয়া মানভূম জেলার মাঝখানে এতগুলি মাদ্রাজী অধিবাসী আসিয়া বসবাস করিল, তাহার ইতিহাস আমি বলিতে পারি না।

মন্দিরটি কালো পাথরের এবং একটু অদ্ভুত গঠনের। অনেকটা যেন চাঁচড়া রাজবাড়ির দশমহাবিদ্যার মন্দিরের মতো ধরনটা—এ অঞ্চলে এরূপ গঠনের মন্দির আমার চোখে পড়ে নাই—তা ছাড়া মন্দিরটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ও বিগ্রহশূন্য। দক্ষিণের দেওয়ালের পাথরের চাঁই কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, দরজা নাই, শুধু আছে পাথরের চৌকাঠ। মন্দিরের মধ্যে ও চারিপাশে বনতুলসীর ঘন জঙ্গল—সান্ধ্য আকাশের পটভূমিতে সেই পাথরের বিগ্রহহীন ভাঙা মন্দির আমার মনে কেমন এক অনুভূতির সঞ্চার করিল। আশ্চর্যের বিষয়,—অনুভূতিটা ভয়ের। ভাঙা মন্দির দেখিয়া মনে ভয় কেন হইল একথা তারপর বাড়ি ফিরিয়া অবাক হইয়া ভাবিয়াছি। তবুও অগ্রসর হইয়া যাইতেছিলাম মন্দিরটা ভালো করিয়া দেখিতে, একজন ছাত্র বাধা দিয়া বলিল, "যাবেন না স্যার ওদিকে···"

"কেন?"

"জায়গাটা ভালো না। সাপের ভয় আছে সন্ধ্যেবেলা। তা ছাড়া লোকে বলে অনেক রকম ভয়ভীত আছে—মানে অমঙ্গলের ভয়। কেউ ওদিকে যায় না।"

"ওটা কি মন্দির?"

"ওটা রঙ্কিণীদেবীর মন্দির, স্যার! কিন্তু আমাদের গাঁয়ের বুড়ো লোকেরাও কোনদিন ওখানে পুজো হতে দেখে নি—মূর্তিও নেই বহুকাল। ওইরকম জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে আমাদের বাপ-ঠাকুরদার আমলেরও আগে থেকে।···চলুন স্যার নামি।"

ছেলে দুটা যেন একটু বেশি তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল নামিবার জন্য।

রঙ্কিণীদেবী বা তাঁহার মন্দির সম্বন্ধে দু-একজন বৃদ্ধ লোককে ইহার পর প্রশ্নও করিয়াছিলাম—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, লক্ষ্য করিয়াছি, তাহারা কথাটা এড়াইয়া যাইতে চায় যেন, আমার মনে হইয়াছে রঙ্কিণী দেবী সংক্রান্ত কথাবার্তা বলিতেও তাহারা ভয় পায়।

আমিও আর সে-বিষয়ে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা ছাড়িয়া দিলাম।

বছর খানেক কাটিয়া গেল।

স্কুলে ছেলে কম, কাজকর্ম খুব হালকা, অবসর সময়ে এ-গ্রামে ও-গ্রামে বেড়াইয়া এ অঞ্চলের প্রাচীন পট, পুঁথি, ঘট ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এ বাতিক আমার অনেকদিন হইতেই আছে। নূতন জায়গায় আসিয়া বাতিকটা বাড়িয়া গেল।

চেরো গ্রাম হইতে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে জয়চণ্ডী পাহাড়। এখানে খাড়া উঁচু একটা অদ্ভুত গঠনের পাহাড়ের মাথায় জয়চণ্ডী ঠাকুরের মন্দির আছে। পৌষ মাসে বড় মেলা বসে। বি.এন.আর লাইনের একটা ছোট স্টেশনও আছে এখানে।

এই পাহাড়ের কাছে একটি ক্ষুদ্র বস্তিতে কয়েক ঘর মানভূমপ্রবাসী উড়িয়া ব্রাহ্মণের বাস। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রমোহন পাণ্ডা নামে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হইয়া গেল—তিনি বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় আমার সঙ্গে অনেক রকমের গল্প করিতেন। পট, পুঁথি, ঘট সংগ্রহের অবকাশে আমি জয়চণ্ডীতলা গ্রামে চন্দ্রমোহন পাণ্ডার নিকট বসিয়া তাঁহার মুখে এদেশের কথা শুনিতাম। চন্দ্র পাণ্ডা আবার স্থানীয় ডাকঘরের পোস্টমাস্টারও। এদেশে প্রচলিত কত রকম আজগুবি ধরনের সাপের, ভূতের, ডাকাতের ও বাঘের (বিশেষ করিয়া বাঘের—কারণ বাঘের উপদ্রব এখানে খুব বেশি) গল্প যে বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শুনিয়াছি এবং এই সব গল্প শুনিবার লোভে কত আষাঢ়ের ঘন বর্ষার দিনে বৃদ্ধ

wapsip.com

পোস্টমাস্টারের বাড়িতে গিয়া যে হানা দিয়াছি, তাহার হিসাব দিতে পারিব না।

মানভূমের এই সব আরণ্য অঞ্চল সভ্যজগতের কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত, এখানকার জীবনযাত্রাও একটু স্বতন্ত্র ধরনের। যতই অদ্ভুত ধরনের গল্প হউক, জয়চণ্ডী পাহাড়ের ছায়ায় শালবন-বেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় সেগুলি শুনিবার সময় মনে হইত—এদেশে এরূপ ঘটিবে ইহা আর বিচিত্র কি! কলিকাতা বালিগঞ্জের কথা তো ইহা নয়।

কথায় কথায় চন্দ্র পাণ্ডা একদিন বলিলেন, "চেরো পাহাড়ে রঙ্কিণী দেবীর মন্দির দেখচেন?" আমি একটু আশ্চর্য হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলাম।

রঙ্কিণী দেবী সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমি আর কোনও কথা কাহারও মুখে শুনি নাই, সেদিন সন্ধ্যায় আমার ছাত্রটির নিকট যাহা সামান্য কিছু শুনিয়াছিলাম, তাহা ছাড়া।

বলিলাম, "মন্দির দেখেচি, কিন্তু রঙ্কিণী দেবীর কথা জানবার জন্যে যাকেই জিগ্যেস করেচি সেই চুপ করে গিয়েচে কিংবা অন্য কথা পেড়েচে—এর কারণ কিছু বলবেন?"

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, "রঙ্কিণী দেবীর নামে সবাই ভয় খায়।"

"কেন বলুন তো?"

"মানভূম জেলায় আগে অসভ্য বুনো জাত বাস করতো। তাদেরই দেবতা উনি। ইদানীং হিন্দুরা এসে যখন বাস করলে, উনি হিন্দুদেরও ঠাকুর হয়ে গেলেন। তখন তাদের মধ্যে কেউ মন্দির করে দিলে। কিন্তু রঙ্কিণী দেবী হিন্দু দেব-দেবীর মত নয়, অসভ্য বন্য জাতির ঠাকুর—আগে ওই মন্দিরে নরবলি হত—ষাট বছর আগেও রঙ্কিণী মন্দিরে নরবলি হয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করে রঙ্কিণী দেবী অসন্তুষ্ট হলে রক্ষা নেই—অপমৃত্যু আর অমঙ্গল আসবে তাহলে। এরকম অনেকবার হয়েচে নাকি। একটা প্রবাদ আছে এ অঞ্চল, দেশে মড়ক হবার আগে রঙ্কিণী দেবীর হাতের খাঁড়া রক্তমাখা দেখা যেত। আমি যখন প্রথমে এদেশে আসি, সে আজ চল্লিশ বছর আগের কথা—তখন প্রাচীন লোকদের মুখে একথা শুনেছিলাম।

"রঙ্কিণী দেবীর বিগ্রহ দেখেছিলেন মন্দিরে?"

"না, আমি এসে পর্যন্ত ওই ভাঙা মন্দিরই দেখচি। এখান থেকে কারা বিগ্রহটি নিয়ে যায়, অন্য কোন্ দেশে। রঙ্কিণী দেবীর এসব কথা আমি শুনতাম ওই মন্দিরের সেবাইত বংশের এক বৃদ্ধের মুখে। তাঁর বাড়ি ছিল ওই চেরো গ্রামেই। আমি প্রথম যখন এদেশে আসি—তখন তার বাড়ি অনেকবার গিয়েচি। দেবীর খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার কথাও তাঁর মুখে শুনি। এখন তাঁদের বংশে আর কেউ নেই। তার পর চেরো গ্রামেও আর বহুদিন যাই নি—বয়েস হয়েচে, বড় বেশি কোথাও বেরুই নে।"

'বিগ্রহের মূর্তি কি?"

"শুনেছিলাম কালীমূর্তি। আগে নাকি হাতে সত্যিকার নরমুণ্ড থাকতো অসভ্যদের আমলে। কত নরবলি হয়েচে তার লেখা-জোখা নেই—এখনও মন্দিরের পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঢিবি আছে—খুঁড়লে নরমুণ্ড পাওয়া যায়।"

সাধে এদেশের লোক ভয় পায়! শুনিয়া সন্ধ্যার পরে জয়চণ্ডীতলা হইতে ফিরিবার পথে আমারই গা ছমছম করিতে লাগিল।

আরও বছর দুই সুখে-দুঃখে কাটিল। জায়গাটা আমার এত ভালো লাগিয়াছিল যে হয়তো সেখানে আরও অনেকদিন থাকিয়া যাইতাম—কিন্তু স্কুল লইয়াই বাঙালীদের সঙ্গে মাদ্রাজীদের বিবাদ বাধিল। মাদ্রাজীরা স্কুলের জন্যে বেশি টাকাকড়ি দিত; তাহারা দাবি করিতে

wapsip.com

লাগিল কমিটিতে তাহাদের লোক বেশি থাকিবে—ইংরাজির মাস্টার একজন মাদ্রাজী রাখিতেই হইবে, ইত্যাদি। আমি ইংরাজি পড়াইতাম—মাঝে হইতে আমার চাকুরি রাখা দায় হইয়া উঠিল। এই সময়ে আমাদের দেশে একটি হাই স্কুল হইয়াছিল, পূর্বে একবার তাহারা আমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ম্যালেরিয়ার ভয়ে যাইতে চাহি নাই—এখন বেগতিক বুঝিয়া দেশে চিঠি লিখিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব কারণে চেরো গ্রামের মাস্টারি আমায় ছাড়িতে হয় নাই। কিসের জন্য ছাড়িয়া দিলাম পরে সে কথা বলিব।

এই সময় একদিন চন্দ্র পাণ্ডা চেরো গ্রামে কি কার্য উপলক্ষে আসিলেন। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম আমার বাসায় একটু চা খাইতে হইবে। তাঁহার গরুর গাড়ি সমেত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাসাবাড়িতে আনিলাম।

বৃদ্ধ ইতিপূর্বে কখনও আমার বাসায় আসেন নাই; বাড়িতে ঢুকিয়াই চারিদিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "এই বাড়িতে থাকেন আপনি?"

বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোট্ট গাঁ, বাড়ি তো পাওয়া যায় না—আগে স্কুলের একটা ঘরে থাকতাম। বছর খানেক হল স্কুলের সেক্রেটারি রঘুনাথন্ এটা ঠিক করে দিয়েচেন।"

পুরানো আমলের পাথরে গাঁথুনির বাড়ি। বেশ বড় বড় তিনটি কামরা, একদিকে একটু সরু যাতায়াতের বারান্দা। জবরদস্ত গড়ন, যেন খিলজিদের আমলের দুর্গ কি জেলখানা—হাজার ভূমিকম্পেও এ বাড়ির একটু চুন বালি খসাইতে পারিবে না। বৃদ্ধ বসিয়া আবার বাড়িটার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলাম বাড়ীটার গড়ন তাঁহার ভালো লাগিয়াছে, বলিলাম, "সেকালের গড়ন, খুব টন্‌কো—আগাগোড়া পাথরের।"

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, "না, সেজন্যে নয়। আমি এই বাড়িতে প্রায় ত্রিশ বছর আগে যথেষ্ট যাতায়াত করতাম—এই বাড়িই হ'ল রঙ্কিণী দেবীর সেবাইত বংশের। ওদের বংশে এখন আর কেউ নেই। আপনি যে এ বাড়িতে আছেন তা জানতাম না।...তা বেশ বেশ। অনেকদিন পরে বাড়িটাতে ঢুকলাম কিনা, আমার বড় অদ্ভুত লাগচে। তখন বয়েস ছিল ত্রিশ, আর এখন হল প্রায় ষাট।" তারপর অন্যান্য কথা আসিয়া পড়িল। চা পান করিয়া বৃদ্ধ গাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

আরও বছর খানেক কাটিয়াছে। দেশের স্কুলে চাকুরির আশ্বাস পাইলেও আমি এখনও যাই নাই, কারণ এখানকার বাঙালী-মাদ্রাজী সমস্যা একরূপ মিটিয়া আসিয়াছে, আপাতত আমার চাকুরিটা বজায় রহিল বলিয়াই তো মনে হয়।

চৈত্র মাসের শেষ।

পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে আমারই এক ছাত্রের বাড়িতে অন্নপূর্ণা পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম—মধ্যে রবিবার পড়াতে শনিবার গরুর গাড়ি করিয়া রওনা হই, রবিবার ও সোমবার থাকিয়া মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

বলা আবশ্যক বাসায় আমি একাই থাকি। স্কুলের চাকর রাখহরি আমার রাঁধে, এ কয়দিন স্কুলের ছুটি ছিল, রাখহরিকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। বাহিরের দরজার তালা খুলিয়াই রাখহরি বলিয়া উঠিল, "এ, বাবু, এ কিসের রক্ত! দেখুন..."

প্রায় চমকিয়া উঠিলাম।

তাই বটে! বাহিরের দরজায় চৌকাঠের ঠিক ভিতর দিক হইতেই রক্তের ধারা উঠান বাহিয়া যেন চলিয়াছে। একটানা ধারা নয়, ফোঁটা ফোঁটা রক্তের একটা অবিচ্ছিন্ন সারি। একেবারে টাটকা রক্ত—এইমাত্র সদ্য যেন কাহারও মুণ্ড কাটিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

wapsip.com

আমি তো অবাক। কিসের রক্তের ধারা এ! কোথা হইতেই বা আসিল, আজ দুদিন তো বাসা বন্ধ ছিল—বাড়ির ভিতরের উঠানে রক্তের দাগ আসে কোথা হইতে—তাহার উপর সদ্য তাজা রক্ত!

অবশ্য কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুরের কথা মনে পড়িল। এ ক্ষেত্রে পড়াই স্বাভাবিক। চাকরকে বলিলাম, "দেখতো রে, রক্তটা কোন্ দিকে যাচ্চে—এ সেই বড় হুলো বেড়ালটার কাজ..."

রক্তের ধারাটা গিয়াছে দেখা গেল সিঁড়ির নিচের চোরকুঠুরির দিকে। ছোট্ট ঘর, ভীষণ অন্ধকার এবং যত রাজ্যের ভাঙাচোরা পুরনো মালে ভর্তি বলিয়া আমি কোনদিন চোরকুঠুরি খুলি নাই। চোরকুঠুরির দরজা পার হইয়া বন্ধ ঘরের মধ্যে রক্তের ধারাটার গতি দেখিয়া ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতকাল ধরিয়া ঘরটা বাহির হইতে তালা বন্ধ, যদি বিড়ালের ব্যাপারই হয়, বিড়াল ঢুকিতেও তো ছিদ্রপথ দরকার হয়।

চোরকুঠুরির তালা লোহার শিকের চাড় দিয়া খোলা হইল। আলো জ্বালিয়া দেখা গেল ঘরটায় পুরনো ভাঙা, তোবড়ানো টিনের বাক্স, পুরনো ছেঁড়া গদি, খাটের পায়া, মরিচাধরা সড়কি, ভাঙা টিন, শাবল প্রভৃতি ঠাসা বোঝাই। ঘরের মেঝেতে সোজা রক্তের দাগ এক কোণের দিকে গিয়াছে—রাখহরি খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ কি বাবু! এতে কি করে এমনধারা রক্ত লাগলো..."

তারপর সে কি একটা জিনিস হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখুন কাণ্ডটা বাবু..." জিনিসটাকে হাতে লইয়া সে বাহিরে আসিতে তাহার হাতের দিকে চাহিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম।

একখানা মরিচাধরা হাতলবিহীন ভাঙা খাঁড়া বা রাম-দা—আগার দিকটা চওড়া ও বাঁকানো—বড় চওড়া ফলাটা তাজা রক্তে টকটকে রাঙা! একটু আধটু রক্ত নয়, ফলাতে আগাগোড়া রক্ত মাখানো, মনে হয় যেন খাঁড়াখানা হইতে এখনি টপ্‌টপ্ করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িবে!

সেই মুহূর্তে এক সঙ্গে আমার অনেক কথা মনে হইল। দুই বৎসর পূর্বে চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শোনা সেই গল্প। রঙ্কিণী দেবীর সেবাইত বংশের ভদ্রাসন বাড়ি এটা। পুরানো জিনিসের গুদাম এই চোরকুঠুরিতে রঙ্কিণী দেবীর হাতের খাঁড়াখানা তাহারাই রাখিয়াছিল হয়তো। ...মড়কের আগে বিগ্রহের খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার প্রবাদ!

আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

মড়ক কোথায় ভাবিতে পারিতাম যদি সময় পাইতাম সন্দেহ করিবার। কিন্তু তাহা পাই নাই। পরদিন সন্ধ্যার সময় চেরো গ্রামে প্রথম কলেরা রোগীর খবর পাওয়া গেল। তিন দিনের মধ্যে রোগ ছড়াইয়া মড়ক দেখা দিল—প্রথমে চেরো, তারপর পাশের গ্রাম কাজরা, ক্রমে জয়চণ্ডীতলা পর্যন্ত মড়ক বিস্তৃত হইল। লোক মরিয়া ধুলধাবাড় হইতে লাগিল। চেরো গ্রামের মাদ্রাজী বংশ প্রায় কাবার হইবার যোগাড় হইল।

মড়কের জন্য স্কুল বন্ধ হইয়া গেল। আমি দেশে পলাইয়া আসিলাম; তারপর আর কখনও চেরোতে যাই নাই—গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বেই দেশের স্কুলের চাকুরিটা পাইয়াছিলাম।

সেই হইতে রঙ্কিণী দেবীকে মনে মনে ভক্তি করি! তিনি অমঙ্গলের পূর্বাভাস দিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেন মাত্র। মূর্খ জনসাধারণ তাঁহাকেই অমঙ্গলের কারণ ভাবিয়া ভুল বোঝে।

wapsip.com

মেডেল

কয়েক বছর পূর্বে এ ঘটনা ঘটেচে, তাই এখন মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আগাগোড়া মিথ্যে; আমারই কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতার দরুন হয়তো চোখে ভুল দেখে থাকবো বা ওই রকম কিছু!—কিন্তু আমার মন বলে, তা নয়, ঘটনাটা মিথ্যে ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনও কারণ ঘটে নি। আমার তখনকারের অভিজ্ঞতাই সত্যি, এখন যা ভাবচি, তাই মিথ্যে।

ঘটনাটি খুলে বলা দরকার।

প্রসঙ্গক্রমে গোড়াতেই একথা বলে রাখি যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে আমার শরীরে কোনও রোগ-বালাই নেই। আমার মন বা মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ আছে এবং যে সময়ের কথা বলচি, এখন থেকে বছর চারেক আগে, তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। আমার স্কুলমাস্টারের জীবনে অত্যাশ্চর্য বা অবিশ্বাস্য ধরনের কখনও কিছু দেখি নি। অন্য পাঁচজন স্কুলমাস্টারের মতোই অত্যন্ত সাধারণ ও একঘেয়ে রুটিন বাঁধা কর্তব্যের মধ্যে দিয়েই দিন কাটিয়ে চলেছি আজ বহু বৎসর।

সে বছর বর্ষাকালে, গরমের ছুটির কিছু পরে একদিন ক্লাসে পড়াচ্ছি, এমন সময় একটি ছেলে আর একটি ছেলের সঙ্গে হাত-কাড়াকাড়ি করে কি একটা কেড়ে বা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করচে, আমার চোখে পড়লো। আমি ওদের দুজনকে অমনোযোগিতার জন্যে ধমক দিতে, অন্য একটি ছেলে বলে উঠলো, "স্যার, কামিখ্যে সুধীরের মেডেল কেড়ে নিচ্ছে···"

"কার মেডেল? কিসের মেডেল?"

সুধীর নামে ছেলেটি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আমার মেডেল, স্যার!"

অন্য ছেলেটির দিকে চেয়ে বললুম, "ওর মেডেল তুমি নিচ্ছিলে, কামিখ্যে?

কামিখ্যে ওরফে কামাখ্যাচরণ মৌলিক নামে ছেলেটি বললে, "নিচ্ছিলুম না স্যার, দেখতে চাইছিলুম; তা, ও দেবে না···"

"ওর মেডেল যদি ও না দেয়; তোমার কেড়ে নেবার কি অধিকার আছে? বোসো, ও রকম আর করবে না···"

কথা শেষ করে সুধীরের দিকে চেয়ে ক্লাসের ছেলেদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সখ্য থাকার ঔচিত্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দেবার পরে ঈষৎ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলুম, "কই, কি মেডেল দেখি? কোথায় পেলে মেডেল?"

ভেবেছিলুম আজকাল কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে সব ব্যাডমিন্টন খেলা, সাঁতারের বা দৌড়ের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তারই কোন কিছুতে সুধীর হয়তো চতুর্থ স্থান বা ওই ধরনের কোনো সাফল্যলাভ করে ছোট্ট এতটুকু একটা আধুলির মতো মেডেল পেয়ে থাকবে—এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, সে সেটা ক্লাসে এনে পাঁচজনকে গর্ব-ভরে দেখাতে চাইবে; এমন কি এই ছুতো অবলম্বন করে ক্লাসসুদ্ধু হেডমাস্টারের কাছে দলবদ্ধ হয়ে গিয়ে একবেলার জন্যে ছুটিও চাইতে পারে। সুতরাং মেডেলটা যখন আমার হাতে এসে পৌঁছুলো, তখন সেটাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই হাত পেতে নিলুম; কিন্তু মেডেলটার দিকে একবার চেয়ে দেখেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসলুম। না, এ তো পাড়ার ব্যাড্‌মিন্টন ক্লাবের

wapsip.com

বাজে মেডেল নয়, মেডেলটা পুরনো, বড় ও ভারি চমৎকার গড়ন!—কি জিনিস দেখি?

মেডেলের গায়ে কি লেখা রয়েচে, আধ-অন্ধকার ক্লাসরুমে ভালো পড়তে পারলুম না—ও-পিঠ উলটে দেখি, মহারানী ভিক্টোরিয়ার অল্প-বয়সের মূর্তি খোদাই করা। পকেটে চশমা নেই, মনে হল অফিস ঘরের টেবিলে ফেলে এসেচি। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ছেলে ভিড় করেচে আমার চেয়ারের চারিপাশে—মেডেল দেখবার জন্যে। তাদের ধমক দিয়ে বললুম, "যাও, বোসোগে সব, ভিড় কোরো না এখানে।"

একটা ছেলেকে বললুম, "কি লেখা আছে মেডেলের গায়ে পড়ো তো?"

ক্লাস ফোরের ছেলে—অতি কষ্টে ধীরে ধীরে পড়লে, "ক্রাইমিয়া, সিবাস্টোপোল, ভিক্টোরিয়া রেজিনা···।"

"ও পিঠে?"

"সার্জেন্ট এস. বি. পার্কিন্‌স্‌, সিক্সথ্ ড্রাগন গার্ডস্‌—আঠারো শ' চুয়ান্ন সাল···"

দস্তুরমতো অবাক হয়ে গেলুম। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময় সিবাস্টোপোলের রণক্ষেত্রে কোনও সাহসের কাজ করবার জন্যে এই মেডেল দেওয়া হয়েছিল ইংলন্ডের সামরিক দপ্তর থেকে ড্র্যাগন গার্ডস্‌ সৈন্যদলের সার্জেন্ট পার্কিন্‌স্‌কে। এ তো সাধারণ জিনিস মোটেই নয়!

ক্রাইমিয়া···সিবাস্টোপোল? ···চার্জ অফ দি লাইট ব্রিগেড্! কিন্তু কলকাতার নীলমণি দাসের লেনের সুধীর সাহার কাছে সে মেডেল কোথা থেকে আসে।

"এদিকে এসো, এ মেডেল কোথায় পেয়েচ?"

"ওটা আমার স্যার!"

"তোমার তা বুঝলুম। পেলে কোথায়?"

"আমার দাদু দিয়েচেন স্যার।"

"তোমার দাদু কোথায় পেয়েছিলেন জানো?

"হ্যাঁ, স্যার, জানি। আমার দাদুর বাবার কাছে এক সাহেব জমা রেখে গিয়েছিল।"

"কি ভাবে?"

"আমাদের মদের দোকান ছিল কিনা, স্যার! মদ খেয়ে টাকা কম পড়লে ওটা বাঁধা রেখে গিয়েছিল, আর নিয়ে যায় নি—দাদুর মুখে শুনেচি।"

হিসেব করে দেখলুম ছিয়াশি উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে সেই বছরটি থেকে, যে বছরে সার্জেন্ট পার্কিন্‌স্‌ (সে যেই হোক) এ মেডেল পায়। তখন তার বয়স যদি কুড়ি বছরও থেকে থাকে, এখন তার বয়স হওয়া উচিত একশো ছয়। সুতরাং সে মরে ভূত হয়ে গেছে কোন্ কালে।

সেদিন ছিল শনিবার, সকাল সকাল স্কুল ছুটি হবে এবং অনেক দিন পরে সেদিন দেশে যাবো পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলুম। আমার এক গ্রাম-সম্পর্কে জ্যাঠামশায় ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, বেশ পড়াশুনো আছে, গ্রামেই থাকেন। ভাবলুম, তাঁকে মেডেলটা দেখালে খুশি হবেন খুব। সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটি চেয়ে নিলুম, সোমবারে ফেরত দোব বললুম। স্কুলের ছুটির পরে বাসা থেকে সুটকেসটি নিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে এসে আড়াইটের গাড়ি ধরলুম। দেশের স্টেশনে যখন নামলুম, তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। দু'মাইল রাস্তা হেঁটে বাড়ি পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগেই হয়তো পৌঁছুতে পারা যেত—কিন্তু আমি খুব জোরে হাঁটি নি।

ভাদ্র মাসের শেষ, অথচ বৃষ্টি তত বেশি না-হওয়ায় পথ-ঘাট বেশ শুকনো খটখটে।

wapsip.com

পথের ধারের বর্ষা-শ্যামল গাছপালা চোখে বড় ভালো লাগছিল অনেক দিন কলকাতা বাসের পরে—তাই জোরে পা না-চালিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিলুম। এখানে প্রথমেই বলি, আমার বাড়িতে কেউ থাকে না। পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধা, আমি গেলে রান্না করে দিয়ে আসতেন বরাবর। আমার এক বাল্যবন্ধু বৃন্দাবন, অনেক বছর ধরে বিদেশে থাকে, পিসিমার মুখে শুনলুম, আজ দিন পনেরো হল বৃন্দাবন বাড়ি এসেচে। শুনে বড় আনন্দ হল, সন্ধ্যার পরেই ওর সঙ্গে দেখা করবো ঠিক করে, চা খেয়ে নদীর ধারে বেড়াতে বার হলুম—যাবার সময় সুটকেসটা খুলে মেডেলটা পকেটে নিলুম, বৃন্দাবনকেও দেখাবো।

নদীর ধারে গিয়ে দেখি—বর্ষার দরুন নদীর জল ভয়ানক বেড়েচে, নদীর জল কূল ছাপিয়ে দু'ধারের মাঠে পড়েচে। অনেকক্ষণ বসে রইলুম, সন্ধ্যার অন্ধকার নামলো একটু একটু, বাদুড়ের দল বাসায় ফিরচে। কেউ কোনো দিকে নেই।—এক জায়গায় বর্ষার তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে গিয়েচে। অনেকটা উঁচু পাড়, নিচে খরস্রোতা বর্ষার নদী। জায়গাটা দিয়ে যেতে যেতে একবার কি-রকম ভেঙেচে দেখবার ইচ্ছে গেল। পাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে নিচে জলের আবর্ত দেখচি, পাড়টা সেখানে অনেকখানি উঁচু, জল অনেক নিচে—হঠাৎ আমার মনে একটা অদ্ভুত ইচ্ছা জেগে উঠলো—আমি লাফ দিয়ে পাড় থেকে জলে পড়বো!···দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ইচ্ছাটা যেন ক্রমে বেড়ে উঠচে···লাফাই···দিই লাফ···! অথচ বর্ষার খরস্রোতা নদী, কুটো ফেললে দু'খানা হয়ে যায়! আমি সাঁতার জানি না,—গভীর জল পাড়ের নিচেই। ইচ্ছাটা কিছুতেই যেন সামলাতে পারচিনে! এমন কি আমার মনে হল আর কিছুক্ষণ থাকলে আমাকে লাফ দিতেই হবে, নইলে আমার জীবনের সুখ চলে যাবে!···

তাড়াতাড়ি নদীর পাড় থেকে একরকম জোর করেই চলে এলুম। কারণ যেন মনে হচ্ছিল এর পর আমার আর যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, পা দুটো যেন ক্রমশ সীসের মত ভারী হয়ে উঠচে—এর পর ওই বিপজ্জনক নদীর পাড় থেকে পা দুটোকে নাড়াবার ক্ষমতা চলে যাবে আমার!···

নদীর ধার থেকে বৃন্দাবনদের বাড়ি আসবার পথে ও সব ইচ্ছে আর কিছু নেই। আমি নিজের মনোভাবে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলুম—কি অদ্ভুত! এ রকম হওয়ার মানে কি? ট্রেনে বসে অতিমাত্রায় ধূমপান করেছিলাম মনে পড়লো। এই ভাদ্র মাসের গরমে অত ধূমপান করা ঠিক হয় নি, তার ওপর বাড়ি এসে দু'তিন পেয়ালা চা খেয়েচি। এ সবেই ওরকমটা হয়ে থাকবে।—নিশ্চয়ই তাই।

বৃন্দাবনের বাড়ি গেলুম। বৃন্দাবনকে অনেক দিন পরে দেখে সত্যিই আনন্দ হল। দুজনে অনেক রাত পর্যন্ত অনেক গল্প করলুম। অনেক-বছর-ধরে-জমানো অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনী। বড় গরম আজ, কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। ভাদ্রমাসের গুমোট গরম। বৃন্দাবন বললেন, "চল ভাই, ছাদে গিয়ে বসে গল্প করি, তবুও একটু হাওয়া পাওয়া যাবে। ···তুই আমাদের এখানে খেয়ে যাবি—মা বলে দিয়েচেন। তোদের বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়েচে।"

দু'জনে ছাদে উঠলুম। বাড়িটা দো-তলা। দো-তলার ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর আছে। আমি জানতুম, বৃন্দাবনের কাকা ওই ঘরটায় থাকেন। দো-তলার ছাদে উঠে দেখলুম—বাড়ির পেছন দিকটায় বাঁশের ভারা-বাঁধা। বললুম, "বাড়িতে রাজমিস্ত্রি খাটচে বুঝি, বৃন্দাবন?

"হ্যাঁ ভাই, কাকার ঘরটা মেরামত হবে; উত্তর দিকে দেওয়ালটার গা থেকে নোনা ধরা ইটগুলো বার করা হচ্ছে।"

wapsip.com

বৃন্দাবন দোতলার ঘরটার মধ্যে ঢুকলো—আমার কিন্তু মনে কেমন একটা অস্থির ভাব! খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে গল্প করে আমি একটু জল খেতে চাইলুম। বৃন্দাবন জল আনতে নিচে নেমে গেল, আমি ছাদে পায়চারি করতে লাগলুম। ছাদে কেউ নেই। অন্ধকার ছাদটা। ...যে দিকটায় রাজমিস্ত্রিরা ভারা বেঁধে কাজ করচে, পায়চারি করতে করতে সেখানটাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখচি, হঠাৎ আমার মনে হল—ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়িনে কেন?

বেশ হবে!...লাফ দেবো? প্রায় দুর্দমনীয় ইচ্ছা হল লাফ দেবার। লাফ দেওয়াই ভালো।...লাফ দিতেই হবে।...দিই লাফ...এমন সময় বৃন্দাবন ছাদের ওপর এসে বললে, "আয় ঘরের মধ্যে, মা চা পাঠিয়ে দিচ্ছেন; ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

আরও প্রায় আধ-ঘণ্টা কথা বলবার পরে, নিচে থেকে চা ও খাবার এসে পৌঁছুলো। আমারা দুই বন্ধুকে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করলুম। তারপর বৃন্দাবন খাওয়ার কতদূর যোগাড় হল দেখতে নিচে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে বড় গরম—আমি বাইরের ছাদে খোলা হাওয়ায় আবার বেড়াতে লাগলুম। রাজমিস্ত্রিদের ভারার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল—লাফ এবার দিতেই হবে। কেউ নেই ছাদে। কেউ বাধা দিতে আসবে না—এই উপযুক্ত অবসর! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের গভীর তলায় কে যেন বলচে—'লাফ দিও না, মূর্খ'! লাফ দিও না, পড়ে চূর্ণ হয়ে যাবে।'...আমার মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করচে!...

কতক্ষণ পরে জানিনে, এবং কিসে থেকে কি হল তাও জানিনে,—হঠাৎ বৃন্দাবনের চিৎকারে আমার চমক ভাঙলো? দেখি, বৃন্দাবন আমাকে হাত ধরে টেনে তুলচে!

"একি সর্বনাশ! তুই লাফ দিয়ে পড়লি দেখলুম যেন! ভাগ্যিস, বাঁশে পা-বেঁধে গিয়েচে তাই রক্ষে...কি হল তোর?"

আমার মাথা যেন কেমন ঘুরছিল, গা ঝিমঝিম করছিল। বৃন্দাবনকে বললুম, "আমি ভাই কিছুই জানিনে তো?..."

বৃন্দাবন ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমায় শুইয়ে দিলে। সকলে বললে ট্রেনে আসার দরুন আর গরমে শরীর কি রকম খারাপ হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম। আমি জানি মাথা ঘুরে পড়ে আমি যাই নি, লাফ আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছিলুম—তবে ঠিক যে সময়টাতে আমি লাফ দিয়েচি সে সময়ের কথাটা আমি অনেক চেষ্টা করে কিছুতেই মনে করতে পারলুম না।

বিছানায় শুয়ে বেশ সুস্থ বোধ করলুম। পাশ ফিরতে হঠাৎ যেন কি একটা শক্ত জিনিস বুকের কাছে ঠেকলো। পকেটে হাত দিয়ে দেখি—সুধীরের সেই মেডেলটা।

আশ্চর্য, এটার কথা এতক্ষণ একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম! বৃন্দাবনকে সেটা দেখালুম। ওদের বাড়ির সকলে মেডেলটা হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে।

রাত্তিরে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। আমার বাড়িতে কেউ নেই বর্তমানে, একাই থাকি এক ঘরে। একটা জিনিস লক্ষ্য করচি; যখন থেকে বৃন্দাবনদের বাড়ি থেকে বার হয়ে পথে পা দিয়েছি, তখন থেকেই কেমন এক ধরনের ভয় করচে আমার! বাড়িতে যখন ঢুকলুম, তখন ভয়টা যেন বাড়লো। একা ঘরে কতবার এর আগে শুয়েচি—এমন ভয় হয় নি মনে কোন দিন। ...না, শরীরটা সত্যিই খারাপ। শরীর খারাপ থাকলে মনও দুর্বল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার শিয়রের কাছে একটা বড় জানলা—জানলা দিয়ে বাড়ির পেছনের বন-বাগান চোখে পড়ে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে—কৃষ্ণ-পক্ষের একাদশীর

wapsip.com

জ্যোৎস্না। হাওয়া আসবে বলে জানলা খুলে রেখেচি। কতক্ষণ ঘুম হয়েছিল জানি নে, ঘণ্টাখানেকের বেশি হবে না—হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হতে লাগলো আমার শিয়রের দিকের জানলায় কে দাঁড়িয়ে! যেন মাথা তুলে সে দিকে চেয়ে দেখলেই তাকে দেখা যাবে! কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভয় হল। অথচ কিসের যে ভয় জানিনে। এমন ভয় যে, কিছুতেই শিয়রের জানলার দিকে তাকাতে পারলুম না। চোখে না দেখলেও আমার বেশ মনে হল, জানলার গরাদেতে দুটো হাত রেখে কে দাঁড়িয়ে আছে—জ্বলন্ত চোখে সে আমার দিকে চেয়ে রয়েচে—আমি ওদিকে চাইলেই দেখতে পাবো।

প্রাণপণে চোখ বুজে শুয়ে রইলুম,—কিছুতেই চাইবো না। ঘুমুবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও কি ইঁদুর পচেছে? কিসের পচা গন্ধ? যেন আয়োডিন, লিন্ট, মলম প্রভৃতি উগ্র গন্ধের সঙ্গে পচা ক্ষতের গন্ধ মেশানো? এতকাল বাড়িতে থাকা নেই, যার ওপর বাড়ি ঘর পরিষ্কার রাখার ভার, সে কিছুই দেখাশোনা করে না বোঝা গেল।···

কে যেন আমার মনের ভেতর বলচে, "চেয়ে দেখ, তোমার মাথার শিয়রের জানলার দিকে চেয়ে দেখ না?"

ঘরের চারিধারে কিসের যেন একটা প্রভাব—কোনো অমঙ্গলজনক, হিংস্র, উগ্র, অশান্ত ধরনের ব্যাপারটা,—ঠিক বলে বোঝানো যায় না। আমি যেন ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। সে এমন বিপদ, যা আমাকে মরণের দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে—এমন কি সে দোরের চৌকাঠ পার করে অন্ধকার মৃত্যুপুরীর হিমশীতল নীরবতার মধ্যে ডুবিয়ে দিতেও পারে!···

···আমি চাইবো না···কিছুতেই চাইবো না শিয়রের জানলার দিকে।

কিন্তু যে প্রভাবই হোক, আমার ঘরের মধ্যে, দেওয়ালের এ পিঠে তার অধিকার নেই। বহুকাল ধরে পূর্বপুরুষেরা বাস্তু শালগ্রামের অর্চনা করেচেন এ ঘরে···এর মধ্যে কারও কিছু খাটবে না। আমার মনই আবার এ কথাগুলি যেন বললে! অন্ধকার রাত্রে নির্জন ঘরে মন কত কথা কয়!

জানলার ধারে কি যেন একটা শব্দ হল!

অদ্ভুত ধরনের শব্দটা। কে যেন জানলার গরাদের ওপর ঠোকা দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইচে!···একবার···দুবার, তিনবার···ভয়ে আমার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে লাগলো···কাউকে ডাকবো চীৎকার করে? ···একবার চেয়ে দেখবো জানলার দিকে জিনিসটা কি? হঠাৎ আমার মনে পড়লো একটা ধাড়ি বেঁজী অনেকদিন থেকে বাইরের দেওয়ালে, কড়িকাঠের খোলে বাসা বেঁধে আছে···আজ বিকেলেও সেটাকে একবার দেখেচি। জানলার ওপরকার কাঠে সেটা পোকামাকড় বা জোনাকি ধরছে···এ তারই শব্দ।

কথাটা মনে হতেই মনের মধ্যে সাহস আবার ফিরে এল। ···উঃ, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল যেন!···শরীর অসুস্থ থাকলে কত সামান্য কারণ থেকে ভয় পায় মানুষ! পাশ ফিরে এবার ঘুমুবার চেষ্টা করলুম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু আমার এ ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। এ-ধারণা আমার মন থেকে কিছুতেই গেল না যে, আজ রাত্রে আমি একা নই—আরও কে এখানেই আছে! নিদ্রাহীন চোখে সে আমার ওপর খরদৃষ্টি দিয়ে পাহারা রেখেচে—আমায় সে নিরাপদে বিশ্রাম করতে দেবে না আজ।···

বার বার ঘুম আসে, আবার তন্দ্রা ছুটে যায়, অমনি জেগে উঠি; কিন্তু চোখ চাইতে, বা বিছানার ওপর উঠে বসতে সাহস হয় না···আর সেই শব্দটা মাঝে মাঝে জানলার গরাদের ওপর হতে শুনি—খুব মৃদু করাঘাতের শব্দ যেন!···যেন শব্দটা বলচে—"চেয়ে দেখ···পেছন

wapsip.com

ফিরে জানলার দিকে চেয়ে দেখ…”

ঘামে দেখি বিছানা ভেসে গিয়েচে, ভাদ্রের গুমট গরম কিনা! এই অবস্থায় ভোর হল। দিনের আলো ফুটলে, লোকজনের শব্দ কানে যেতে রাত্রের ভয়টা মন থেকে কোথায় গেল মিলিয়ে! নিশ্চিন্ত মনে বেলা ন'টা পর্যন্ত পড়ে ঘুম দিলুম। তার পর উঠে, চা খেয়ে, পাড়ায় বেড়াতে বার হওয়া গেল।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটলো—তখন আমি তার বিশেষ কোন মূল্য দিই নি—কিন্তু পরে সব কথা মনে মনে আলোচনা করে দেখে সেটা ভারি আশ্চর্য বলেই মনে হয়েছিল। ও-পাড়ার পথে আমার সেই জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা, তাঁকে দেখাবার জন্যে আমি মেডেলটা কাল রাত্রে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলুম—কিন্তু বৃন্দাবনদের বাড়িতে নিমন্ত্রণের জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি নি…

আমায় দেখে তিনি বললেন, “এই যে সুরেন, ভালো আছ? কাল তুমি এসেচ দেখলুম, তখন অনেক রাত, তা আর ডাকলুম না। বোধ হয় বৃন্দাবনের বাড়ি থেকে ফিরছিলে? আমি তখন ছাদে পায়চারি করচি, যে গরম গিয়েচে বাবা কাল রাত্তিরে… তোমার সঙ্গে লোক রয়েচে দেখে আরও ডাকলুম না। ও লোকটি কে? খুব লম্বা বটে—যেন শিখ কি পাঞ্জাবীর মতো লম্বা—তোমার বন্ধু বুঝি? বাঙালীর মধ্যে এমন চেহারা—বেশ, বেশ!”

আমি অবাক হয়ে জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললুম, “আমার সঙ্গে লম্বা লোক কাল রাত্তিরে! সে কি জ্যাঠামশায়?”

জ্যাঠামশায় আমার চেয়েও অবাক হয়ে বললেন, “তোমার সঙ্গে লোক ছিল না বলচো? একা যাচ্ছিলে? আমার চোখের দৃষ্টি একেবারে কি এত খারাপ হয়ে যাবে বাবা…”

আমি হেসে বললুম, “তাই হবে, জ্যাঠামশায়। চোখে কি রকম ঝাপসা দেখে থাকবেন। বয়েস হয়েচে তো?…আমার সঙ্গে কেউ ছিল না, তা ছাড়া আপনাদের বাড়ির সামনের আমগাছটার ছায়া…কি রকম আলো-আঁধার দেখেচেন চোখে…অমন ভুল হয়।”

জ্যাঠামশায় যেন রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেলেন! বললেন, কি আশ্চর্য কাণ্ড? এতটা ভুল হবে চোখে? আমগাছের এদিকে যখন তুমি টর্চ জ্বাললে, তখন দেখলুম তুমি আর তোমার পেছনে একজন লম্বা মতো লোক…তার পর তুমি টর্চ নিবিয়ে আমগাছের ছায়ার মধ্যে ঢুকলে, তখনও জ্যোৎস্নার আলো আর আমগাছের ছায়ার অন্ধকারে আমি বেশ দেখতে পেলুম লোকটি তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছে…তোমার মাথার চেয়েও যেন এক হাত লম্বা…তোমার একেবারে ঠিক পেছনে…তবে খুব ভালো তো দেখতে পেলুম না…অতদূর থেকে আর আলো-অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট কিছু দেখা গেল না তো? এমন কি একবার এ পর্যন্ত মনে হল তোমায় ডেকে জিজ্ঞেস করি তোমার বন্ধুটি কে?…একেবারে এত ভুল হবে চোখের?”

জ্যাঠামশায়কে পুনরায় বুঝিয়ে বললুম, আমার সঙ্গে কাল কেউ ছিল না। আমি একাই ছিলুম, সুতরাং তাঁর দৃষ্টিশক্তির গোলমাল ছাড়া এ-ব্যাপারের অন্য কোনও সিদ্ধান্ত করা চলে না।

সারাদিন বৃন্দাবনের সঙ্গে আড্ডা গিয়ে কাটানো গেল। গতকাল রাত্রের ভয়ের ব্যাপার দিনের আলোয় এত হাস্যকর বলে আমার নিজের কাছেই মনে হল যে, বৃন্দাবনকে সে কথাটা বলিও নি।

wapsip.com

রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় ফিরবো। বৃন্দাবনদের বাড়ি থেকে চা খেয়ে বাড়ি এসে সুটকেসটা নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়েচি, তখনই সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ নেমেচে। বাউরিপাড়ার বড় বাগানটার মধ্যে দিয়ে আসচি···বাগানটা পার হতে প্রায় পাঁচ-ছ মিনিট লাগে—মস্ত বড় বাগান।

বাগানের ঠিক মাঝামাঝি এসে হঠাৎ পেছন ফিরে চাইলুম কি ভেবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আচমকা ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঠ হয়ে গেল।

কে ওটা ওখানে দাঁড়িয়ে।

রাস্তা থেকে একটু পাশে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে আধ-অন্ধকার এক অদ্ভুত মূর্তি! খুব লম্বা, তার মাথায় ঘোড়ার বালামচির সেই এক লম্বা ধরনের টুপি, পাতলা লোহার চেন দিয়ে থুতনির সঙ্গে বাঁধা—ছবিতে গোরা সৈনিকদের মাথায় যে ধরনের টুপি দেখা যায়?···মূর্তিটা যেন নিশ্চল নিস্পন্দ অবস্থায় আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে! আমার কাছ থেকে মাত্র দশ গজ কি তারও কম দূরে! মরীয়ার মতো আর একটু এগিয়ে গেলুম। এই ভয়ানক কৌতূহল আমাকে চরিতার্থ করতেই হবে যেন! মূর্তি নড়ে না চড়ে না,—যেন নিশ্চল পাথরের মূর্তি! কিন্তু বেশ স্পষ্ট দেখচি সাত আট গজ মাত্র দূরে তখন মূর্তিটা। আর ঘোড়ার বালামচির লম্বা টুপি ও ইস্পাতের চেনের স্ট্র্যাপ্ স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

আমার পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো, সারা দেহ কেমন অবশ হয়ে আসচে, মাথাটা হঠাৎ বড় হালকা হয়ে গিয়েচে! বোধ হয় আর আধ মিনিট এ-ভাবে থাকলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতুম—কারণ সেই ভীষণ মূর্তিটার মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে—আমার পা দুটো বেজায় ভারী হয়েচে—নড়বার উপায় নেই মূর্তির সামনে থেকে···

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাউরিবাগানের পথে লণ্ঠন নিয়ে কারা ঢুকলো। দু-তিন জন লোকের গলার শব্দ শুনে আমার সাহস ফিরে এল। আমি ওদের ডাক দিলুম চিৎকার করে। ওরা ছুটে এল। আমায় ওখানে বনের মধ্যে দেখে তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বললে, "ওখানে কি বাবু? কি হয়েচে?"

তারপর লণ্ঠন তুলে ওরা আমার মুখ দেখে বললে, "ও আপনি? কি হয়েছে আপনার? মুখ একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েচে—ভয়টয় পেলেন নাকি? বাউরিবাগান জায়গাটা ভালো না। সন্ধ্যের পর এখানে অনেকে ভয় পায়।"

ওদের লণ্ঠনটা যখন উঁচু করে তুলে ধরলে আমার মুখে, সেই আলোয় দেখলুম—সামনের মূর্তিটা তখনও সেখানে ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়ে! একজন বললে, "কি দেখছিলেন এখানে দাঁড়িয়ে বাবু—এই ষাঁড়াগাছটা?"

আর একজন বললে, "গাছটার ডালপালা কেটে মাথায় ঝোপের মতো করে রেখেচে, যেন মানুষ বলে অন্ধকারে ভুল হয় বটে···চলে আসুন বাবু!"

আমিও দেখলুম ষাঁড়াগাছই বটে। মাথার দিকের পাতাগুলো ছেঁটে গাছটাকে দেখতে হয়েচে ঠিক হর্স্‌গার্ডস্‌দের ঘোড়ার বালামচির টুপি! লোকের চোখের কি ভুলই হয়? কাল আমি আবার জ্যাঠামশায়কে চশমা নিতে বলছিলুম! ভেবে লজ্জা হল মনে মনে। তিনি বৃদ্ধ লোক, তাঁর চোখের ভুল তো হতেই পারে—আমারই যখন এই অবস্থা!

ওরা আমায় আলো ধরে স্টেশনে পৌঁছে দিলে।

পরের দিন স্কুলে সুধীরের মেডেলটা ফেরত দিলুম।

wapsip.com

সুধীর বললে, "আপনাকে দাদু একবার ডেকেচেন, আমার সঙ্গে ছুটির পর আমাদের বাড়ি আসুন। নিয়ে যেতে বলেচেন।"

সুধীরের দাদু বললেন, "যাক, আমার বড় ভয় হয়েছিল, মাস্টারবাবু! সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটা নিয়ে গিয়েছেন দেশে শুনলুম কিনা? আপনার দেশের ঠিকানা জানতুম না—তাহলে একটা তার করে দিতুম।…ও মেডেলটা আমার বাবাকে একজন গোরা সৈন্য দিয়ে যায়—আমি তখন জন্মাই নি। বাঁধা দিয়েছিল আর উদ্ধার করতে পারে নি। বেজায় মাতাল আর গোঁয়ার ছিল লোকটা। ও মেডেলের বিপদ হচ্ছে—আমাদের বংশের লোক ছাড়া অন্য কেউ নিলে তার বড় বিপদ ঘটে। আমার এক ভগ্নীপতি একবার কিছুতেই শুনলে না—অনেক কাল আগের কথা—বাড়ি নিয়ে গেল মেডেল দেখাতে; সেই দিনই সন্ধ্যের সময় ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল। মৃতদেহের পকেট থেকে মেডেলটা বেরুলো।…"

আমি কলের পুতুলের মতো শুধু বললুম, "ছাদ থেকে?…পকেটে মেডেল পাওয়া গেল?…"

"হ্যাঁ, মাস্টারবাবু। আমার নিজের ভগ্নীপতি, মিথ্যে কথা তো বলবে না। আজ সাতাশ-আটাশ বছর আগের কথা। …ওটা আরও দু-একজন নিয়েচে—তক্ষুনি ফেরত দিয়ে গিয়েচে। বলে রাত্রে ভয় পায়, গা ছমছম করে। কে যেন পেছনে ফলো করচে বলে মনে হয়! ও বাইরের লোকের সহ্য হয় না। প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়।…তাই ভাবছিলুম একটা তার করে দেবো…'

একটা কথা বলা দরকার। মাসখানেক পরে আমি আবার দেশে যাই। বাউরিবাগানে ঢুকে যেখানে সে-রাত্রে ভয় পেয়েছিলুম, সেদিকে চেয়ে দেখে সে ষাঁড়াগাছটা কোথাও আমার চোখে পড়লো না। যে আমগাছটার ধারে ষাঁড়াগাছটা দেখেছিলুম সেখানে দিনমানে বেশ ভালো করে দেখেছি—কোথাও সে ষাঁড়াগাছটা নেই—বা গাছ কেটে নিলে সে গুঁড়িটা থাকবে, তারও কোন চিহ্ন নেই। কস্মিনকালে সেখানে একটা বড় ষাঁড়াগাছ ছিল বলে মনেও হয় না জায়গাটা দেখে।…

মসলাভূত

বড়বাজারের মসলাপোস্তায় দুপুরের বাজার সবে আরম্ভ হয়েচে। হাজারি বিশ্বাস প্রকাণ্ড ভুঁড়িটি নিয়ে দিব্যি আরামে তার মসলার দোকানে বসে আছে। বাজার একটু মন্দা। অনেক দোকানেই বেচা-কেনা একেবারে নেই বললেই চলে, তবে বিদেশী খদ্দেরের ভিড় একটু বেশি। হাজারির দোকানে লোকজন অপেক্ষাকৃত কম। ডানহাতে তালপাতার পাখার বাতাস টানতে টানতে হাজারি ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল, এমন সময়ে হঠাৎ কার পরিচিত গলার স্বর শুনে সে চমকে উঠলো।

—"বলি ও বিশ্বেস,—বিশ্বেস মশাই!"—বার দুই হাঁক ছেড়ে যতীন ভদ্র তার ডান হাতের লাঠিটি একটা কোণে রেখে দিয়ে সম্মুখের খালি টুলটার উপর ধপাস্ করে বসলো।

যতীন হাজারি বিশ্বাসের সমবয়স্ক—অনেক দিনের বন্ধু। ভাগ্যলক্ষ্মী এতকাল তার ওপর অপ্রসন্ন ছিল। হালে সে হাজারির পরামর্শে মসলার বাজারে দালালী আরম্ভ করেছে। দু'পয়সা পাচ্ছেও সে। যতীনের মোটা গলার কড়া আওয়াজ পেয়ে হাজারি খুব আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে

wapsip.com

বসলো। হাজারি বিলক্ষণ জানতো যে, যতীন যখনই আসে কোন একটা দাঁও বিষয়ে পাকাপাকি খবর না নিয়ে সে আসে না। তাই সে যতীনকে খুবই খাতির করে।

যতীন বললে, "দেখ, শুধু দোকানদার হয়ে খদ্দেরের আশায় রাস্তার দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকলে তাতে আর টাকা আসে না—ঘুমই আসে। পাঁচটা খবরাখবর রাখতে হয়, বুঝলে?"

হাজারি বললে, "এসো এসো, যতীন। ভালো আছ? অনেক দিন দেখি নি। কিছু খবর আছে নাকি?"

"সেই খবর দিতেই তো আসা। এ-বাজারে শুধু গণেশের পায়ে মাথা ঠুকলেই টাকা করা যায় না—। অনেক হদিস জানতে হয়—অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে টাকা, বুঝলে? ...এখন কি দেবে বলো। জানই তো যতীন ভদ্র বকে একটু বেশি, কিন্তু খবর যা আনে তা একদম পাকা। যাক, এখন আসল কথা তোমায় যা বলি বেশ মন দিয়ে শোন..."

যতীন অতঃপর হাজারিকে কাছে বসিয়ে চুপি চুপি তার কথাটি বলে গেল। যতীনের কথায় টাকার গন্ধ পেয়ে হাজারি কান খাড়া করে এমনি একাগ্রভাবে শুনে যেতে লাগলো, যে সত্যনারায়ণের পাঁচালীও লোকে অতটা মন দিয়ে শোনে না।

ব্যাপারটি এই।—

গ্রেহাম ট্রেডিং কোম্পানির একটা মস্ত মালজাহাজ এস. এস. রেঙ্গুন, ডাচ্ ইস্ট্ ইন্ডিজের কোন এক বন্দর থেকে প্রচুর মাল নিয়ে কলকাতায় আসছিলো। যতরকম মাল বোঝাই ছিল, তার মধ্যে মসলার বস্তাই সব চেয়ে বেশি। লঙ্কা, হলুদ, জিরে, তেজপাতা প্রভৃতি কত রকমের মসলা। প্রতি বস্তাটি ওজনে আড়াই মণের কম নয়। এরকম শত শত বস্তার গাদায় জাহাজখানা আগাগোড়া ঠাসা। সেই মালজাহাজখানি গঙ্গার ভেতরে ঢুকতেই ঘন কুয়াশার মধ্যে শেষ রাত্রির ভাঁটার মুখে গঙ্গার চোরাবালির চড়ায় ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। জাহাজ যখন সবে ডায়মন্ডহারবার পেরিয়ে গঙ্গায় এসেচে—তখন এই ব্যাপার। সারেঙ শত চেষ্টা করেও কিছুতে সামাল দিতে পারলে না। জাহাজডুবির সঙ্গে কতক লোকেও জলে ডুবে মারা যায়। জাহাজের কতক মাল নষ্ট হয়ে যায় আর বাদবাকি মাল সব গঙ্গার জলে ভাসতে থাকে। মসলার বস্তাগুলো প্রায়ই ডোবে নি—বিশেষ ক্ষতিও হয় নি। দূর থেকে ওই মসলাবস্তার গাদাগুলো ভেসে যেতে দেখে পোর্টকমিশনারের লোকেরা সে সব তুলে পারে টেনে নেয়। কাল সাড়ে আটটার সময় নিলাম ডেকে সেই বস্তাবন্দী মসলাগুলো বিক্রি করা হবে।

ধড়িবাজ হাজারি বিশ্বাস যতীনের কথাবার্তা শুনে চট করে সব বুঝে নিলে। কত লোককে চরিয়ে কত পাকা ধানে মই দিয়ে তবে সে আজ এত টাকার মালিক। কথাবার্তা তখনই সব ঠিক হয়ে গেল। যাবার সময় যতীন আবার হাজারিকে বেশ করে মনে করিয়ে দিয়ে বললে, "দেখো ভায়া! টাকা যদি পিটতে চাও তবে এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়া নয়। জলের দামে মাল বিকিয়ে যাচ্ছে। কাল সকাল সাড়ে আটটায় নিলেম। আমি সাতটার সময়েই এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো।"

পরদিন হাজারি যতীনকে নিয়ে যথাসময়ে খিদিরপুরের দিকে রওনা হয়ে গেল। নিলামের জায়গায় পৌঁছুতে আর বেশি দেরি নেই, দূর থেকে কলরব শোনা যাচ্ছে। যতীন আগে আগে চলেচে—হাজারি পেছনে পেছনে ছুটচে। এতবড় সস্তার কিস্তিটা ফস্‌কে না যায়। হাজারি যতীনকে বরাবর নিলামের কাছে বস্তাগুলো গুনতি করতে পাঠিয়ে দিয়েই নিজে সটান এক দৌড়ে সাহেবের কাছে গিয়ে মস্ত বড় এক সেলাম করলে। সাহেবের সঙ্গে দু-মিনিট

wapsip.com

ফিসফাস করে কি কথাবার্তা বলে হাজারি উর্ধশ্বাসে ছুটে এসে নিলামের ডাক বন্ধ করে দিলে।

যতীন বললে, "কি খবর ভায়া—সুবিধে করতে পেরেছ তো?"

হাজারি খুব ব্যস্তসমস্ত ভাবে বললে, "পরে বলবো। কাজ হাসিল। এখন কত বস্তা গুনলে বলো দেখি?"

"একশো বস্তা গোনা হয়ে গেছে।"

বাস্তবিক, উঁচু উঁচু গাদা-করা মসলার বস্তাগুলোর দিকে চেয়ে হাজারির চোখ জুড়িয়ে গেল। সে যে দিকেই তাকায়, দেখে যে অগুনতি বস্তা সারবন্দী থামের মতো রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। উঃ, এমন দাঁও জীবনে কারও ভাগ্যে একবার বই দুবার আসে না! এখন মসলাপোস্তায় কোনরকমে তার গুদামে এগুলো চালান দিতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

"আর দেরি নয়"—হাজারি যতীনকে তাড়া দিয়ে ডেকে বললে, "ওহে ভায়া, শুভ কাজে আর বিলম্ব কেন? এখন লরী ডেকে তাড়াতাড়ি মাল বোঝাই করে পোস্তায় চালান দিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ এগিয়ে যাই।"

একেবারে সব মাল লরীতে ধরলো না। দ্বিতীয় ক্ষেপ বস্তা চাপিয়ে যতীন যখন পোস্তায় ফিরে গেল তখনও বিকেল আছে। সে এসে দেখে, সবই অব্যবস্থা। রাশীকৃত বস্তার গাদা হাজারির দোকানের সামনে ফুটপাতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মাত্র তিনটি লোক এতগুলো মাল তোলবার জন্যে লাগানো হয়েচে। চতুর্দিকে লোকের মহাভিড়—হৈ হৈ ব্যাপার! এদিকে পুলিশ তাড়া দিচ্ছে—"জলদি মাল হঠাও!" হাজারি কেবল চেঁচাচ্ছে। সে যেন কিছুই গোছগাছ করে উঠতে পাচ্ছে না।

কাণ্ডকারখানা দেখে যতীন নিজেই কোমর বেঁধে লেগে গেল। প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার পূর্বেই সব মাল তোলা হয়ে গেল। বস্তাগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে দেখা গেল ঘরে আর কুলোয় না। তখন বস্তার ওপর বস্তা চাপিয়ে দিয়ে কড়িকাঠ পর্যন্ত মাল ঠাসা হল। গম্বুজের মতো এক একটা ফুলো ফুলো বস্তা, আর বস্তগুলো উঁচুও কি কম? এই ভাবে বস্তা ভরাট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, যতীন আর হাজারি যখন বাড়ি ফিরলো তখন রাত দশটা। সে রাত্রি গুদামে তালা লাগিয়ে দিয়ে প্রতিদিনের মতো হাজারির চাকর বাইরে শুয়ে রইলো।

শেষ রাত্রে মসলার গুদামে কি একটা শব্দ শুনতে পেয়ে আশে-পাশে দোকানদারদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা চোরের আশঙ্কা করে চাকরটাকে ডেকে তুললে। চাকরটা শশব্যস্ত হয়ে আলো জ্বেলে বেশ পরখ করে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো। কিন্তু চোর ঘরে ঢুকলো কি করে? গুদোমের দরজার তালা বন্ধ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। খানিক বাদে আবার দুম্ দুম্ শব্দ! সকলে কান খাড়া করে রইলো। বেশ মনে হল এবারকার শব্দটা যেন হাজারির মসলার গুদোমের ভেতর থেকেই আসচে। অথচ ঘরের দোর-জানলা বন্ধ, বাইরে থেকে মোটা তালা দেওয়া। কি আশ্চর্য, চোর ভেতরে যাবেই বা কি করে? আর চোর-টোর যদি না এল তবে শব্দও বা করে কে? মাঝে মাঝে মনে হতে লাগলো, ঘরের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসবার জন্যে কারা যেন ভেতর দরজায় ধাক্কা মারচে। শেষ রাতের বাকি সময়টা এইভাবেই শব্দ শুনে কেটে গেল। আরও আশ্চর্য, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই গুদোমঘর থেকে শব্দও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। সে রাত্রি এই পর্যন্ত।

পরদিন সকালে মসলাপট্টির দোকানদারদের মুখে মুখে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে হাজারির দোকানে বিষম কাণ্ড, ভীষণ চুরি! আসলে সত্যি যা নয় তার দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে মিথ্যে

wapsip.com

রটাতে লাগলো। ক্রমে কথাটা হাজারির কানে উঠলো। হাজারি বিশ্বাস খবর পাওয়া মাত্র দৌড়ে এসে তালা খুলে গুদোমে ঢুকে দেখে যে, বস্তাগুলো ঠিকই আছে, একটি মালও বেহাত হয়নি। কি ব্যাপার? তখন সে ভাবলে কিছু নয়; তার মসলা-বস্তাগুলো দেখে যাদের চোখ টাটিয়ে ছিল—এ নিশ্চয়ই সেই বদমাশদের মিথ্যে কারসাজি; তারাই মজা দেখবার জন্যে চুরির গুজব রটিয়েচে, কিন্তু হরে চাকরটাও যে বললে, ভীষণ শব্দ শোনা যাচ্ছিল? এই শব্দ-রহস্যটা হাজারি কিছুতেই কিনারা করতে পারলে না। চোর যদি এসেই থাকবে, তবে কিছু নিলেও না, উপরন্তু শব্দ করে জানান দিয়ে চলে গেল—এ কি ব্যাপার? তবে কি তাকে ভয় দেখাবার জন্যেই রাত্রিবেলা দুর্বৃত্তেরা এইসব আয়োজন করেচে? সাতপাঁচ ভেবে হাজারি সেদিনকার মতো কথাটা চেপে গেল, ভাবলে আজ রাতে আর বাড়ি না গিয়ে নিজেই দোকান পাহারা দেবে! করলেও তাই।

রাত্রে ঘুমোবার আগে হাজারি বেশ করে চাকরটাকে নিয়ে গুদোমের উপর থেকে আরম্ভ করে নিচে পর্যন্ত পাতিপাতি প্রত্যেকটি বস্তার গাদা দেখতে লাগলো। তারপর ভেতরে থেকে জানলাটা খুলে রেখে ঘরে তালা লাগিয়ে দিল। তবে, আজ একটু নয়—হবসের চার লিভারের দুটো মস্ত ভারী তালা। হাজারি চাকরটাকে নিয়ে ঘরের সামনে শুয়ে নানা কথাবার্তার পর যখন ঘুমিয়ে পড়লো তখন রাত দুপুর।

শেষ রাত্রের দিকে কি একটা শব্দ হতেই হাজারির ঘুম ভেঙে গেল। হরে চাকরটা আগেই একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। গত রাত্রের ব্যাপারও তার বেশ মনে আছে। তাই সে নিজে আর কোন কথা না বলে চুপ করেই পড়ে ছিল। কিন্তু খানিক বাদেই ও আবার কিসের শব্দ?...ধপাস্—ধুপ্—দুম্—দুম্—দাম্! ঘরের ভেতরে বস্তায় বস্তায় কি বিষম ধস্তাধস্তি! যেন দৈত্য দানবে লড়াই বেধেচে। হরে আর হাজারি তখন ধড়মড় করে এক লাফে বিছানা ছেড়ে আলো জ্বালিয়ে দেখতে লাগলো তালা ঠিক আছে কিনা। তালা দুটা ঠিকই আছে। হাজারি জানলার ফাঁকে চোখ তাকিয়ে দেখতে পেলে—দুটো প্রকাণ্ড বস্তা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় ঢুঁ মারচে। ভয়ে হাজারির চোখ দুটো ডাগর হয়ে উঠলো। বস্তা জীবন্ত হয়ে উঠলো নাকি? না, সে চোখে ভুল দেখছে? না, অনিদ্রায় আর দুর্ভাবনায় তার মাথার ঠিক নেই? হাজারি ভয়ে ভয়ে খানিকটা চোখ বুজে রইলো।

হাজারি চোখ যখন খুললে তখন ভোরের আলো জানলার গরাদ দিয়ে ঘরে স্পষ্ট দেখা দিয়েচে। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-টব্দও সব থেমে গিয়েচে। হরে অমনি বলে উঠলো, "বাবু সেদিনও দেখেচি—ভোর হতেই শব্দ থেমে যায়।" হাজারি আর দ্বিরুক্তি না করে তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখলে কোথাও কিছু নেই। মালপত্র ঠিকই আছে, তবে কালকের থেকে আজ তফাত এই যে বস্তাগুলো যেটি যে জায়গায় দাঁড় করানো ছিল, সেটি ঠিক সেখানে নেই। প্রত্যেক বস্তাটিই যেন সরে সরে তফাত হয়ে গেছে। একটা বস্তা আর একটার ঘাড়ে কাত হয়ে পড়েচে। বিশেষ করে পেছন দিকের কতগুলো বস্তা হাণ্ডুল-বাণ্ডুল অবস্থায় পড়ে রয়েচে!—হাজারি মহা ভাবনায় পড়ে গেল। চোরই যদি হয় তবে শব্দের সৃষ্টিপাত কেন? আর চোর ঢোকেই বা কোথা থেকে? আর বেরিয়েই বা যায় কেমন করে? অসম্ভব! তবে কি জাহাজডুবি লোকগুলো ডুবে মরে ভূত হয়ে মসলাবস্তায় যে যার ঢুকে বসে আছে?

লাটের মাল কিনে অবধি দু'রাত্রি তো এই ভাবে কাটলো। আজ তৃতীয় রাত্রি। হাজারির রোখ অসম্ভব বেড়ে গেছে! আজ সে মরীয়া হয়ে দুজন লোক নিয়ে সারা রাত্রি গুদামের বাইরে জেগে বসে রইলো। হাতের কাছে যাকেই সে পাবে, কিছুতেই আজ আর তাকে আস্ত

wapsip.com

রাখবে না। তার এই অভীষ্টসিদ্ধি করার জন্যে দিনমানেই সে খুব ঘুমিয়ে নিয়েচে—পাছে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে। টং টং টং টং—পাশের ঘরের ঘড়িতে চারটে বেজে গেল। হাজারির চোখের পাতা পড়ে না। সে ঠায় জেগে আছে। কোথাও কিছু নেই, কিন্তু হঠাৎ এ কি কাণ্ড? শত শত লোক একত্র খুব দম দিয়ে নিশ্বাস টেনে ছেড়ে দিলে যেমন একটা ঝড়ের মতো সাঁই সাঁই করে শব্দ হয়—অবিকল তেমনি একটা শব্দ শোনা গেল।

হাজারি আলো জ্বালিয়ে দিয়েই এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠলো! দরজার দোরগোড়ায় যে দুটো লোক শুয়েছিল হাজারি চট্ করে তাদের জাগিয়ে দিয়ে বললে, "তোরা শীগ্‌গির ঘরের পেছনটায় দৌড়ে গিয়ে দেখ দেখি—চোরেরা সেখানে কোন সিঁধ কেটেচে নাকি।" তারপর হাজারি গুদোমের তালা খুলে ফেললে।

কিসের সিঁধ, আর কোথায় বা চোর! বস্তাগুলো যে সব হাই ছেড়ে সারবন্দী দাঁড়াতে লাগলো! হরে চাকরটা ভয়ের সুরে বললে, "বাবু এদিকে চেয়ে দেখুন!" হাজারি দুই চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে বললে, "অ্যাঁ, বলে কি? আমার মসলার বস্তারা নাচচে?" চাকর দুজন এ দৃশ্য দেখেই ভয়ে দে চম্পট।

তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড!

বস্তাগুলো সব একটির পর একটি ঠক্‌ঠক্ করে ঠিকরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। সৈন্ধব লবণের প্রকাণ্ড জাঁদরেল গোছের বস্তাটা তো সর্বাগ্রে বেরিয়ে পড়েই সটান গঙ্গার দিকে দে ছুট। অন্য বস্তাগুলো সব সারি দিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ধিনিক্ ধিনিক্ করে খানিকটা নেচে নিয়ে তারপর সমানে লাফিয়ে মার্চ করে স্ট্যান্ড রোড ট্রামের রাস্তা ছাড়িয়ে চলতে লাগলো। নিলামে কেনা বস্তাগুলো দলের অগ্রণী হয়ে চলেচে, পেছনে পেছনে চলেচে সারবন্দী গুমোদের অন্য অন্য বস্তা। এই ভাবে হাজারির মসলার গুদোম উজাড় হয়ে গেল!

শেষ রাত্রি। আকাশে ভাসা ভাসা মেঘ! গঙ্গার জলে মেটে জ্যোৎস্না। হাজারি বিশ্বাস একা দাঁড়িয়ে। একি সত্যি, না স্বপ্ন! নির্বাক হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে সে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে দেখচে। লোক ডেকে চেঁচিয়ে উঠবে সে শক্তিও তার লুপ্ত। সারবন্দী মসলার বস্তাগুলো গঙ্গার ধারে পৌঁছলো এবং গঙ্গার উঁচু বাঁধানো পোস্তার ওপর থেকে ধপাস্ ধপাস্ করে নিচে গঙ্গার জলে দিলে ডুব। এইভাবে পরপর সমস্ত বস্তা একে একে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। এবারেও আগে ডুবলো নিলামের বস্তাগুলো—তারপর গুদোমের অন্য অন্য বস্তা।

এক রাত্রির মধ্যে হাজারি বিলক্ষণ নিঃস্ব হয়ে গেল।

এই ঘটনা শোনার পর হাজারির প্রতিবেশী দোকানদারেরা সকলেই বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে এক বাক্যে বললে, "হুঁ, হুঁ, আমরা অনেক আগেই জানতুম। ভরা অমাবস্যায় জাহাজডুবি। আর সেই লাটের মাল কিনলে কিপটে হাজারি বিশ্বাস! ভাগ্যিস, বুদ্ধি করে আমরা ঘেঁষি নি। এ মাল কিনলে আমাদের কি রক্ষা থাকতো!"

বামা

আমার যখন বাইশ চব্বিশ বছর বয়েস তখন নানা দেশ বেড়ানোর একটা কাজ জুটে গেল আমার অদৃষ্টে। তখন আমি দৈব ঔষধের মাদুলি বিক্রি করে বেড়াতুম। চুঁচড়োর শচীশ কবিরাজের তরফ থেকে মাইনে ও রাহাখরচ পেতুম। অল্প বয়সের প্রথম চাকরি, খুব

wapsip.com

উৎসাহের সঙ্গেই করতুম।

আমাকে কাপড়চোপড় পরতে হত সাধু ও সাত্ত্বিক বামুনের মতো। ওটা ছিল ব্যবসায়ের অঙ্গ। গিরিমাটির রঙে ছোপানোর কাপড় পরনে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, গলায় মালা, হাতে থাকতো একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, তারই মধ্যে মাদুলি ও অন্যান্য ওষুধ থাকতো।

বছর তিনেক সেই চাকরি করি, তারপর শরীরে সইলো না বলে ছেড়ে দিলুম।

একবার যাচ্ছি বর্ধমান জেলার মেমারি স্টেশন থেকে মাখমপুর বলে একটা গ্রামে। এটা মাদুলি বিক্রির জন্যে নয়; মাখমপুরে শচীশ কবিরাজের শ্বশুরের বাড়ি। সেখানকার জমিজমার ওয়ারিশান দাঁড়িয়েছিলেন শচীশবাবু—শ্বশুরের ছেলেপুলে না থাকায়। আমাকে পাঠিয়েছিলেন পৌষ-কিস্তির সময় জমিজমার খাজনা যতটা পারি আদায় করে আনতে।

কিন্তু তাহলেও পরনে আমার গেরুয়া কাপড়, হাতে মাদুলি ও ওষুধভরা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ইত্যাদি সবই ছিল, যদি পথেঘাটে কিছু বিক্রি হয়ে যায়, কমিশনটা তো আমি পাব!

কখনও ও অঞ্চলে যাইনি। মেমারি স্টেশনে নেমে বেলা দুটোর সময়ে হাঁটচি তো হেঁটেই চলেচি, পথ আর ফুরোয় না। এক জায়গায় একটা ছোট বাজার পড়লো, সেখানে কিছু খেয়ে নিয়ে আবার পথ হাঁটি।

গ্রামে গ্রামে ওষুধ বিক্রি করে বেশ কিছু রোজগারও করা গেল, দেরিও হল বিশেষ করে সেই জন্যে। আর একটা বাজার পড়লো। সেখানে দোকানদারদের কাছে শুনলুম, আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে অন্তত রাত নটা বাজবে। কিন্তু সকলেই বললে, "সন্ধ্যের পরে আগে গিয়ে আর পথ হাঁটবেন না, ঠাকুরমশায়। এই সব দেশে ফাঁসুড়ে ডাকাতের বড় ভয়, বিদেশী দেখলে মেরেধরে যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়। প্রায়ই বনের ধারে বড় বড় মাঠের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। সাবধান, একটা দীঘি পড়বে মাঠের মধ্যে ক্রোশ তিনেক দূরে, জায়গাটা ভালো নয়…"

বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তা। সন্ধ্যা প্রায় হয়-হয়, এমন সময় দূরে একটা তালগাছ ঘেরা দীঘি দেখা গেল বটে। আমার বুক টিপটিপ করে উঠলো। দীঘির ও-পাশে সঞ্জয়পুর বলে একটা গ্রাম, সেখানেই রাত্রের জন্যে আশ্রয় নেওয়ার কথা বাজারে বলে দিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যা তো হয়ে গেল তালদীঘির এদিকেই—অন্ধকার হবার দেরি নেই, কোথায় বা সঞ্জয়পুর, কোথায় বা কি?

মনে ভারি ভয় হল। কি করি এখন? সঙ্গে মাদুলি ও ওষুধ বিক্রির দরুন অনেক টাকা। পরক্ষণেই ভাবলাম, কিছু না পারি দৌড়তে তো পারব? না-হয় ব্যাগটাই যাবে,—প্রাণ তো বাঁচবে।

ভয়ে ভয়ে দীঘির কাছাকাছি তো এলুম। …বড় সেকেলে দীঘি, খুব উঁচু পাড়, পাড়ের দু-ধারে বড় বড় তালগাছের সারি। তার ধার দিয়েই রাস্তা। দীঘির পাড়ে কিন্তু লোকজনের সম্পর্ক নেই। যে ভয় করেছিলুম, দেখলুম সবই ভুয়ো। মানুষ মিথ্যে যে কেন এ-রকম ভয় দেখায়!

প্রকাণ্ড দীঘিটার পাড় ঘুরে যেমন তালবনের সারি ও দীঘির উঁচু পাড়কে পেছনে ফেলেচি, সামনেই দেখি ফাঁকা মাঠের মধ্যে দূরে একটা গ্রাম লি-লি করছে—নিশ্চয় ওটা সেই সঞ্জয়পুর। …বাঁচা গেল বাবা! কি ভয়টাই দেখিয়েছিল লোকে! দিব্যি ফাঁকা মাঠ, কাছেই লোকের বসতি, গাঁয়ের গরু বাছুর চরছে মাঠে—কেন এ-সব জায়গায় বিপদ থাকবে?

আমি এই রকম ভাবচি, এমন সময় তালপুকুরের ওদিকের পাড়ের আড়ালে যে পথটা,

wapsip.com

সেই পথ বেয়ে একজন বৃদ্ধকে আমার দিকে আসতে দেখলুম। বৃদ্ধ বেশ বলিষ্ঠ গড়নের, এই বয়সেও মাংসপেশী বেশ সবল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ছোট একটা লাঠি।

বৃদ্ধ আমায় বললে, "ঠাকুরমশায় কোথায় যাবেন?"

"যাব মাখমপুর..."

"মাখমপুর! সে যে এখনও তিন ক্রোশ পথ...কাদের বাড়ি যাবেন?"

"শচীশ কবিরাজের বাড়ি।"

"ঠাকুরমশায় কি কবিরাজমশায়ের গোমস্তা?"

"গোমস্তা নই, তবে যাচ্ছি জমিজমার কাজে বটে।"

"এ অঞ্চলে আর কাউকে চেনেন? ...মশাইয়ের নিজের বাড়ি কোথায়?"

"আমি এদিকে কখনও আসিনি, কাউকে চিনিও নে। মাখমপুরেও নতুন যাচ্ছি..."

"সেখানেও কেউ তাহলে আপনাকে চেনে না।"

"নাঃ, কে চিনবে?"

আমার এই কথায় আমার যেন মনে হল বুড়ো একটু কি ভাবলে, তারপর আমায় বললে, "কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি...রাত্রে আজ দয়া করে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিন। আমরা জাতে বারুই, জল-আচরণীয়, আপনার অসুবিধে হবে না। চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বাইরের ঘর আছে, সেখানে থাকবেন, রান্নাবাড়া করে খাবেন...আসুন দয়া করে...

আমি বৃদ্ধের কথায় ভারি সন্তুষ্ট হলুম। সত্যিই তো, সেকালের লোকেরা অন্য ধরনের শিক্ষায় মানুষ। অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা করেই এদের তৃপ্তি। বৃদ্ধ এই প্রস্তাব না করলে রাঢ়-অঞ্চলের অজানা মেঠো পথ বেয়ে এই সুমুখ-আঁধার রাতে আমায় যেতেই তো হত মাখমপুরে, তিন ক্রোশ হেঁটে।

গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বড় মাঠের ধারে বৃদ্ধের বাড়ি। বৃদ্ধের নাম নফরচন্দ্র দাস। আমি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে উঠতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।

কুকুরের এই ডাকটা আমার ভালো লাগলো না; এর আমি কোন কারণ দিতে পারবো না,—কিন্তু এই কুকুরের চিৎকারে যেন একটা ছন্নছাড়া অমঙ্গলজনক অর্থ আছে—মঙ্গলসন্ধ্যায় কোন গৃহস্থবাড়িতে আসি নি, যেন শ্মশানভূমিতে এসেচি...

বৃদ্ধের বাড়ি দেখে মনে হল বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাড়ির উঠোনে সারি সারি তিনটে বড় বড় ধানের গোলা—গোলার সঙ্গে প্রকাণ্ড গোয়ালঘর, বলদ ও গাইয়ে প্রায় কুড়ি বাইশটা। অন্তঃপুরের দিকে চারখানা বড় বড় আটচালার ঘর। বাইরের এই চণ্ডীমণ্ডপ ও তার পাশে আর একখানা কুঠরি!

আমার কথাটা ভালো করে বুঝতে গেলে এই কুঠরিটার কথা আর একটু ভালো করে শুনতে হবে। কুঠরিটিকে চণ্ডীমণ্ডপ-সংলগ্ন একটা কামরাও বলা যায়, কারণ একটা সরু রোয়াকের দ্বারা চণ্ডীমণ্ডপের পেছন দিকের সঙ্গে সংলগ্ন; অথচ দোর বন্ধ করে দিলে বাইরের বাড়ির সঙ্গে এর সম্পর্ক চলে গিয়ে এটা ভেতরবাড়ির একখানা ঘরের সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

আমায় বাসা দেওয়া হল এই কুঠরিতে। কুঠরির একপাশে ছোট একটা চালা। সেখানে আমার রান্নার আয়োজন করে দিয়েচে। হাত মুখ ধুয়ে সুস্থ হয়ে আমি বিশ্রাম করচি।

গৃহস্বামী এসে বললে, "ঠাকুরমশায় রান্না চাপান, আর রাত করেন কেন?"

আমি রান্নাচালায় বসে রান্না চড়িয়ে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি একটি বাড়ির বৌ

wapsip.com

ভেতর থেকে একগাছা ঝাঁটা হাতে এসে আমার রান্নাচালার সামনে দিয়ে ঢুকলো ও ঝাঁট দিতে লাগলো।

কুঠরির দরজা খোলা, আমি যেখানে বসে সেখান থেকে কুঠরিটার ভেতর দেখা যায়। আমি দু-একবার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলুম বৌটি ঝাঁট দিতে দিতে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচে। দু'তিন বার বেশ ভালো করে লক্ষ্য করে মনে হল বৌটি ইচ্ছে করেই আমার দিকে অমন করে চাইচে।

আমি দস্তুরমত অবাক হয়ে গেলুম। ব্যাপার কি? সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়ে, পল্লীর গৃহস্থবধূ—এমন ব্যবহার তো ভালো নয়? কি হাঙ্গামায় আবার পড়ে যাবো রে বাবা। কর্তাকে কাছে বসিয়ে রাঁধতে রাঁধতে গল্প করবো নাকি?

এমন সময় বৌটি ঝাঁট শেষ করে চলে গেল। কিন্তু বোধ হয় পাঁচ মিনিট পরেই আবার এল। দেখে মনে হল সে যেন খুব ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত। এবারও সে কুঠরির মধ্যে ঢুকে এটা ওটা সরাতে লাগলো এবং আমার দিকে চাইতে লাগলো, তারপর হঠাৎ রান্নাচালার দরজায় এসে চকিতদৃষ্টিতে চারদিক চেয়ে কেউ নেই দেখে আমার দিকে আরও সরে এল এবং নিচু সুরে বললে, "ঠাকুরমশায়, আপনি এখনই এখান থেকে পালান, না হলে আপনি ভয়ানক বিপদে পড়বেন—এরা ফাঁসুড়ে ডাকাত, রাতে আপনাকে মেরে ফেলবে"—বলেই চট করে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

শুনে তো আমি আর নেই! হাতের খুন্তি হাতেই রইলো, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল—আর সারা হাত-পা অবশ ও ঝিমঝিম করতে লাগলো। বলে কি! দিব্যি গেরস্তবাড়ি, গোলাগালা, ঘরদোর—ডাকাত কি রকম?

কিন্তু পালাবোই বা কেমন করে? এখন বেশ রাত হয়েচে। সামনের চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধ বসে লোকজনের সঙ্গে কথা কইচে—ওখান দিয়ে যেতে গেলেই তো সন্দেহ করবে!

কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচি একেবারে—হাতে পায়ে জোর নেই, কিছু ভাববারও শক্তি লোপ পেয়েচে। মিনিট পাঁচেক এমনি ভাবে কাটলো—এমন সময়ে দেখি সেই বৌটি আবার কি-একটা কাজে কুঠরির মধ্যে ঢুকে খোলা দরজা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মেয়েটি কথা বলবার পূর্বেই আমি বললুম, "তুমি যে হও, তুমি পরম দয়াময়ী—বলে দাও কোন্ পথে কি ভাবে পালাবো..."

বৌটি চাপা গলায় বললে, "সেই জন্যেই এলুম। সব দেখে এলুম। পালাবার পথ নেই—ওরা ঘাঁটি আগলে রেখেচে..."

আমি বললুম, "তবে উপায়!"

মেয়েটি বললে, "একটা মাত্র উপায় আছে। তাও আমি ভেবে এসেছি। আমি এ-বাড়িতে আর ব্রহ্মহত্যা হতে দেব না—অনেক সহ্য করেচি, আর করবো না...দাঁড়ান ঠাকুরমশায়, আর একবার বাড়ির মধ্যে থেকে আসি, নইলে সন্দেহ করবে।"

মিনিট পাঁচেক পরে বৌটি আবার এল, চকিতদৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে বললে, "শুনুন, আমার উপায়—এই কথা ক'টা মনে রাখুন। মনে যদি রাখতে পারেন, তবে বাঁচাতে পারবো। ...আমার নাম বামা, আমি এ-বাড়ির মেজবৌ, আমার বাপের বাড়ির গ্রামের নাম কুসুমপুর, জেলা বর্ধমান, থানা রায়না—আমার বাপের নাম হরিদাস মজুমদার, জ্যাঠামশায়ের নাম পাঁচকড়ি মজুমদার, আমরা দুই বোন, আমার দিদির নাম ক্ষান্তমণি, বিয়ে হয়েচে সামন্তপুর-

wapsip.com

তেওটা, বর্ধমান জেলা। শ্বশুরের নাম দুর্লভ দাস—সবাই জাতে বারুই। আমার বাবা, জ্যাঠামশায় সব বেঁচে আছেন, কিন্তু মা নেই···”

আমার তখন বুদ্ধি লোপ পেতে বসেচে—যা বলে মেয়েটি তাই করে যাই। এতে কি হবে? বৌটি কিন্তু এক একবার বাড়ির মধ্যে যায়, আবার অল্প দু'মিনিটের জন্যে ফিরে এসে আমায় তালিম দিয়ে যায়—“মনে আছে তো? জ্যাঠামশায়ের নাম কি?”

আমি বললুম, “হরিদাস মজুমদার···”

“না—না, পাঁচকড়ি মজুমদার, বাবার নাম হরিদাস মজুমদার···আমার দিদির নাম কি? শ্বশুরবাড়ি কোন্ গাঁয়?···”

“ক্ষান্তমণি। শ্বশুরবাড়ি হল—শ্বশুরবাড়ি···”

“আপনি সব মাটি করলেন দেখচি! সামন্তপুর-তেওটা, বলুন···”

“সামন্তপুর-তেওটা—শ্বশুরের নাম রামযদু দাস—দুর্লভরাম দাস···”

অবশেষে মিনিট দশ-বারোর মধ্যে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে এসেচে।

বৌটি বললে, “রান্না-খাওয়া করে নিন ঠাকুরমশায়, কোন ভয় করবেন না। আমার বাপের বাড়ির নাম-ধাম যখন জানা হয়ে গেছে, তখন আপনাকে বাঁচাতে পেরেচি। এখন শুনুন,—খাওয়া-দাওয়ার পরেই শ্বশুরমশায়ের কাছে আমার বাপের বাড়ির পরিচয় দিয়ে বলবেন—আপনি তাদের গুরুবংশ, আমার নাম বলে জিগ্যেস করবেন—আমার বিয়ে হয়েচে কোথায়, জানো নাকি? গলা যেন না কাঁপে, কোনরকম সন্দেহ যেন না হয়···আমি চললুম, আবার আসবো আপনি শ্বশুরকে বলবার পরে; কিন্তু দেরি করবেন না বেশি, বিপদ কখন হয় বলা তো যায় না?···

রান্না-খাওয়া শেষ না করলেও তো সন্দেহ করতে পারে। রান্না-খাওয়া করতেই হল। রাত্রের অন্ধকার তখন বেশ ঘন হয়ে এসেচে, রাত আন্দাজ দশটার কম নয়, আহারাদির পর নিজের কুঠুরিতে বসেচি, আর আমার মনে হচ্ছে এ বাড়ির সবাই যেন খাঁড়ায়, রাম-দাতে শান দিচ্ছে, আমার গলাটি কাটবার জন্যে।

এই সময় গৃহস্বামী স্বয়ং আমার জন্যে পান নিয়ে এল। বললে, “কি ঠাকুরমশায়, আহারাদি হল? এখন দিব্যি করে শুয়ে পড়ুন। মশারীটা টাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছি; রাত হয়েচে আর দেরি করবেন না···”

আমি বললুম, “হ্যাঁ, একটা কথা বলি···আমাদের এক মন্ত্রশিষ্য, বাড়ি কুসুমপুর, থানা রায়না, নাম পাঁচকড়ি—ইয়ে, হরিদাস মজুমদার, তার একটি মেয়ের নাম বামা—এ দিকেই কোথায় বিয়ে হয়েচে। তারাও জাতে তোমাদের বারুই কিনা—তাই হয়তো চিনলেও চিনতে পারো। মেয়েটির জ্যাঠা দুর্লভরাম—ইয়ে পাঁচকড়ি—আমায় বলে দিয়েছিল মেয়েটির শ্বশুরবাড়ি খোঁজ করে একবার সেখানে যেতে···তা যখন এলুমই এ দেশে···”

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ যেন কেমন হয়ে গেল, আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে, “কুসুমপুরের হরিদাস মজুমদার? বামা?···আপনি তাদের চিনলেন কি করে?”

বামার কথা স্মরণ করে গলা না কাঁপিয়ে দৃঢ়স্বরে বললুম, “আমি যে তাদের গুরুবংশ—আমার বাবার ওরা মন্ত্রশিষ্য কিনা?”

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললে, “বসুন, আমি আসচি···”

আমি একটা কুঠরির মধ্যে বসে রইলুম, সন্দেহ ও ভয় তখনও কিছু যায় নি। আর এরা যে গুরুদেবকেই রেহাই দেবে তা কে বলেচে?

wapsip.com

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ ফিরে এল; পেছনে পেছনে সেই বধূটি, আর একজন ষণ্ডামার্কা গোছের যুবক এবং একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক—সম্ভবত বৃদ্ধের স্ত্রী।

বৃদ্ধ বললে, "এই যে বামা, ঠাকুরমশায়। আমারই মেজছেলের সঙ্গে···এই আমার মেজছেলে শম্ভু···গড় করো সব, গড় করো···মেজবৌমা, দেখতো, চিনতে পারো এঁকে?"

চমৎকার অভিনেত্রী বটে বামা! অদ্ভুত অভিনয় করে গেল বটে।

ঘোমটা খুলে হাসিমুখে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে গলায় আঁচল দিয়ে। জীবনদাত্রী, দয়াময়ী বামা! আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়লো।

তারপর সে রাত্রি তো কেটে গেল। খাবার জল দেবার ছুতো করে এসে বামা আমায় আশ্বাস দিয়ে গেল। বললে, "বিপদ কেটে গিয়েচে; আমার চোখে না পড়লে সর্বনাশ হত, ভিটেতে ব্রহ্মহত্যে হত। অনেক হয়েছে—এই কুঠরিতে,—এই বিছানায়, এই মেঝেতে অনেক লাশ পোঁতা···

আমার মনের অবস্থা বলবার নয়। বললুম, "পুলিশ কি গাঁয়ের লোক কিছু টের পায় না,—কিছু বলে না?

"কে কি বলবে! এ ফাঁসুড়ে ডাকাতের গাঁ। সবাই এ-রকম। আগে জানলে কি বাবা এখানে বিয়ে দিতেন? বিয়ের পর সব ধরা পড়ে গেল আমার কাছে। এখন আমার একটি সন্তান হয়েছে—এ পাপ-ভিটেয় বাস করলে তার অকল্যাণ হবে। ওকে বারণ করি, কিন্তু ও কি করবে? মাথার ওপর শ্বশুরমশায় রয়েচেন—পুরনো ডাকাত, দাদারা রয়েচে···আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন বাবাঠাকুর, আর ভয় নেই···"

সকাল হল। বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধ আমায় পাঁচ টাকা গুরু-প্রণামী দিলে। বামাকে আড়ালে ডেকে বললুম, "তুমি আমার মা, আমার জীবনদাত্রী। আশীর্বাদ করি চিরসুখী হও মা···"

বামার মতো বুদ্ধিমতী নারী জীবনে আর আমার চোখে পড়ে নি। কতকাল হয়ে গেল, এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই দয়াময়ী পল্লীবধূটির স্মৃতিতে আমার চোখে জল এসে পড়ে, শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে!

বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি

বামাচরণের জন্মের সময় নকীপুরের যদু চক্কোত্তি বলেছিলেন, "এ ছেলে একদিন রাজা হবে।"

যদু চক্কোত্তি এ অঞ্চলের মধ্যে একজন বড় জ্যোতিষী, তার কথার দাম আছে। কিন্তু বামাচরণের জন্মদিনটির পরে বহু বছর কেটে গিয়েচে, রাজা হওয়া তো দূরের কথা, রাজসভার একজন ভালোগোছের প্রহরী হবার লক্ষণও তো বামাচরণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।

অল্পবয়সে বামাচরণ তার মামার বাড়ি থেকে স্কুলে পড়তো। ফোর্থক্লাসে ওঠবার সময়ে ফেল করে সে লেখাপড়া দিলে ছেড়ে। বললে, "ছোট ছোট ছেলেরা উঠবে নিচে থেকে আমার ক্লাসে—তাদের সঙ্গে পড়তে লজ্জা করে।"

সুতরাং বামাচরণের লেখাপড়া হল না। মামারা বললে, "লেখাপড়া যদি না করো বাপু, তবে এখানে বসে বসে অন্নধ্বংস করে আর কি করবে, বাড়ি চলে যাও।"

বাড়ি এসে যখন সে বসলো, তখন তার বয়েস চৌদ্দ-পনেরো বছর। অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, সেখানে থেকে চাকরির চেষ্টা করা চলে না।

wapsip.com

এই সময়ে তার এক ভগ্নীপতি তাদের বাড়িতে এলেন কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে। তিনি পশ্চিমে কোথায় রেলে চাকরি করেন, বামাচরণকে উপদেশ দিয়ে গেলেন;—টেলিগ্রাফি শিখতে। তা হলে রেলে চাকরি হবার সম্ভাবনা আছে! কলকাতা থেকে তিনি বামাচরণকে একটা টেকিকলও আনিয়ে দিয়ে গেলেন, আর টেলিগ্রাম শেখবার একখানা বই।

বামাচরণ সর্বদা গম্ভীর চালে থাকতো, সমবয়সী ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে মিশলে তার মান যাবে। আর একটা মজা ছিল তার, সে তাদের নানারকম বৈষয়িক উপদেশ দিত।

যেমন, হয়তো ছেলের দল ওদের বাড়ির সামনে কয়েতবেলের গাছে উঠে মহা হৈ-চৈ করচে, ও এসে গম্ভীর মুখে বললে, "এই সব, নাম—গাছ থেকে নাম।"

বামাচরণ বললে, "কয়েতবেল তো খাচ্ছিস, এদিকে ঘরে যে অনেকের চাল নেই, সে খোঁজ রাখিস? শুধু কয়েতবেলে কি আর পেট ভরবে? যা, যাতে দু'পয়সা রোজগার হয় তার চেষ্টা করগে যা।"

বামাচরণের বিজ্ঞ ধরনের কথাবার্তায় বেশ কাজ হল। পাড়াগাঁ জায়গা, সকলেরই অবস্থা অল্পবিস্তর খারাপ, প্রত্যেক ছেলেই জানে যে তার বাপ-মার অবস্থা ভালো নয়। অতএব বামাচরণের কথায় অনেকেরই মনের মধ্যে কোথায় ঘা লাগলো—তারা মাথা নিচু করে যে যার বাড়ি চলে গেল।

এই সময়েই ওর ভগ্নীপতি এসে ওকে টেকিকল দিয়ে গেলেন।

গ্রামের ছেলেরা প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতো, বামাচরণ দিনরাত গম্ভীর মুখে ওদের বাড়ির পশ্চিমের ঘরে বসে টেকিকলটাতে টরে-টক্কা অভ্যাস করচে। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, দোল নেই, রাস নেই, শনিবার-রবিবার নেই। কি সে অধ্যবসায়! দ্রোণাচার্যের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখতে অর্জুনও বোধ হয় এত অধ্যবসায়, এত মনোযোগ দেখান নি—তা তিনি মল্লভূমিতে কাঠের বিবিধ পাখি বিদ্ধ করে যতই নাম করুন গিয়ে। বছর খানেক টেলিগ্রাফ শেখবার পর বামাচরণ রেলে চাকরির চেষ্টা করলে; কিন্তু অদৃষ্টের দোষে কোথাও কিছু হল না। গাঁয়ের ছেলেদের সে বলতো, "জানিস, ই.আর.আর. রেলের টি.আই. সাহেব আমার দরখাস্তের জবাব দিয়েচে? তার নিজের হাতের সই আছে।"

ছেলেদের মধ্যে দু-একজন সম্ভ্রমের সঙ্গে জিগ্যেস করতো, "কি লিখেছে বামাচরণ-দা?"

"লিখেছে, এখন চাকরি হবে না, পোস্ট খালি নেই। খালি হলে জানাবে। দাঁড়া···"

তারপর সে পশ্চিমের কোঠায় তার ঘর থেকে একখানা লম্বা খাম নিয়ে এসে তার মধ্যে থেকে ছোট্ট একটা ইংরেজি লেখা কাগজ বার করে সকলের সামনে বাতাসে দুবার উঁচু করে উড়িয়ে বলতো, "এই দ্যাখ!"

কিন্তু এত করেও কিছু হল না, মাসের পর মাস গেল, টি.আই. সাহেবের সে চিঠি আর পৌঁছুলো না।

হঠাৎ মেঘ-ভাঙা আকাশে একদিন চাঁদ উঠলো। বামাচরণের পিতা ছিলেন সেকালের ফৌজদারী কাছারির নাজির। যখন তিনি মেহেরপুরে, সে সময়ে বম্‌পাশ সাহেব মেহেরপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সাহেব নাজিরমশায়কে খুবই খাতির করতো, ভালোও বাসতো।

বামাচরণের বাবা বৃদ্ধবয়সে পেনসনভোগী অবস্থায় নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসে সমবেত বৃদ্ধ মণ্ডলীর কাছে চাকরি জীবনের গল্প করতে করতে বলতেন, "বম্‌পাশ সাহেবকে তো আমিই কাজ শিখিয়েছি, ছোকরা সিভিলিয়ান, নতুন বিলেত থেকে এসেছে তখন—ট্রেজারি অফিসের হিসেব রাখতে রাখতে জান বেরিয়ে যেত। আমায় বলতো, 'শোন নাজির, এ আমার পোষাবে

wapsip.com

না, গাঁজা-আফিমের হিসেব রাখতে আর ওজন করতে করতে প্রাণ বেরুলো?' কত কষ্টে বুঝিয়ে সাহেবকে শান্ত করতুম।"

সে গ্রামে গভর্নমেন্টের চাকরি বামাচরণের বাবা ছাড়া কেউ করে নি—সবাই হাঁ করে থাকতো; পেনসনও ভোগ করচেন তিনি আজ বাইশ-তেইশ বছর কি তারও বেশি।

বামাচরণের বয়স যখন আঠারো-উনিশ বছর, তখন বামাচরণের বাবা গ্রামে বসে 'হিতবাদী' কাগজে দেখলেন বম্‌পাশ সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর হয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এসেছে।

তিনি গেলেন কলকাতায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। বম্‌পাশ সাহেবও আর ছোকরা নেই, পঞ্চাশের ওপর বয়স হয়েছে। পুরনো নাজিরকে চিনতে পারলে, জিজ্ঞেস করলে, "আমি তোমার কি উপকার করতে পারি, নাজির?"

এক কথায় বামাচরণের চাকরি ঠিক হয়ে গেল। খুলনায় সার্ভে ক্যাম্প পড়েচে, জমি জরীপ হচ্চে। বামাচরণের বাবা একগাল হেসে সকলকে কথাটা জানালেন। বামাচরণের বাড়িতে সত্য-নারায়ণের সিন্নি দেওয়া হল।

গাঁয়ের প্রতিবেশীরা যখন প্রসাদ খাচ্ছে ভেতরের ঘরের বারান্দায় বসে তখন বামাচরণের বাবা সবিস্তারে তাদের সামনে তাঁর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করার বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেন : "সাহেব বললে, নাজির, তোমার ছেলে যদি এন্ট্রান্স পাশ করতো তবে আমি ওকে সাবডেপুটি করে দিয়ে যেতাম আজ।"

বামাচরণ চাকরি করতে গেল, সঙ্গে তার বৃদ্ধ পিতা গেলেন। কারণ বামাচরণের মা বললেন, ছেলেকে অত দূর দেশে একলা তিনি পাঠাতে পারবেন না।

আবার সেই অদৃষ্ট এসে বাধা দিলে। মাস দুইয়ের মধ্যে বামাচরণের বাবা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি এলেন। শোনা গেল বামাচরণ চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছে। সেখানে নাকি থাকার কষ্ট, নদীর জল লোনা, কাছেই সুন্দরবন, সন্ধ্যার পর বাঘের ভয়, জঙ্গল-থেকে কাঠ ভেঙে এনে রান্না করতে হয়। সেখানে কি ওই কচি ছেলে থাকতে পারে?

বামাচরণের বাবা বললেন, "কোন ভয় নেই। আমি আবার যাচ্ছি সাহেবের কাছে, আর একটা ভালো জায়গায় চাকরি যাতে হয়।"

কিন্তু এবার সাহেব বেজায় চটে গিয়েচে দেখা গেল, না জানিয়ে চাকরি ছেড়ে আসাতে। সাহেবের আরদালি বললে, সাহেবের এখন দেখা করবার সময় হবে না।

বামাচরণের বাবা এতটা ভাবেন নি, তিনি হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু সেই যে তাঁর মন কেমন ভেঙে গেল, এরপর আর বেশিদিন বাঁচেন নি।

ক্রমে দিন চলে গেল। বামাচরণের বয়স হয়ে উঠলো। বাবা বেঁচে থাকতেই তার বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন, দু' একটি ছেলেপুলেও হল।

গ্রামের যে সব ছোট ছোট ছেলেদের বামাচরণ গম্ভীর মুখে উপদেশ দিয়ে বেড়াতো, তাদের মধ্যে অনেকে এখন বিদেশে বেরিয়ে ভালো লেখা-পড়া শিখেচে, দু'একজন ভালো চাকরিও পেয়েচে। বাপের পেনসনের টাকায় সংসার একরকম চলতো, বাপের মৃত্যুর পর বড় সংসার ঘাড়ে পড়াতে বামাচরণ চোখে অন্ধকার দেখলে।

নিজের ছেলে-মেয়ে দু'তিনটি, এক বিধবা ভগ্নী বাড়িতে, তারও দু'তিনটি ছেলে মেয়ে, বৃদ্ধা মা,—অনেকগুলি পুষ্যি খেতে, চলে কিসে এতগুলি প্রাণীর?

wapsip.com

*　　　*　　　*

এই সব কথাই সে ভাবছিল আজ নদীর ধারে বড়-ভাঙনের চট্‌কা গাছতলায় মাছ ধরতে বসে। বেলা পড়ে এসেচে, কচুরিপানার দামগুলো উজান মুখে চলেচে,—বোধ হয় জোয়ার এল।

সামনের চট্‌কাগাছটায় রোদ রাঙা হয়ে আসচে। রোজ এইখানটিতে বামাচরণ মাছ ধরতে আসে। তাদের গ্রাম থেকে প্রায় দেড়মাইল দূরে নদীর বড় বাঁকের মুখে, জায়গাটা চারিদিকে নির্জন।

এখন তার মনে হয় খুলনার চাকরিটা ছেড়েও এসেচে আজ চৌদ্দ-পনেরো বছর হবে।

হঠাৎ নদীর উঁচু পাড়ের দিকে তার নজর পড়লো;—ওটা কি?

পাড়টা সেখানে খুব উঁচু ও খাড়া—হাত ত্রিশ-চল্লিশ উঁচু সে যেখানে বসে আছে সেখান থেকে। পাড়ের খানিকটা ভেঙে পড়েচে বোধ হয় দু'একদিন হল। সেই পাড়ের গায়ে একটা বড় কলসী পাড় ভাঙার দরুন বেরিয়ে পড়েচে—অর্ধেকটা দেখা যাচ্চে। বাকি অর্ধেকটা মাটির মধ্যে পোঁতা।

বামাচরণের চট করে মনে পড়ে গেল, সে গ্রামের বুড়োদের মুখে শুনেচে এই বাঁকের মুখে আগে—বহুকাল আগে, খুব সমৃদ্ধ গোয়ালাদের গ্রাম ছিল; অনেক লোকের বাস ছিল। কলসীটা জমির ওপর থেকে হাত চার-পাঁচ নিচে পোঁতা অবস্থায় রয়েচে। সেকালে লোকে কলসী করে টাকা পুঁতে রেখে দিত—এ নিশ্চয়ই টাকার কলসী।

বামাচরণ এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে আর কেউ কাছাকাছি আছে কিনা। স্থানটা নির্জন, অন্য লোক এদিকে আসে না। কলসীটা আর কেউ দেখে নি নিশ্চয়ই। তা ছাড়া মোটে কাল রাত্রে এই পাড় ভেঙেচে, কে আর লক্ষ্য করেচে একটা কানাভাঙা কলসী? কে-ই তারপর এসেচে এদিকে?

অবশ্য নৌকো থেকে দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু জেলে-ডিঙি এতদূরে আসে না, গাঁ থেকে ওই কদমতলা পর্যন্ত তাদের দৌড়। এতদূরে কেউ কোমড়-জাল পাতে না।

বামাচরণ সেখানে আর দাঁড়ালে না, ছিপ গুটিয়ে উঠে বাড়ির দিকে রওনা হল। তাকে এখানে কেউ না দেখে ফেলে।

বাড়িতে এসে সে ভাবতে বসলো। এখন সে কি করবে? আজ রাত্রেই অবশ্য কলসীটা তুলে আনতেই হবে। কিন্তু একা সে কি করে পারবে? জমির ওপর থেকে খোঁড়া অসম্ভব। যদি শাবলের ঘায়ে কলসীটা নদীগর্ভে পড়ে যায়, তা হলে স্রোতের মুখে হয়তো কোথায় ভেসে চলে যাবে, নয়তো ডুবে যাবে।

তা নয়, নিচে থেকে মই লাগিয়ে উঠতে হবে কলসী পর্যন্ত, তার পর সন্তর্পণে খুঁড়ে কলসী বার করতে হবে। তাতে অন্তত দুজন লোকের দরকার; মই নিচে থেকে একজন ধরে থাকা চাই, কলসী নামাবার সময়েও সাহায্য পাওয়া দরকার।

অনেক ভাবনাচিন্তার পরে বামাচরণ বড় ছেলে নিতাইকে সঙ্গে নেবার ঠিক করলে। নিতাই এই বারো বছরে পড়েছে, গ্রাম্য স্কুলে পড়ে, খেলাধুলায় খুব পটু আর সাহসীও বটে। বামাচরণ ছেলেকে বললে, "তোর মাকে বলিস নে, রাত্তিরে যাবি আমার সঙ্গে একটা জায়গায়।"

পিতাপুত্রে মই, শাবল একগাছা শক্ত দড়ি নিয়ে রাতদুপুরের পরে নদীর ধারে চট্‌কা গাছটার তলায় এসে দাঁড়ালো।

wapsip.com

বুকের মধ্যে টিপটিপ করচে বামাচরণের, কি জানি কি হয়!

বামাচরণের ছেলে কিছুই জানে না কি ব্যাপার, বাবার কথায় সে এসেচে। কেন এসেছে তার বাবা তাকে বলে নি। কিন্তু সে জিনিসটা খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছিল। নিশ্চয়ই জেলেরা কোথাও জলের ভেতর বাঁশের ঘুনিতে বড় মাছ জিইয়ে রেখেচে—সেই মাছ চুরি করতে তার বাবা তাকে সঙ্গে করে এনেচে। কিন্তু মই কি হবে?

জায়গাটা দেখেও সে অবাক হয়ে গেল। বাবাকে বললে, "বাবা, এতদূরে তো জেলেরা কোমড় ফেলে না? এ তো চট্‌কাতলার বাঁক···"

তার বাবা ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, "জেলেদের সঙ্গে আমাদের কি দরকার? নে, মইটা এখানে বেশ করে লাগা···"

অতিকষ্টে বামাচরণ মই বেয়ে উপরে উঠলো। নিতাই খুবই অবাক হয়ে গিয়েচে—পাড়ের ওপর মই দিয়ে উঠে কি হবে, কি আছে ওখানে? সে একটু হতাশও যে না হয়েচে এমন নয়। বড় মাছ নয়, তাহলে হয়তো বাবা কোনও ওষুধের শেকড় কি মুথোঘাসের শেকড় তুলতে এসেচে। অনেক সময় রাত্রেই ওষুধের গাছ তুলতে হয়, সে জানে।

তার ভয়ও হচ্ছিল, চারিদিকে অন্ধকার, নদীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে ডাঙায় ছোট ছোট ঢেউ লেগে। এখানে ভূতের উপদ্রবের কথা অনেকে বলে, শ্মশান এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। নিতাইয়ের গা-টা ছমছম করে উঠলো।

তার বাবা ওপরে গিয়ে পাড়ের গা খুঁড়তে লাগলো। সে নিচে থেকে অন্ধকারে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না বাবা কি খুঁজচে। একবার সে বললে, "কি বাবা, মুথোর শেকড়?"

বামাচরণ চাপাগলায় বললে, "আঃ, চুপ কর্ না! মই ধরে থাক, তোর সে কথায় দরকার কি?"

নিতাই চুপ করে রইলো, কিন্তু ওষুধ খুঁড়তেও কি এত সময় লাগে? সে অন্ধকারের মধ্যে মইয়ের নিচে একা দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অশান্তি বোধ করছিল, বাবার ভয়ে কিছু বলতেও পাচ্ছে না।

অবশেষে অতি কষ্টে ভারী ও কালো একটা কলসী নিয়ে বামাচরণ মই থেকে নামলো। নিতাই অবাক হয়ে বললে, "কি বাবা এতে?"

"চুপ কর্ না, কেবল চেঁচামেচি! তোর সব কথায় কি দরকার? শাবল আর মইটা নিতে পারবি একলা?"

কেউ না দেখে এজন্যে বামাচরণ বাঁশবনের পথ দিয়ে চললো। বেশি রাত্রে গ্রামে চৌকীদার পাহারা দিতে বার হয়, কি জানি যদি সে এ অবস্থায় হঠাৎ চৌকীদারের সামনেই পড়ে যায়?

বামাচরণের বুকের মধ্যে টিপ্‌টিপ্ করচে। কলসীটা বেজায় ভারী। নিশ্চয়ই কোনো ভারী জিনিসে ভর্তি। কলসীর মুখটা একখানা পাথরের ছোট খুরি দিয়ে চাপা ছিল—বহুদিন মাটির মধ্যে থাকার দরুণ সেটা এমন দারুণ এঁটে গিয়েচে যে অস্ত্র দিয়ে চাড় না দিলে খোলা যাবে না।

বাড়ি পৌঁছেই বামাচরণ বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলে। স্ত্রীকে বললে, "একটা আলো নিয়ে এসো তো?"

ওর আর বিলম্ব সইচে না। এখুনি সে কলসীর মুখ খুলে দেখবে।

নিতাইয়ের মা একটা কাচ-ভাঙা সেকেলে হিঙ্কসের লণ্ঠন নিয়ে উঁচু করে ধরলে।

wapsip.com

বিস্ময়ের সুরে বললে, "কলসীটাতে কি? মড়ার কলসীর মতো দেখতে,—ওটাকে আনলে কোথা থেকে গো?

অধীর কৌতূহলে ও আগ্রহে বামাচরণ শাবলের এক ঘা দিয়ে কলসীটা ফাটিয়ে ফেললে—সঙ্গে সঙ্গে কালো আলকাতরার মতো কি একটা দুর্গন্ধ পদার্থ মেঝেময় ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

নিতাইয়ের মা অবাক, স্বামী পাগল হয়ে গেল নাকি পয়সার দুর্ভাবনায় এতদিন পরে?

"রাতদুপুরে কিসের একটা কলসী কোথা থেকে উঠিয়ে এনে কি কাণ্ড বাধালে দেখো তো?"

বামাচরণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। এত কষ্ট তবে সব বৃথা। রুপোর গুঁড়োও এতটুকু নেই কলসীটাতে। কোথায় এক কলসী টাকা বা মোহর—আর তার বদলে—এগুলো কি কালো কালো? অদৃষ্ট একেই বলে।

সারারাত্রি বামাচরণের ঘুম হল না। সত্যিই তার অদৃষ্ট ভালো নয়। এমন জায়গায় পোঁতা কলসী পেয়েও তার মধ্যে থেকে বেরোয় কালো আলকাতরা! না হলে বম্‌পাশ সাহেবের দেওয়া এমন চাকরি সে ছেড়ে দিয়ে আসে? পেয়ে হারানোই তার অদৃষ্ট।

পরদিন সকালে লোকজনকে আলকাতরার মতো জিনিসটা দেখাতে কেউ কিছু বলতে পারে না। অবশেষে মামুদপুরের বাজারের বুড়ো কবিরাজমশায় দেখে বললেন, "এ পুরনো ঘি। বহুকালের পুরনো ঘি। কতটা আছে? এর দাম খুব। বিক্রি করবে? কলকাতায় বৌবাজারের সেনেদের দোকানে পেলেই নেবে।"

বুড়ো কবিরাজকে সঙ্গে নিয়ে বামাচরণ কলকাতায় এল।

বৌবাজারের সেনেদের মস্ত কবিরাজী দোকান, সারা ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর সঙ্গে তাদের কারবার। ঘি দেখে তারা বললে, "হ্যাঁ জিনিসটা খুবই ভালো, অন্তত দুশো বছরের পুরোনো। তোমাদের ঘরে ছিল?"

বামাচরণ সংক্ষেপে কলসী-প্রাপ্তির কথা বর্ণনা করলে। তারপর দরদস্তুর চললো, ওরা সাতটাকার বেশি দর দিতে রাজী নয়, তারপর উঠলো দশ টাকায়, তার বেশি কিছুতেই নয়। বুড়ো কবিরাজকে সঙ্গে না আনলে কিন্তু বামাচরণ দু-টাকা সেরেই জিনিসটা দিয়ে ফেলতো।

একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকে ওদের কথাবার্তা শুনেছিলেন; তিনি উঠে এসে বুড়ো কবিরাজকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আমি খয়রাগড়ের রাজার ম্যানেজার। আমি আপনাদের কথাবার্তা এতক্ষণ শুনছিলাম—রাজার মায়ের বয়স হয়েচে, হাঁপকাশের অসুখ। এই পুরোনো ঘি কিনতেই আমি এদের দোকানে এসেছিলাম। এত বছরের পুরোনো ঘি কলকাতার কোন দোকানে নেই। আমি আপনাদের জিনিস নেবো। একশো টাকা করে সেরের দাম দেবো আমি। ওজন করুন মাল।"

এ কলসীতে মোট সাড়ে বারো সের ঘি ছিল। কিন্তু আদত কলসীটাতে বোধ হয় আরও বেশি ছিল, কিন্তু সেটা ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। বাকিটা ওরা নতুন কলসীতে পুরে এনেছিল।

ঘি বিক্রি করে মোট পাওয়া গেল সাড়ে বারশো টাকা।

যদু চক্কোত্তি জ্যোতিষী ছিল বড়, সে মিথ্যে বলে নি—এখন তো বামাচরণের অনন্তকাল পড়ে রয়েচে। রাজা হওয়ার আশ্চর্যটা কি?

wapsip.com

অরণ্যে

বেশি দিনের কথা নয়, গত ফাল্গুন মাসের কথা। দোলের ছুটিতে গালুডি বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে বলি যে সিংভূম জেলার এই অঞ্চলে আমি অনেকবার গিয়েচি এবং এখানে আমার কয়েকটি বন্ধু বাড়িও করেচেন, ছুটি-ছাটাতে গিয়ে কিছুদিন যাপন করবার জন্যে।

গালুডি ক্ষুদ্র গ্রাম, এ থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে দূরে সব দিকেই পাহাড়ের শ্রেণী ও জঙ্গল। দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণরেখার ওপারে সিদ্ধেশ্বর ও ধনঝরি শৈলমালা, তার ওদিকে তামাপাহাড় নামে একটি অনুচ্চ পাহাড়; এখানে কয়েক বৎসর পূর্বে একটা তামার খনি ছিল, কোম্পানি ফেল হয়ে যাওয়াতে ঘর, বাড়ি, কারখানা, চিমনি, ম্যানেজারের বাংলো সবই পড়ে আছে, মানুষ জন নেই। জায়গাটার নাম রাখা মাইন্‌স্‌। এই নামে একটা ছোট রেলস্টেশনও আছে দেড় মাইল দূরে। রাখা মাইন্‌স্‌ এবং তার আশেপাশে ঘন জঙ্গল ও পাহাড়, মাঝে সাঁওতালী বন্য গ্রাম। এই সব বনে হস্তী আছে, শঙ্খচূড় সাপ আছে, ভাল্লুক তো আছেই। এই জঙ্গলে যখন-তখন চলাফেরা করা বিপজ্জনক, বন্দুক না নিয়ে কখনও যাওয়া উচিত নয়।

এই পরিত্যক্ত নির্জন স্থানে একটা ভগ্নপ্রায় খড়ের বাংলোতে এক মাদ্রাজী কবিরাজ থাকতেন, তাঁর সঙ্গে বেশ আলাপ হয়েছিল। তাঁর মুখে গল্প শুনেচি—কিছুদিন আগে দুই বুনো হাতীর লড়াই হয়েছিল পুরোনো কারখানার কাছে। দুদিন ধরে লড়াই হয়, শেষকালে একটা হাতী মারা যায়। বেশি রাত্রে তাঁর বাংলোর বারান্দায় বাঘ ডাকে, সম্পূর্ণ দিনের আলো না ফুটলে তিনি কখনও বাংলোর বারান্দার দিকের দোর খোলেন না।

আমি ইতিপূর্বে অনেকবার যখন গালুডি গিয়েচি, তখন রাখা মাইন্‌স্‌ ও তার আশেপাশের বনে বেড়াতে গিয়েচি একা একা। একা যাওয়ার কারণ প্রথমত তো ওসব বনের মধ্যে স্বাস্থ্যান্বেষী অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত শৌখীন কলকাতার বাবুরা পায়ে হেঁটে যেতে রাজী হন না, দ্বিতীয়ত গভীর বনের মধ্যে বেড়ানোর শখও সবার থাকে না—এতে তাঁদের দোষ দেওয়া চলে না অবশ্য। অনেকবার বেড়িয়ে বনের মধ্যে কিছু কিছু জায়গা পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হয় তখন লোকে স্বভাবতই সেখানে একটু অসতর্ক হয়ে পড়ে। আমিও তাই হয়েছিলাম; ওদেশে বনে বেড়াতে হলে সাধারণত সকালের দিকে যাওয়াই নিয়ম, বেলা দুটো তিনটের পর অর্থাৎ পড়ন্ত বেলার দিকে বনের মধ্যে থেকে বার হয়ে লোকালয়ের দিকে আসাই ভালো।

প্রথম প্রথম এ-নিয়ম খুবই মেনে এসেচি। একজন করে সাঁওতাল গাইড্‌ সঙ্গে না নিয়ে বনে যেতাম না। একবার সিদ্ধেশ্বরডুংরি বলে প্রায় পনেরো শ' ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলাম, সেবারও সঙ্গে ছিল একজন সাঁওতাল ছোকরা। পাহাড়ের ওপর অনেক উঁচুতে বুনো হাতীতে চারা কেঁদগাছ ভেঙে দিয়েচে সেই পথপ্রদর্শক সাঁওতাল ছোকরা আমায় দেখায়। চীহড় ফল,—এক রকম বুনো সীমের মতো ফল, তার বীজ পুড়িয়ে খেতে ঠিক গোলআলুর মতো—সে-ই পুড়িয়ে খাইয়েছিল পাহাড়ের ওপরকার জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে। পাহাড়ের এক জায়গায় একটি গুহা দেখিয়ে বলেছিল, এ গুহা এখান থেকে সুবর্ণরেখার ওপার পর্যন্ত চলে গিয়েচে।

এ-সব অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। যাঁরা ঘন অরণ্যানী, নির্জন শৈলমালার

wapsip.com

সৌন্দর্য ভালবাসেন তাঁদের এ সব স্থানে আসা দরকার। বনের মধ্যে মাঝে মাঝে ক্ষীণকায়া পার্বত্য নদী—হয়তো হাঁটুখানেক জল ঝিরঝির করে বইচে পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে। দু-ধারেই জনহীন বনভূমি, কেঁদ পলাশ ও শালের জঙ্গল, ঘন ও প্রস্তরাকীর্ণ, কত বিচিত্র বন্যপুষ্প, বন্য শেফালির বন। বার বার যাতায়াত করতে করতে ভয় ভেঙে গেল। যখন নিজের চোখে কখনও ভাল্লুক দেখলাম না, বা বুনো হাতীর তাড়া সহ্য করতে হল না, তখন মনে হল অনর্থক কেন একজন গাইড্ নিয়ে গিয়ে পয়সা খরচ করা। যেতে হয় একাই যাবো।

অর্থব্যয় ছাড়া গাইড্ নিয়ে ঘোরার অন্য অসুবিধাও ছিল। ধরুন, এক জায়গায় চমৎকার বন্য-পুষ্পের শোভা, পাহাড়ের নীল চূড়া সুনীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, নিকটেই ক্ষুদ্র পার্বত্য ঝরনার মৃদু কলধ্বনি, বনস্পতিদের শাখায় শাখায় বন্য পক্ষীর কূজন,—আমার মনে হল এখানে অদূরবর্তী শিলাখণ্ডে পিয়াল গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি, আপন মনে প্রকৃতির এই নিরালা রাজ্যে বসে বনবিহগ-কাকলী শুনি; কিন্তু গাইড্ দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসতে দেবে না, বলবে, "চলো বাবুজী, চলো, এখনও অনেক পথ বাকি!"—তা ছাড়া সঙ্গে লোক থাকলে মনের সে শান্ত, সমাহিত ভাবও আসে না।

এই সব কারণে ইদানীং একাই বেড়াতে যেতাম বনের মধ্যে। কিন্তু যে ঘটনার কথা এখানে বলবো, তার পূর্বে সুবর্ণরেখার ওপারে দু'তিন মাইল ছাড়া একা খুব বেশি দূরে যাই নি, বড় জোর গিয়েচি সিদ্ধেশ্বর পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশ পর্যন্ত। গিয়েচি, আবার বেলা পড়বার অনেক আগেই সুবর্ণরেখার তীরে ফিরে এসেচি।

দোলের ছুটিতে এবার গালুডি গিয়ে দেখি অপূর্ব নির্মেঘ নীল আকাশ। বনে বনে শাল-মঞ্জরির সুগন্ধ, নব বসন্তে নতুন কচি-পাতা-ওঠা শাল, কেঁদ, পিয়াল, মহুয়া, গাছে গাছে কুঁড়ি দেখা দিয়েচে। বসন্তের বন্যা এসেচে পাহাড়ী ঝরনার মতো নেমে—বিচিত্র বর্ণে, বিচিত্র সজ্জায় বনে বনে।

একজন বৃদ্ধ সাঁওতালের মুখে শুনেছিলাম পাঁচ মাইল দূরে বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছোটখাট জলপ্রপাত আছে—জায়গাটার নাম নিশিঝরনা। সেখানে নাকি বন আরও ঘন, পথে এক জায়গায় পুরোনো আমলের একটা দেউল আছে ইত্যাদি। জায়গাটা দেখবার খুব ইচ্ছে হল। দোলের আগের দিন বেলা দশটার মধ্যে কিছু খেয়ে নিয়ে জায়গাটার উদ্দেশ্যে বার হয়ে পড়লাম।

শীঘ্রই সুবর্ণরেখা পার হয়ে গিয়ে রাখা মাইন্‌স্-এর পথ ধরলাম। মুসাবনী রোড যেখানে রাখা মাইন্‌স্-এর চার নম্বর শ্যাফ্‌টের গভীর বনের মধ্যে গালুডির পাকা রাস্তার সঙ্গে মিশেচে—সেখানে পৌঁছতে বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। তারপর বাঁধা সড়ক ছেড়ে দিয়ে বাঁ দিকে কুলামাড়ো বলে একটা ক্ষুদ্র বন্যগ্রাম পার হয়ে পায়েচলা সুঁড়িপথ ধরে ধন্‌ঝড়ি পাহাড়ের নিচেকার ঘন বনের মধ্যে ঢুকলাম! পথ যে আমার একেবারে অপরিচিত তা নয়, আর বেশিদূর অগ্রসর না হলেও কুলামাড়ো গ্রামে সাঁওতালী উৎসবে সাঁওতালী নৃত্য দেখতে এর আগেও একবার এসেচি। সুতরাং আমার মনে দ্বিধা বা ভয় থাকবার কথা নয়, ছিলও না।

কুলামাড়ো পেছনে ফেলে চলেচি, আমার ডাইনে ধন্‌ঝরি পাহাড় সরু বন্য পথের সমান্তরাল ভাবে যেন বরাবর চলেচে উত্তর-দক্ষিণ কোণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে। বন ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে তা বেশ লক্ষ্য করচি। কিছুদূর গিয়ে বাঁ দিক থেকেও

wapsip.com

আর একটা শৈলশ্রেণী যেন ক্রমশ ধন্‌ঝরির গায়ে মেশবার চেষ্টা করচে। যে অরণ্যাবৃত উপত্যকা দিয়ে আমি চলেচি সেটা যেন ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসচে। আমার জানা ছিল এই পথটা বনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় ধন্‌ঝরি পাহাড় পার হয়ে ওপারে চলে গিয়ে আবার মুসাবনী রোডের সঙ্গে মিশেচে। সুতরাং মনে কোন উদ্বেগ ছিল না। জানি, যেতে যেতে আপনা-আপনি মুসাবনী রোডে পড়বোই। নিশিঝরনা কোথায় আমার জানা ছিল না; আমি বনের মধ্যে যেতে যেতে কান খাড়া করে আছি কোথায় ঝরনার শব্দ পাওয়া যায়। এক জায়গায় সত্যিই শব্দ পাওয়া গেল জলের, সুঁড়িপথটা ছেড়ে নিবিড়তর বনের মধ্যে ঢুকে দেখি একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী উপলরাশির উপর দিয়ে বয়ে চলেচে; তার দু'ধারে এক প্রকার বন্য গাছ—অজস্র বেগুনী রঙের ফুল ফুটে আছে। স্থানটি যেমন সুন্দর তেমনি স্নিগ্ধ, কতক্ষণ বসে রইলাম একটা শিলাখণ্ডে, উঠতে যেন ইচ্ছে করে না।

কিন্তু এই বনে থাকা তখন যে উচিত ছিল না, তা তখন বুঝি নি। প্রথমত তো বনের ও সব নিভৃত স্থানে—বিশেষ করে যেখানে জল থাকে, সেখানে বাঘ থাকা বিচিত্র নয়, দ্বিতীয়ত বেলা গেল, পথ তখনও কত বাকি সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা ছিল না—অথবা ধারণা থাকলেও ভুল ধারণা ছিল। যখন আবার সুঁড়িপথটায় উঠলাম তখন বেলা বেশ পড়ে এসেচে।

বনের এই অংশের শোভা অবর্ণনীয়। প্রথম বসন্তে কত কি বনের ফুল গাছের মাথা আলো করে রেখেচে, ধন্‌ঝরির নীল সানুদেশ এক দিকে খাড়া হয়ে উঠেচে ডাইনে, শালমঞ্জরির সুবাসে উপত্যকার বাতাস নিবিড় হয়ে উঠেচে, বেলা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে গন্ধটি যেন আরও বাড়চে; কতক্ষণ অন্যমনে চলেছি, সুঁড়িপথটা কখন হারিয়ে গেছে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখি আমার সামনেই ধন্‌ঝরি পাহাড়ের খুব উঁচু একটি অংশ, সেখানে পাহাড় টপকে ওপারে যাওয়ার কোন উপায় নেই—পথও নেই। স্থানটি সম্পূর্ণ জনমানবহীন। সেই কুলামাড়ো গ্রাম ছাড়িয়ে এসে আর লোকালয় চোখে পড়ে নি। বেলাও পড়েচে, একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তা ছাড়া সুঁড়িপথটাই বা গেল কোথায়? বনের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পথ খুঁজতে গিয়ে আরও গভীর বনের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

এ দিকে সূর্য হেলে পড়েচে। এ বনের মধ্যে আর বেশিক্ষণ দেরি করা উচিত হবে না। ভাবলাম, আর নিশিঝরনা দেখে দরকার নেই, এবার যে পথে এসেছি সেই পথেই ফিরি। কিন্তু কোথায় সে পথ? ক্রমে এমন সব জায়গার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যেখান দিয়ে আসবার সময় আসিনি তা বেশ বুঝলাম। বনের মধ্যে দিক্‌ভ্রান্ত হওয়া খুব সহজ, বিশেষ করে এ ধরনের নিবিড় বনের মধ্যে। কিন্তু আমি জানি ধন্‌ঝরি উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে বিস্তৃত, বিশেষত সূর্য যখন এখনও আকাশে দেখা যাচ্ছে, তখন দিক ভুলের সম্ভাবনা অন্তত নেই—এই একটা ভরসা ছিল মনে। কিন্তু ভরসা ভরসাই রয়ে গেল সেই পর্যন্ত, কোনও কাজে এল না। সূর্য ক্রমে পাহাড়ের আড়ালে অস্ত গেল। ছায়া ঘনিয়ে এল বনে। যদিও সামনে জ্যোৎস্না রাত্রি, তবুও এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা রাত্রি কাটানোর সম্ভাবনায় বিশেষ পুলকিত হয়ে উঠলাম না।

হঠাৎ মনে হল ধন্‌ঝরি পাহাড়ের ওপারেই তো মুসাবনী রোড। পাহাড়টা যদি কোনও রকমে টপকাতে পারি, এখনও রাত হয়নি, লোকালয়ে পৌঁছতে পারবো। নতুবা ঘনায়মান সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে যতই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরবো ততই সম্পূর্ণরূপে পথভ্রান্ত হয়ে পড়তে হবে। একটা জায়গায় মনে হল যেন ধন্‌ঝরি একটু নিচু হয়েচে। এই ধরনের নিচু খাঁজ দিয়েই আমার জানা পায়ে-চলার সুঁড়িপথটা গেছে—ঘন চুলের মধ্যে চেরা সিঁথির মতো;

wapsip.com

পার্বত্য পথের কোন চিহ্নই দেখছি না কোন দিকে, তবুও এই অপেক্ষাকৃত নিচু থাক টপকে ধনঝরির ওপারে যাওয়া খুব কঠিন হবে না মনে হয়।

জুতো খুলে হাতে নিলাম। পাহাড়ের কিছুদুর উঠে গিয়ে দেখি নিচে বনের মধ্যে যত অন্ধকার ওপর ততটা নয়। জ্যোৎস্না উঠলো, জ্যোৎস্না ফুটবে ভালো। প্রথম খানিকটা উঠেই মনে হল ভুল জায়গা দিয়ে পাহাড় পার হচ্ছি, এখান দিয়ে কখনও কেউ পাহাড় পার হয়নি—যেমন বড় বড় পাথরের চাঁই, তেমনি কাঁটা গাছ সর্বত্র। খালি পায়ে ধারালো পাথরের ওপর দিয়ে চলতে বিষম কষ্ট, অথচ জুতো পায়ে দেওয়াও চলে না।

পাহাড়ের ওপরে খানিকটা উঠে গেলাম দিব্যি। তারপরে এক জায়গায় গিয়ে দেখি সামনে একেবারেই খাড়াই—দুরারোহ পাহাড় দেওয়ালের মত উঠেচে। বড় বড় গাছের শেকড় ঝুলচে, যেন জলের তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে পড়েচে। আমি শিক্ষিত পর্বতারোহণকারী নই, সেই খাড়া উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে ওঠা আমার পক্ষে তাই সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এদিক ওদিক চেয়ে দেখি একদিকে একটা মসৃণ প্রকাণ্ড শিলা আড়ভাবে শোয়ানো, সেখানা উচ্চতায় আন্দাজ কুড়ি-বাইশ হাত এবং চওড়ায় ত্রিশ-বত্রিশ হাত হবে। এ ধরনের পাথরকে এদেশে 'রাগ্' বলে। 'রাগ্' পার হওয়া বিপজ্জনক, কারণ হাত-পা দিয়ে ধরবার এতে কিছু থাকে না। তবে এখানা অন্তত ৬০ ডিগ্রি কোণ করে হেলে আছে বলে ভরসা হল; এই একমাত্র পথে পাহাড়ের ওপরের দিকে ওঠা চলবে এখন।

জুতো যখন পায়ে নেই এক রকম করে চার হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে 'রাগ্' পার হয়ে ওপরে উঠলাম। তারপরে ওঠার বিশেষ কষ্ট নেই, শুধু অর্জুন আর শুভ্র নিষ্পত্র শিববৃক্ষের জঙ্গল, বাঁকাভাবে চাঁদের আলো এসে শিববৃক্ষের দুধের মতো সাদা ধবধবে গুঁড়ির গায়ে পড়েচে। কারণ তখন প্রদোষের ঈষৎ অন্ধকার কেটে জ্যোৎস্না ফুটে উঠেচে। এক জায়গায় ওপর দিকে মনে হল যেন গাছে আগুন লেগে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কৌতূহল হল অত্যন্ত, আপনি আপনি গাছে কি করে আগুন লাগবে? ওপরে উঠে গিয়ে দেখি সত্যিই এক জায়গায় একটা মোটা শেকড়ের গা দিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে—তবে কি ভাবে শেকড়ে আগুন লাগলো তা আজও বলতে পারি না।

তখন আমি অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়েচি, নিম্নের উপত্যকার গাছপালার মাথা কোঁকড়া-চুল কাফ্রিদের মাথার মতো দেখাচ্ছে; চাঁদের আলো বনের নিবিড় অন্ধকার উপত্যকার মধ্যে এতটুকু ঢোকে নি, ওপর থেকে ঘন কালো দেখাচ্ছে। আর আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে চারিদিকে ধন্‌ঝরির বিভিন্ন চূড়ার বনরাজির মাথায় মাথায় শুভ্র ঢেউ। সে জনমানবহীন শৈলমালার ঊর্ধ্ব সানুতে জ্যোৎস্না-প্লাবিত শুক্লা চতুর্দশী রাত্রির শোভা যে দেখে নি তাকে বলে বোঝানো যাবে না সে কি অপূর্ব ব্যাপার! একা যেন আমি পৃথিবীর ঊর্ধ্বে কোন দেবলোকে বিচরণশীল আত্মা; আমার চোখের সম্মুখে যে দৃশ্য দূর থেকে সুদূরে প্রসারিত, কোনও পার্থিব চক্ষু কোনদিন তা দর্শন করেনি। কিন্তু সেখান থেকে আমার মনে হল আমি সম্পূর্ণ ভুল করেচি, যে দিক দিয়ে পাহাড়ে উঠেচি সেখান দিয়ে পাহাড় টপকাবার উপায় নেই—যতই উঠি ততই দেখি আমার চোখের সামনে অর্জুন ও শিববৃক্ষের সাদা সাদা সোজা গুঁড়িগুলো থাকে থাকে উঠে যেন স্বর্গে উঠেচে। অর্থাৎ পাহাড়ের শিখর দেশের তখনও পর্যন্ত কোনও পাত্তাই নেই। তাছাড়া ক্লান্তও খুব হয়ে পড়েচি। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে যেন ঢেঁকির পাড় পড়চে অতিরিক্ত শ্রমের ফলে। এই বন ভেঙে অতখানি উঠে ওপারের

wapsip.com

ঢালু দিয়ে নামতে পারবো বলে মনে হল না—তার চেয়ে যে পথে উঠেচি হাত-পা ভেঙে মরার চেয়ে নিম্ন উপত্যকায় নেমে জ্যোৎস্নার আলোয় আবার না হয় পথ খুঁজি। বিপদ এল এতক্ষণে এই নামবার সময়, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে; একেবারে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হল প্রায়। দুর্ঘটনা যখন আসে তখন এমনি অতর্কিতে আসে।

যতটা উঠেছিলাম জ্যোৎস্নার আলোতে একরকম করে নেমে এসে সেই 'রাগ্' খানার কাছে পৌঁছলাম। 'রাগ্' পার হয়ে নেমে গেলে উপত্যকা আর বেশি নিচে নয়।

'রাগ্' বেয়েই নামতে হবে, কারণ অন্য দিকে নামবার কোন উপায় নেই। অথচ 'রাগ্' এমন মসৃণ যে হাত পায়ে আঁকড়াবার কিছু নেই—এ ধরনের পাথর বেয়ে ওঠা বরং সহজ, কিন্তু নামা অত্যন্ত কঠিন। তাড়াতাড়িতে আর একটা ভুল করলাম, উপুড় হয়ে না নেমে চিৎ হয়ে নামতে গেলাম। যাই হোক, খানিকটা তো নামলাম দিব্যি, তারপর পাথরখানার ওপর দিকের যে প্রান্ত হাত দিয়ে ধরেচি সেটা ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে সড়্ সড়্ করে খানিকটা নামলাম। তারপর পাথরের গায়ে এক জায়গায় একরাশ শুকনো পাতা জমে আছে, সেখানটিতে পাথরের কোন খাঁজ আছে ভেবে যেমন পা নামিয়ে দিয়েচি অমনি শুকনো পাতার রাশ হড়্ হড়্ করে সরে গেল—সেই ঝোঁকে আমিও খানিকটা গড়িয়ে পড়লাম। অথচ পায়ে আটকাবার কোন খাঁজ বা উঁচু-নিচু জায়গা কিছুই পেলাম না।

তখন আমার অবস্থা সঙিন হয়ে উঠেচে। কোথাও কিছু ধরবার নেই—শ্লেটের মতো মসৃণ পাথরখানার কোন জায়গায়। আমি চিৎ হয়ে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় তার ওপর শুয়ে আছি এবং আঙুল টিপে বা সামান্য কিছু ধরে আছি, সেটা ছেড়ে দিলেই নিচের দিকে গড়িয়ে পাথরের নুড়ির স্তূপের ওপর গিয়ে পড়বো। যে পাথরের স্তূপ অন্তত ত্রিশ ফুট নিচে, তার ওপর পড়লে তীক্ষ্ণ ধারালো অসমান প্রস্তরখণ্ডে বিষম আহত হতে হবে। তারপর হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকলে এ জনশূন্য পাহাড়ের ওপরে কে-ই-বা উদ্ধার করচে? এ অবস্থায় মৃত্যু ঘটা বিচিত্র কি?

যখন আমি বুঝলাম আমি খুব বিপদগ্রস্ত তখন হাত-পায়ে যেন আর বল নেই। আঙুলে টিপে ধরব কি, আঙুলই অবশ হয়ে আসচে। এভাবে আর কিছুক্ষণ কাটলেই গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবো এবং সাংঘাতিক আহত হব।—তখন মনে হল ওঠবার সময় পাথরখানার এ অংশ দিয়ে উঠি নি, কোণ ঘেঁষে উঠেছিলাম। সেখানে নিচে ছোটবড় অসমান শিলাখণ্ডের ধাপমতো ছিল, তখন দিনের আলো ছিল বলে দেখে শুনে ওঠবার সুবিধা ছিল, এখন রাত্রে বিশেষ করে ওপরের দিক থেকে নামবার সময় অতটা বুঝতে পারি নি।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারিদিকে চাইলাম, জলে ডোবার পূর্ব মুহূর্তে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কোন আশ্রয় খোঁজে, তেমনি। হঠাৎ নজরে পড়লো হাত খানেক দূরে একটা অর্জুন গাছের মোটা শেকড় ওপরের একখানা শিলাখণ্ডের ফাটল থেকে বার হয়ে ঝুলচে। মরীয়ার মতো সাহসে ঝোঁক দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সেই শেকড়টি আঁকড়ে ধরতে গেলাম এবং ধরেও ফেললাম। এতে নিজেকে আরও বিপন্ন করেছিলাম—কারণ শেকড় হাতের নাগালে না এলে টাল খেয়ে পড়ে গিয়ে সজোরে নিচের প্রস্তররাশির উপর পড়ে চূর্ণ হয়ে যেতাম—ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়লে হয়তো চোট খেয়ে বেঁচে যেতাম, এতে কিন্তু বাঁচবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না।

'রাগ্' থেকে শেকড় ধরে নেমে এসে সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন ঝাল বেরুচ্ছে বলে মনে হল!—নিশ্চিন্ত দুর্ঘটনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে যেমন হয় মানুষের। কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করে নিয়ে হাত-পায়ের অবশ ভাবটা কাটিয়ে আবার নামতে আরম্ভ করলাম এবং পনেরো

wapsip.com

মিনিটের মধ্যেই ধন্‌ঝরির উপত্যকার সমতল ভূমিতে পা দিলাম।

তখন আমার মনে সাহস বেড়ে গিয়েচে। গুরুতর দুর্ঘটনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সমতল ভূমিতে কোন বিপদই আর আমার কাছে বিপদ নয়। তখন রাত আন্দাজ দশটা হবে মনে হল। জ্যোৎস্না খুব ফুটেচে, বনের মধ্যে আগের মতো অত অন্ধকার নেই। প্রথমে সেই পার্বত্য নদীর ধারে এসে পৌছলাম তার জলের কলধ্বনি শুনে। জল পান করে ও মাথায় মুখে জল দিয়ে শরীর ও মন সুস্থ হল। মনে তখন ভয় বা উদ্বেগ আদৌ নেই। সুতরাং ধীর মস্তিষ্ক নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে সেই সুঁড়িপথটা প্রায় আধঘণ্টা পরে বার করলাম।

কুলামাড়ো যখন এসে পৌঁছেচি তখন রাত বারোটার কম নয়। গ্রাম নিষুতি হয়ে গেছে বহুক্ষণ; আমায় দেখে গ্রাম্য কুকুরের দল মহা ঘেউ ঘেউ শুরু করলে। একটা ঘরের দাওয়ায় লোকেরা শুয়েছিল, কুকুরের ডাক শুনে তারা জাগলো। আমায় দেখে তারা খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমায় বনের মধ্যে যেতে দেখেছিল দুপুরের পরে—বললে, "খুব বেঁচে গিয়েছিস বাবু। শঙ্খচূড় সাপের সামনে পড়লে আর বাঁচতিস না। ধন্‌ঝরির বনে বড্ড শঙ্খচূড় সাপের ভয়।"

রাতটা সে গ্রামে কাটিয়ে সকালের দিকে সুবর্ণরেখা পার হয়ে গালুডিতে ফিরে এলাম।

গঙ্গাধরের বিপদ

অনেকদিন আগেকার কথা। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে। সে সময় মসলাপোস্তায় গঙ্গাধর কুণ্ডুর ছোটখাটো একখানা মসলার দোকান।

গঙ্গাধরের দেশ হুগলি জেলা, চাঁপাডাঙ্গার কাছে। অনেকদিনের দোকান, যে সময়ের কথা বলচি গঙ্গাধরের বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু শরীরটা তার ভালো যাচ্ছিল না। নানারকম অসুখে ভুগতো প্রায়ই। তার ওপর ব্যবসায়ে কিছু লোকসান দিয়ে লোকটা একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। দোকান-ঘরের ভাড়া দু-মাসের বাকি, মহাজনদের দেনা ঘাড়ে—দুপুর বেলা দোকানে বসে থেলো হুঁকো হাতে নিয়ে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। আজ আবার সন্ধ্যের সময় গোমস্তা ভাড়া নিতে আসবে বলে শাসিয়ে গিয়েচে। কি বলা যায় তাকে!

এক পুরোনো পরিচিত মহাজনের কথা তার মনে পড়ে গেল। তার নাম খোদাদাদ খাঁ, পেশোয়ারী মুসলমান, মেটেবুরুজে থাকে। আগে গঙ্গাধরের লেনদেন ছিল তার সঙ্গে। কয়েকবার টাকা নিয়েচে, শোধও করেচে, কিন্তু সুদের হার বড় বেশি বলে ইদানিং বছর কয়েক গঙ্গাধর সেদিকে যায় নি।

ভেবেচিন্তে সে মেটেবুরুজেই রওনা হল। সুদ বেশি বলে আর উপায় কি? টাকা না আনলেই নয় আজ সন্ধ্যের মধ্যে।

মেটেবুরুজে গিয়ে খোদাদাদ খাঁয়ের নতুন বাসা খুঁজে বার করতে, টাকা নিতে দেরি হয়ে গেল। খিদিরপুরের কাটিগঙ্গা পার হয়ে এসে ট্রাম ধরবে, হনহন করে হেঁটে আসচে—এমন সময়ে একজন লোক তাকে ডেকে বললে, "এ সাহেব, ইধার শুনিয়ে তো জরা..."

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েচে। যেখান থেকে লোকটা তাকে ডাকলে সেখানে কতকগুলো

wapsip.com

গাছপালার বেশ একটু অন্ধকার। স্থানটা নির্জন, তার ওপর আবার তার সঙ্গে রয়েচে টাকা। গঙ্গাধরের মনে একটু সন্দেহ যে না হল এমন নয়। কিন্তু উপায় নেই, লোকটা এগিয়ে এল। ওই গাছগুলোর তলায়—সে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

লোকটা খুব লম্বা, মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঘাড়ের ওপর পড়েচে, মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। পরনে ঢিলে ইজের ও আলখাল্লা। সে কাছে এসে সুর নিচু করে হিন্দীতে ও ভাঙা বাংলায় মিলিয়ে বললে, "বাবু, সস্তায় মাল কিনবেন?"

গঙ্গাধর আশ্চর্য হয়ে বললে, "কি মাল?"

লোকটা চারিদিকে চেয়ে বললে, "এখানে কথা হবে না বাবু, পুলিশ ঘুরচে, আমার সঙ্গে আসুন..."

ঝুপ্সি গাছের তলায় এক জায়গায় অন্ধকার খুব ঘন। সেখানে গিয়ে লোকটা বললে, "জিনিসটা কোকেন। খুব সস্তায় পাবেন। ডিউটি-ছুট মাল—লুকিয়ে দেবো!"

গঙ্গাধর চমকে উঠলো।

সে কখনও ও ব্যবসা করে নি। ডিউটি-ছুট কোকেন—কি সর্বনেশে জিনিস! ভালো লোকের পাল্লায় সে পড়েচে! না—সে কিনবে না।

লোকটা সম্ভবত পাঞ্জাবী মুসলমান। বাংলা বলতে পারে—তবে বেশ একটু বাঁকা। অনুনয়ের সুরে বললে, "বাবু আপনি নিন। আপনার ভালো হবে। সিকি কড়িতে দেবো...আমার মুশকিল হয়েচে আমি মাল বিক্রির লোক খুঁজে পাচ্ছিনে। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি কত জায়গায়—আবার সব জায়গায় তো যেতে পারিনে, পুলিশের ভয় তো আছে? কেউ কথা কইচে না আমার সঙ্গে; সেই হয়েচে আরও মুশকিল। হঠাৎ শহরে এত পুলিশের ভয় হল যে কেন বাবু তা বুঝিনে। আগে যারা এ-ব্যবসা করতো, তাদের কাছে যাচ্ছি, তারা আমার দিকে চেয়েও দেখচে না। ...আপনি গররাজি হবেন না বাবু—মাল দেখুন পরে দামদস্তুর হবে..."

লোকটার গলার সুরে একটা কি শক্তি ছিল, গঙ্গাধরের মন খানিকটা ভিজলো। কোকেনের ব্যবসাতে মানুষ রাতরাতি বড় লোক হয়েচে বটে। বিনা সাহসে, বিপদ এড়িয়ে চলে বেড়ালে কি লক্ষ্মীলাভ হয়? দেখাই যাক না।

হঠাৎ গঙ্গাধর চেয়ে দেখলে যে লোকটা নেই সেখানে। এই তো দাঁড়িয়েছিল, কোথায় গেল আবার? পাছে কেউ শোনে এই ভয়ে বেশি জোরে ডাকতেও পারলে না। চাপা গলায় বাঙালী-হিন্দীতে ডাকলে, " কোথায় গিয়া, ও খাঁ সাহেব?"

এদিকে ওদিকে চাওয়ার পর সামনে চাইতেই দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লাধারী খাঁসাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। গঙ্গাধর বললে, "জলদি চলো, অনেক দূর যানে হোগা।"

কি একটা যেন ঢাকবার জন্যে লোকটি প্রাণপণে চেষ্টা করচে। "আমার সঙ্গে এসো, মাল দেখাবো।"

দুজনে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে অনেক দূর গেল। যে সময়ের কথা বলচি, তখন ওদিকে অত লোকজন ছিল না। মাঝে মাঝে জোয়ার নেমে যাওয়াতে বড় বড় ভড় ও নৌকো কাদার ওপর পড়ে আছে, দু-একটা করাতের কারখানা, তাও দূরে দূরে—জলের ধারে নোনা চাঁদাকাঁটার বন, পেছনে অনেক দূরে খিদিরপুর বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে।

পথে যেতে যেতে খাঁসাহেব একটা বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। গঙ্গাধরের দিকে চেয়ে বললে, "আমায় দেখতে পাচ্ছ তো?..."

"কেন পাবো না? এমন বয়েস এখনও হয়নি যে এই সন্ধ্যে-বেলাতেই চোখে ঠাওর

wapsip.com

হবে না।”

একবার গঙ্গাধর জিজ্ঞেস করলে, “তোমার ডেরা কোথায়, খাঁসাহেব?”

লোকটা চকিতে পেছনে ফিরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, “কেন, সে তোমার কি দরকার? পুলিশে ধরিয়ে দেবে ভেবে থাকো যদি, তবে ভালো হবে না জেনো। মাল দেবো, তুমি টাকা দেবে—মাল নিয়ে চলে যাবে,—আমার বাসার খোঁজে তোমার কি কাজ?”

লোকটার চোখের চাউনি অদ্ভুত! গঙ্গাধর অস্বস্তি বোধ করলো; খুব ভালো দেখা যায় না, কিন্তু ওর দুই চোখে যেন ইস্পাতের ছুরি ঝলসে উঠলো। না, তার সঙ্গে টাকা রয়েচে—এ-অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে একা এই সন্ধ্যেবেলাতে সে এতদূর এসে পড়েচে? লোভে মানুষের জ্ঞান থাকে না—তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু যখন এসেইচে, তখন আর চারা নেই। বিশেষত, সে যে ভয় পেয়েচে এটা না-দেখানোই ভালো। দেখালে বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বই কমবে না! ছুরি বার করে বসলে তখন আর উপায় থাকবে না।

অনেকদূর গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গুদামঘর। একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, গুদামঘরের দরজা থেকে একটু দূরে। তার ওপর গঙ্গাধরকে বসতে বলে লোকটা কোথায় চলে গেল। গঙ্গাধর বসে চারিধারে চেয়ে দেখলে গুদামঘরের আশেপাশে সর্বত্র আগাছার অনুচ্চ জঙ্গল, নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

অন্ধকার হলেও মাঠের মধ্যে বলে অন্ধকার তত ঘন নয়; সেই পাতলা অন্ধকারে চেয়ে দেখে গঙ্গাধরের মনে হল গুদামঘরটা পুরোনো এবং যেন অনেককাল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। বাঁশের বেড়া খসে পড়েচে জায়গায় জায়গায়, চালের খোলা উড়ে গিয়েচে মাঝে মাঝে, সামনের দোরটা উই-ধরা, ভেঙে পড়তে চাইচে যেন।...

গঙ্গাধরের কেমন একটা ভয় হল। কেন সে এখানে এল এই সন্ধ্যায়? এরকম জায়গায় একা মানুষে আসে, বিশেষ করে এতগুলো টাকা সঙ্গে করে? সে আসতো না কখনই, সে কলকাতায় আজ নতুন নয়, তার ওপরে ঝুনো ব্যবসাদার, বাঙাল দেশ থেকে নতুন আসে নি। ওই লোকটির কথার সুরে কি জাদু আছে, গঙ্গাধরকে যেন টেনে এনেচে, সাধ্য ছিল না যে সে এড়ায়! একথা এখন তার মনে হল।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে খাঁসাহেবের মূর্তি দেখা গেল। লোকটার যাওয়া-আসা এমন নিঃশব্দ ও এমন অদ্ভুত ধরনের, যেন মনে হয় অন্ধকারে ওর চেহারা মিলিয়ে গিয়েছিল, আবার ফুটে বেরুলো। কোথাও যে চলে গিয়েছিল এমন মনে হয় না। পাকা আর ঝুনো খেলোয়াড় আর কি!

খাঁ সাহেব দোর খুলে গুদামঘরে ঢুকলে। গঙ্গাধরকেও যখন পেছনে আসতে বললে তখন ভয়ে গঙ্গাধরের হাত-পা ঝিমঝিম করচে, বুক ঢিপঢিপ করচে। এই অন্ধকার গুদাম ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠিক ও লোকটা ওর ওই লম্বা হাতে গলা টিপে ধরবে কিংবা ছুরি বুকে বসাবে—সেই ফন্দিতে এতদূর ভুলিয়ে এনেচে। লোকটা নিশ্চয়ই জানতো যে তার কাছে টাকা আছে, অনুসন্ধান রেখেছিল। কে জানে খোদাদাদ খাঁয়ের দলের লোক কিনা? গঙ্গাধরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলে। একবার সে ভাবলে, দৌড়ে পালাবে? কিন্তু সে বুড়ো মানুষ, এই জোয়ান পাঞ্জাবী মুসলমানের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তার পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

কলের পুতুলের মতো গঙ্গাধর গুদামঘরের মধ্যে ঢুকল। আশ্চর্য! গুদামের ওদিকের

wapsip.com

দেওয়ালটা যে একেবারে ভাঙা! গুদামের সর্বত্র দেখা যাচ্ছে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে। এক জায়গায় দুটো খালি পিপে ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মাকড়সার জাল সর্বত্র, অন্ধকারে দেখা যায় না বটে, কিন্তু নাকে মুখে লাগে। একটা কি রকম ভ্যাপ্‌সা গন্ধ গুদামের মধ্যে, মেজেটা স্যাঁতসেতে, কতকাল এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকে নি।

এদিকে আবার খাঁসাহেব কোথায় গেল? লোকটা থাকে থাকে যায় কোথায়?

অল্পক্ষণ···মিনিট দুই হবে, কেউ কোথাও নেই, শুধু গঙ্গাধর একলা···আবার সেই ভয়টা হল। কেমন এক ধরনের ভয়···যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। এই বা কি রকম ভয়? আর গুদামঘরটার মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন একটা স্রোত বইচে মাঝে মাঝে।

মিনিট-দুই পরেই খাঁসাহেব—এই তো আধ অন্ধকারের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়ে।···

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বললে খাঁসাহেব। বললে, "তুমি কালা নাকি? এতক্ষণ কথা বলচি, শুনতে পাচ্ছ না? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? কোকেন যে জায়গায় আছে বললাম, তা দেখতে পেয়েচ? শাবলের চাড় দিয়ে তুলতে বললাম পিপে দুটো। হাঁ করে সঙের মতো দাঁড়িয়ে কেন?"

বা রে! এত কথা কখন বলেচে লোকটা? পাগল নাকি? গঙ্গাধর কেবল ভ্যাবাচাকা হয়ে গিয়েছে, মূঢ়ের মতো দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "কখন তুমি দেখালে কোকেনের জায়গা—কই কোথায় শাবল?"···

কথা বলতে বলতে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ খাঁসাহেবের মুখের দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল তার বিভ্রান্ত, বিমূঢ়, আতঙ্কাকুল দৃষ্টির সামনে খাঁসাহেবের মুখ, গলা, বুক, হাত-পা, সারা দেহটা যেন চুরচুর হয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়চে···সব যেন ভেঙে বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে···খাঁসাহেব প্রাণপণে দাঁতমুখ খামুটি করে বিষম মনের জোরে তার দেহের চূর্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধরে রাখবার জন্যে চেষ্টা করচে! কিন্তু পেরে উঠচে না···সব ভেঙে গেল গুঁড়িয়ে গেল, উড়ে গেল···এক···দুই···তিন···চার···

আর কোথায় খাঁসাহেব? চারিপাশের অন্ধকারের মধ্যে সে মিশিয়ে গিয়েচে ···একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের ঝাপটা এল কোথা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর আর্তরবে চীৎকার করে গুদামঘরের স্যাঁতসেতে মেঝের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

একটা দেশী ভড় কাছে কোথায় বাঁধা ছিল, তার মাঝিরা এসে গঙ্গাধরকে অচেতন অবস্থায় তাদের ভড়ে নিয়ে যায়। তারাই তাকে দোকানে পৌঁছে দেয়। গঙ্গাধরের টাকা ঠিক ছিল, কানাকড়িও খোয়া যায় নি। তবে শরীর শুধরে উঠতে সময় নিয়েছিল, অনেকদিন পর্যন্ত অন্ধকারে সে একা কিছুতেই থাকতে পারতো না।

মাস দুই পরে মেটেবুরুজে খোদাদাদ খাঁর কাছে টাকা শোধ দিতে গিয়ে গঙ্গাধর টাকা নিয়ে যাবার দিন কি ঘটনা ঘটেছিল সেটা বললে। খোদাদাদ খাঁ গল্প শুনে গম্ভীর হয়ে গেল!

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "সাহ্‌জী, ও হল আমীর খাঁ। চোরাই কোকেনের খুব বড় ব্যবসাদার ছিল। আজ বছর পনেরো আগেকার কথা, রমজান মাসে বেশ কিছু মাল হাতে পায়। তক্তাঘাটের কাছে একখানা জাহাজ ভিড়েছিল, সেখান থেকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলে, জাহাজের লোকের সঙ্গে সড় ছিল। কোথায় সে মাল রাখতো কেউ জানে না। সেই মাসের মাঝামাঝি সে খুন হয়। কে বা কেন খুন করলে জানা যায় নি, কেউ ধরা পড়ে নি। তবে দলের লোকই তাকে খুন করেছিল এটা বোঝা কঠিন নয়। এই পর্যন্ত আমীর খাঁর ঘটনা আমি জানি। আমার মনে হয় আমীর খাঁ সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মাল বিক্রি করবার

wapsip.com

জন্যে, ওর পুরোনো কোকেনের বাক্স হয়েছে দোজখের বোঝা।...তা বাবু, সে গুদাম ঘরটা কোথায় তুমি দেখাতে পারবে?"

গঙ্গাধর অন্ধকারে কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে সেখানে গিয়েছিল তা তার মনে নেই, মনে থাকলেও সে যেত না।

পথে আসতে আসতে গঙ্গাধরের মনে পড়লো, পুরোনো ভাঙা গুদামঘরটায় অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আমীর খাঁয়ের মুখের সেই হতাশ ও অমানুষিক চেষ্টা করেও হেরে যাবার দৃষ্টিটা। হতভাগ্য এতদিনেও কি বোঝে নি সে মারা গিয়েচে?...কে উত্তর দেবে? ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন।

রাজপুত্র

কাঞ্চীর রাজপুত্র এবার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। রাজ্যময় ধুমধাম পড়ে গেছে। কাঞ্চীর উত্তর প্রান্তে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুমন্দির। পুরোহিত গেছেন সেখানকার আশীর্বাদ নির্মাল্য আনতে, লোক পাঠান হয়েচে প্রয়াগতীর্থ থেকে জল আনবার জন্যে। সেই জলে স্নান করিয়ে বিষ্ণুর পূজা-নির্মাল্য তাঁর কপালে ঠেকিয়ে রাজপুত্রকে পুরনারীরা বরণ করবেন।

রাজা বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করেচেন। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। কোশলরাজের দূত কি এক প্রস্তাব নিয়ে এসেচে, রাজা তাই আজ সারাদিন ধরে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন—শরীর ও মন দুই-ই বড় ক্লান্ত। এমন সময়ে রাজকুমার কক্ষে ঢুকে পিতাকে প্রণাম করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা বললেন, "চন্দ্রসেন, তোমার কিছু বলবার আছে?"

রাজপুত্র বিনীত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, "বাবা, গত বছর যখন গুরুগৃহ থেকে ফিরে আসি তখন আপনি বলেছিলেন আমায় কিছুদিন দেশভ্রমণে যাবার অনুমতি দেবেন। আপনার অসুখের জন্যে এতদিন কোন কথা বলি নি। আমি এইবার সে বিষয়ে অনুমতি চাই।"

মহারাজ বিস্মিতসুরে বললেন, "কি বিষয়ে অনুমতি চাই বলো?"

"আমি দেশভ্রমণে যেতে চাই বাবা।"

"তুমি জানো তোমার যৌবরাজ্যের অভিষেকের সব আয়োজন করা হয়েচে?"

"সেই জন্যেই তো আরও বেশি করে যেতে চাই, বাবা। আমি কাঞ্চী ছাড়া জীবনে কখনও কিছু দেখলুম না, কিছু জানলুম না,—কানে শুনেচি উত্তরে হিমবান পর্বত আছে, দক্ষিণে সমুদ্র আছে, পশ্চিমে সিন্ধুনদ আছে—কাঞ্চী ছাড়াও আরও কত রাজ্যদেশ আছে, কিন্তু উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সে আমি চোখ থেকেও অন্ধ। যার জীবনে কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তাকে দিয়ে দেশ-শাসন কি করে হবে! আমায় যেতে দিন বাবা!"

এর দুদিন পরে রাজ্যের লোক সবিস্ময়ে শুনলে রাজকুমার চন্দ্রসেনের অভিষেক-উৎসব সম্প্রতি স্থগিত থাকলো—কারণ তিনি চলেচেন বিদেশ ভ্রমণে—একা, সঙ্গে তিনি কাউকে নিতে রাজী নন।

সত্যিই রাজকুমার কউকে সঙ্গে নেন নি।

আজ সপ্তাহ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, চন্দ্রসেন তাঁর প্রিয়-সাদা ঘোড়াটিতে চড়ে একা পথ চলেচেন। আর সঙ্গে থাকবার মধ্যে বাঁদিকে খাপে-ঝোলানো পিতৃ-দত্ত তলোয়ারখানি। আর আছে চোখে অসীম তৃষ্ণা, বুকে অদম্য সাহস ও নির্ভীকতা। কাঞ্চী রাজ্যের সীমা ছাড়িয়েও দুদিনের পথ চলে এসেচেন, কত গ্রাম, মাঠ, বন, নদী পার হয়ে চলেচেন—সবই অচেনা, এ

wapsip.com

তাঁর নিজের রাজ্য কাঞ্চী নয়, এখানে তিনি একজন অজানা পথিক মাত্র।

তখনও সূর্য অস্ত যায় নি। এক নদীর ধারে তার ঘোড়া এসে পৌঁছুলো তাঁকে নিয়ে। প্রকাণ্ড নদী—বৈকালের রাঙা আলোয় ওপারের বনরেখা অপূর্ব দেখাচ্ছে। অতবড় নদী কি করে পার হবেন, রাজকুমার চিন্তায় পড়লেন। কোনদিকে মানুষের বাসের চিহ্ন নেই—সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে ধূসর হয়ে এল। বিজন নদী—তীরের ছন্নছাড়া চেহারাটা সুমুখ আঁধার রাতে গাঢ় ছায়ায় যেন আরও বেশি ছন্নছাড়া হয়ে ফুটে উঠলো।

ওপারে বহু দূরে একটা পাহাড়—নীল চূড়া একটু একটু চোখে পড়ে। রাজকুমার চেয়ে থাকতে থাকতে পাহাড়ের ওপর থেকে আগুনের রাঙা একটা হল্‌কা হঠাৎ আকাশের পানে লক্ লক্ করে জ্বলে উঠেই দপ্ করে নিবে গেল। রাজপুত্র অবাক হয়ে সেদিকে চেয়েই আছেন এমন সময়ে একটা প্রকাণ্ড বাজপক্ষী সন্ধ্যার আকাশে ডানা মেলে নদীর উজান দিক থেকে উড়ে এসে তাঁর মাথার ওপর তিন চার বার চক্রাকারে ঘুরে আবার কোন্‌দিকে অদৃশ্য হোল।

রাজকুমারের নির্ভীক মনও একটুখানি কেঁপে উঠলো। তিনি জানতেন, তাঁদের বংশে কারুর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মাথার ওপর গৃধ্রজাতীয় পাখি তিনবার ওড়ে—কেউ কেউ বলেচেন, বিশেষ করে শাকুন-শাস্ত্রবিৎ কোন গণৎকার সেবার বলেছিলেন যে এই গৃধ্র তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের হাতে অন্যায়ভাবে অবিচারে নিহত কোনো শত্রুর আত্মা—বহুকাল ধরে সে পৈশাচিক উল্লাসের সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যায় নিজ শত্রুর বংশধরের মৃত্যুর পূর্বাভাস। কোথা থেকে আসে, কোথায় আবার উড়ে চলে যায়—কেউ বলতে পারে না।

রাতের সঙ্গে সঙ্গে এল হাড়কাঁপুনি ধারালো শীত। একটা বড় গাছও কোথাও নেই যার তলায় আশ্রয় নিতে পারেন। অবশেষে একটা মাটির ঢিপির পেছনে ঘোড়া থেকে নেমে রাজপুত্র নিজের আসন বিছালেন—সেখানটাতে হাওয়া বেশি লাগে না—শুকনো লতাকাঠি কুড়িয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করে সে রাত্রের মতো তিনি সেখানেই রইলেন। উপায় কি?

গভীর রাত্রে রাজপুত্রের ঘুম ভেঙে গেল! বহুদূরে যেন কাদের আর্তনাদ—মৃত্যু-পথের পথিকদের অন্তিম চিৎকারের মতো করুণ। রাজপুত্র নিজের অলক্ষিতে একবার শিউরে উঠলেন। শয্যার পাশের আগুন নিবে গিয়েচে, উঠে আগুন ভালো করে জ্বাললেন। সারারাত্রির মধ্যে ঘুম আর এল না কিন্তু।

ভোরের দিকে একটা ডিঙি পাওয়া গেল। তাতে পার হয়ে রাজকুমার ওপারে গিয়ে উঠলেন। ডিঙির মাঝি আধ-পাগল এবং বোধ হয় কানে আদৌ শুনতে পায় না। রাজকুমারের প্রশ্নের কোন উত্তর সে দিতে পারলো না!

প্রথমে একটা মরুভূমির মতো মাঠ—ঘাস, খড়, গাছপালা কিছুই নেই—কটা রঙের বালির পাহাড় এখানে-ওখানে। অনেক দূরে গিয়ে একটা জনপদ। কিন্তু কেমন একটা নিরানন্দ ভাব চারদিকে। পথ দিয়ে পথিক চলে না, দোকান-পসারে খদ্দের নেই, নদীর ঘাটে স্নানার্থীর দল নেই, মাঠে চাষারা চাষ করে না—যেন কেমন একটা বিষাদ ও অমঙ্গলের ছায়া চারিদিকে।

রাজকুমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বড় কাতর হয়েছিলেন। নিকটেই একটি গৃহস্থের বাড়ি। সেখানে গিয়ে আশ্রয় চাইতেই তারা খুব যত্নের সঙ্গে আশ্রয় দিলে। অনেকদিন পরে রাজকুমার ভালো খাবার খেলেন, ভালো বিছানায় বিশ্রাম করতে পেলেন, মানুষের সঙ্গ অনেকদিন পরে বড় প্রিয় মনে হল। কয়েকদিন সেখানে রয়ে গেলেন তিনি। গৃহস্থের একটি

wapsip.com

ছোট মেয়ে ও ছোট ছেলের সঙ্গে রাজকুমারের বড় ভাব হল। তারা তাঁকে ফুল তুলে মালা গেঁথে দেয়, দুপুরে তাঁর কাছে বসে গল্প শোনে, তাদের শত আবদার প্রতিদিন তাঁকে সহ্য করতে হয়। ছোট ছেলেটির উপদ্রবের তো আর অন্ত নেই।

অল্পদিনের মধ্যে রাজকুমার সে বাড়ির সবারই তো বটেই, গ্রামেরও সকল লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলেন। এত সুন্দর মুখশ্রী, এমন সুন্দর কান্তি, এমন মিষ্টি স্বভাবের মানুষ তারা কখনও দেখে নি। রাজকুমারের আসল পরিচয় কেউ জানে না। তিনি কাউকে সে সব কথা বলেন নি—সবাই ভাবে তিনি একজন গৃহহীন পথিক—হয়তো তাঁর কেউ কোথাও নেই। এতে সবারই স্নেহ তাঁর ওপর আরও বেড়ে যায়, কিসে তিনি সুখে থাকবেন কিসে আত্মীয়হীন নিঃসঙ্গ প্রবাস-কষ্ট তাঁর কমবে—সবারই এ চেষ্টা।

তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, এমন সুন্দর চেহারার ছেলে নিশ্চয়ই কোন বড় ঘরের হবে। গ্রামের যিনি মণ্ডল, তাঁর এক মেয়ে পরমাসুন্দরী—সবাই বলে ওই ছেলেই এ মেয়ের উপযুক্ত হবে। বিধাতা ওর জন্যেই যেন এ দেবতার মতো সৌম্যকান্তি ছেলেটিকে কোথা থেকে জুটিয়ে এনেচেন। মণ্ডলগৃহিণীও রাজকুমারকে একদিন দূর থেকে দেখে এত পছন্দ করলেন যে তিনি স্বামীকে জানিয়ে দিলেন যদি ঐ ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয় ভালোই—নইলে মেয়ে চিরকুমারী থাকুক, তাঁর আপত্তি নেই।

রাজকুমার কিন্তু কিছুতেই তেমন আমোদ পান না। তাঁর মনে কি একটা বিপদের ছায়া সকল আনন্দকে ম্লান করে রাখে। একবার ভাবেন হয়তো বাপ-মাকে অনেকদিন দেখেন নি বলে এমন হয়—কিন্তু তাঁর মন বলে তা নয়, তা নয়,—ওসব সামান্য সুখ-দুঃখের ব্যাপার এ নয়—এ এমন একটা কিছু, যার কারণ আরও গভীর, জীবন-মরণ নিয়ে এর কারবার।

ক্রমে এল সে মাসের কৃষ্ণপক্ষ। রাজকুমার অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন বাড়িতে সবারই চোখে জল—গ্রামসুদ্ধ লোক সকলে বিষণ্ণ, নিরানন্দ। কিন্তু কেউ কোনও কথা বলে না, কারণ, জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর পাওয়া যায় না! সবাই কিসের ভয়ে জুজু হয়ে আছে যেন।

অবশেষে রাজকুমার কথাটা শুনলেন। এখান থেকে এক যোজন দূরে গৃধ্রকূট পাহাড়ের ওপর রাজগুরু এক কাপালিকের সাধন-পীঠ। প্রতি অমাবস্যায় সেখানে নরবলির জন্য প্রতি গ্রাম থেকে পালাক্রমে একটি তরুণ বয়স্ক লোক পাঠানো চাই-ই। রাজার হুকুম। এবার এ গ্রামের পালা।

শোনা মাত্র রাজকুমার কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। তাঁর পিতৃদত্ত তূণের তীক্ষ্ণ ইস্পাতের ফলা-পরানো যে বাণ, তা কি শুধু নিরীহ পশুপক্ষী শিকারের জন্যে?

"ক্ষতি হতে ত্রাণ করে এই সে কারণ—মহান ক্ষত্রিয় নাম বিদিত জগতে।"—অস্ত্রগুরুর সে উপদেশ রাজকুমার কি ভুলে গিয়েচেন এত শীগ্‌গির!

অমাবস্যার দিন মণ্ডলের বাড়িতে পাশার সাহায্যে নির্ধারিত হবে এবার কে গ্রাম থেকে যাবে। রাজকুমার এ-কথা শুনলেন। অমাবস্যার পূর্বদিন গভীর রাত্রের অন্ধকারে তিনি চুপি চুপি শয্যাত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন—কেউ জানে না। সকালে উঠে তাঁকে আর কেউ দেখতে পেলে না।

মণ্ডলের বাড়িতে পাশার মজলিসে যার নাম উঠল সে গৃহস্থের একমাত্র পুত্র। সবাই চোখের জলে ভেসে তাকে বিদায় দিলে। তার বৃদ্ধ পিতা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চললো কাপালিকের কাছে—যদি হাতে পায়ে ধরে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে পারে এই দুরাশায়।

wapsip.com

গৃধ্রকূট পর্বতের পাদদেশে গিয়ে তারা যা দেখলে, তাতে তারা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল। বড় জামগাছটার তলায় দুটো মৃতদেহ একটা তাদের গ্রামের সেই তরুণ অতিথির, আর একটা কাপালিকের—দেখে মনে হয় দুজনেই পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করেচে। দলে দলে স্ত্রীপুরুষ সবাই ছুটে এল দেখতে। যে নিজের প্রাণ দিয়ে তাদের চিরকালের জন্যে বিপদমুক্ত করে গেল—রাজার ভয়ে গোপনে চোখের জলে ভেসে তার শেষ সৎকার সম্পন্ন করলে।

রাজকুমারের সত্যিকার পরিচয় সে দেশের লোক তখনও জানে নি।

চাউল

মানভূমের টাঁড় ও জঙ্গল জায়গা। একটু দূরে বড় পাহাড়শ্রেণী, অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বসন্তকালের শেষ, পলাশ ফুল বনে আগুন লাগিয়ে দিয়েচে, নাকটিটাঁড়েয় উঁচু ডাঙা জমি থেকে যতদূর দেখা যায়, শুধু রক্তপলাশের বন দূরে নীল শৈলমালার কোল ছুঁয়েচে।

জঙ্গল দেখতে এসেচি এদিকে, কাছেই রাস্তার ধারে পলাশবনের প্রান্তে ডাকবাংলোতে থাকি, জঙ্গলের কাঠে কেমন আয় হবে তাই দেখে বেড়াই। একদিন সন্ধ্যের আগে নাকটিটাঁড়ের বন দেখে ফিরচি, পথের ধারে একটা হরিতকী গাছের তলায় একটি লোক ও একটি ছোট মেয়ে বসে পুঁটুলি খুলে কি খাচ্ছে। জনহীন পথিপার্শ্ব, কেউ কোনদিকে নেই—সন্ধ্যেরও আর অল্পই বিলম্ব, সামনে বাঘমুণ্ডীর বনময় পথ, এমন সময়ে লোকটা কি করে জানবার আগ্রহে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটার চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। মাথার চুল কিছু পাকা, কিছু কাঁচা। পুঁটুলির মধ্যে খানদুই ছেঁড়া নেকড়া, একখানা কাঁথা আর কিছু মকাই—সের দুই হবে, একটা খালি চায়ের কিংবা বিস্কুটের টিন। বোধ হয় সেটাই তৈজসপত্রের অভাব পূর্ণ করচে সব দিক দিয়ে। সঙ্গের মেয়েটির বয়েস চার কি পাঁচ। পরনে ছোট্ট একটু ময়লা নেকড়া মেয়েটার, কোমরে ঘুন্সি।

আমি বললাম, "কোথায় যাবে হে, বাড়ি কোথায়?"

লোকটি মানভূমি বাংলায় বললে, "তোড়াং হে···টুকু আগুন আছে?"

"দেশলাই? আছে, দিচ্ছি।···তোড়াং কতদূর এখান থেকে?"

টুকু দূর আছে বটে। পাঁচ কোশ হবেক।"

কোথা থেকে আসা হচ্ছে এমন সন্ধ্যেবেলা?"

"হেই সেই পুরুলিয়া থিকে। ···আগুন দাও বাবু। শোরিল এক্কেবারে কাবু হয়ে গিয়েছে। হেই মেয়েটার মা মরে গেল ওর দু'বছর বয়সে। ওকে রেখে জঙ্গলে কাঠের নাম করতে যাইতে পারি নাই—তাই পুরুলিয়া গেইছিলি। ভিক্ষা মাঙি দু'বছর রঁইয়েছিলি।"

লোকটির কথাবার্তার ধরন আমাকে আকৃষ্ট করলে। ডাক-বাংলোতে সন্ধ্যার সময়ে ফিরেই বা কি হবে এখন? সেখানেও সঙ্গীহীন ঘর-দোর। তার চেয়ে একটু গল্প করা যাক এর সঙ্গে। কাছে একটা বড় পাথর পড়েছিল, সেটার ওপর বসে ওকে একটা বিড়ি দিলাম। নিজেও একটা ধরালাম। লোকটার বাড়ি নাকি পাঁচ-ছ' ক্রোশ দূরবর্তী একটি ক্ষুদ্র বন্য গ্রামে, বাঘমুণ্ডী ও ঝালদা শৈলমালা ও অরণ্যের মধ্যবর্তী কোন নিভৃত ছায়াগহন উপত্যকাভূমিতে, পলাশ, মহুয়া, বট, কেঁদ গাছের তলায়। ওর আর দুটি সন্তান হয়ে মারা যাওয়ার পরে এই মেয়েটি হয়

wapsip.com

এবং মেয়েটির বয়স যখন দু'বছর, তখন ওর মাও হল মৃত্যুপথযাত্রী। লোকটা জঙ্গলের কাঠ ভেঙে এনে চন্দনকিয়ারীর হাটে বিক্রি করতো এদেশের অনেক গ্রাম্যলোকের মতো। কিন্তু ঘরে কেউ নেই দু'ছরের মেয়েকে দেখবার, তাকে সঙ্গে নিয়ে উচ্চ পাহাড়ে উঠে রৌদ্র ও বর্ষায় কি করে কাঠ ভাঙে? তাই ঘরে আগড় বন্ধ করে ও চলে গিয়েছিস অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় পুরুলিয়া শহরে।

আমি বললাম, "কাঠের কাজে আয় হত কেমন?"

লোকটা বিড়িতে টান দিয়ে বললে, "বোঝা পিছু তিন আনা, চার আনা। জঙ্গলে ছাড় লিত দু'পয়সা। চাল বস্তা ছিলি। হইয়ে যেতো পেটের ভাত দু'জনার। তারপর বাবু মেয়্যাটা হোলেক্, ওর মা মর্যা গেলেক্। তখন কচি মেয়্যাটারে ফেলে জঙ্গলে যেতে মন নাই সরলেক্। বলি যাই পুরুলিয়া, ভারি শহর, পেটের ভাত দু'জনার হইয়ে যাবেক।"

"পুরুলিয়া বড় জায়গা?"

"ওঃ বাবু, ইধার থিকে উধার যাওয়ার কূল-কিনারা দু'বছরে নাই পাইলেক্। ভারি শহর বাবু..." আমি ওকে আর একটা বিড়ি দিলাম। গল্প জমে উঠেচে। বললাম, "তারপর...?"

তারপর পুরুলিয়া শহরে কিভাবে গেল, তার গল্প করলে। ওদের পাশের গাঁয়ের একজন লোক পুরুলিয়া শহরে কি একটা কাজ করে, তার ঠিকানা খুঁজে বার করতে দিন কেটে গেল। সন্ধ্যা হয়েছে, তখন এক বড়লোকের বাড়ির ফটকে মেয়ের হাত ধরে ভিক্ষে করতে দাঁড়ালো। তারা দুটি পয়সা দিলে, দু'পয়সার ছোলা কিনে বাপ-মেয়েতে রাত কাটিয়ে দিলে গাছতলায় শুয়ে। পুলিশে আবার শুঁতে দেয় না; অর্ধেক রাত্রে এসে লণ্ঠনের আলো ফেলে বলে, "হিঁয়াসে হঠ্ যাও!" তার পরদিন আলাপী লোকের সন্ধান মিললো। গিয়ে দেখে দেশে সে লোকটা যত বড়াই করে, আসলে সে তত বড় নয়। সামান্য একটা দু-কামরা ঘরে সে আর তার স্ত্রী থাকে—তামাক মেখে বিক্রি করে মাথায় নিয়ে, কখনও জলের কুঁজো পাইকেরি দরে কিনে ফিরি করে খুচরো বেচে—এই সব উঞ্ছবৃত্তি। অথচ দেশে বলেছিল সে বড় সাহেবের আরদালি।

যাহোক, অনেক বলা-কওয়াতে সে জায়গা একটু দিলে—ঘরের বাইরের দাওয়ার একপাশে শুয়ে থাকতে হবে, তবে নিজের এনে খাওয়া-দাওয়া, তার ভার সে নেবে না। বছর দুই সেখানেই থেকে চলেছিল যা হয় একরকম—তারপর এই অকাল পড়লো, চালের দাম চড়লো—শহরে চালের দাম হল আঠারো টাকা। ভিক্ষে আর তেমন লোক দিতে চায় না—তাও হয়তো চলতো যা হয় করে, কিন্তু যাদের বাড়িতে থাকা তারা গোলমাল করতে লাগলো। তারা আর জায়গা দিতে চায় না, বলে, "আমাদের লোক আসবে, বাড়ি ছেড়ে দাও।" রোজ গোলমাল করে, তাই আজ তিন দিন শহর থেকে বেরিয়ে জন্মভূমি তোড়াং গ্রামে চলেচে।

ছোট মেয়েটা এতক্ষণ খালি বিস্কুটের টিন হাতে করে বাজাচ্ছিল।

ওর দিকে সস্নেহদৃষ্টিতে চেয়ে লোকটা বললে, "এর নাম রেঁখেছে থুপী।"

আমি বাপের মনে আনন্দ দেবার জন্যে বললাম, "থুপী? বেশ নাম।"

বাপ সগর্বে বললে, "হাঁ, থুপী?" তারপর আমায় বললে, "বাবু, তামাক কিনবার পয়স দিবেন দুটি?"

আমি পয়সা সামান্যই নিয়ে বেড়াতে বার হয়েচি, জঙ্গলের পথে পয়সা কি করবো? ওকে দুটি মাত্র পয়সা দিতে পারলাম। থুপী কি একটা বললে ওর বাবাকে, বাবা তাকে কাঁধে

wapsip.com

নিয়ে চললো। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম—

রাস্তা যেখানে উঁচু হয়ে ওদিকের সব দৃশ্য ঢেকে দিয়েচে, সেখানে ওর পাঁচ বছরের মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে পুঁটলি বগলে ও চলেচে—সেদিকেই অস্তদিগন্ত ও সূর্যাস্ত, রঙীন আকাশের পটে ওর মূর্তি দেখাচ্ছে ছবির মতো, কারণ আগেই বলেছি রাস্তা উঁচু হওয়ার দরুন সেখানে আর কিছু দেখা যায় না, রাস্তাই সেখানে চক্রবালরেখার সৃষ্টি করেচে।

মনে মনে ভাবলাম, ওর কোথাও অন্ন নেই, গৃহ নেই—পাঁচ বছরের মেয়েকে কত স্নেহে কাঁধে তুলে ও যে চললো গ্রামের দিকে, সেখানে অন্ন কি জুটবে এ দুর্দিনে—যদি পুরুলিয়া শহরে না জুটে থাকে? কোন্ বৃথা আশার আকর্ষণ ওকে নিয়ে চলেচে গ্রামের মুখে? তার পরেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।···

এ হল গত মাসের কথা। তখনও চাল ছিল ষোল টাকা আঠারো টাকা মণ, ক্রমে তাই দাঁড়ালো বত্রিশ টাকা, চল্লিশ টাকা। এই সময় একবার কার্য উপলক্ষে বিহার থেকে আমায় যেতে হল বাংলাদেশে, পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলায়। মানুষের এমন কষ্ট কখনও চোখে দেখি নি—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হবে।

যে আত্মীয়ের বাড়ি ছিলাম তাদের বাড়িতে সন্ধ্যা থেকে কত রাত পর্যন্ত শীর্ণ, বুভুক্ষু, কঙ্কালসার বালকবালিকা, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় কালো হাঁড়ি উঁচু করে তুলে দেখিয়ে বলচে,—"একটু ফেন দিন মা, একটু ফেন!···" অনাহারে মৃত্যুর কত মর্মন্তুদ কাহিনী শুনে এলাম সারা পথ কুমিল্লা থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত—স্টীমারে, ট্রেনে।

বিহারে এসে দেখি এখানেও তাই। বহেরাগোড়া স্কুলের বোর্ডিঙে ড্রেন দিয়ে যে ভাতের ফেন গড়িয়ে পড়ে তাই ধরে খাবার জন্যে একপাল বুভুক্ষু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হাঁড়ি হাতে দুবেলা বসে থাকে—তারই জন্যে কি কাড়াকাড়ি!

হেডমাস্টার বললেন, "এই গ্রামের ডোম আর কাহারদের ছেলেমেয়ে এখানেই পড়ে আছে ভাতের ফেনের জন্যে—সকাল থেকে এসে জোটে আর সারাদিন থাকে, রাত ন'টা পর্যন্ত। সামান্য দুটো ভাতের জন্যে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে।"

পুরুলিয়া থেকে আদ্রা যাচ্ছি, প্ল্যাটফর্মের খাবারের দোকানে খাবার খেয়ে পাতা ফেলে দিয়েচে লোকে—তাই চেটে চেটে খাচ্ছে উলঙ্গ, কঙ্কালসার ছোট ছোট ছেলেরা—অথচ সে পাতায় কিছুই নেই! কি চাটছে তারাই জানে!

এই অবস্থার মধ্যে ভাদ্রমাসের শেষে আমি এলাম এমন একটা জায়গায়, যেখানে অনেক লোক খাটচে একজন বড় কন্ট্রাক্টারের অধীনে ডিনামাইট্ দিয়ে পাথর ফাটানো কাজে। জঙ্গলের মধ্যে পাথর ফাটিয়ে এরা টাটায় চালান দিচ্ছে, স্থানীয় জমিদারের কাছে থেকে নতুন ইজারা নেওয়া পাথর খাদান।

একদিন সেখানকার ছোট্ট ডাক্তারখানাটার সামনে ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। ডাক্তারখানাটার সংকীর্ণ বারান্দাতে একজন কুলি শুয়ে আছে। পিঠে ব্যান্ডেজ বাঁধা—ব্যান্ডেজ ভিজে রক্ত দরদরিয়ে পড়ে সিমেন্টের রোয়াক ভিজিয়ে দিয়েচে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েচে?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "এমন মাঝে মাঝে এক আধটা হচ্ছেই। ব্লাস্টিং করতে গিয়ে পাথর ছুটে লেগে মেরুদণ্ড একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েচে। সেলাই করে দিয়েচি, এখন টাটানগর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অ্যাম্বুলেন্স আসচে।"

ভিড় একটু সরিয়ে কাছে গিয়ে দেখি একটা পাঁচ-ছ' বছরের মেয়ে ওর কাছে একটু দূরে

wapsip.com

বসে—কিন্তু সে কাঁদেও না, কিছুই না—নির্বিকার ভাবে বসে একটা খড় তুলে মুখে দিয়ে চিবুচ্ছে।

আমি তাকে দেখেই চিনলাম—আটমাস পূর্বে মানভূমের বন্য অঞ্চলে দৃষ্ট সেই ক্ষুদ্র বালিকা থুপী!

আহত কুলির মুখ ভাল করে দেখে চিনলাম—এ সেই থুপীর বাবা, যে সগর্বে বলেছিল, "এর নাম রেখেচি থুপী।"

আশপাশের দু একজনকে জিগ্যেস করলাম, "এ কোথা থেকে এসেছিল জানো?"

একজন বললে, "মানভূম জিলা থেকে আজ্ঞে।"

"কি গাঁ?"

"তোড়াং।"

"ওর কোনো আপনার লোক এখানে নেই।"

"কে থাকবেক্ আজ্ঞে—ওর ওই বিটি ছানাটা আছে। কত কত ধুর থিক্যা এখেনে কাজ করতে এসেচে, চাল দেয় সেই জন্যে আজ্ঞে।"

"কোম্পানি কত করে চাল দেয়?"

"হপ্তায় পাঁচ সের মাথাপিছু।"

সুতরাং থুপীর বাপের ইতিহাস আমি অনেকটা অনুমান করে নিলাম। গ্রামে গিয়ে দেখলে বাড়ি ভেঙে চুরে গিয়েচে, চাল মেলে না, মিললেও ওর সামর্থ্যের বাইরের জিনিস তা কেনা। মকাই ও বিরি কলাই, তারপরে বুনো কচু ও ভুঁই-কুমড়োর মূল খেয়ে যতদিন চলবার চললো—কারণ ঠিক এই ইতিহাস আমি বিভিন্ন অঞ্চলগুলি থেকে আগত প্রত্যেক কুলির মুখেই শুনেচি—শেষে এখানে ও এসে পড়লো মজুরি, বিশেষ করে চাল পাওয়ার লোভে। পয়সা দিলেও গ্রামে আজকাল চাল মিলচে না, আমি সেদিন বহেরাগোড়া অঞ্চলে দেখে এসেচি।

অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি এল। ধরাধরি করে থুপীর বাবাকে গাড়িতে ওঠানো হল—সে কেবলমাত্র একবার যন্ত্রণাসূচক 'আঃ' শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া অত আদরের অত গর্বের বস্তু থুপীর নামও করলে না, তার দিকে ফিরেও চাইলে না।

ডাক্তার বললেন, "টাটা এখান থেকে সাতাশ মাইল রাস্তা। ঝাঁকুনিতেই বোধ হয় মারা যাবে—বিশেষ করে রক্তবন্ধ হল না যখন এখনও।"

দুধারে শালবনের মধ্যবর্তী রাঙা মরুম মাটির সোজা রাস্তা বেয়ে অ্যাম্বুলেন্সের মোটর ছুটলো থুপীর বাবাকে নিয়ে—পুনরায় অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে, পুনরায় পশ্চিমের আকাশ লক্ষ্য করে জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে। অত সাধের অনাথা থুপীকে কার কাছে রেখে চললো সে হিসেব নেবার অবসর তখন তার নেই।

wapsip.com

অপ্রকাশিত গল্প

ভূত

কি বাদামই হোত শ্রীশ পরামানিকের বাগানে। রাস্তার ধারেই বড় বাগানটা। অনেক দিনের প্রাচীন গাছপালায় ভর্তি। নিবিড় অন্ধকার বাগানের মধ্যে—দিনের বেলাতেই।

একটু দূরে আমাদের উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালা। রাখাল মাস্টারের স্কুল। একটা বড় তুঁত গাছ আছে স্কুলের প্রাঙ্গণে। সেজন্যে আমরা বলি 'তুঁততলার স্কুল।'

দুজন মাস্টার আমাদের স্কুলে। একজন হলেন হীরালাল চক্রবর্তী। স্কুলের পাশেই এঁর একটা হাঁড়ির দোকান আছে, তাই এঁর নাম 'হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার'।

মাস্টার তো নয়, সাক্ষাৎ যম। বেতের বহর দেখলে, পিলে চমকে যায় আমাদের। টিফিনের সময় মাস্টার মশায়েরা সব ঘুমুতেন। আমরা নিজের ইচ্ছেমতো মাঠে-বাগানে বেড়িয়ে ঘণ্টাখানেক পরেও এসে হয়তো দেখি তখনও মাস্টার মশায়দের ঘুম ভাঙে নি। সুতরাং তখন আমাদের টিফিন শেষ হোল না—টিফিনের মানে হচ্ছে ছুটি মাস্টার মশায়দের, ঘুমুবার ছুটি।

সেদিনও এমনি হোল।

রেল লাইন আমাদের স্কুল থেকে অনেক দূরে। আমরা মাৎলার পুল বেড়িয়ে এলাম, রেল লাইন বেড়িয়ে এলাম—ঘণ্টাখানেক পরে এসেও দেখি এখনও হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের নাক ডাকচে।

নারাণ বললে—ওরে চুপ চুপ, চেঁচাস নি, চল ততক্ষণ পরামানিকদের বাগানে বাদাম খেয়ে আসি—

আমাদের দলে সবাই মত দিলে।

আমি বললাম—বাদাম পাড়া সোজা কথা?

—তলায় কত পড়ে থাকে এ সময়—

—চল তো দেখি—

এইবার সবাই আমরা মিলে পরামানিকদের বাগানে ঢুকলাম পুলের তলার রাস্তা দিয়ে। দুপুর দুটো, রোদ ঝম্ ঝম্ করচে। শরৎকাল, রোদের তেজও খুব বেশি।

গত বর্ষায় আগাছার জঙ্গল ও কাঁটা ঝোপের বেজায় বৃদ্ধি হয়েচে বাগানের মধ্যে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সুঁড়িপথ। এখানে-ওখানে মোটা লতা গাছের ডাল থেকে নেমে নিচেকার ঝোপের মাথায় দুলচে। আমরা এ বাগানের সব অংশে যাই নি, মস্ত বড় বাগানটা। পাকা রাস্তা থেকে গিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত লম্বা।

পেয়ারাও ছিল কোনও কোনও গাছে। কিন্তু অসময়ের পেয়ারা তেমন বড় হয় নি। ফল আরও যদি কোনও রকম কিছু থাকে, খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারের দিকে চলে গেলাম। বাদাম তো মিললোই না। যা বা পাওয়া গেল, ইঁট দিয়ে ছেঁচে তার শাঁস বের করবার ধৈর্য আমার ছিল না। সুতরাং দলের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। নদীর দিকে বন বেজায় ঘন। এদিকে বড় একটা কেউ আসে না।

wapsip.com

খস্ খস্ শব্দে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে শেয়াল চলে যাচ্ছে। কুল্লো পাখি ডাকচে উঁচু তেঁতুল গাছের মাথায়। আমার যেন কেমন ভয় ভয় করচে।

আমাদের স্কুলের ছেলেরা কানে হাত দিয়ে গায়—

ঠিক দুক্‌খুর বেলা—
ভূতে মারে ঢ্যালা—
ভূতের নাম রসি
হাঁটু গেড়ে বসি—

সঙ্গে সঙ্গে তারা অমনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। এসব করলে নাকি ভূতের ভয় চলে যায়।

আমার সঙ্গে কেউ নেই—ঠিক দুপুর বেলাও বটে! মন্তরটা মুখে আউড়ে হাঁটু গেড়ে বসবো? কিন্তু ভূতের নাম রসি হোল কেন, শ্যামও হতে পারতো, কালো হতে পারতো, নিবারণ হতেই বা আপত্তি কি ছিল?

একটা বাঁক ঘুরে বড় একটা বাঁশবন আর নিবিড় ঝোপ তার তলায়।

সেখানটায় গিয়ে আমার বুকের ঢিপঢিপ শব্দ যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

একটা আমড়া গাছের তলায় ঘন ঝোপের মধ্যে আমড়া গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে বসে আছে বরো বাগদিনীই।

ভালো করে উঁকি মেরে দেখলাম। হ্যাঁ, ঠিক—বরো বাগদিনীই বটে, সর্বনাশ!

সে যে মরে গিয়েছে।

বরো বাগদিনীর বাড়ি আমাদের গাঁয়ের গোঁসাই পাড়ায়। অশত্থতলার মাঠে একখানা দোচালা কুঁড়ে ঘরে সে থাকতো, কেউ ছিল না তার। পাল মশায়ের বাড়ি ঝি-গিরি করতো অনেক দিন থেকে। তারপর তার জ্বর হয় এই পর্যন্ত জানি। একদিন তাকে আর ঘরে দেখা যায় না। মাস দুই আগের কথা।

একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেল বাঁওড়ের ধারে বাঁশবনে—শেয়াল কুকুরে তাকে খেয়ে ফেলেছে অনেকটা। সেই রকমই কালো রোগা-মতো দেহটা, বরো বাগদিনীর মতো। সকলে বললে, জ্বরের ঘোরে বাঁওড়ে জল তুলতে গিয়ে বরো গিয়েচে।

সেই বরো বাগদিনী আমড়া গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে দিব্যি বসে।

আমি এক ছুটে বনবাগান ভেঙে দিলাম ছুট পাকা রাস্তার দিকে। যখন বাদামতলায় দলের মধ্যে এসে পৌঁছলাম তখন আমার গা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

ছেলেরা বললে—কি হয়েচে রে? অমন কচ্ছিস্ কেন?

আমি বললাম—ভূত।

—কোথায় রে? সে কি? দূর—

—বরো বাগদিনী বসে আছে ঝোপের মধ্যে আমড়াতলায়—সেই নদীর ধারের দিকে। স্পষ্ট বসে আছে দেখলাম।

—সে কি রে? তা কখনও হয়?

—নিজের চোখে দেখলাম। এক্কেবারে স্পষ্ট বরো বাগদিনী—

—দূর—চল তো যাই—দেখি কেমন? তোর মিথ্যে কথা—

সবাই মিলে যেতে উদ্যত হোল—কিন্তু সেই সময় দলের চাঁই নিমাই কলু বললে,—না ভাই। ওর কথায় বিশ্বাস করে অতদূর গিয়ে স্কুলে ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। এতক্ষণ

wapsip.com

মাস্টারদের ঘুম ভেঙেচে। হাঁড়ি-বেচা মাস্টারের বেতের বহর জানো তো! সে ঠ্যালা সামলাবে কে? আমি ভাই যাবো না—তোমরা যাও—ওর সব মিথ্যে কথা—

ছেলের দলের কৌতূহল মিটে গেল হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের বেতের বহর স্মরণ করে। একে একে সবাই স্কুলের দিকে চললো। আমিও চললাম।

আমরা গিয়ে দেখি মাস্টার মশায়দের ঘুম খানিক আগেই ভেঙেচে—ওঁদের গতিক দেখে মনে হোল। হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার আমাদের শূন্য ক্লাস রুমের সামনে অধীরভাবে পায়চারি করছিলেন—আমাদের আসতে দেখে বলে উঠলেন—এই যে! খেলা ভাঙলো?

আমরাও বলতে পারতাম, আপনার ঘুম ভাঙলো?...কিন্তু সে কথা বলে কে? তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে আমরা তখন সবাই এতটুকু হয়ে গিয়েছি।

ক্লাসে ঢুকেই তিনি হাঁকলেন—রত্না! অর্থাৎ আমি। এগিয়ে গেলুম।

—কোথায় থাকা হয়েছিল?

আমি তখন নবমীর পাঁঠার মতো জড়সড় হয়ে কাঁপচি। এদিকে বরো বাগদিনী ওদিকে হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার। আমার অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়ে উঠেচে! কিন্তু শেষ অস্ত্র ছিল আমার হাতে, তা ত্যাগ করলাম।

বললাম—পণ্ডিত মশাই, দেরি হয়ে গেল কেন ওরা জানে। এই সর্ব পরামানিকের বাগানে বাদাম কুড়ুতে গিয়ে ভূত দেখেছিলাম—তাই—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের মুখে অবিশ্বাস ও আতঙ্ক যুগপৎ ফুটে উঠলো। বললেন—ভূত? ভূত কি রে?

—আজ্ঞে, ভূত—সেই যারা—

—বুঝলাম বাঁদর। কোথায় ভূত? কি রকম ভূত?

সবিস্তারে বললাম! আমার সঙ্গীরা আমায় সমর্থন করলে। আমায় কি রকম হাঁপাতে হাঁপাতে আসতে দেখেছিল, বললে সে কথা! হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার ডেকে বললেন—শুনচেন দাদা?

রাখাল মাস্টার তামাক খাওয়ার যোগাড় করছিলেন, বললেন—কি?

—ওই কি বলে শুনুন। রত্না নাকি এখুনি ভূত দেখে এসেচে সর্ব পরামানিকের বাগানে।

—সর্ব পরামানিক কে?

—আরে, ওই শ্রীশ পরামানিকের বাবার নাম। ওদেরই বাগান।

আবার বর্ণনা করি সবিস্তারে।

রাখাল মাস্টার গোঁড়া ব্রাহ্মণ,—হাঁচি, টিকটিকি, জল-পড়া, তেল-পড়া সব বিশ্বাস করতেন। গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলেন,—তা হবে না? অপঘাত মৃত্যু—গতি হয় নি—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার একটু নাস্তিক প্রকৃতির লোক। অবিশ্বাসের সুর তখনও তাঁর কথার মধ্যে থেকে দূর হয় নি। তিনি বললেন—কিন্তু দাদা, এই দুপুর বেলা, ভূত থাকবে বাগানে বসে গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে।

—তাতে কি? তা থাকবে না ভূত এমন কিছু লেখাপড়া করে দিয়েচে নাকি? তোমাদের আবার যত সব ইয়ে—

—আচ্ছা চলুন গিয়ে দেখে আসি।

ছেলেরা সবাই সমস্বরে চিৎকার করে সমর্থন করলে।

wapsip.com

রাখাল মাস্টার বললেন,—হ্যাঁ, যত সব ইয়ে—ভূত তোমাদের জন্যে সেখানে এখনও বসে আছে কি না? ওরা হোল কি বলে অশরীরী—মানে ওদের শরীর নেই—ওরা মানে বিশেষ অবস্থায়—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার বললেন—চলুন না দেখে আসি গিয়ে কি রকম কাণ্ডটা, যেতে দোষ কি?

আমরা সকলেই তো এই চাই। এঁরা গেলে এখুনি ইস্কুলের ছুটি হবে এখন। সেদিকেই আমাদের ঝোঁকটা বেশি।

যাওয়া হোল সবাই মিলে।

হুড়মুড় করে ছেলের পাল চললো মাস্টারদের সঙ্গে।

আমি আগে আগে, ওরা আমাদের পেছনে।

সেই নিবিড় ঝোপটাতে আমি নিয়ে গেলাম ওদের সকলকে। যে-দৃশ্য চোখে পড়লো, তা কখনও ভুলবো না—এত বৎসর পরেও সে দৃশ্য আবার যেন চোখের সামনে দেখতে পাই এখনও!

সবাই মিলে ঝোপ-ঝাপ ভেঙে সেই আমড়াতলায় গিয়ে পৌঁছুলাম।

যা দেখলাম, তা অবিকল এই।

আমড়াগাছের তলায় একটা ছেঁড়া, অতি-মলিন, অতি-দুর্গন্ধ কাঁথা পাতা, পাশে একটা ভাঁড়ে আধ ভাঁড়টাক জল। একরাশ আমড়ার খোসা ও আঁটি জড়ো হয়েচে পাশে—কতক টাটকা, কতক কিছু দিন আগে খাওয়া, একরাশ কাঁচা তেঁতুলের ছিবড়ে, পাকা চালতার ছিবড়ে—শুকনো।

ছিন্ন কাঁথার ওপর জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধা বরো বাগদিনী মরে পড়ে আছে। খানিকটা আগে মারা গিয়েচে।

এ সমস্যার কোনও মীমাংসা হয় নি!

আমরা হৈ হৈ করে বাইরে গিয়ে খবর দিলাম। গ্রাম্য চৌকিদার ও দফাদার দেখতে এল। কেন যে বরো বাগদিনী এই জঙ্গলে এসে লুকিয়ে ছিল নিজের ঘর ছেড়ে—এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে! কেউ বললে, ওর মাথা হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কেউ বললে, ভূতে পেয়েছিল।

কিন্তু বরো বাগদিনী মরেছে অনাহারের শীর্ণতায় ও সম্ভবত আশ্বিন কার্তিক মাসের ম্যালেরিয়ায় ভুগে। কেউ একটু জলও দেয় নি তার মুখে।

কে-ই বা দেবে এ জঙ্গলে? জানতোই বা কে?

বরো বাগদিনীর এ আত্মগোপনের রহস্য তার সঙ্গেই পরপারে চলে গেল।

এয়ার গান

হাবুল নাকি পাস করেছে ফার্স্ট হয়ে। কথাটা শুনে গর্বে তার বুকটা তো ফুলে উঠলো দশ হাত। হাওয়ার ওপর ভর করে সে ফিরে এল বাড়িতে ধীরে ধীরে। বিপুল আনন্দে সারা রাত্রি তার ভালরকম ঘুমই হল না। মাকে কথাটা বলতে মা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, "সুখী হও—বড় হও বাবা!'

wapsip.com

সত্যি, তার এই দীর্ঘদিনের খাটুনি সার্থক হয়েচে। বাড়ির লোকের চোখ এড়িয়ে কত রাত্রি জেগে সে বই পড়ে গেছে, তার পড়ার বই একাগ্রচিত্তে। আজ তার পরিণতি ওর প্রথম হওয়া। সকলে তো কথাটা শুনে বিশ্বাসই করতে চায় না। স্কুলের ছেলেরা তো প্রথমে হেসে উড়িয়েই দিয়েছিল একেবারে। সারাদিন যে আড্ডা মেরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সে এত উন্নতি করলে কি করে? তবু হাবুল ফার্স্ট হল—

শীতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে ঝির্ ঝির্ করে। হাবুলের ঘুম ভেঙে গেল; ধড়মড় করে উঠে বসলো। মনে পড়ল গতকালের ঘটনা—তার প্রথম হবার কথা। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে। হাবুল গিয়ে দাঁড়াল তার ছোট-কাকার ঘরের দরজায়। ছোট-কাকা তখন ঘুমুচ্চেন নাক ডাকিয়ে লেপের মধ্যে। হাবুল ডাকল, 'ছোট কাকা—ছোট-কাকা!'

ছোটকাকার ঘুম ভাঙলো। তিনি দু-হাত দিয়ে চোখ রগড়ে উত্তর দিলেন, 'কি রে হাবুল!'

হাবুল বললে, 'কাকা, আমি ফার্স্ট হয়েচি।'

এমন সময় এই সকালে টুনু এসে হাজির হয়। যে হাবুলের কথা শুনে তীব্র প্রতিবাদ করলে, 'কক্ষনো না ছোট-কাকা!'

হাবুল রুখে উঠলো, 'তুই জানিস টুনু!'

টুনুও দমে না একটুও, 'ইস! উনি আবার ফার্স্ট হবেন? তবে যদি টোকেন, সে কথা আলাদা।'

হাবুলের রাগ চড়ে গেল। সে ঠাস করে টুনুর কচিগালে একটা চড় মেরে বললে, 'বাবা সাক্ষী। কাল রাত্রে হেড-মাস্টার মশায় বললেন, জানিস সে-কথা? সকাল বেলা এসেচেন চালাকি কর্তে।'

টুনু গালে হাত বুলোতে থাকে বেদনায়। ছোট-কাকা বললেন, 'ছিঃ, মারলি কেন রে ওকে?'

'দেখলে তো কি হিংসুটে!'

'এ রকম চড় তোমার গালেও পড়বে অখন।' কথার শেষে টুনু ছল ছল চক্ষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পর হাবুল বললে,—'ছোট-কাকা, তুমি বলেছিলে, ফার্স্ট হলে আমাকে একটা এয়ার গান কিনে দেবে।'

'ও!' এতক্ষণ পর ছোট-কাকার আট মাস আগেকার প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে গেল। বললেন, 'বেশ বেশ, কাল কিনে দেবো।'

'কাল না—আজই।'

ঠিক আটমাস আগে হাবুল একদিন ওর ক্লাসফ্রেন্ড ভুলোদের বাড়িতে দেখেছিল তার একটা এয়ার গান। হাবুলেরও একটা এয়ার গান কিনবার ভারি শখ হল। কথাটা তার ছোটকাকাকে বলতে তিনি বললেন 'ফার্স্ট হলে এয়ার গান তোকে প্রাইজ দেবো।'

হাবুল উঠে-পড়ে লেগে গেল প্রথম হবার জন্যে এবং প্রথম হল যথাসময়ে।

সেদিনই সে একটা এয়ার গান কিনে আনলে। তারপর সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে এয়ার গান হাতে ঝুলিয়ে বাড়িময় খুঁজতে লাগলো শিকার। কোথাও বসেছে একটা অসহায় চড়াই কিংবা পায়রা। তাকে লক্ষ করে এয়ার গানে আওয়াজ হল ফট্ ফট্ শব্দে। পাখি উড়ে পালালো অক্ষত শরীরে আর গুলি বেরিয়ে গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে, পাখির দশ হাত

wapsip.com

তফাত দিয়ে প্রায়।

হতাশ হয়ে ও ফিরে এল হাত-ঠিক করবার জন্যে, যাতে সে পুনরায় না লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ঘরের দরজার চৌকাঠে বসে, ও লক্ষ্য করলে দেওয়ালে টাঙানো একটা বিলিতি ক্যালেন্ডারে ছবির মুখ। অনেকক্ষণ পর তার এয়ার গান থেকে শব্দ বেরুল ফট্ করে—গুলিও ছুটে চল ছবিতে একটা ছেলের ঠিক মুখের পানে। তারপর আওয়াজ হল ঝন্-ঝন্-ঝন্। ভয়ে হাবুলের মুখ হয়ে গেল পাংশু। সে দৌড়ে গেল। দেখলে মেঝেতে ছড়ানো অগুনতি কাচের টুকরো। আস্তে আস্তে ক্যালেন্ডারটা তুলে ধরতে দেখলে, দেওয়ালে কালী ঠাকুরের একখানা পট ফ্রেম দিয়ে মুড়ে কাচ দিয়ে ঢাকা। ছবিখানাকে ক্যালেন্ডারটা ঢেকে ছিল এতক্ষণ। লোহার গুলির ঘায়ে ভঙ্গুর কাচই গেছে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে। বুকের ভেতরটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠলো আতঙ্কে। চোখের সামনে লক লক করতে লাগলো কালী ঠাকুরের দীর্ঘ জিভ। ভয়ে ও ভাবনায় সে মুষড়ে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে ফেললে কাচগুলো। মা জানলে তো এক্ষুনি রসাতল করে ফেলবেন।

তখন মধ্যাহ্ন প্রায়। হাবুল ধীরে ধীরে চলে গেল ছাতের 'চিলকুঠরি'র ভেতর। সেখান থেকে লক্ষ্য করলে পাশের বাড়ির আঙিনায়-বসা একটা কাককে। কাকও সঙ্গে সঙ্গে উড়ে পালিয়ে গেল তাকে বিদ্রূপ করে হয়তো। হাজার হোক, কাক বড় ধূর্ত প্রাণী।

নিচে যেতে হাবুলের আর সাহস হচ্ছে না। টুপ করে বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে একটা চটের উপর বসে থাকে জানলা দিয়ে দূরের পানে তাকিয়ে। কাক কিংবা পায়রা কিংবা চড়াই এলে, ও গুলি ছুড়ে মারবে তাকে। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে ও সামনের বাড়ির ট্রাঙ্কটাকে লক্ষ্য করে ফেলে। গুলির আঘাতে ট্রাঙ্কটাও বেজে ওঠে ঝন্-ঝন্-ঝন্।

মনে আবার আনন্দ ফিরে আসে। হ্যাঁ, তার হাত অনেকটা ভাল হয়েছে। আবার সে লক্ষ্য করে পাঁচিলের ওপরের একটা ফুল গাছের টবে। সেটায় আওয়াজ হয় খট্ করে।

আনন্দ ওর বেড়ে যায় চতুর্গুণ। বন্দুকটা নেড়েচেড়ে ভাল করে পরীক্ষা করে। হ্যাঁ, একদিন ও বড় বন্দুকও ছুঁড়তে পারবে নিশ্চয়। এই হল তার সূচনা। বড় হলে সে চলে যাবে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে মঙ্গো পার্কের মত। অসংখ্য জন্তু-জানোয়ার শিকার করে, ও দেখাবে ওর শৌর্য-বিক্রম। বাঙালী ভীরু নয়—বীরের জাতি—ও তা প্রমাণ করবে। খবরের কাগজের পাতায় পাতায় ওর ফটো ছাপানো হবে। ও দাঁড়িয়ে থাকবে হাফ প্যান্ট পরে বন্দুক হাতে, আর পায়ের কাছে পড়ে থাকবে বিরাটকায় হিংস্র জন্তুর নিহত দেহটা। পুলকে ওর হৃদয় ভরে গেল এখনই। কৃষ্ণ মহাদেশের গভীর অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসবে মানুষ-খাদক জাতি সভ্য মানুষের গন্ধে, ও তাদের দেখে ভয় পাবে না একটুও। বরং ওর বন্দুক ছুঁড়ে দেবে গুড়ুম-গুড়ুম-গুড়ুম। শিক্ষা হয়ে যাবে তাদের রীতিমত। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে কতকগুলো ইতস্তত ভূমিতে। আর সবাই পালিয়ে যাবে এই আশ্চর্য কল দেখে। নিরীহ হাবুল এখনই যে নিষ্ঠুর শিকারী হয়ে উঠলো সম্পূর্ণরূপে! রক্ত-প্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠলো ওর ধমনীতে ধমনীতে। ও পায়চারি করতে লাগলো ঘরের ভেতর এয়ার গানটা হাতে ঝুলিয়ে আফ্রিকার রোমাঞ্চকর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে। অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে ও ইতিহাসের পাতায়। নেপোলিয়ন কিংবা নেলসনের চেয়ে ও কোন অংশে হেয় নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন নাকি পেছনে হাত দিয়ে নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর পাশ দিয়ে শন্ শন করে গুলি চলে গেলেও তিনি গ্রাহ্য করতেন না আদৌ। ঠিক সেই ভঙ্গিমায় সেই স্বর্গীয় বীরের অনুকরণে ও দাঁড়িয়ে রইলো ঘরের মধ্যে জানলার পানে মুখ করে।

wapsip.com

কিন্তু ও কি? সামনের বাড়ির ট্রাঙ্কের ওপর একটা বাঁদর যে? তাই এত কাক ডেকে উঠছে অবিশ্রান্ত, তাদের বিকট রব তার কানে যায় নি এতক্ষণ। কারণ সে কলকাতা ছেড়ে এযাবৎ আফ্রিকার গভীর অরণ্যে পড়ে ছিল শিকারের খোঁজে। ওর বুকের ভেতরটা যেন দুর দুর করে উঠলো। ও ওর বন্দুকটা একবার ভাল করে দেখে নিলে—বাঁদরটা বেশ বড় এবং হৃষ্টপুষ্ট। আর ওদিকে বাঁদরটা ঝুপ্ করে হাবুলের ঘরের দরজার কাছে এসে উপস্থিত হল। বীর পুরুষের কাঁপুনি শুরু হয়, রীতিমত হাঁটুতে-হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লেগে যায়, নেলসনের ও নেপোলিয়নের মত। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বাঁদরটার পানে। ঘরের এক পাশে ছিল একছড়া বড় বড় চাঁপা কলা। বাঁদরটা একপা একপা করে এগিয়ে আসে সেই কলার দিকে—বাঁদর নাকি কলা খেতে বড় ভালবাসে। হাবুলের সামনে এই নিদারুণ ডাকাতি ঘটে যায়! সে আর দেখতে পারে না, মরীয়া হয়ে, তার সমস্ত শক্তি একত্র করে দাঁড়ায় কলা ও বাঁদরের মাঝখানে জন্তুটাকে এয়ার গান দিয়ে লক্ষ্য করে। এয়ার গানের ঘোড়া দিলে টিপে; কিন্তু তাতে গুলি পোরা ছিল না একটাও। সুতরাং বাঁদরের ক্ষতি হয় না আদৌ। পরন্তু তার রাগ বেড়ে যায় এই বাধা দেওয়ার জন্যে। সে ত্বরিতে এসে হাবুলের গালে মারলো একটা বিরাশি সিক্কার চড়। বেচারার মাথা ঘুরতে থাকে বন্ বন্ করে। নেপোলিয়ন গালে হাত দিয়ে দাঁড়ায়। এয়ার গান পড়ে থাকে তার পদতলে। বাঁদরটাও সুযোগ বুঝে এয়ার গানটা নিয়ে উধাও হয় পাশের নিমগাছের ডালে। হাবুলও প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে বাঁদরের এই বেয়াদপি দেখে। মনে পড়ে টুনুর গালের ব্যথা আর কালীর ছবির কাচ ভাঙার কথা?

তার চিৎকার শুনে ছুটে আসেন মা, দাদা, ছোট-কাকা, মায় টুনু। হৈচৈ পড়ে যায়, 'কি হয়েচে রে হাবুল? কি হয়েছে?

নিরুত্তর হাবুল করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকে পলাতক বাঁদরের পানে। টুনু তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'ওই দেখ ছোট-কাকা, ছোড়দার এয়ার গান বাঁদরের হাতে।'

'কি ছেলে রে তুই? বাঁদরে তোর হাত থেকে এয়ার গানটা নিয়ে গেল? অমন খাসা জিনিসটা, ন-টাকা দশ আনা দাম!

আর হাবুল?—সে অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে নিষ্ঠুর অপমানে ও পরাজয়ে হৃদয় ভারাক্রান্ত করে।

শুভ কামনা

১৯২৫ সালের কথা। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম সুধীরবাবুদের দোকানে যাই। সেখান তখন প্রতি বিকালে একটি সাহিত্যিক আড্ডা হোত। আমি তখন নতুন সাহিত্যিক, 'প্রবাসী'তে কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছি মাত্র—এবং 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের খসড়া করচি। তাঁদের এই বৈকালিক আড্ডাটি আমার বড় ভাল লাগতো। কাজকর্মের অবসরে মাঝে মাঝে 'মৌচাক', আপিসে এসে এই আড্ডাতে যোগ দিতাম। ১৯২৯ সালে আমি কলকাতায় আবার ফিরে আসি, কয়েক বৎসর বিহার প্রবাসের পরে। ওই বৎসরেই 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হয়। ঐ সাল থেকে 'মৌচাক' আপিসে আমার যাওয়া আসা বাঁধা নিয়মে শুরু হয়ে গেল।

অনেক সাহিত্যিক, শিল্পী, মজলিসী ও রসিক ব্যক্তির সমাগমে 'মৌচাক'-এর এ আড্ডা গমগম করতো। এইখানে বন্ধুবর হেমেন্দ্রকুমার রায়, মনীন্দ্রলাল বসু, সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। সুধীরবাবুর আদর আপ্যায়নে কত বর্ষার

wapsip.com

বৈকাল ও শীতের সন্ধ্যায় চায়ের মজলিস এখানে সরস ও আনন্দময় হয়ে উঠেচে। কত ঠোঙা ঠোঙা 'অবাক জলপান' ফেরি-ওয়ালার ঝুলির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বাদল দিনে অতিথি সৎকারে সহযোগিতা করেচে; 'মৌচাক'-এর ইতিহাসের সঙ্গে সে সবের ইতিহাসও জড়ানো।

একদিন সুধীরবাবু বললেন—বিভূতিবাবু, মৌচাকের জন্যে লিখবেন?

আমি তো একপায়ে খাড়া। বললুম—নিশ্চয়ই।

—কি লিখবেন বলুন। ছেলেদের উপন্যাস দিন। কি বলেন?

এভাবে ছেলেদের জন্য লেখা উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়'-এর সূত্রপাত। সুধীরবাবুর উৎসাহ না পেলে হয়তো ও বই লেখাই হোত না।

আজকাল কলকাতা থেকে দূরে বাস করি। কিন্তু 'মৌচাক'-এর বৈকালিক আড্ডার আকর্ষণ এমন মোহ বিস্তার করেচে মনে, যে, কলকাতায় এলেই ওখানে না গিয়ে পারি না। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও যাওয়া চাই-ই। বন্ধুবর সরোজ রায়চৌধুরী আসে, মণীন্দ্র বসু আসে, সুধীরবাবু ও অপূর্ববাবু তো থাকেনই—অতীত দিনের আনন্দ মুহূর্তগুলি আবার যেন সজীব হয়ে ওঠে। সে সব দিনের হারানো অনুভূতিগুলি আবার যেন ফিরে পাই। সেজন্যই 'মৌচাক কাগজের ওপর আমার কেমন একটা ব্যক্তিগত টান আছে—এর ভালমন্দ ব্যক্তিগত লাভক্ষতির দৃষ্টি নিয়ে দেখি।

আমি জানি 'মৌচাক' শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দবর্ধন করে না। তাদের পিতামাতারও অবসর বিনোদনে যথেষ্ট সাহায্য করে।

চাঁইবাসায় একটি বন্ধু গভর্নমেন্টের এনজিনিয়ার ও বিদ্বান ব্যক্তি। আমায় বললেন—এবার 'মৌচাক'-এ হেম বাগচীর 'গরমেটো' কবিতা পড়েছেন?

আমি বললুম—এখনও পড়ি নি।

—পড়ে দেখবেন। চমৎকার রস আছে ওর মধ্যে। আজ দুপুরে মশগুল হয়ে ছিলাম 'মৌচাক' খানা নিয়ে।

এ রকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। একটা মাত্র মনে হোল।

'মৌচাক'-এর লেখা যখন লিখতে বসি, তখন কল্পনা নেত্রে দেখি বহু ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও তাদের কর্মক্লান্ত পিতাঠাকুরদের উৎসুক দৃষ্টি, সবাই যেন এই লেখার দিকে চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টে—তবে অক্ষমতার জন্যে তাদের সে ঔৎসুক্য চরিতার্থ হয়তো সব সময় করে উঠতে পারি না—সে কথা আলাদা।

wapsip.com

গ্রন্থ পরিচয়

‘চাঁদের পাহাড়’

‘চাঁদের পাহাড়’ বিভূতিভূষণ রচিত প্রথম শিশুদের উপন্যাস। ‘চাঁদের পাহাড়’ পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে ধারাবাহিক রচনা হিসাবে সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত ছোটদের সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা ‘মৌচাক’-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। রচনাকাল : ‘মৌচাক’, আষাঢ় ১৩৪২—চৈত্র ১৩৪৩। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ : ‘চাঁদের পাহাড়’, প্রথম সংস্করণ : ১৩৪৪ ইং ২৮ জানুয়ারী ১৯৩৭। পৃ. ১৭৫; প্রকাশক : মেসার্স এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, অ্যালবার্ট বিল্ডিং—কলিকাতা।

‘চাঁদের পাহাড়’-এর প্রথম সিগনেট সংস্করণ ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ‘চাঁদের পাহাড়’ সিগনেট সংস্করণে অনেক চিত্র সংযোজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের অনুমোদিত ‘চাঁদের পাহাড়’-এর একটি ছাত্র-পাঠ্য সুলভ সংস্করণ (সম্পূর্ণ গ্রন্থ) অত্যন্ত অল্প মূল্যে সিগনেট প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৩৭১ সালের ২৮ ভাদ্র বিভূতি-জন্ম-দিবসে প্রকাশিত বিভূতিভূষণের রচনার এক সঙ্কলনগ্রন্থ ‘বিভূতি-বিচিত্রা’য় সমগ্র ‘চাঁদের পাহাড়’ উপন্যাস অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিভূতিভূষণ আজীবন ভারতের বাহিরে যাওয়ার ইচ্ছা অন্তরে লালন করিয়াছেন। তাঁহার প্রায় সমগ্র রচনায়, এমন কি একেবারে প্রথম ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’ ইত্যাদিতেও তিনি দূরের হাতছানির কথা বার বার শুনাইয়াছেন। অপু অতি অল্প বয়স হইতেই বাহিরে যাওয়ার ইচ্ছা মনের মধ্যে বহন করিত। ‘চাঁদের পাহাড়ে’র শঙ্কর বিভূতিভূষণ নিজেই। শঙ্কর নামের আড়ালে বিভূতিভূষণ নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছেন। (যিনি ‘বিভূতিভূষণ’ তিনিই ‘শঙ্কর’) শঙ্করের চোখ দিয়াই তিনি ‘চাঁদের পাহাড়ে’র স্বপ্নজগৎ রচনা করিয়াছেন। ‘বিচিত্র জগৎ’ রচনা এবং ভাগলপুর ও পূর্ণিয়ার বিস্তৃত অরণ্য সঙ্কুল আফ্রিকার পটভূমি রচনায় বিভূতিভূষণকে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেই সঙ্গে আফ্রিকা-পর্যটনকারী স্যার এইচ. এইচ. জনস্টন, বোসিটা ফরব্‌স্ প্রভৃতি বিখ্যাত ভ্রমণকারীর রচনাও তিনি সযত্নে অধ্যয়ন করেন। বিভূতিভূষণের উদ্ভিদ্-বিদ্যা ও জ্যোতিষ-তত্ত্বে প্রবল আকর্ষণ ছিল। তার পরেই তিনি বিখ্যাত পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনী এবং নিসর্গ-বর্ণনা পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। পরিণত বয়সেও বালকের মত আগ্রহের সহিত তাঁহাকে 'Wide World' এবং 'National Geographical Magazine' পড়িতে দেখিয়াছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে উক্ত বিদেশী পত্রিকাগুলির শীর্ণ কলেবর এবং অনিয়মিত আমদানির জন্য তাঁহাকে আক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার নিজ গৃহে চামড়ায় বাঁধানো বহু 'Wide World' ও 'National Geographical Magazine' ছিল। তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিতেন।

এত সযত্নে এই সব ভ্রমণ-বিবরণ ও ভূতত্ত্ববিষয়ক নিবন্ধাবলী পাঠ করিতেন বলিয়াই, যে স্থানে কখনও যান নাই—এমন কি এই দেশেরও—সে স্থানের বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে পারিতেন। তাঁহার বহু উপন্যাসে তাঁহার এই শক্তির পরিচয় আছে। সে সব বর্ণনায় অদ্যাপি কেহ কোন ভুল বাহির করিতে পারেন নাই। অথচ অনেক সত্যকার ভ্রমণকাহিনীতেও বহু লেখক তথ্য পরিবেশনে ভুল করিয়া বসেন।

‘অপরাজিত’ উপন্যাসে কলেজ পালাইয়া অপু ও সহপাঠী বন্ধু অনিলের গঙ্গার ধারে বিদেশী জাহাজ দেখিতে যাইবার কথা আছে। তাহারা সেখানে বিদেশে যাইবার নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিত।

wapsip.com

অপুর ফিজি যাইবার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া 'অপরাজিত' উপন্যাস শেষ হয়। (বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৪)। বিভূতিভূষণের চির-পরিব্রাজক অশান্ত মনের পরিচয় তাঁহার প্রথম দিনলিপি, 'স্মৃতির রেখা'তেও পাওয়া যায়। 'স্মৃতির রেখা' বই হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি : "... ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নারাত্রে কাশবনের মধ্য দিয়ে আমি ও নায়েব পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সীমানার কাছে, যেখান ওবেলা মহিষ দেখেছিলাম সেখানে এলাম। মনে হল দূরে আমার বাড়ি। এই জ্যোৎস্না-ওঠা সন্ধ্যায় মার সঞ্চিত হাঁড়িকলসীগুলো পড়ে আছে জঙ্গল ভরা ভিটেতে। মার হাতের সজনে গাছটা এই ফাগুন দিনে জঙ্গলের মধ্যে ফুলে ভর্তি হয়ে উঠছে। কেউ দেখছে না, কেউ ভোগ করছে না। হরি রায়ের জমিটুকু নেবার কথা মা যখন সইমাকে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি জানতেন না যে ছেলে তাঁর ঘরকুনো গেরস্ত গোছের ছাপোষা গেঁয়ো মানুষ হবে না। সে দেশে দেশে বহু দূরে বহু সমাজে পাহাড়ে পর্বতে ঘোড়ায় স্টীমারে ট্রেনে—সারা জগতের অধিবাসী হয়ে বেড়াবে। জীবনের যাত্রাপথের সে হবে উৎসাহী উন্মত্ত পথিক— পথের নেশাতেই ভোর।" (বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪০৯)।

শঙ্করও আফ্রিকার গভীর শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে তাঁবুতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' পাঠ করিত। গ্রহনক্ষত্র অবলোকন করিত। বিভূতিভূষণেরও জ্যোতিষতত্ত্বে গভীর আগ্রহ ছিল। তাঁহারও প্রথম জীবনের প্রিয় গ্রন্থ ছিল বঙ্কিমের 'রাজসিংহ'। 'বিচিত্র জগতে'র প্রবন্ধগুলি তাঁহার চির-যাযাবর মনের মধ্যে আফ্রিকার ভাগ্যান্বেষী পর্যটকের চরিত্র কল্পনা করিতে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বিভূতিভূষণের অন্যান্য রচনার মত 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাস রচনার পিছনেও কিছুটা বাস্তবের ভিত্তি আছে। বারাকপুর গ্রামে বিভূতিভূষণের প্রতিবেশী কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা নলিনীদিদির স্বামী উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বরের অধিবাসী ছিলেন। নলিনীদি বিভূতিভূষণের সইমা হেমাঙ্গিনী দেবীর কন্যা। উপেন্দ্রনাথ দুর্দান্ত বলশালী লোক ছিলেন। তিনি বিবাহের পরে প্রথম যৌবনে, প্রথম মহাযুদ্ধের অনেক আগে, বিভূতিভূষণের বাল্যকালে, বাড়ি হইতে পলাইয়া আফ্রিকায় চলিয়া যান। তিনি আফ্রিকায় ইউগাণ্ডা, আবিসিনিয়া প্রভৃতি স্থানে রেলওয়ে বিভাগে কাজ করিতেন। তখন সেখানে রেল লাইন বসানো হইতেছিল। উপেন্দ্রনাথের সহিত বিভূতিবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। উপেন্দ্রনাথ বহু বৎসর নিখোঁজ থাকিবার পর আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসেন। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে বিভূতিবাবু উপেন্দ্রনাথের নিকটে আফ্রিকার অনেক গল্প শুনিয়াছিলেন। প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রের কাঠামো তিনি উপেন্দ্রনাথের আদলে অঙ্কিত করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথের আফ্রিকা গমনের কথা বিভূতিভূষণের, 'উর্মিমুখর' দিনলিপিতেও পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক অংশ 'উর্মিমুখর' দিনলিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি : "আমাদের পাড়ার সবাই কাল সকালে সাতভেয়ে কালীতলায় যাবে। অভিলাষের নৌকো বলে, ওইপথে অমনি সইমাদের রান্নাঘরে গিয়ে বসলুম। কতকাল পরে যে ওদের রান্নাঘরে গেলাম! নলিনীদিদি যত্ন করে বসালে— চা আর খাবার দিলে, তারপর কত কালের এ গল্প ও গল্প, কত ছেলেবেলার কথা, নলিনীদির বিয়ের সময়কার ঘটনা। ওর স্বামী উত্তর আফ্রিকায় ছিলেন— সেসব গল্প।" (বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০৩)।

বিভূতিভূষণের আফ্রিকা যাইবার আকাঙ্ক্ষা 'উর্মিমুখর' দিনলিপির অন্যত্রও পাওয়া যায় : "বাইরে কোথাও ভ্রমণের একটা পিপাসা আবার জেগে উঠেছে। ভাবচি আফ্রিকা যাব, শম্ভু আজ এসেছিল, সে বললে, তার কে একজন আত্মীয় মাকিনন ম্যাকেঞ্জির আপিসে কাজ করে, তারই সাহায্যে যদি কিছু হয়—দেখবে ও চেষ্টা করে। আজ সারাদিন স্কুলেও ওই কথাই ভেবেচি, বেশিদূর কোথাও যেতে চাইনে, কিন্তু জগতের খানিকটা অন্তত দেখতে চাই।" (বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২০)।

wapsip.com

'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসে উপেন্দ্রনাথ হইয়াছেন প্রসাদদাস—নলিনীদি হইয়াছেন ননীবালাদিদি। প্রসাদদাস যে ভদ্রেশ্বরের লোক ছিলেন সে কথার উল্লেখ অবশ্য 'চাঁদের পাহাড়ে' আছে। *

'সাতভেয়ে তলা'র কালীবাড়ি বনগ্রামের অতি নিকটে। 'সাতভেয়ে তলা'র কালীবাড়িতে ঢিল বাঁধিয়া মানসিক করিবার ব্যবস্থা আছে। 'চাঁদের পাহাড়' লিখিবার কিছু আগে-পরে তিনি বার-দুই সেখানে গিয়াছেন সেকথা তাঁহার 'উর্মিমুখর' দিনলিপিতে পাওয়া যায়। (বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০৪-৫১০)।

সম্প্রতি 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রে 'উপলব্যথিত গতি'র আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রসিত রায়চৌধুরী ওই পত্রিকার আলোচনা বিভাগে হরিনাভি-রাজপুরের প্রসঙ্গে জমিদার মদন রায় এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পোড়ো ভগ্ন মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করের গ্রামের ভগ্ন মন্দিরের বর্ণনা বিভূতিভূষণ সোনারপুর-হরিনাভির মদন রায়ের মন্দির হইতে লইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মদন রায়ের উল্লেখও 'চাঁদের পাহাড়ে' পাওয়া যায়। (সাপ্তাহিক দেশ, ৩০ অক্টোবর ১৯৭০ : প্রসিত রায়চৌধুরীর পত্র দ্র:)।

'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র ডিয়াগো আলভারেজ্-এর চরিত্রের উৎস সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ ক্ষীণ সূত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণের 'গোরক্ষা সভা'র ভ্রাম্যমাণ পর্যবেক্ষক হিসাবে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় রাজ-অতিথিশালায় অবস্থানের বিবরণ তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী 'অভিযাত্রিক'-এ পাওয়া যায়। সেখানে এক আশ্চর্য চরিত্রের ভবঘুরে ভাগ্যান্বেষী পর্যটকের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ভদ্রলোক মহাকবি গ্যেটের 'ফাউস্ট' পড়িতে ভালোবাসিতেন। তিনি রোজ রাত্রিতে আলো জ্বালাইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত গ্যেটের 'ফাউস্ট' পড়িতেন। সঙ্গতির অভাবে তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ তিনি বাঁধাইতে পারিতেন না। তরুণ বিভূতিভূষণের মনে এই ভবঘুরে পর্যটকের কথা চির-জাগরূক ছিল। এই প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ তাঁহার 'অভিযাত্রিক' ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিতেছেন :

"আমি গিয়ে দেখি অত বড় বাংলোতে একজন মাত্র সঙ্গী— আর কোনো অতিথি তখন নেই। জিজ্ঞেস করে জানলুম তিনি প্রায় মাসখানেকের বেশি আছেন রাজ-অতিথিরূপে। ইনি অদ্ভুত ধরনের মানুষ—একাধারে ভবঘুরে দার্শনিক, কবি ও মাইনিং এঞ্জিনিয়ার।

"অনেক দিন হয়ে গেলেও এই ভদ্রলোকের কথা আমার অতি স্পষ্ট মনে আছে। আমার বইগুলির দু-একটি চরিত্রের মূলেও ইনি প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্তমান। পরে এঁর কথা আরও বলচি।" (বিভূতি-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৯২)।

বিভূতিভূষণ 'অভিযাত্রিক' ভ্রমণ কাহিনীতে এই ভদ্রলোকের কথা আরও লিখিতেছেন :

"অথিতিশালায় ফিরে দেখি আমার সঙ্গী টেবিলে আলো জ্বেলে কি লেখাপড়া করচেন। এই ভদ্রলোকটিকে আমার কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হ'ত—কি কাজ করেন, কি ভাবেন, কি ওঁর জীবন, এসব জানতে আমার খুব আগ্রহ ছিল মনে মনে। কিন্তু কোনো কথা সেসব নিয়ে জিজ্ঞেস করা ভদ্রতাসঙ্গত হবে না বলে তাঁর নিজের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ইতিপূর্বে করি নি।

"আজ হঠাৎ কি জানি কেন বললুম— কি লিখচেন?"

"ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, একটা রিপোর্ট লিখচি—"

"— কিসের রিপোর্ট?"

* সংবদাদাতা : সইমা হেমাঙ্গিনীর পুত্র নলিনীদির ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় (বারাকপুর গ্রামসভার সদস্য)

wapsip.com

"— আমি পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়িয়ে দেখলুম ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলে খনিজ সম্পদ যথেষ্ট আছে। কিন্তু এ নিয়ে কেউ কখনো মাথা ঘামায় নি। মহারাজের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করচি। এমন কি, আমার মনে হয় পেট্রোলিয়ামের সন্ধানও এখানে পাওয়া কঠিন হবে না। সেই সব সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট লিখচি। বসুন আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্চি এখানে পেট্রোলিয়ামের খনি থাকা অসম্ভব নয় কেন।

"তারপর ভদ্রলোক আমাকে স্বাধীন ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের ভূ-তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বোঝাতে শুরু করলেন। অনেক কিছু বললেন, আমি কিছু বুঝলাম, বেশির ভাগই বুঝলাম না। কেমন করে পৃথিবীর স্তর দুমড়ে বেঁকে উৎসের সৃষ্টি করে, পেট্রোলিয়াম আর কয়লা একই পর্যায়ভুক্ত জিনিস, আরও সব কত কি।

"ভদ্রলোকের কথাবার্তা আমার বড় ভালো লাগল।

"আমি তাঁর বিষয়ে কখনও কোনো প্রশ্ন করি নি, কেবল পূর্বের প্রশ্নটি ছাড়া। তাঁকে দেখে আমার মনে হল লোকটি বৈষয়িক নয়, অর্থোপার্জন এঁর ধাতে নেই, পয়লা নম্বরের ভবঘুরে মানুষ! সে রাত্রে তাঁর কথাবার্তা শুনে আমার সে ধারণা আরও দৃঢ় হল।

"আমায় তিনি বড়লোক হবার অনেক রকম ফন্দী বাৎলে দিলেন। সামান্য মাইনের চাকরি করে কোনো লাভ নেই। এইসব অঞ্চলের পাহাড়ে কয়লা আছে, পেট্রোলিয়াম আছে, জঙ্গলের কাঠ কেটে চালান দিতে পারলে দু'বৎসরে ফেঁপে ওঠা যায়। তিনি মহারাজকে ভজিয়ে সত্বর একটা মাইনিং সিন্ডিকেট্ গড়ে তুলবেন, এই আগরতলাতেই তাঁর হেড আপিস হবে, কোনো বড় বিলিতি কোম্পানির সঙ্গে তিনি চিঠি চালাচালি করবেন এ নিয়ে— ইত্যাদি অনেক কথা।

"আমি বললুম— আপনি আর কতদিন আছেন এখানে?

"— তা কি বলা যায়? কাজ শেষ না হলে তো যাচ্চিনে। এক মাসের কম নয়, দু মাসও হতে পারে।

"— কলকাতায় বুঝি থাকেন আপনি?

"— সেখানে ছিলাম কিছুদিন। ঢাকাতেও ছিলাম— আরও অনেক জায়গায় ছিলাম। এখানকার কাজ সেরে রেঙ্গুনে যাবার ইচ্ছে আছে। আপার বার্মা অঞ্চলে একবার ঘুরে প্রস্‌পেকটিং করবো। যেতাম এতদিন, শুধু আমার এই শরীরের জন্যে—

"— আপনার কি অসুখ?

"— হজম হয় না যা খাই। তবুও তো আগরতলা এসে অনেক ভালো আছি। দেখেচেন তো কত লেবু খাই, সারাদিনে পনেরো কুড়িটা কাগচিলেবু না খেলে আমার শরীর ভালো থাকে না।

"— আপনার দেশ বুঝি কলকাতায়?

"এ প্রশ্নটি করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বাড়ি ও আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় কিনা। কিন্তু তিনি আমার অযথা কৌতূহলকে তেমন প্রশ্রয় দিলেন না বলেই মনে হল। অন্য কথা পাড়লেন, আবার সেই ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত তথ্য। ধীরভাবে কিছুক্ষণ তাঁর বক্তৃতা শুনবার পরে গেস্ট হাউসের ভৃত্য নৈশ আহারের জন্যে ডাক দিয়ে আমায় সে যাত্রা উদ্ধার করলে।

"খেতে গেলে চাকর আমায় বললে, বাবু, আপনি সাহেবের খবর কি জিজ্ঞেস করছিলেন? উনি এখানে অনেকদিন আছেন, আমরা ওঁর টিকিট বদলে আনি আপিস থেকে। তিনদিন থাকবার পরে টিকিট না বদলালে এখানে থাকতে দেবার নিয়ম নেই। একটা কথা বলচি বাবু, উনি এতদিন আছেন, কখনও কোনো চিঠি আসে নি ওঁর নামে। কেউ নেই বাবু, থাকলে আর চিঠি দেয় না!

"আমি ধমক দিয়ে চাকরটাকে চুপ করালুম। তার অত কথার দরকার কি।

"একদিন দেখি ভদ্রলোক গ্যেটের ফাউস্ট-এর ইংরিজি অনুবাদ পড়ছেন। আমায় ডেকে দু-এক

wapsip.com

জায়গা শোনালেন, গ্যেটে সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। বায়রন যখন যুবক, গ্যেটে তখন বৃদ্ধ, বায়রনের মতো সুশ্রী তরুণ কবিও প্রেমিক গ্যেটের মনে কি রেখাপাত করেছিলেন প্রধানত সেই সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। এই বইখানা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, বহুবার পড়েচেন। সর্বদা সঙ্গে রাখেন।

"আমি তাঁর টেবিলে 'ফাউস্ট'-খানা পড়ে থাকতে দেখলুম বিকেলেও, তখন তিনি বেরিয়ে গিয়েচেন। বই দেখে মনে হয় ভদ্রলোকের অবস্থা ভালো নয়। বইয়ের পাতাগুলো ময়লা, বাঁধুনি আলগা, এত প্রিয় বই অথচ এমন অযত্নে রেখেচেন কেন? হাতে পয়সা থাকলে কি আর বই বাঁধাতেন না?

"বড় দরের কবিকে ভালোবাসে, এমন লোক দুজন দেখলুম আমার ভ্রমণের মধ্যে, বরিশালের সেই শেক্‌স্‌পিয়ারের ভক্ত ভদ্রলোক, আর ইনি। কিন্তু দুজনের মধ্যে একটা বড় তফাত রয়েছে, বরিশালের সে ভদ্রলোকের অবস্থা সচ্ছল, এমন কি তাঁকে ছোটখাটো জমিদার বলা চলে, কিন্তু ইনি একেবারে নিঃসম্বল। অথচ কি অদ্ভুত কাব্যপ্রিয়তা! যত রাত্রেই ফিরতেন, তাঁকে দেখতাম 'ফাউস্ট'-এর কয়েকখানা পাতা না পড়ে কিছুতেই ঘুমোতেন না।

* * *

"অল্পক্ষণ পরেই দেখি আমার গেস্ট-হাউসের বন্ধুটি লম্বা লম্বা পা ফেলে বাঁশবন ভেঙে হাসি মুখে আমাদের দিকেই আসচেন।

"...আমরা তাঁকে পেয়ে যেমন খুশী, তিনিও আমাদের পেয়ে তেমনই খুশী। একটু পরে আমরা সবাই মিলে গান আরম্ভ করলুম...আমার সঙ্গীটি তাঁর বয়স ভুলে আমাদের সঙ্গে গানে আমোদে এমন করে যোগ দিলেন যে সেদিন বুঝলুম তাঁর মনের তারুণ্য, যা জীবনে আর্থিক অসাফল্যে বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নি।

"সেইদিন রাত্রে ফিরে এসে তাঁর জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু আমায় বললেন। শুনে আমার পূর্বের অনুমান আরও দৃঢ় হল, লোকটি পয়সা নম্বরের ভবঘুরে বটে, স্বপ্নালুও বটে।

"তখন আমার অটোগ্রাফ নেবার বাতিক ছিল—বললুম তাঁকে আমার অটোগ্রাফের খাতায় কিছু লিখে দিতে। আজও আমার কাছে তাঁর লেখা আছে—নামটি প্রকাশ করবার অনুমতি তাঁর কাছ থেকে নিই নি, কাজেই নাম এখানে দিলাম না। তবে আমার মনে হয় যে প্রকাশ করলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না—আজকাল কেউ তাঁর নাম জানে না।" বিভূতি-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯)।

আল্‌ভারেজের চরিত্র বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রাসঙ্গিক বোধে, 'অভিযাত্রিক' হইতে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

'চাঁদের পাহাড়ে'ও আছে আল্‌ভারেজের মৃত্যুর পরে আল্‌ভারেজের কাগজপত্রের মধ্যে শঙ্কর তাঁহার খনিজবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষার ডিপ্লোমা দেখিতে পাইয়াছিল। আল্‌ভারেজ শুধু ভাগ্যান্বেষী স্বর্ণসন্ধানী দুর্ধর্ষ পর্টুগীজ পর্য্যটকই ছিল না। 'চাঁদের পাহাড়' গ্রন্থ হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"পরদিন সকলে আল্‌ভারেজের মৃতদেহ সে একটা বড় গাছের তলায় সমাধিস্থ করলে এবং দুখানা গাছের ডাল ক্রুশের আকারে শক্ত লতা দিয়ে বেঁধে সমাধির উপর পুঁতে দিলে।

"আল্‌ভারেজের কাগজপত্রের মধ্যে ওপর্টো খনি বিদ্যালয়ের একটা ডিপ্লোমা ছিল ওর নামে। তাদের শেষ পরীক্ষায় আল্‌ভারেজ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েচে। ওর কথাবার্তায় অনেক সময়েই শঙ্করের সন্দেহ হত যে, সে নিতান্ত মূর্খ, ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে নয়।

"লোকালয় থেকে বহু দূরে এই জনহীন গহন অরণ্যে, ক্লান্ত আল্‌ভারেজের রত্নানুসন্ধান শেষ হল। তার মতো মানুষ রত্নের কাঙাল নয়, বিপদের নেশায় পথে-পথে ঘুরে বেড়ানোই তাদের

wapsip.com

জীবনের পরম আনন্দ, কুবেরের ভাণ্ডারও তাকে এক জায়গায় চিরকাল আটকে রাখতে পারত না।

"দুঃসাহসিক ভবঘুরের উপযুক্ত সমাধি বটে। অরণ্যের বনস্পতিদল ছায়া দেবে সমাধির ওপর। সিংহ, গরিলা, হায়েনা সজাগ রাত্রি যাপন করবে, আর সবার উপরে, সবাইকে ছাপিয়ে বিশাল রিখটার্স্‌ভেল্ড পর্বতমালা অদূরে দাঁড়িয়ে মেঘলোকে মাথা তুলে খাড়া পাহারা রাখবে চিরযুগ।" (বিভূতি-রচনাবলী, নবম খণ্ড, পৃ. ৫৮)।

'অভিযাত্রিক' ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ২২ মার্চ প্রথম প্রকাশিত হয়। অতএব নিঃসন্দেহে 'চাঁদের পাঁহাড়ে'র আল্‌ভারেজ চরিত্রটি 'অভিযাত্রিক' ভ্রমণ-কাহিনীতে উল্লিখিত ভূতত্ত্ববিদ্‌কে লক্ষ্য করিয়া অঙ্কিত । 'থনটন কাকা' গল্পটি অনেক পরে বিভূতিভূষণ রচনা করিয়াছিলেন। 'থনটন কাকা' গল্পের উৎস উক্ত গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে করা হইবে।

রচনা-কৌশলের দিক দিয়াও 'চাঁদের পাহাড়' বিশেষ উল্লেখ্য। সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনীকে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙালীর ছেলে শঙ্করের আফ্রিকার হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যে ও পর্বতে ভ্রমণ আদৌ অবাস্তব বা 'গাঁজাখুরী' বলিয়া মন হয় না—ইহাই লেখকের অসামান্য শক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। লেখক এই সব ভ্রমণকাহিনী বা অ্যাডভেঞ্চার'-এর বই পাঠকালে নিজেকে সেই দেশের সেই আবহাওয়ায় সম্পূর্ণ মিশাইয়া দিতেন, তাঁহার মন সেই পর্যটকদের সঙ্গী হইয়া সঙ্গে চলিত, সুখ-দুঃখ-অসুবিধা-অস্বস্তি ভাগ করিয়া লইত—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মরণের ডঙ্কা বাজে

'মরণের ডঙ্কা বাজে' কিশোরদের জন্য রচিত বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় উপন্যাস। এই উপন্যাসটিও সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত ছোটদের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'মৌচাক'-এ ধারাবাহিক রচনা হিসাবে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশ কাল : 'মৌচাক', (পৌষ ১৩৪৪— আশ্বিন ১৩৪৬)। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ : 'মরণের ডঙ্কা বাজে', প্রথম সংস্করণ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪০। পৃ. ১৫০। ১৬ পেজী ডবল ক্রাউন সাইজ। প্রকাশক : মেসার্স বি. এন. পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাস চীন ও জাপানের যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়। যেন চীন-জাপানের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে দুইজন কাল্পনিক বাঙালী যুবক ভাগ্যচক্রে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই কাহিনীই এই উপন্যাসটির উপজীব্য। উপন্যাসটি অত্যন্ত সুলিখিত এবং যুদ্ধের বর্ণনা ও চীনের নিসর্গ বাস্তবানুগ করিতে লেখক কোনোরূপ ত্রুটি করেন নাই। চীনের ভূভাগ ও তাহার প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করিবার জন্য লেখক চীনের ভূগোল ও ভ্রমণ কাহিনী প্রচুর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধের airplaneগুলির নাম ও বর্ণনা জানিবার জন্য এক বালক বন্ধু-পুত্রের নিকট হইতেও সাহায্য লইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এ বিষয়ে 'বাঙালী জীবনে রমণী'র রচয়িতা ও বিভূতিসুহৃদ শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শ্রীযুক্তা অমিয়া চৌধুরাণীর 'বিভূতিভূষণের স্মৃতি' নামক স্মৃতিচিত্রণটি দ্রষ্টব্য। রচনাটি ১৩৭৫ সালের ভাদ্র মাসের 'কথাসাহিত্য' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অংশ সেই প্রবন্ধটি হইতে এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

'তিনি ছোটদের সঙ্গেও একেবারে ছেলেমানুষের মত মিশতে পারতেন। তিনি ছোট ছেলেদের জন্য একটা গল্পের বই লিখছিলেন, সেই সময়ে গত দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেই গল্পের বই-এ বিমান যুদ্ধের বর্ণনা দেবার সঙ্কল্প করে একদিন আমাদের বাড়ি এসে হাজির। এসেই আমার বড় ছেলেকে ডেকে বললেন, 'ওরে ভোঁদো, কোথায় তুই, শীগ্‌গির আয় বাবা! কতগুলি 'বমার'-এর নাম আমায় বলে দে।' যুদ্ধের সময় যে সব 'বমার' ইত্যাদি ব্যবহার হত ছেলেরা তাদের বাবার কাছ থেকে

wapsip.com

সব ছবি দেখে তাদের নাম খুব রপ্ত করেছিল, সেটা উনি জানতেন। বড় ছেলে তখন মাত্র ছয় বছরের। সে বিভূতিবাবুর কথা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে খেলে বেড়াচ্ছে, তিনি তার পিছু পিছু দৌড়চ্ছেন আর বলছেন ; 'আয় নারে, তোর বাবা আসবার আগে আমায় বলে দে, তা না হলে তোর বাবা এসে গেলে আমায় জেরা করে মারবে।' ওদিকে আবার বন্ধুকে ভয় আছে, যদি তাঁর অজ্ঞতার জন্য লাঞ্ছিত হতে হয়। ('কথাসাহিত্য', ভাদ্র ১৩৭৫)।

'বিভূতিভূষণ' যখন 'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসটি রচনা করিতে শুরু করেন তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। আমাদের দেশেও যুদ্ধের ধাক্কা আসিয়া লাগে নাই। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাহার বেশিদিন পরের ব্যাপারও নয়। তখন আফ্রিকায় আবিসিনিয়ার যুদ্ধ এবং চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ এবং স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হইয়াছে। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব চলিয়াছে অর্থাৎ ইতালীতে মুসোলিনী এবং জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও চীন-জাপানের যুদ্ধ আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের চিত্তে প্রবল বেগে নাড়া দিয়া যায়। স্বয়ং জওহরলাল নেহরু চীনে যান এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে ভারতীয় মেডিকেল মিশন যায়। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে স্পেনের গৃহযুদ্ধের ভয়াবহতার কথা পাওয়া যায়। তাঁহার শিল্পী চিত্ত যে যুদ্ধের বর্বরতায় অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল দিনলিপির ওই অংশটি পাঠ করিলে তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। প্রাসঙ্গিক বোধে উক্ত অংশটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"স্পেনের বিদ্রোহ কি ভীষণ মূর্তি ধারণ করেচে। বাড়াজোজ শহর বিদ্রোহীরা অধিকার করেচে, রাস্তায় রাস্তায় barricade এবং প্রত্যেক barricade-এর গায়ে মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে আছে, আর স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা মৃতদেহের স্তূপ খুঁজে নিজেদের বাপ, ভাই, ছেলে, স্বামীর দেহ বার করতে ব্যস্ত। মানুষ এখনও কত আদিম যুগে পড়ে রয়েচে তা এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায়। জার্মানিতে বিদ্রোহের সময়েও ঠিক এ ধরনের নিষ্ঠুর কাণ্ড এই সেদিন ঘটে গিয়েচে, Ernest Toller-এর বই পড়লে তা জানা যায়। মানুষের প্রতি মানুষ এমন senseless নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান কি করে করতে পারে ভেবেই পাইনে।

"এর মধ্যে বড় মানুষও জন্মেচে বৈ কি! Ernest Toller-এর ভাষায় বলি ঃ—

"In the war there lived a man among millions—Karl Liebkrecht; his was the voice of truth and of freedom. Even the prison groove could not silence that voice."

এদের ideal যে কি তা বুঝিনে। স্পেনে socialist ও communist-রা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গণতন্ত্র স্থাপন করলে, খুব ভাল কথা। এ পর্যন্ত বুঝি। আবার এল Fascist-এর দল, এরা বিদ্রোহ করচে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, socialist-দের শাসনের বিরুদ্ধে, কিন্তু কি ভীষণ রক্তারক্তি আর নিষ্ঠুরতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্চে, ভাবলে বর্তমান সভ্যতার ওপরে মানুষের আস্থা থাকে না। দলে দলে যুদ্ধের বন্দীদের পুড়িয়ে মারচে, বিষাক্ত গ্যাস পর্যন্ত ব্যবহার করচে।" (বিভূতি-রচনাবলী, উর্মিমুখর, তৃতীয় খণ্ড পৃ. ৫৪৮/৫৪৯)।

'উর্মিমুখর' দিনলিপির রচনাকাল ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর। উপরোক্ত উদ্ধৃতি একেবারে উক্ত গ্রন্থের শেষাংশ হইতে সংকলন করা হইয়াছে। সম্ভবত ইহা ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে লিখিত হইয়াছিল। বিভূতিভূষণ যে কত আগ্রহের সহিত সমসাময়িক ঘটনাবলী পাঠ করিতেন দিনলিপির উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। যুদ্ধের ভয়াবহ এবং সর্বনাশা রূপও বিভূতিভূষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহাই কল্পনায় অনুরঞ্জিত হইয়া 'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসে প্রকাশ করিয়াছেন।

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'র নায়কের নামও বিমল। 'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসের অন্যতম দুই মুখ্য প্রধান চরিত্রের মধ্যে বিমলই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। 'উপেক্ষিতা'র

wapsip.com

বিমলও বিদেশে পাড়ি দিয়াছিল।* এখানেও বিমল রেঙ্গুনে এবং সিঙ্গাপুরে পাড়ি জমাইয়াছিল। পরবর্তীকালে সে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত চীনা জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য সুরেশ্বরকে লইয়া চীনে রওনা হইয়া যায়।

'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসটি বিভূতি-সাহিত্যে এবং বাংলা সাহিত্যে অভিনব। বাংলা সাহিত্যে যুদ্ধের উপন্যাস এখনো বিশেষ রচিত হয় নাই। বিভূতিভূষণই সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম যুদ্ধের কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। 'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসকে বাস্তবানুগ এবং বিশ্বাস্য করিবার জন্য বিভূতিভূষণের চেষ্টা ছিল। চীনের পটভূমিতে যুদ্ধের পরিবেশ রচনায় বিভূতিভূষণ কৃতকার্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থের মধ্যে মহাচীন ও ভারতের সুমহান ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা পাওয়া যায়।

বিভূতিভূষণের ডায়েরীতে 'মরণের ডঙ্কা বাজে' এবং চীনের সম্পর্কে বিশেষ কোনো কথা পাওয়া যায় না। বিভূতিভূষণ সম্ভবত বাল্যে সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় চীন ভ্রমণ পাঠ করিয়াছিলেন। এই রচনাবলীর 'গ্রন্থ পরিচয়' প্রসঙ্গে অন্যত্র সেকথার উল্লেখ করিয়াছি। বিভূতিভূষণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ সালের ৬ ভাদ্র বৃহস্পতিবার ভাবী স্ত্রী শ্রীযুক্তা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিতেছেন : 'আমার বইখানা (মরণের ডঙ্কা বাজে) তোমাদের ভাল লেগেচে, এতে সত্যিই আনন্দ পেলাম। তোমাদের সমজদারিত্ব আছে, তোমাদের ভাল লাগলে অনেকেরই ভাল লাগবে এ আমার ধারণা।' (আমার লেখা, পরিশিষ্ট পত্রাবলী, পৃ. ৯৬)।

মিস্‌মীদের কবচ

'মিস্‌মীদের কবচ' বিভূতিভূষণ রচিত তৃতীয় শিশুদের উপন্যাস। 'মিস্‌মীদের কবচ' পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে ছোটদের কোনো সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। 'দেব সাহিত্য কুটির' কর্তৃক প্রকাশিত 'কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজে'র অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ হিসাবে 'মিস্‌মীদের কবচ' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁহাদেরই সৌজন্যে এই উপন্যাস রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইল।

'মিস্‌মীদের কবচে'র প্রথম প্রকাশ ঃ মিস্‌মীদের কবচ : প্রথম সংস্করণ, ১ এপ্রিল ১৯৪২। পৃ. ৯৯ (সচিত্র) প্রকাশক : দেব সাহিত্য কুটির, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

বিভূতিভূষণ 'মিস্‌মীদের কবচ' রচনা করিবার পূর্বে ছোটদের জন্য দুইটি রোমাঞ্চকর উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটির পটভূমি আফ্রিকার অরণ্য, অন্যটির পটভূমি চীন দেশ এবং চীন ও জাপানের যুদ্ধ। 'মিস্‌মীদের কবচ' প্রকাশিত হইবার ঠিক এক বৎসর পূর্বে বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'মৌচাক' মাসিক পত্রিকায় 'হীরামানিক জ্বলে' উপন্যাস ধারাবাহিক রচনা হিসাবে প্রকাশ শুরু হয়। বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ সালের চৈত্র মাসে উক্ত উপন্যাসের শেষ কিস্তি প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে (বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ বৈশাখ মাস) 'মিস্‌মীদের কবচ' প্রকাশিত হয়। 'হীরামাণিক জ্বলে' 'মিস্‌মীদের কবচে'র আগে আরম্ভ হইলেও অনেক পরে ধারাবাহিক রচনা হিসাবে সমাপ্ত হয় এবং আরও অনেক পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

'মিস্‌মীদের কবচ' গোয়েন্দা কাহিনী। বিভূতিভূষণের অন্য উপন্যাসগুলির মত ইহার পটভূমি অন্যত্র নয়। বাংলা দেশের একটি হত্যাকাণ্ডের কাহিনী এই উপন্যাসে বিবৃত হইয়াছে। বিভূতিভূষণ 'মিস্‌মীদের কবচে'র কাহিনীর আখ্যানভাগের প্রথমাংশ তাঁহার স্বগ্রামবাসী একটি প্রতিবেশী পরিবার হইতে লইয়াছেন। সেই প্রতিবেশী পরিবারে 'মিস্‌মীদের কবচে' উল্লিখিত গাঙ্গুলী মশায়ের মত এক

---

* 'উপেক্ষিতা' (মেঘমল্লার, বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড পৃ. ৩৩৮)।

wapsip.com

প্রবীণ ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহাদের কৌলিক পদবী মুখোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিপত্নীক ছিলেন এবং তেজারতির কারবার করিতেন। ছেলেরা স্ত্রী-পুত্র লইয়া কলিকাতায় বাস করিত। তিনি গ্রামের প্রান্তদেশে অবস্থিত বাড়িতে একাকী থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গী ছিল একটি কুকুর। তেজারতির কারবার এবং গ্রামদেশ বলিয়া ভদ্রলোক বাড়িতে থাকিলে রাত্রিতে প্রায় ঘুমাইতেন না। এক রাত্রিতে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর দ্বারা তিনি নিহত হন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি প্রায় গ্রামের প্রান্তে জঙ্গলের ধারে অবস্থিত ছিল আগে বলিয়াছি। ফলে দেহ যখন গলিয়া পচিয়া ওঠে তখন গ্রামবাসীরা ঘর ভাঙিয়া মৃতদেহ দেখিতে পায়। পুলিশের তদন্তে আততায়ীদের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কালে এই মৃত্যুর ঘটনা চাপা পড়িয়া যায়। এই ঘটনাংশকে অবলম্বন করিয়া এবং কল্পনার আশ্রয় লইয়া বিভূতিভূষণ 'মিস্‌মীদের কবচ' নামক ছোটদের উপন্যাসটি রচনা করিয়াছেন।

'মিস্‌মীদের কবচ' গ্রন্থের আরও কয়েকটি চরিত্রের আদলও বিভূতিভূষণ তাঁহার স্বগ্রাম হইতে লইয়াছেন। লালমোহন ঘোষ বিভূতিভূষণের গ্রামের কাছে গোপালনগর নিবাসী এক ধনী গৃহস্থের নাম। এইরূপ আরও দুই একটি চরিত্রের পরিচয় জানা যায়। বাহুল্য বোধে আর উল্লেখ করা হইল না।

অনেক বিষয়ের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বও বিভূতিভূষণের প্রিয় পাঠ্য-বিষয় ছিল। তিনি একাধিকবার আসাম ভ্রমণ করিয়াছেন। পরশুরামের তীর্থ-ক্ষেত্র এবং মিস্‌মী জাতির কবচের কথা তিনি জানিতেন। বলা প্রয়োজন মুখোপাধ্যায়ের আততায়ীর হস্তে মৃত্যুর ঘটনা ছাড়া এই উপন্যাসের অন্যান্য ঘটনা কাল্পনিক।

তালনবমী

'তালনবমী' ছোটদের জন্য রচিত বিভূতিভূষণের একমাত্র গল্প-গ্রন্থ। 'তালনবমী' প্রকাশের পূর্বে ও পরে বিভূতিভূষণ ছোটদের জন্য বহু গল্প রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি তাঁহার সাধারণ গল্পগ্রন্থের মধ্যেই সংগ্রহভুক্ত হইয়াছে।

'তালনবমী' গল্পগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৫১ (এপ্রিল ১৯৪৪) পৃ. ১০৪। হাফ-ফুলস্কেপ সাইজ। প্রকাশক : রমেশ ঘোষাল, কলিকাতা।

সূচী : তালনবমী, রঙ্কিণীদেবীর খড়্গ, মেডেল, মশলাভূত, বামা, বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি, অরণ্যে, গঙ্গাধরের বিপদ, রাজপুত্র, চাউল। গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে 'মৌচাক' প্রভৃতি ছোটদের মাসিকপত্রে ও পূজা-বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে যে কয়েকটির প্রকাশকাল জানা গিয়াছে তাহা এখানে প্রদত্ত হইল।

১) তালনবমী ('পড়ে পাওয়া' নামে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'মধুমেলা'য় প্রথম প্রকাশিত হয়) মধুমেলা, দেব সাহিত্য কুটির, শারদীয়া ১৩৪৯ (ইং ১৯৪২)।

২) রঙ্কিণীদেবীর খড়্গ (মৌচাক, আশ্বিন ১৩৪৭ (?))

৩) মেডেল (প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'মায়ামুকুর', দেব-সাহিত্য কুটির, শারদীয়া ১৩৪৭ (ইং ১৯৪০)

৪) বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি (সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'শিশু গল্পিকা', দেব সাহিত্য কুটির, শারদীয়া ১৩৪৩)

৫) অরণ্যে (সুনির্মল বসু সম্পাদিত ছোটদের বার্ষিকী, 'আরতি', ইস্টার্ন-ল-হাউস, ১৯৩৮)

৬) গঙ্গাধরের বিপদ (মৌচাক, কার্তিক ১৩৪১)

৭) রাজপুত্র ('অতিথি' নামে 'মৌচাক'-এ প্রথম প্রকাশিত হয়) 'মৌচাক', শ্রাবণ ১৩৪০।

wapsip.com

'তালনবমী' বিভূতিভূষণ রচিত একটি উৎকৃষ্ট গল্প। গল্পটি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত পূজাবার্ষিকী 'মধুমেলা'তে 'পথচেয়ে' নামে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থাকারে মুদ্রণের সময় নাম পরিবর্তন করিয়া গল্পটির নাম 'তালনবমী' রাখা হয়। 'তালনবমী' নামেই গল্প সংকলনটির নামকরণ হয়। গল্পটি সত্যঘটনামূলক। বিভূতিভূষণের প্রতিবেশী এক ভদ্রলোকের বালকপুত্রের জীবনে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। বিভূতিভূষণ সেই বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই এই গল্পটি রচনা করিয়াছেন। গল্পের দুই একটি নামও তিনি প্রতিবেশী পরিবারের পুত্রকন্যাদের নাম হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে তাল কুড়ানো এবং তাল খাওয়ার কথা পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক অংশ 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপি ও 'উৎকর্ণ' দিনলিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 'উৎকর্ণ' দিনলিপির প্রাসঙ্গিক অংশ এবং 'তালনবমী' ('পথচেয়ে') গল্প রচনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব বেশী নয় (১১ অক্টোবর ১৯৩৬—১৬ নভেম্বর ১৯৪১)।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি 'স্মৃতির রেখা'-তে বিভূতিভূষণ লিখিতেছেন :

"জোৎস্না উঠেছে, পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে—এই পাশের তালতলায় গত ভাদ্রমাসে কল্পনা করেছিলাম দুর্গার তাল কুড়ানো, শৈশবে তাল পড়ে থাকলে গাছতলায় কি আনন্দ হোত। কি অপূর্ব আম্র বউলের গন্ধ মাখা জ্যোৎস্না রাত্রিটা! (বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪০৭)।

'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে লিখিতেছেন :

"আমাদের বাড়ির পেছনে বাঁশবাগানটার পথে কাল বিকেলে ঘুম ভেঙে উঠে যাচ্ছি, তখন মনে কি এক অদ্ভুত অনুভূতি হল। যেন কি সব শেষ হয়ে গেছে, কি যাচ্চে, এই ধরনের একটা উদাস মনোভাব। প্রতিবারই এই স্থানটি আমাদের মনে অদ্ভুত ভাব জাগায়। বঙ্গবাসীর কথা, বাবার কথা, চীন ভ্রমণের কথা, কত কি মনে আনে। দরিদ্র সংসারে তালের বড়া খাওয়ার দিন সে কি উৎসব...সেও এই ভাদ্র মাসে। পিসীমা কাল তালের বড়া খাইয়েছিলেন কিন্তু। " (বিভূতি-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬৪)।

'রঙ্কিণীদেবীর খড়্গ' বিভূতিভূষণের একটি বিখ্যাত অলৌকিক গল্প।

ঘাটশীলার রঙ্কিণীদেবীর মন্দির বিখ্যাত। প্রত্যেক রঙ্কিণীদেবীর মন্দিরের কাছে মহুলিয়া নামে গ্রাম থাকে। ঘাটশীলার কাছেও মহুলিয়া নামে গ্রাম আছে। ঘাটশীলার রঙ্কিণীদেবীর মন্দির বহু প্রাচীন। কবি মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' কাব্যেও ঘাটশীলার রঙ্কিণীদেবীর মন্দিরের উল্লেখ আছে।*

পূর্বে ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে রঙ্কিণীদেবীর সম্মুখে নরবলি হইত। সে কথার উল্লেখ তৎকালিক সাময়িক পত্রে পাওয়া যায়। জঙ্গল-সমাকীর্ণ ঘাটশীলায় যে রঙ্কিণীদেবীর মন্দিরের সম্মুখে নরবলি হইত অনুমান করা যায়। (দ্রঃ বিনয় ঘোষ, 'পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি' ১৩৬৩)। বিভূতিভূষণ ঘাটশীলার জনশ্রুতি শুনিয়া ছোটদের জন্য এই গল্পটি রচনা করিয়াছিলেন। গল্পের পরিবেশ তিনি পুরুলিয়া জেলার চেরো গ্রামের পটভূমিকায় রচনা করিয়াছেন। পুরুলিয়া জেলায় জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনের কাছে ওই মাদ্রাজী ও ওড়িয়া বহুল গ্রাম আছে। বিভূতিভূষণ অবশ্য কোনোদিন পুরুলিয়া জেলায় শিক্ষকতা করিতে যান নাই।

'মেডেল' গল্পটির পিছনেও কিছুটা বাস্তবের ভিত্তি আছে। বিভূতিভূষণ ১৯৪০ সালে কলিকাতা খেলাতচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করিতেন। একদিন ক্লাসরুমে ক্লাস লইতে গিয়া অনুরূপ একটি মেডেল লইয়া ছেলেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করিতে দেখিতে পান। তারপর ওই মেডেলটিকে লইয়াই

---

* মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সংস্করণ, পৃ. ১৮)।

wapsip.com

গল্পটি রচনা করেন। বলা বাহুল্য গল্পাংশ কাল্পনিক। কিন্তু গল্পের গ্রাম্য পরিবেশ বিভূতিভূষণের নিজ গ্রাম বারাকপুরের।

'বামা' গল্পের মত অনুরূপ গল্প আরও লিখিয়াছেন। 'নবাগত' গল্পগ্রন্থের 'ঠাকুরদার গল্প' (বিভূতি-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৩৬) এবং 'ছায়াছবি' গল্পগ্রন্থের 'বিপদ' গল্প দ্রষ্টব্য (বিভূতি-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৪২১)। বিভূতিভূষণের 'কুশলপাহাড়ী' গল্পগ্রন্থের 'গল্প নয়' গল্পটিরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয়। বিভূতিভূষণের প্রথম গ্রন্থ 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের কাহিনী ও দীনু পালিত কথিত বুধো গাড়োয়ানের ডাকাতের গল্পেরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয়। (বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৬)। মনে হয় কোন স্থানে এই মূল গল্পটি শুনিয়া থাকিবেন। পরবর্তীকালে তাঁহার রচিত সাহিত্যে তাহা নানাভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে।

'বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি' গল্পের উৎস অজ্ঞাত। তবে গল্পটির পূর্বজ রূপ বা version বীজাকারে 'পথের পাঁচালী'তে পাওয়া যায়। মনে হয় বাল্যে শোনা কোন কাহিনীকে পরবর্তীকালে 'বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি' গল্পে পরিণত করিয়াছেন। 'পথের পাঁচালী' হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে তুলিয়া দিতেছি : "কুঠির মাঠের পথে যে জায়গাটাকে এখন নাল্‌তা কুড়ির জোল বলে ঐখানে আগে— অনেক কাল আগে—গ্রামের মতি হাজরার ভাই চন্দর্ হাজরা কি বনের গাছ কাটিতে গিয়েছিল। বর্ষাকাল—এখানে ওখানে বৃষ্টির জলের তোড়ে মাটি খসিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চন্দর্ হাজরা দেখিল এক জায়গায় যেন একটা পিতলের হাঁড়ির কানামত মাটির মধ্য হইতে একটুখানি বাহির হইয়া আছে। তখনই সে খুঁড়িয়া বাহির করিল। বাড়ি আসিয়া দেখে এক হাঁড়ি সেকেলে আমলের টাকা। তাই পাইয়া চন্দর্ হাজরা দিনকতক খুব বাবুগিরি করিয়া বেড়াইল—এসব সান্ন্যাল মশায়ের নিজের চোখে দেখা।" (বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৫)। গ্রামের পটভূমি বাস্তব। বিভূতিভূষণ গল্পটি নিজ গ্রাম বারাকপুরের পটভূমিকায় রচনা করিয়াছেন।

বিভূতিভূষণ রচিত 'অরণ্যে' রচনাটি সুনির্মল বসু সম্পাদতি 'আরতি' নামক ছোটদের বার্ষিকীতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। (প্রকাশ কাল ১৯৩৮) বিভূতিভূষণের 'ঊর্মিমুখর' ও 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে সিংভূম জেলার গালুডি ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল ভ্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক বোধে উক্ত দুইটি দিনলিপি হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইল :

"... কাল ঘন জঙ্গলের পথে আমরা অনেকদূর গিয়েছিলুম, পথে পড়ল দুখানা সাঁওতালী গ্রাম। বরমডেরা ও কুলামাতো।" (বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯৪)

* * *

"... দুপুরে মহুলিয়ার পোস্ট মাস্টার এসেছিল, কেষ্ট আবার এসেছিল— ওরা বললে সেদিন যে হাতীঝরনায় গিয়ে চা খেয়েছিলুম, তার ওদিকে বাঁকাই বলে গ্রাম আছে, গভীর জঙ্গল তার ওপারে—ধান পাকলে নিত্য হাতীর দল বার হয়। বাসাডেরা ও ধারাগিরির পথ এখন নিরাপদ নয়, কেষ্ট বলছিল। সেদিকে এখন জঙ্গলও খুব ঘন, তাছাড়া বড় বাঘের ভয় হয়েচে,. অনেকগুলো মানুষ গরুকে বাঘে নিয়েচে এ বছর।" (বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯৫)।

* * *

"...রুগ্রামের মুদীর দোকানের সামনে সাঁওতালী নাচ হচ্চে, মাদল বাজার তালে তালে। আমাদের একটা কম্বল পেতে দিলে, আমরা অষ্টমীর চাঁদের নিচে পাহাড়ের সামনের ছোট গ্রামে খাঁটি সাঁওতালী নাচ দেখে বড় আনন্দ পেলুম। কবিরাজের সঙ্গে বসে একটু গল্প করা গেল। তার বাংলোর সামনে কবে রাত্রে চিতাবাঘ এসে দাঁড়িয়েছিল, সাঁওতালদের গোরস্থানে সেবারে ভূত দেখেছিল, ইত্যাদি কত গল্প।" (বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড পৃ. ৪৯৬)।

"সবুজ ঝরনার কাছে এসে বসলুম, ওখানে একটি সুবৃহৎ শিমূল গাছের শাখা নত হয়ে আছে।

wapsip.com

ঝরনার জলের ওপর কুলু কুলু ক্ষীণ শব্দ হচ্চে ঝরনার জলধারার, জ্যোৎস্না রাত্রে ঝরনার জল চিক্ চিক্ করচে, বড় শিমুল গাছের মাথায় একরাশ জোনাকী জ্বলচে, সে এক অপরূপ ছবি। ছবিটা বহুদিন মনে থাকবে। তারপর রুথামের পাহাড়ের একেবারে মাথায় একটা বড় শিলাখণ্ডের ওপরে উঠে বসি। যেদিকে চাই, জ্যোৎস্না-বিধৌত বনরাজি-শোভিত শৈলমালা, দূরে টাটার কারখানার রক্ত-আভা যেন বহু দূরের কোন অজানা আগ্নেয়গিরি অগ্নি-গহ্বরের রক্তশিখার আভা বলে মনে হচ্ছে। পিছন দিকের ঢালুটা সহজ বলে মনে হল, সেখানেই নেমে জঙ্গলের মধ্যে পথ ঠিক করতে পারচিনে। নারীকণ্ঠে বললে কে, এদিক দিয়ে বাবু। চেয়ে দেখি নিচে একটা সাঁওতালদের ঘর। নেমে এলুম তাদের উঠোনে। দুটি মেয়ে ও একটি পুরুষ উঠোনে আগুন জ্বেলে সম্ভবত আগুন পোয়াচ্চে। আমরা তাদের জিজ্ঞেস করলুম—এই বনে পাহাড়ের নিচে আছিস্ কেমন করে, হাতী নামে না?

"তারা সবাই দেখলুম অদৃষ্টবাদী। বললে— বাবু, ভয় করে কি হবে। যেদিন বাঘে নেবে সেদিন নেবেই।

"রুথাম থেকে আমাদের বাংলো প্রায় দু-মাইল, এদিকে রাত হয়েচে, ন-টা বাজে। আর বেশীক্ষণ এসব জায়গায় থাকা ভাল নয় বুঝে দু-জনে বেশ জোর পায়ে হেঁটে রাত পৌনে দশটায় পরিপূর্ণ ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে বাংলোতে পৌঁছে গেলাম।" (বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯৮/ ৪৯৯)।

বিভূতিভূষণ ১৯৩৮ সালের দোলের সময় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার ও 'সুকান্ত সা'র রচয়িতা নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে গালুডি গিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দিনলিপি 'উৎকর্ণে' পাওয়া যায়।

"কলকাতার বাসায় গিয়ে স্নান করে বসে আছি, এমন সময় নীরদবাবুর ড্রাইভার এসে খবর দিলে গাড়ী এসেচে। নীরদবাবু সস্ত্রীক গালুডি যাচ্ছেন, আমায় সেই সঙ্গে যেতে হবে। তখনি জিনিসপত্র বেঁধে ছেঁদে আবার রওনা। নাগপুর প্যাসেঞ্জার বেলা তিনটার সময় গালুডি পৌঁছলো। পথে খড়গপুরের উঁচু ডাঙ্গা ও শালবনের দৃশ্য দেখবার লোভে দুপুরে একটু ঘুম এল না চোখে।

"বহুদিন পরে আবার নামলুম গালুডি। আজ বছর তিন-চার আসিনি— ১৯৩৪ সালের পুজোর পর আর কখনো আসিনি।..." (বিভূতি-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৬)।

* * *

'...এখানে ঝাটি-ঝর্না বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে জঙ্গল আরও অনেক বেশী। ঘন জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে কত গ্রাম রয়েচে। পাহাড়ী ঝর্না তাদের জল যোগাবার একমাত্র স্থান। (বিভূতি-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৮)

* * *

"... আমি ও কনক ডানদিকের পাহাড়টাতে উঠলুম। কনক কিছুদূর গিয়ে আর উঠতে সাহস করলে না—আমি একটা মসৃণ পাথর বেয়ে উঠে গেলুম। খুব ওপরে প্রায় পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকের পাহাড়গুলো চেয়ে দেখলুম। সব পাহাড়ের মাথাতেই বন। আগুন লেগেছিল কিছুদিন আগে, এখনও এ পাহাড়ে একটা মোটা শেকড় ধোঁয়াচ্চে। একটা শিব গাচের রেনু হাতে মেখে মুখে দিলাম, যেন পাউডার মুখে মাখচি এম্নি সাদা হয়ে গেল। নামবার সময় মসৃণ পাথরখানা বেয়ে আর নামতে পারিনে, মাঝামাঝি এসে আটকে গেলাম— অবশেষে একটা শেকড় ধরে এসে নামলুম কনক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমার অবস্থা দেখে অনেকের ভয় হয়ে গিয়েছিল।...

"... রওনা হবার সময়ে দেখি আমার পায়ের আঙ্গুলে পাহাড়ে ওঠবার সময়ে যে চোট লেগেছিল, তার দরুণ দস্তুরমত ব্যথা হয়েছে।" (বিভূতি-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৮)।

wapsip.com

দিনলিপির সহিত 'অরণ্যে' ভ্রমণ কাহিনীর কিছু কিছু গরমিল আছে। সম্ভবত অনেক পরে স্মৃতি হইতে রচনাটি লিখিবার জন্য 'ঊর্মিমুখর' ও 'উৎকর্ণ' দিনলিপির অনেক স্মৃতি ও ঘটনা একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

'গঙ্গাধরের বিপদ' গল্পটি পাঠ করিলে 'দেবযান' উপন্যাসের দীনু পাড়ুইয়ের কথা মনে পড়িয়া যায়। সেও স্ত্রীকে হত্যা করিয়া পুলিসের ভয়ে জঙ্গলে পলাইয়া ছিল এবং সেখানেই তাহার মৃত্যু হয়। সে বুঝিতে পারিত না যে সে মারা গিয়াছে। সে বিদেহী আত্মা। (বিভূতি-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৪৬)।

'গঙ্গাধরের বিপদ' গল্পটি 'দেবযান' রচনা করিবার অনেক পূর্বে রচিত হয়। গল্পটির সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশকাল ঃ 'মৌচাক', কার্তিক, ১৩৪১। 'দেবযান' প্রথম প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১৯৪৪।

'চাউল' গল্পটি বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'কুশল পাহাড়ী' নামক গল্প-গ্রন্থেরও অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। গল্পটির উৎস অজ্ঞাত। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের সময়ের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত এবং ছোটনাগপুরের অরণ্যের পটভূমিকায় রচিত।

হীরামানিক জ্বলে'

'হীরামানিক জ্বলে' বিভূতিভূষণ কর্তৃক ছোটদের জন্য রচিত চতুর্থ উপন্যাস। উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে ধারাবাহিক রচনা হিসাবে সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'মৌচাকে' প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল : (মৌচাক, বৈশাখ ১৩৪৮—চৈত্র ১৩৪৯)। পৃ. ১৫৯, ১৬ পেজী ডবল ডিমাই সাইজ। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত প্রচ্ছদপট, কাগজে বাঁধাই। প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

'হীরামাণিক জ্বলে' উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ ডি. এম. লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৯৬৫ সালের মে মাসে (বঙ্গাব্দ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২), 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর সঞ্চয়ন' প্রকাশিত হয় (প্রকাশক : অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা- ৬)। সম্পূর্ণ 'হীরামানিক জ্বলে' উক্ত সংকলন গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে (বঙ্গাব্দ, আষাঢ় ১৩৭৫) উক্ত 'কিশোর সঞ্চয়নে'র দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে।

'হীরামানিক জ্বলে' সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বিভূতিভূষণ এবং প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও ইতিহাস সম্বন্ধে দু-একটি কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। বিভূতিভূষণের অনেক বিষয়ে আগ্রহের মধ্যে আকাশতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব এবং ভূগোল ও ইতিহাসে গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি ছাত্রজীবনে গভীর আগ্রহের সহিত দেশ ও বিদেশের ইতিহাস পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনেও ইতিহাসের প্রতি গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার প্রথম দিনলিপি 'স্মৃতির রেখা'-তেও পাওয়া যায় ইসমাইলপুর ও আজমাবাদের গভীর অরণ্যে বসিয়া তিনি গভীর আগ্রহের সঙ্গে গীবন (Gibbon) ও বিউরী (Bury) রচিত ইতিহাস গ্রন্থ এবং এমার্সন পাঠ করিতেছেন। তাঁহার ফুটনোট সম্বলিত Everyman's Library সংস্করণ গীবন (Gibbon)-এর 'The Decline and Fall of the Roman Empire' গ্রন্থের কয়েকটি খণ্ড আজিও তাঁহার পারিবারিক গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

বিভূতিভূষণ গভীর আগ্রহের সহিত ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন এবং গল্প রচনার জন্য সেখান হ২তে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের মধ্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট গল্প রচনা করেন, তন্মধ্যে 'মেঘমল্লার', 'নাস্তিক' 'প্রত্নতত্ত্ব', 'স্বপ্ন-বাসুদেব' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শেষ রচনা 'শেষ লেখা' (গল্পটির নামকরণ

wapsip.com

বিভূতিভূষণ জীবিতাবস্থায় করিয়া যাইতে পারেন নাই) গল্পটিও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া রচিত হয়। উপরোক্ত গল্পগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে বিভূতিভূষণের ইতিহাসে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রাচীন যুগের পরিবেশ রচনায় বিভূতিভূষণ যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাহার চিহ্নও গল্পগুলির মধ্যে পরিস্ফুট। এই প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আধুনিক কাল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পরিবেশে রচিত বিভূতিভূষণের আরও একটি উৎকৃষ্ট গল্প 'অন্তর্জলি'র উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'হীরামানিক জ্বলে' দ্বীপময় ভারতকে লইয়া রচিত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। বাঙালী ছেলের দূরাকাঙ্ক্ষার—দূর দেশভ্রমণের কাহিনী বিভূতিভূষণ এ গ্রন্থে পাঠকদের শুনাইয়াছেন। 'হীরামাণিক জ্বলে' উপন্যাসের গল্প ও ঘটনার সংস্থান অভিনব। তবে রচনায় কিছু অসতর্কতার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবত বিভিন্ন মানসিকতার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে কিস্তিতে কিস্তিতে উপন্যাসটি রচনা করিবার জন্য এরূপ হইয়াছে।

'হীরামাণিক জ্বলে' উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি মূল্যবান উক্তি আছে। উক্তিগুলির মধ্যে অশান্ত ভবঘুরে চির-যাযাবর বিভূতিভূষণকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক বোধে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"বিপদের নামে ত্রিশ হাত পেছিয়ে থাকে যারা, গা বাঁচিয়ে চলবার ঝোঁক যাদের সারা জীবন ধরে, তাদের দ্বারা না ঘুচবে অপরের দুঃখ, না ঘুচবে তাদের নিজেদের দুঃখ। লক্ষ্মী যান না কাপুরুষের কাছে, অলসের কাছে—তাদের তিনি কৃপা করেন যারা বিপদকে, বিলাসকে, আরামপ্রিয়তাকে তুচ্ছ বোধ করে।" (বিভূতি-রচনাবলী, নবম খণ্ড, পৃ. ২৮৭)।

বিভূতিভূষণ শান্ত নিরুত্তাপ নিস্তরঙ্গ বাঙালী জীবনকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহার পরিচয় এই উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায় :

"কোথায় সে পড়ে আছে পাড়াগাঁয়ে, পুরোনো জমিদার-ঘরের বিলাসপুষ্ট আয়েসী ছেলেটি সেজে—তাদেরই পূর্বপুরুষ একদিন যে অসিহাতে সপ্তসমুদ্র পাড়ি জমিয়েছিল—তাঁদেরই স্বজাতি, স্বদেশবাসী—আর সে থাকবে দিব্যি আরামে তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে, তেলেজলে, দাদখানি চালের ভাত আর মাছের ঝোলে কোনরকমে পৈতৃক বাঙালী প্রাণটুকু বজায় রেখে চলবে টায়-টায়!

চিরকাল হয়ত এমনি কেটে যাবে তার।

প্রজা ঠেঙিয়েছে খাজনা আদায় করে, পুরোনো চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক টেনে আর পাল-পার্বণে গ্রাম্য লোকজনের পাতে দই মোণ্ডা দিয়ে হাততালি অর্জন করবার প্রাণপণ চেষ্টায় মশগুল হয়ে।" (বিভূতি-রচনাবলী, নবম খণ্ড, পৃ. ২৯৫)।

* * *

"ভারত! ভারত! কত মিষ্টি নাম, কী প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডার! তার নিজের দেশের মানুষ একদিন কম্পাস-ব্যারোমিটারহীন যুগে সপ্তসমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এখানে এসে হিন্দু ধর্মের নিদর্শন রেখে গিয়েছিল, তাদের হাতে গড়া এই কীর্তির ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে গর্বে ও আনন্দে সুশীলের বুক ফুলে উঠল। বীর তারা, দুর্বল হাতে অসি ও বর্শা ধরে নি, ধনুকে জ্যা রোপণ করে নি—সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে—এই অজ্ঞাত বিপদসঙ্কুল মহাসাগর, হিন্দু ধর্মের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিগ্বিজয় করে নটরাজ শিবের পাষাণ-দেউল তুলেছে সপ্তসমুদ্র পারে।

"পরবর্তী যুগের যারা স্মৃতিশাস্ত্রের বুলি আউড়ে টোলের ভিটেয় বাঁশবনের অন্ধকারে বসে বলে গিয়েছিল—সমুদ্রে যেও না, গেলে জাতটি একেবারে যাবে, হিন্দুত্ব একেবারে লোপ পাবে, তারা ছিল গৌরবময় যুগের বীর পূর্বপুরুষদের অযোগ্য বংশধর, তাদের স্নায়ু দুর্ব্বল, মন দুর্বল, দৃষ্টি ক্ষীণ, কল্পনা স্থবির।" (বিভূতি-রচনাবলী, নবম খণ্ড, পৃ. ৩২৯)।

wapsip.com

উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে মানুষ বিভূতিভূষণের মানসিকতা বিধৃত রহিয়াছে। স্থাণু জড়বৎ জীবনকে তিনি ঘৃণা করিতেন। তাঁহার রচিত প্রায় সব ছোটদের রচনাতেই দূরের হাতছানির গল্প শুনাইয়াছেন। তাঁহার প্রধান তিনটি ছোটদের জন্য রচিত উপন্যাসের পটভূমি আফ্রিকা, চীনদেশ এবং দ্বীপময় ভারত। সারা জীবনই তিনি বিশাল বিশ্বের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার ছোটদের রচনায়ও তাহার নিদর্শন প্রচুর।

পরিশিষ্ট

স্বর্গত সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত ছোটদের মাসিকপত্র 'মৌচাক'-এর রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বিভূতিভূষণ এই রচনাটি শুভেচ্ছাসূচক বাণী হিসাবে প্রেরণ করেন। 'শুভ কামনা' রচনাটি এতদুপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ 'জয়ন্তী মৌচাক'-এ মুদ্রিত হয়।

এই ক্ষুদ্র রচনাটিতে বিভূতিভূষণের সাহিত্য জীবনের উন্মেষকাল জানা যায়। ১৯২৫ সালেই বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী' রচনায় হাত দিয়াছেন এবং হাত মকসো করিতেছেন। সময়ের হিসাবে ২/১ বছর এদিক-ওদিক হইতে পারে—কিন্তু মোটামুটি 'পথের পাঁচালী'-র রচনাকাল ইহাই। বিভূতিভূষণ তাঁহার সাহিত্য ও রচনা সম্পর্কে বিশেষ কিছু কোথাও বলেন নাই—সে হিসাবেও এ রচনাটি মূল্যবান।

বিভূতিভূষণ ছোটদের সাহিত্যজগতে কি ভাবে প্রবেশ করিলেন তাও এই ক্ষুদ্র রচনাটিতে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রধানত সুধীরচন্দ্রের উৎসাহে ও আগ্রহে ছোটদের রচনা লিখিতে আরম্ভ করেন। যদিও তিনি 'পথের পাঁচালী'র রচয়িতা।

বিভূতিভূষণের সমগ্র মৌলিক শিশু সাহিত্য রচনার এই সম্পূর্ণ সংকলনে—রচনাটি বিশেষ আর্কষক হইবে বলিয়া মুদ্রিত করা হইল।

অপ্রকাশিত কয়েকটি গল্প

বিভূতিভূষণ রচিত "ভূত" গল্পটি খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত "সপ্তডিঙা" নামক পূজাবার্ষিকীতে বঙ্গাব্দ ১৩৫২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতাবৎকাল গল্পটি কোনো গল্প-সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত "সপ্তডিঙা" হইতে গল্পটি আমাদের উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

"ভূত" গল্পটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। গল্পটির মধ্যে বিভূতিভূষণের প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষা-জীবনের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণ রচিত বিভিন্ন দিনলিপিতে ও ছোট গল্পে "রাখাল মাস্টারের স্কুল", "হাঁড়ি-বেচা মাস্টারের স্কুল" এবং "তুঁততলা স্কুল"-এর কথা পাওয়া যায়। "হাঁড়ি-বেচা মাস্টারের স্কুলে"র এবং "তুঁততলা স্কুলে"র কথা বিভূতিভূষণ তাঁহার "উর্মিমুখর", "উৎকর্ণ", "হে অরণ্য কথা কও" দিনলিপিতেও উল্লেখ করিয়াছেন। বিভূতিভূষণ আনুমানিক ১৯০১/১৯০২ খ্রীস্টাব্দে রাখাল মাস্টারের স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলেন। বিভূতিভূষণের 'উৎকর্ণ' দিনিলপিতে পাওয়া যায়— তিনি ৬ বৎসর বয়সের সময় কেওটা হইতে বারাকপুর গ্রামে ফিরিয়া আসেন। (দ্র. 'বিভূতি-রচনাবলী,' চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪০২)। তাঁহার দিনলিপি 'হে অরণ্য কথা কও"-এর গোড়ার দিকে আছে : তিনি যখন "রাখাল মাস্টারের স্কুলে" ছাত্র ছিলেন—তখন তিনি ও তাঁহার বন্ধু ভরত ("পথের পাঁচালী"র পটু চরিত্র) হাটবারের দিন রায়পাড়ার হাটে নৌকায় খেয়া পারাপার খেলা করিতেন। (দ্র. : 'হে অরণ্য কথা কও', বিভূতি-রচনাবলী সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩৯৫)।

wapsip.com

বিভূতিভূষণের "উর্মিমুখর" দিনলিপিতে 'হাঁড়ি-বেচা মাস্টারের স্কুল' এবং তাঁহার সতীর্থ আফজল, যুগল বোষ্টম এবং গৌর কলুর নাম পাওয়া যায়। বঙ্গাব্দ ১৩১০-১১ সালে বিভূতিভূষণ তুঁততলার স্কুলে পড়িতেন বলিয়া মনে হয় (দ্র. 'উর্মিমুখর', বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২৮)। তখন তাঁহার বয়স ৯/১০ বৎসর। সা-গঞ্জ কেওটা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিভূতিভূষণ সম্ভবত স্বগ্রাম বারাকপুরে "তুঁততলার স্কুলে" ভর্তি হইয়াছিলেন।

বিভূতিভূষণের "রামচরণ চাটুজ্যে—অথর" গল্পেও রাখাল মাস্টারের স্কুলের উল্লেখ পাওয়া যায়। (দ্র. 'ক্ষণভঙ্গুর' গল্প সংকলন)।

তাঁহার "হারুন-অল-রশিদের বিপদ" গল্পেও রাখাল মাস্টারের স্কুলের অনুরূপ পটভূমির পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে কিন্তু মাস্টার মহাশয়ের নাম বিপিন মাস্টার। স্বগ্রাম বারাকপুরে আসিবার পূর্বে সা-গঞ্জ কেওটাতে বিভূতিভূষণ বিপিন মাস্টারের পাঠশালাতে কিছুকাল প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। (বিভূতি-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৩)।

বিভূতিভূষণের "বরো বাগদিনী" নামে একটি গল্পও হুমায়ুন কবির সম্পাদিত "চতুরঙ্গ" ত্রৈমাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। পরে গল্পটি তাঁহার "নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব" নামক গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বরো বাগদিনী বিভূতিভূষণের গ্রাম-নিবাসিনী শ্রমজীবী রমণী। সে বিভূতিভূষণের সমসাময়িক। বিভূতিভূষণের বাল্যে তাহার মৃত্যু হয় নাই।

গল্পটি দীর্ঘদিন আগে পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হইয়া বিভূতিভূষণের কোনো গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ফলে এতকাল লোকচক্ষুর অগোচরে রহিয়াছে। বিভূতিভূষণের অনুরাগী পাঠকবৃন্দের রচনাটি ভালো লাগিবে বিবেচনা করিয়া এখানে মুদ্রিত করা হইল।

বিভূতিভূষণ রচিত 'এয়ারগান' গল্পটি নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত এবং প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক 'দেব সাহিত্য কুটির' কর্তৃক প্রকাশিত ছোটদের পূজাবার্ষিকী 'সোনার কাঠি'তে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

বিভূতিভূষণের পরলোক গমনের পরেও বহুদিন গল্পটি তাঁহার কোনো গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই—লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত গল্পটি সঙ্কলন করিয়া "বিংশ শতাব্দী" নামক সাময়িক পত্রে পূজা সংখ্যায় প্রকাশ করেন। পরে বিভূতিভূষণের পূর্বে প্রকাশিত ও বিভিন্ন গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গল্প লইয়া এবং 'এয়ার গান' গল্পটি সংযুক্ত করিয়া "বাক্স বদল" নামক বিভূতিভূষণের একটি গল্প-সঙ্কলন প্রকাশিত হয় ('বাক্স-বদল', প্রথম সংস্করণ ১৮ জুন ১৯৬৫)।

'বিভূতি-রচনাবলী'র দশম খণ্ডে 'বাক্স-বদল' গ্রন্থটি মুদ্রিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে 'বাক্স-বদল' গল্পটি 'বিভূতি-রচনাবলী'র অষ্টম খণ্ডে 'বিধু মাস্টার' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্প হিসাবে মুদ্রিত হইয়াছে। একমাত্র 'বাচাই' গল্পটি বাদে উক্ত সংকলনের অন্যান্য গল্পগুলিও ইতিমধ্যে বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত গল্প হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 'বাচাই' গল্পটি 'বিভূতি-রচনাবলী'র দশম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

'বাক্সবদল' গ্রন্থে একটি গল্পই মৌলিক। সেটি 'এয়ার গান'। সে গল্পটি নবম খণ্ডে দেওয়া হইল। 'বাক্সবদল' নামে কোন গ্রন্থ রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত আর হবে না।

'বাক্স-বদল' গল্প-সঙ্কলনের 'এয়ার গান' গল্পটি মূলত ছোটদের জন্য রচিত। বর্তমান খণ্ডটিতে শিশু ও কিশোরদের জন্য রচিত বিভূতি-সাহিত্য সঙ্কলিত হইয়াছে। সেই কারণেই 'এয়ার গান' গল্পটিকেও বর্তমান সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

wapsip.com

বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে খ্যাতিমান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায় 'শনিবারের চিঠি'তে "বিভূতিভূষণ ও তাঁর শিশু-সাহিত্য" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি অত্যন্ত সুলিখিত। প্রবন্ধটি হইতে 'এয়ার গান' গল্প প্রসঙ্গে সমালোচনার কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছি :

"একটি পূজা-বার্ষিকীতে প্রকাশিত তাঁর 'এয়ার গান' নামক গল্পটি একটু ভিন্ন ধরনের। হাবুল ফার্স্ট হয়ে এয়ার গান পুরস্কার পেয়েছে। এই এয়ার গান নিয়ে হাবুলের মনে জেগে ওঠে শৌর্য বিক্রম। হাবুল বলে, বাঙালী ভীরু নয়, বীরের জাতি এবং তা সে প্রমাণ করবে। কিন্তু কি "ব্যাথস" সৃষ্টিই করেছেন বিভূতিবাবু হাবুলকে দিয়ে এই গল্পে! যে এয়ার গান নিয়ে বিশ্ব জয় করবার কামনা তার মনকে উত্তেজিত করেছিল, ঘটনাচক্রে কপিধ্বজ কর্তৃক সেই এয়ার গান অপহৃত হ'ল এবং হাবুল তার কাছেই খেল গালে চড়। ভাল ছেলে অথচ ভীতু হাবুলের এই ট্র্যাজেডির মধ্যে যে রস সৃষ্টি হয়েছে, তা বিভূতিভূষণের মত শক্তিমান শিল্পীর দ্বারাই সম্ভব।" (শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭)।

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

—সমাপ্ত—

wapsip.com

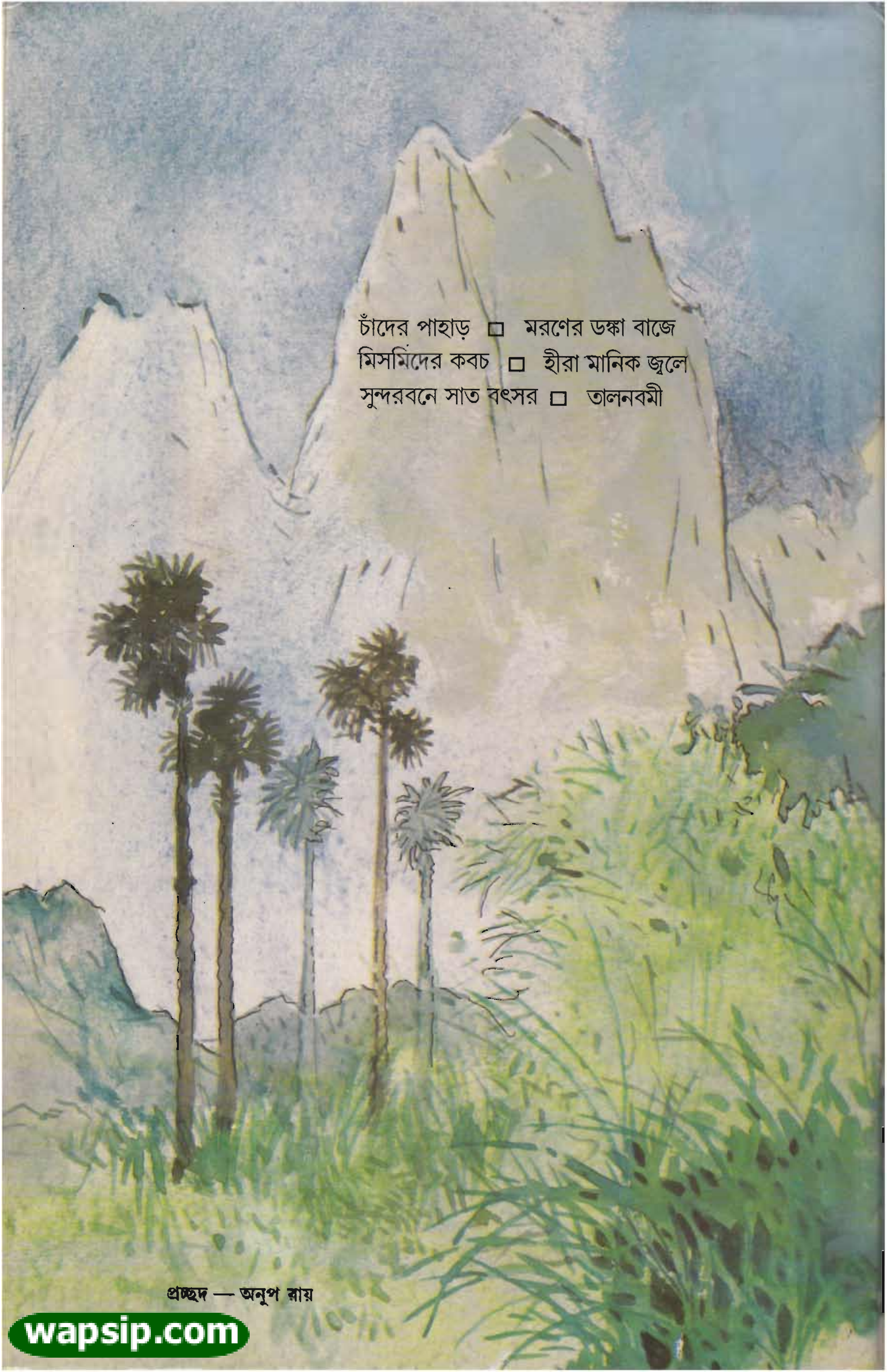

চাঁদের পাহাড় □ মরণের ডঙ্কা বাজে
মিসমিদের কবচ □ হীরা মানিক জ্বলে
সুন্দরবনে সাত বৎসর □ তালনবমী

প্রচ্ছদ — অনুপ রায়

wapsip.com